উপন্যাস সমগ্র

৩

হুমায়ূন আহমেদ

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ১৯৪৬

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশকের পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অষ্টাদশ শতকের নকশী রুমাল অবলম্বনে আলমগীর রহমান

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

UPANYASH SAMAGRA (A Collection of Novels) Vol–III by Humayun Ahmed
Published by PROTIK. 46/2 Hemendra Das Road Sutrapur, Dhaka-1100

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

সৈয়দ শামসুল হক
করকমলে

'দেবী' কী ভাবে লেখা হল বলি। এক সন্ধ্যায় আমার বিভাগের একজন শিক্ষকের বাসায় গিয়েছি। উপলক্ষ মিলাদ কিংবা চায়ের নিমন্ত্রণ, ঠিক মনে নেই। অতিথিরা সব বিদায় নিয়েছেন, স্যার আমাকে যেতে দিচ্ছেন না। যত বারই উঠতে যাই, তিনি বলেন, আরেকটু বস, গল্প করি। সমস্যা হচ্ছে, স্যার গল্প জানেন না। তাঁর সমস্ত কথাবার্তাই কেমিস্ট্রি নিয়ে। এই পৃথিবীতে কেমিস্ট্রি ছাড়াও যে আরো কিছু থাকতে পারে তা তিনি সম্ভবত জানেন না। তা যাই হোক, এক সময় তিনি আমাকে বিস্মিত করে বললেন, 'হুমায়ূন, আমি একটা অদ্ভুত ঘটনা জানি। মন দিয়ে শোন।' আমি কেমিস্ট্রি-বিষয়ক আরেকটি গল্প শোনার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হলাম। স্যার বললেন, —অতিপ্রাকৃত ধরনের এক গল্প। ষোল-সতেরো বছরের এক মেয়ে পদ্মায় নাইতে গেছে। হঠাৎ সে লক্ষ করল কে যেন তার পা চেপে ধরেছে। সে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তাকে নদী থেকে তোলা হল। দেখা গেল, মুণ্ডুহীন প্রায় পচা-গলা একটি শবদেহ তার পা শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে। মেয়েটিকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। দীর্ঘ দিন তার চিকিৎসা চলল। মাঝে মাঝে কিছু দিন ভালো থাকে, আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখন মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ। অসাধারণ গল্প। সব অসাধারণ গল্পের শেষে একটি চমক থাকে। এই গল্পেও আছে। স্যার বললেন, হুমায়ূন, মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবে? সে আমার বাসায় আছে। আমি কথা বলতে চাইলাম। মেয়েটি কিছুতেই আমার সামনে আসতে রাজি হল না।

আমি বাসায় ফিরেই এই মেয়েটিকে নিয়ে 'দেবী'র গল্প লেখা শুরু করলাম। প্রথম বারের মতো মিসির আলি নামের একটি চরিত্র চলে এল। বলতে খুব আনন্দ লাগছে যে, মিসির আলি চরিত্রটি পাঠকের মনে গেঁথে গেল। একটা ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। বিয়েবাড়িতে গিয়েছি। প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড ভিড়, বিরিয়ানির তীব্র গন্ধ। অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছি কখন বিয়েবাড়ির খাওয়া নামক কুৎসিত পর্বটি শেষ হবে, তখন শুনি আমার সামনের টেবিলের এক ভদ্রলোক জনৈক জামান সাহেবের গল্প করছেন। গল্পের এক পর্যায়ে বললেন, আরে ভাই, জামান সাহেবের বুদ্ধি মিসির আলির মতো। লেখক জীবনের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাওয়ার মধ্যে এও এক পাওয়া। 'দেবী'র পরে মিসির আলিকে নিয়ে আরো অনেক গল্প লিখলাম। এখনো লিখছি। 'দেবী' গ্রন্থটি আর কিছু পারুক না-পারুক মিসির আলির জন্ম দিয়েছে। এই কারণেই আমার কাছে বইটির বিশেষ এক গুরুত্ব আছে।

'আমার আছে জল' প্রসঙ্গে বলি। সেবার ঈদ সংখ্যায় লেখার খুব চাপ পড়ল। কাউকেই না করতে পারি না বলেই এক সঙ্গে পাঁচটি পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হয়ে বাসায় এসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। এ কী সমস্যা! অথৈ জল। রাত-দিন লিখে চারটা শেষ করলাম। পঞ্চমটা আর লেখা হয় না। সম্পাদক রোজ এক বার করে আসেন। পঞ্চমটির কাহিনী মাথায় আসেই না। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করেছি। একবার ভাবলাম বাসা থেকে কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যাই। এই অবস্থায় এক সকালে নাশতা খেয়ে আমার মেয়ের পড়ার টেবিলে বসেছি। মেয়ের বাংলা খাতা আমার সামনে। খাতার ভেতর পেনসিল। পেনসিল হাতে নিয়ে অকারণেই লিখলাম—'সোহাগী'। সঙ্গে সঙ্গে গল্প তৈরি হয়ে গেল। কোনো দিকে না তাকিয়ে দুপুর দু'টা পর্যন্ত একটানে লিখলাম। দুপুরে ভালোমতো খেতে পারলাম

না; ভাত-তরকারি সব বিস্বাদ মনে হতে লাগল। আবার লেখার টেবিলে ফিরে গেলাম। যতটুক লিখছি সবটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লিখতে শুরু করলাম। লেখা হল 'আমার আছেজল'।

'এইসব দিনরাত্রি'র গল্প লেখার কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি টিভির জন্যে একটা ধারাবাহিক নাটক। এই ধারাবাহিক নাটকের গ্রন্থরূপ দেয়ার কথা কখনো ভাবি নি। যে-জিনিসের শুরু টিভিতে, তার শেষও টিভিতেই হওয়া উচিত—এই হচ্ছে আমার মনোভাব। একটা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্যে গেলাম বোম্বে। ওয়ার্কশপ শেষে দেশে ফিরছি। কলকাতা হয়ে ফিরব। প্লেনে উঠতে গিয়ে শুনলাম আমার টিকিট নাকি কনফার্মড না, আমি যেতে পারব না। আমাকে দু' দিন অপেক্ষা করতে হবে। এত বড়ো সমস্যায় আমি কখনো পড়ি নি। হাতে টাকাপয়সা খুব অল্প। হোটেল ভাড়া করে দু' দিন থাকা সম্ভব কি না তাও বুঝতে পারছি না। কলকাতা শহরে কাউকে চিনিও না। এয়ারপোর্টের কাছে সস্তার এক হোটেলে উঠলাম। রাত দশটার দিকে হোটেলের অতি ভদ্র এক কর্মচারী এসে বলল, আমি ডলার বিক্রি করতে চাই কিনা। আমি বললাম, না। তারপর বলল, রাতে আমার কোনো বান্ধবী লাগবে কিনা। আমি আতঙ্কে অস্থির হয়ে গেলাম—এ কোথায় এসে উঠেছি! একবার ভাবলাম হোটেল ছেড়ে সুটকেস নিয়ে এয়ারপোর্টের মেঝেতে বসে রাত কাটিয়ে দিই। সেই সাহসও হল না। আমি হোটেলের লোকটিকে বললাম, ভাই, আমি একজন লেখক। নিরিবিলিতে সারা রাত লিখব। আমার কিছু লেখার কাগজ ছাড়া আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই। আপনি যদি আমাকে কিছু লেখার কাগজ জোগাড় করে দিতে পারেন, খুব খুশি হব। লোকটি খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি এত ভয় পেয়েছেন কেন? কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না, আপনি লেখালেখি করুন। এই অবস্থায় নতুন কিছু লেখা সম্ভব না. 'এইসব দিনরাত্রি'র পুরানো গল্প উপন্যাস আকারে লিখতে শুরু করলাম। রাত দু'টার দিকে দরজায় টোকা পড়ল। ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে দরজা খুললাম। ঐ লোক দাঁড়িয়ে। সে খুব আন্তরিক গলায় বলল, এক্সপ্রেসো কফি খাবেন? আপনার জন্যে এক্সপ্রেসো কফি নিয়ে এসেছি। সে এক পট-ভর্তি কফি রেখে গেল আমার টেবিলে। দু' দিন এই হোটেলে ছিলাম। দ' দিন হোটেলের ঘর ছেড়ে বাইরে পা দিই নি। দু' দিনে 'এইসব দিনরাত্রি'র অনেকখানি লেখা হয়ে গেল। আর হোটেলের ঐ লোক আমাকে ক্রমাগত এক্সপ্রেসো কফি খাইয়ে গেল। 'এইসব দিনরাত্রি' বইটি হাতে নিলেই আমি কেন জানি এক্সপ্রেসো কফির গন্ধ পাই। ব্যাপারটা বেশ মজার।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ্ হল।

তৃতীয় খণ্ডের সূচী

দেবী

১

মাঝরাতের দিকে রানুর ঘুম ভেঙে গেল।

তার মনে হল ছাদে কে যেন হাঁটছে। সাধারণ মানুষের হাঁটা নয়, পা টেনে টেনে হাঁটা। সে ভয়ার্ত গলায় ডাকল, 'এই, এই।' আনিসের ঘুম ভাঙল না। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অল্প অল্প বাতাস। বাতাসে জামগাছের পাতায় অদ্ভুত এক রকমের শব্দ উঠছে। রানু আবার ডাকল, 'এই, একটু ওঠ না। এই।'

'কী হয়েছে?'

'কে যেন ছাদে হাঁটছে।'

'কী যে বল! কে আবার ছাদে হাঁটবে। ঘুমাও তো।'

'প্লিজ, একটু উঠে বস। আমার বড়ো ভয় লাগছে।'

আনিস উঠে বসল। প্রবল বর্ষণ শুরু হল এই সময়। ঝমঝম করে বৃষ্টি। জানালার পর্দা বাতাসে পতপত করে উড়তে লাগল। রানু হঠাৎ দেখল জানালার শিক ধরে খালিগায়ে একটি রোগামতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটির দু'টি হাতই অসম্ভব লম্বা। রানু ফিসফিস করে বলল, 'ওখানে কে?'

'কোথায় কে?'

'ঐ যে জানালায়।'

'আহ্, কী যে ঝামেলা কর! নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে।'

'একটু বাতিটা জ্বালাও না।'

'রানু, তুমি ঘুমোও তো।'

আনিস শোবার উপক্রম করতেই ছাদে বেশ কয়েক বার থপথপ শব্দ হল।

যেন কেউ—এক জন ছাদে লাফাচ্ছে।

রানু চমকে উঠে বলল, 'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

'বানর। এ জায়গায় বানর আছে। কালই তো দেখলে ছাদে লাফালাফি করছিল।'

'আমার বড়ো ভয় করছে। একটু উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাও না। পায়ে পড়ি তোমার।'

আনিস বাতি জ্বালাল। ঘড়িতে বাজে দেড়টা। ছাদে আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবু রানুর ভয় কমল না। সে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আনিস বিরক্ত স্বরে বলল, 'এ রকম করছ কেন?'

'কেন জানি অন্য রকম লাগছে আমার। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম আমি যেন . . . .'

কথার মাঝখানে হঠাৎ রানু থেমে গেল। কে যেন হাসছে। ভারি গলায় হাসছে। রানু কাঁপা স্বরে বলল 'হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কে যেন হাসছে।'

'কে আবার হাসবে! বানরের শব্দ। কিংবা কেউ হয়তো জেগে উঠেছে দোতলায়।'

আনিস লক্ষ করল রানু খুব ঘামছে। চোখ-মুখ রক্তশূন্য। বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। দেশলাই জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'কী স্বপ্ন দেখছিলে?'

'দিনের বেলা বলব।'

'কি যে সব কুসংস্কার তোমাদের! এখনো ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভয়টা কিসের? চোর-ডাকাতের, না ভূতের?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, বাতি জ্বালানোই থাক। বাতি জ্বালিয়েই ঘুমাব আজকে। এখন বল দেখি কী স্বপ্ন দেখলে।'

'দিনের বেলা বলব।'

'আহ্, বল না। বললেই ভয় কেটে যাবে।'

রানু আনিসের বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরল। থেমে থেমে বলল, 'দেখলাম, একটা ঘরে আমি শুয়ে আছি। একটা বেঁটে লোক এসে ঢুকল। তারপর দেখলাম সে আমার শাড়ি টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে।'

আনিস শব্দ করে হাসল।

রানু বলল, 'হাসছ কেন?'

'হাসব না? এটা কি একটা ভয় পাওয়ার স্বপ্ন?'

'তুমি তো সবটা শোন নি।'

'সবটা শুনতে হবে না। পরে কী হবে তা আমার জানা। তুমি যা দেখেছ

তা হচ্ছে একটা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি। যুবক-যুবতীরা এ রকম প্রায়ই দেখে।'

'আমি দেখি না।'

'তুমিও দেখ। মনে থাকে না তোমার।'

'আমি স্বপ্ন খুব কম দেখি। যা দেখি তা সব সময় সত্যি হয়। তোমাকে তো বলেছি অনেক বার।'

আনিস চুপ করে রইল। রানু এই কথাটি প্রায়ই বলে। বিয়ের রাতে প্রথম বার বলেছিল। আনিস সে-বারও হেসেছে। রানু অবাক হয়ে বলেছে, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, না?'

'নাহ্।'

'আমি আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, বিশ্বাস করুন আমার কথা।'

রানু এমনভাবে বলল, যেন আনিসের বিশ্বাসের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আনিস শেষ পর্যন্ত হাসিমুখে বলল, 'ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম, এখন দয়া করে আপনি আপনি করবে না।' রানু ফিসফিস স্বরে বলল, 'আপনার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে, সেটাও আমি জানতাম।'

'এটাও স্বপ্নে দেখেছিলে?'

'হুঁ। দেখলাম, একটি লোক খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেটের কাছে একটা মস্ত কাটা দাগ। লোকটিকে দেখেই মনে হল এর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি তাকে বললাম, 'কেটেছে কিভাবে? আপনি বললেন, সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলাম।'

আনিস সে-রাতে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে নি। তার পেটে একটা কাটা দাগ সত্যি সত্যি আছে, এই মেয়েটির সেটা জানার কথা নয়। তবে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে কাটে নি। জামগাছ থেকে পিছলে পড়ে কেটেছে। ব্যাপারটা কাকতালীয়, বলাই বাহুল্য। মাঝে মাঝে এমন দু'-একটা জিনিস খুব মিলে যায়। তবুও কোথায় যেন একটা ক্ষীণ অস্বস্তি থাকে।

বাইরে বৃষ্টি খুব বাড়ছে। ঝড়টড় হবে বোধহয়। শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে জানালায়। একটি কাঁচ ভাঙা। প্রচুর পানি আসছে ভাঙা জানালা দিয়ে, শীত-শীত করছে।

'রানু, চল ঘুমিয়ে পড়ি।'

'সিগারেট শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

বিছানায় ওঠামাত্র প্রবল শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল। বাতি চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শুধু এ অঞ্চল নয়, সমস্ত ঢাকাই বোধ করি অন্ধকার হয়ে গেল। আনিস বলল, 'ভয় লাগছে রানু?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, হাসির গল্পটল্প কর। এতে ভয় কমে যায়। বল একটা গল্প।'

'তুমি বল।'

আনিস দীর্ঘ সময় নিয়ে এক জন পাদ্রী ও তিনটি ইহুদী ও তিনটি মেয়ের গল্প বলল। গল্পের এক পর্যায়ে শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করতে হয়--পাদ্রী তখন কী বলল? এর উত্তরটি হচ্ছে পাঞ্চ লাইন। কিন্তু কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না রানু। সে কি শুনছে না? আনিস ডাকল, 'এই রানু, এই।' রানু কথা বলল না। বাতাসের ঝাপ্টায় সশব্দে জানালার একটি পাল্লা খুলে গেল। আনিস বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই রানু তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি যেও না। খবরদার, যেও না!'

'কি আশ্চর্য, কেন?'

'একটা-কিছু জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে।'

'কি যে বল!'

'প্লিজ, প্লিজ।'

রানু কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?'

'কিসের গন্ধ?'

'কর্পূরের গন্ধের মতো গন্ধ।'

এটা কি মনের ভুল? সূক্ষ্ম একটা গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে ঘরে। ঝন্‌ঝন্‌ করে আরেকটা কাঁচ ভাঙল। রানু বলল, 'ঐ জিনিসটা হাসছে। শুনতে পাচ্ছ না?' বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আনিস কিছু শুনতে পেল না।

'তুমি বস তো। আমি হারিকেন জ্বালাচ্ছি।'

'না, তুমি আমাকে ধরে বসে থাক।'

আনিস অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তুমি ঐ জানালাটার দিকে আর তাকিও না তো।' আনিস লক্ষ করল রানু থরথর করে কাঁপছে, ওর গায়ের উত্তাপও বাড়ছে। রানুকে সাহস দেবার জন্যে সে বলল, 'কোনো দোয়া-টোয়া পড়লে লাভ হবে? আয়াতুল কুর্সি জানি আমি। আয়াতুল কুর্সি পড়ব?'

রানু জবাব দিল না। তার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে নাকি? শ্বাস ফেলছে টেনে টেনে।

'এই রানু, এই।'

কোনোই সাড়া নেই। আনিস হারিকেন জ্বালাল। রান্নাঘর থেকে খুটখুট শব্দ আসছে। ইঁদুর, এতে সন্দেহ নেই। তবু কেন জানি ভালো লাগছে না। আনিস বারান্দায় এসে ডাকল, 'রহমান সাহেব, ও রহমান সাহেব।' রহমান সাহেব বোধহয় জেগেই ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেরুলেন।

'কি ব্যাপার?'

'আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

'কি হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'হাসপাতালে নিতে হবে নাকি?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আপনি যান, আমি আসছি। এক্ষুণি আসছি।'

আনিস ঘরে ফিরে গেল। মনের ভুল, নিঃসন্দেহে মনের ভুল। আনিসের মনে হল সে ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র কেউ–এক জন যেন দরজার আড়ালে সরে পড়ল। রোগা, লম্বা একটি মানুষ। আনিস ডাকল, 'রানু।' রানু তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, 'কি?'

ইলেকট্রিসিটি চলে এল তখনই। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই রহমান সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'এখন কেমন অবস্থা?' রানু অবাক হয়ে বলল, 'কিসের অবস্থা? কি হয়েছে?'

রহমান সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। আনিস বলল, 'তোমার শরীর খারাপ করেছিল, তাই ওঁকে ডেকেছিলাম। এখন কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

রানু উঠে বসল। রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'এখন আমি ভালো।'

রহমান সাহেব তবুও মিনিট দশেক বসলেন। আনিস বলল, 'আপনি কি ছাদে দাপাদাপি শুনেছেন?'

'সে তো রোজই শুনি। বাঁদরের উৎপাত।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'খুব জ্বালাতন করে। দিনে–দুপুরে ঘর থেকে খাবারদাবার নিয়ে যায়।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। নতুন এসেছেন তো। কয়েক দিন যাক, টের পাবেন। বাড়িঅলাকে বলেছিলাম গ্রিল দিতে। তা দেবে না। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনিও বলবেন। সবাই মিলে চেপে ধরতে হবে।'

'জ্বি, আমি বলব। আপনি কি চা খাবেন নাকি এক কাপ?'

'আরে না না। এই রাত আড়াইটার সময় চা খাব নাকি, কী যে বলেন! উঠি ভাই। কোনো অসুবিধা দেখলে ডাকবেন।'

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। রানু চাপা স্বরে বলল, 'এই রাত–দুপুরে ভদ্রলোককে ডেকে আনলে কেন? কি মনে করলেন উনি।'

'তুমি যা শুরু করেছিলে। ভয় পেয়েই ভদ্রলোককে ডাকলাম।'

'কী করেছিলাম আমি?'

'অনেক কাণ্ড করেছ। এখন তুমি কেমন, সেটা বল।'

'ভালো।'

'কি রকম ভালো?'

'বেশ ভালো।'

'ভয় লাগছে না আর?'

'নাহ্।'

রানু বিছানা থেকে নেমে পড়ল। সে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। ভয়ের

কোনো চিহ্নও নেই চোখে–মুখে। শাড়ি কোমরে জড়িয়ে ঘরের পানি সরাবার ব্যবস্থা করছে।

'সকালে যা করবার করবে। এখন এসব রাখ তো।'

'ইস্, কী অবস্থা হয়েছে দেখ না।'

'হোক, এস তো এদিকে।'

রানু হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এল।

'এখন আর তোমার ভয় লাগছে না?'

'না।'

'জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল বলেছিলে!'

'এখন কেউ নেই। আর থাকলেও কিছু যায় আসে না।'

আনিস দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাল। হালকা গলায় বলল, 'এক কাপ চা করতে পারবে?'

'চা, এত রাতে!'

'এখন আর ঘুম আসবে না, কর দেখি এক কাপ।'

রানু চা বানাতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি ফোটার শব্দ হল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে। রানু একা–একা রান্নাঘরে। কে বলবে এই মেয়েটিই অল্প কিছুক্ষণ আগে ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। ছাদে আবার ঝুপঝুপ শব্দ হচ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে বানর এসেছে নাকি? আনিস উঠে গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল। হালকা গলায় বলল, 'ছাদে বড়ো ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে।' রানু জবাব দিল না।

আনিস বলল, 'এই বাড়িটা ছেড়ে দেব।'

'সস্তায় এরকম বাড়ি আর পাবে না।'

'দেখি পাই কিনা।'

'চায়ে চিনি হয়েছে তোমার?'

'হয়েছে। তুমি নিলে না?'

'নাহ্, রাত–দুপুরে চা খেলে আমার আর ঘুম হবে না।'

রানু হাই তুলল। আনিস বলল, 'এখন বল তো তোমার স্বপ্ন–বৃত্তান্ত।'

'কোন স্বপ্নের কথা?'

'ঐ যে স্বপ্ন দেখলে। একটা বেঁটে লোক।'

'কখন আবার এই স্বপ্ন দেখলাম? কী যে তুমি বল!'

আনিস আর কিছু বলল না। চা শেষ করে ঘুমুতে গেল। শীত-শীত করছিল। রানু পা গুটিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো শুয়েছে। একটি হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে আনিসকে। তার ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। জানালায় নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে। মানুষের মতোই লাগছে ছায়াটাকে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে। মনে হচ্ছে মানুষটি হাত নাড়ছে। ঘরের ভেতর মিষ্টি একটা গন্ধ। মিষ্টি, কিন্তু অচেনা।

আনিস রানুকে কাছে টেনে আনল। রানুর মুখে আলো এসে পড়েছে। কী যে মায়াবতী লাগছে! আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ' মাস। আনিস এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। প্রতি রাতেই রানুর মুখ তার কাছে অচেনা লাগে। অপরূপ রূপবতী একটি বালিকার মুখ, যাকে কখনো পুরোপুরি চেনা যায় না। আনিস ডাকল, 'রানু, রানু।' কোনো জবাব পাওয়া গেল না। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন রানু। আনিসের ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে ঠিক করে ফেলল, রানুকে ভালো এক জন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অফিসের কমলেন্দু বাবু এক ভদ্রলোকের কথা প্রায়ই বলেন, খুব নাকি গুণী লোক। মিসির সাহেব। দেখালে হয় এক বার মিসির সাহেবকে।

রানু ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। অপ্রকৃতিস্থ মানুষের হাসি শুনতে ভালো লাগে না, গা ছমছম করে।

২

ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে বের করতে অনেক দেরি হল। কাঁঠালবাগানের এক গলির ভেতর পুরনো ধাঁচের বাড়ি। অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর অসম্ভব রোগা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, 'কাকে চান?'

'মিসির সাহেবকে খুঁজছি।'

'তাকে কী জন্যে দরকার?'

'জ্বি, আছে একটা দরকার। আপনি কি মিসির সাহেব?'

'হ্যাঁ। বলেন, দরকারটা বলেন।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সমস্যার কথা বলতে হবে নাকি? আনিস অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি এ রকম যে, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন, ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। আনিস বলল, 'ভেতরে এসে বলি?'

'ভেতরে আসবেন? ঠিক আছে, আসুন।'

মিসির সাহেব যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। ঘন অন্ধকার। তিন–চারটা বেতের চেয়ার ছাড়া আসবাবপত্র কিছু নেই।

'বসুন আপনি।'

আনিস বসল। ভদ্রলোক বললেন,'আজ আমার শরীর ভালো না। আলসার আছে। ব্যথা হচ্ছে এখন। তাড়াতাড়ি বলেন কি বলবেন।'

'আমার স্ত্রীর একটা ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। আপনার নাম শুনেই এসেছি।'

'আমার নাম শুনে এসেছেন?'

'জ্বি।'

'আমার এত নামডাক আছে, তা তো জানতাম না। স্পেসিফিক্যালি বলুন তো কার কাছে শুনেছেন?'

আনিস আমতা-আমতা করতে লাগল। ভদ্রলোক অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'বলুন, কে বলল?'

'আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক। কমলেন্দু বাবু। আপনি নাকি তাঁর বোনের চিকিৎসা করেছিলেন।'

'ও আচ্ছা, চিনেছি, কমলেন্দু। শোনেন, আমি কিন্তু ডাক্তার না, জানেন তো?'

'জ্বি স্যার, জানি।'

'আচ্ছা, আগে এক কাপ চা খান, তারপর কথা বলব। রুগীটি কে বললেন? আপনার স্ত্রী?'

'জ্বি।'

'বয়স কত?'

'ষোল–সতের।'

'বলেন কী! আপনার বয়স তো মনে হয় চল্লিশের মতো, ঠিক না?'

আনিস শুকনো গলায় বলল, 'আমার সাঁইত্রিশ।'

'এরকম অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করেছেন কেন?'

এটা আবার কেমন প্রশ্ন? আনিসের মনে হল কমলেন্দু বাবুর কথা শুনে এখানে আসাটা ঠিক হয় নি। ভদ্রলোকের নিজেরই মনে হয় মাথার ঠিক নেই। এক জন অপরিচিত মানুষকে কেউ এ রকম কথা জিজ্ঞেস করে?

'বলুন বলুন, এ রকম অল্পবয়েসী মেয়ে বিয়ে করলেন কেন?'

'হয়ে গেছে আর কি।'

'বলতে চান না বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, বলতে হবে না। চা'র কথা বলে আসি। চা খেয়ে তারপর শুরু করব।'

ভদ্রলোক আনিসকে বাইরে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। তারপর আর আসার নামগন্ধ নেই। আট–ন' বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে এক কাপ দারুণ মিষ্টি সর–ভাসা চা দিয়ে চলে গেল। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। আনিস বেশ কয়েক বার কাশল। দু' বার গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'বাসায় কেউ আছেন?' কোনো সাড়া নেই। কী ঝামেলা!

কমলেন্দু বাবু অবশ্য বারবার বলে দিয়েছেন––এই লোকের কথাবার্তার ঠিকঠিকানা নেই। তবে লোকটা অসাধারণ। আনিসের কাছে অসাধারণ কিছু মনে হয় নি। তবে চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। এইটি অবশ্য প্রথমেই চোখে পড়ে। আর দ্বিতীয় যে–জিনিসটি চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে তার আঙুল। অস্বাভাবিক লম্বা লম্বা সব ক'টা আঙুল।

'এই যে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।'

'না, ঠিক আছে।'

'ঠিক থাকবে কেন? ঠিক না।'

লোকটি এই প্রথম বার হাসল। থেমে থেমে বলল, 'আলসার আছে তো, ব্যথায় কাহিল হয়ে শুয়েছিলাম। অমনি ঘুম এসে গেল।'

'আমি তাহলে অন্য এক দিন আসি?'

'না, এসেছেন যখন বসুন। চা দিয়েছিল?'

'জ্বি।'

'বেশ, এখন বলুন কী বলবেন।'

আনিস চুপ করে রইল। এটা এমন একটা ব্যাপার, যা চট করে অপরিচিত কাউকে বলা যায় না। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর মাথার ঠিক নেই, তাই তো?'

'জ্বি না স্যার, মাথা ঠিক আছে।'

'পাগল নন?'

'জ্বি না।'

'তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'মাঝে মাঝে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে।'

'কি রকম অস্বাভাবিক?'

'ভয় পায়। মাঝে মাঝেই এ-রকম হয়।'

'ভয় পায়? তার মানে কি? কিসের ভয়?'

'ভূতের ভয়।'

'ঠিক জানেন, ভয়টা ভূতের?'

'জ্বি না, ঠিক জানি না। মনে হয় এ-রকম।'

ভদ্রলোক একটি চুরুট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে কাশতে বললেন, 'বর্মা থেকে আমার এক বন্ধু এনেছে, অতি বাজে জিনিস।' আনিস কিছু বলল না। তবে এই ভদ্রলোকের স্টাইলটি তার পছন্দ হল। ভদ্রলোক অবলীলায় অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এবং এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আগের কথাবার্তা তাঁর কিছুই মনে নেই।

'এরকম চুরুট চার–পাঁচটা খেলে যক্ষা হয়ে যাবে। আপনাকে দেব একটা?'

'জ্বি না।'

'ফেলে দিতে মায়া লাগে বলে খাই। খাওয়ার জিনিস না। অখাদ্য। তবে হাভানা চুরুটগুলি ভালো। হাভানা চুরুট খেয়েছেন কখনো?'

'জ্বি না।'

'খুব ভালো। মাঝে মাঝে আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়ে যায়।'

ভদ্রলোক চুরুটে টান দিয়ে আবার ঘর কাঁপিয়ে কাশতে লাগলেন। কাশি থামতেই বললেন, 'এখন আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। যথাযথ জবাব দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'
'প্রথম প্রশ্ন, আপনার স্ত্রী কি সুন্দরী?'
'জ্বি।'
'বেশ সুন্দরী?'
'জ্বি।'
'আপনার স্ত্রী কখন ভয় পান--রাতে না দিনে?'
'সাধারণত রাতে। তবে এক বার দুপুরে ভয় পেয়েছিল।'
'ভয়টা কি রকম সেটা বলেন।'
'মনে হয় কিছু-একটা দেখে।'
'সব বার একই জিনিস দেখেন, না একেক বার একেক রকম?'
'এটা আমি ঠিক বলতে পারছি না।'
'এই সময় কি তিনি কোনো রকম গন্ধ পান?'
'আমি ঠিক বলতে পারছি না।'
'যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন কি তাঁর ভয়ের কথা মনে থাকে?'
'বেশির ভাগ সময়ই থাকে না, তবে মাঝে মাঝে থাকে।'
'আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খারাপ।'
'জ্বি।'
'উনি প্রথম কখন ভয় পেয়েছিলেন, বলতে পারেন?'
'জ্বি-না। তবে খুব ছোটবেলায়।'
'প্রথম ভয়ের ঘটনাটা আমাকে বলুন।'
'আমি সেটা ঠিক জানি না।'
'আপনি অনেক কিছুই জানেন না মনে হচ্ছে। আপনার স্ত্রীকে একদিন নিয়ে আসুন।'
আনিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তাকে আনতে চাই না।'
'কেন চান না?'
'সে খুব সেনসিটিভ। সে যদি টের পায় যে, তার এই অস্বাভাবিকতা নিয়ে আমি লোকজনের সাথে আলাপ করছি, তাহলে খুব মন খারাপ করবে।'
'দেখুন ভাই, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করা যাবে না। আপনার স্ত্রী অসুস্থ এবং আমার মনে হচ্ছে এই অসুখ দ্রুত বেড়ে যাবে। আপনি তাঁকে নিয়ে আসবেন।'
আনিস উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনাকে কত দেব?'
ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কমলেন্দু বাবু কি আপনাকে বলেন নি আমি ফিস নিই না? এই কাজটি আমি শখের খাতিরে করি, বুঝতে পারছেন?'
'জ্বি, পারছি।'
'তবে আপনি যদি ভালো গোলাপের চারা পান, তাহলে আমাকে দিতে পারেন। আমার গোলাপের খুব শখ। সব মিলিয়ে ত্রিশটি ডিফারেন্ট ভেরাইটির

চারা আমার কাছে আছে। একটা আছে দারুণ ইন্টারেস্টিং, ঘাসফুলের মতো ছোট সাইজের গোলাপ।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। ওরা বলে মাইক্রো রোজ। হল্যাণ্ডের গোলাপ। কড়া গন্ধ। দেখবেন?'

'আরেক দিন দেখব। আজ দেরি হয়ে গেছে, আমার স্ত্রী একা থাকে।'

'ও, তাই নাকি? শোনেন, একা তাকে রাখবেন না। কখনো যেন মেয়েটি একা না থাকে। এটা খুবই জরুরি।'

রাস্তায় নেমে আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। খামোকা সময় নষ্ট। লোকটি তেমন কিছু জানে না। কমলেন্দু বাবু যে-সব আধ্যাত্মিক শক্তিটক্তির কথা বলেছেন, সে-সব মনে হয় নেহায়েতই গালগল্প। তবে লোকটির কথাবার্তা বেশ ফোর্সফুল। রানুকে বুঝিয়েসুঝিয়ে এক বার এনে দেখালে হয়। ক্ষতি তো কিছু নেই।

তা ছাড়া ভদ্রলোক খুব সম্ভব ফ্যালনাও নন। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রির টিচার। একেবারে কিছু না জেনে তো কেউ মাষ্টারি করে না। কিছু নিশ্চয়ই জানেন। মানুষের চেহারা দেখে কিছু অনুমান করাটাও ঠিক না।

৩

আনিস অফিসে চলে গেলে রানুর খুব একলা লাগে। কিছুই করার থাকে না। গোছানো আলনা আবার নতুন করে গোছায়। বসার ঘরের বেতের সোফা ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়ে। শোবার মেঝে ভেজা ন্যাকড়ায় মুছতে-মুছতে চকচকে করে ফেলে, তবু সময় কাটে না। এক সময় তেতলার বারান্দায় গিয়ে বসে। এ বাড়ির ছোট বারান্দাটি তার খুব পছন্দ। গ্রিল দেওয়া বারান্দাটি গোলাকার। এখানে বসে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সামনেই একটা মেয়েদের স্কুল। টিফিন টাইমে মেয়েগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখতে এমন মজা লাগে! রানু প্রায় সারা দুপুর বারান্দাতেই বসে থাকে। একা-একা ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে না। কেমন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটু যেন ভয়-ভয়ও লাগে।

অবশ্য যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতে থাকে, তখন ভয়-ভয় ভাবটা কমে যায়। বিকেলবেলা বাড়িঅলার মেয়ে দু'টি তাদের ভেতরের দিকের বাগানে বসে মজা করে চা খায়। চা খেতে-খেতে দু' জনেই খুব হাসাহাসি করে। একেক দিন ওদের বাবাও সঙ্গে বসেন, রানুর দেখতে বেশ লাগে।

ছোট মেয়েটির সঙ্গে রানুর কিছু দিন আগে আলাপ হয়েছিল। বেশ

মেয়েটি। খুব স্মার্ট। দেখতেও সুন্দর। এক দিন দুপুরে রানু বারান্দায় এসে বসেছে, মেয়েটি এসে উপস্থিত। মুখে চাপা হাসি। হাতে কি-একটা বই। এসেই বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'কি কথা?'

'আপনি সারা দিন বারান্দায় বসে থাকেন কেন?'

'সারা দিন কোথায়? দুপুরবেলায় বসি। কিছু করার নেই তো, একা-একা লাগে।'

'তা ঠিক। বসব আপনার এখানে? আজ আমি কলেজে যাই নি। বোটানি প্র্যাকটিক্যাল ছিল আজকে।'

মেয়েটি খুব সহজভাবে বলল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে একগাদা কথা বলল। তারপর যাবার সময় হঠাৎ বলল, 'আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কর।'

'আপনি এত সুন্দর কেন? যে আমার চেয়েও সুন্দরী, তাকে আমার ভালো লাগে না।'

রানু কী বলবে ভেবে পেল না। মেয়েটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আমাদের ক্লাসের মেয়েদের কী ধারণা, জানেন? তাদের ধারণা, আমি হচ্ছি বাংলাদেশের সবচে সুন্দরী মহিলা। ওদের এক দিন এনে আপনাকে দেখিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে, দিও। আরেকটু বস। চা খাবে?'

'না, চা আমি বেশি খাই না। বেশি চা খেলে গায়ের রঙ ময়লা হয়ে যায়।'

মেয়েটি যেমন হুট করে এসেছিল, তেমনি হুট করে নিচে নেমে গেল। বেশ লাগল রানুর। নতুন বাসাটা তার ভালোই লাগছে। পুরনো ঢাকায় হলেও বেশ নিরিবিলি। মালিবাগের বাসাটার মতো নয়। নিঃশ্বাস নেবার জায়গা ছিল না সেখানে। পাশ দিয়ে রাতদিন রিকশা যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে। জঘন্য! এই বাসাটা ভেতরের দিকে। বাড়িঅলা ভদ্রলোকও বেশ ভালো মানুষ। প্রথম দিনেই আনিসকে বলেছেন, 'আমার বাড়ি ভাড়া দেবার দরকার নেই। টাকার জন্যেই তো বাড়ি ভাড়া। টাকা যথেষ্ট আছে। তবু দু' ঘর ভাড়াটে রাখি। কারণ এত বড়ো বাড়িতে মানুষ না থাকলে ভালো লাগে না। কবরখানা-কবরখানা ভাব চলে আসে। তবে সবাইকে আমি বাড়ি ভাড়া দিই না। আপনাকে দিচ্ছি, কারণ আপনাকে পছন্দ হয়েছে।'

ভাড়াও খুব কম। মাত্র ছ' শ' টাকা। তিন রুমের এত বড়ো একটা বাড়ি ছ' শ' টাকায় পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। রানু এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে বাথরুম। বড়ো ঝকঝকে একটা বাথরুম। বাসাটা রানুর খুব পছন্দ হয়েছিল। আনিস যখন বলল, 'কি, নেব? পছন্দ হয়?'

'হয়।'

'ভালো করে ভেবে বল নেব কিনা। দু' দিন পর যদি বল পছন্দ না, তাহলে মুশকিলে পড়ব। মালিবাগের বাসাটা ভালো ছিল। শুধু শুধু বদলালাম।'

'এই বাসাটাও ভালো।'

রানু খুব খুশি মনে নতুন বাসা সাজাল। নিজেই পরদা কিনে আনল, সারা রাত জেগে সেলাই করল। তার উৎসাহের সীমা নেই।

'বুঝলে রানু, সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। অন্যদের বাসায় যাবে-টাবে। একা-একা থাকার অভ্যেসটা ভালো না। যাবে তো?'

'যাব।'

'একা থাকলেই মানুষের মধ্যে নানান রকম প্রবলেম দেখা যায়, বুঝলে? সব ভাড়াটেদের সঙ্গে খাতির রাখবে।'

'ভাড়াটে তো মাত্র এক জন।'

'ঐ ওনার বাসাতেই যাবে। বাড়িঅলার বাসায়ও যাবে।'

'আচ্ছা, যাব।'

রানু অবশ্যি যায় নি কোথাও। তার ভালো লাগে না। অন্যদের মতো সে কারো সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। অন্যদের সামনে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে। বারান্দার বেতের চেয়ারটাতে বসে থাকতেই বেশি ভালো লাগে। দুপুরটাই যা কষ্টের। দুপুরটা কেটে গেলেই অন্য রকম একটা শান্তি লাগে।

কিন্তু আজকের দুপুরটা দীর্ঘ। কিছুতেই আর কাটছে না। বারান্দায় বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। মেয়েদের স্কুলটাও কী কারণে যেন বন্ধ। চারদিক চুপচাপ। বড্ড ফাঁকা। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কেমন হয়?

ঘরের ভেতরটা কেমন যেন অন্য রকম। রানু ভেতরে ঢুকে জানালার পর্দা ফেলে দিল। অনেকখানি অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ও চুপচাপ। আর তখন স্পষ্ট গলায় কেউ ডাকল, 'রানু, রানু।' কয়েক মুহূর্ত রানু নড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যে ডেকে উঠেছে, সে দ্বিতীয় বার আর ডাকল না।

রানুর এরকম চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে এক জন অশরীরী কেউ ডেকে ওঠে। অসংখ্যবার শুনেছে এই ডাক। কে সে! কোথেকে আসে সে! রানু ফিসফিস করে বলল, 'কে?' কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

'কে তুমি?'

জানালার পরদাটা শুধু কাঁপছে। বিকেল হয়ে আসছে। রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বাগানে বাড়িঅলার বড়ো মেয়েটি হাঁটছে। নীলু বোধহয় ওর নাম। এই মেয়েটি তার বোনের মতো নয়। গম্ভীর। কথাবার্তা প্রায় বলেই না। তবুও ওকে দেখলেই রানুর মনে হয়-মেয়েটি বড়ো ভালো। মায়াবতী মেয়ে।

রানু দেখল--বিষণ্ন ভঙ্গিতে মেয়েটি একা-একা বসে আছে। তার ইচ্ছা হল নিচে নেমে ওর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু সে গেল না।

৪

নীলু দু' বার বিজ্ঞাপনটা পড়ল। বেশ একটা মজার বিজ্ঞাপন।

কেউ কি আসবেন?

> আমি এক জন নিঃসঙ্গ মানুষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একা জীবন যাপন করছি। সময় আর কাটে না। আমার দীর্ঘ দিবস ও দীর্ঘ রজনীর নিঃসঙ্গতা কাটাতে কেউ আমাকে দু' লাইন লিখবেন?
>
> জিপিও বক্স নাম্বার ৭৩

দৈনিক পত্রিকায় এ রকম বিজ্ঞাপন দেবার মানে কী? সাপ্তাহিক কাগজগুলিতে এই সব থাকে; ছেলেছোকরাদের কাণ্ড। এই লোকটি নিশ্চয় ছেলে-ছোকরা নয়। বুড়ো-হাবড়াদের এক জন।

'বাবা, এটা পড়েছ?'

নীলু জাহিদ সাহেবের হাতে কাগজটা গুঁজে দিল।

'বাবা, এই বিজ্ঞাপনটি পড় তো।'

জাহিদ সাহেব নিজেও ভ্রূ কুঞ্চিত করে দু' বার পড়লেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হল বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

'পড়েছ?'

'হুঁ, পড়লাম।'

'কী মনে হয় বাবা?'

'কী আবার মনে হবে? কিছুই মনে হয় না। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে। খবরের কাগজঅলারা এইসব ছাপে কীভাবে?'

নীলু হাসিমুখে বলল, 'ছাপাবে না কেন?'

'দেশটা বিলাত-আমেরিকা নয়, বুঝলি? আর ভালো করে পড়লেই বোঝা যায়, লোকটার একটা বদ মতলব আছে।'

'কই, আমি তো বদ মতলব কিছু বুঝছি না।'

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখিস, তুই আবার চিঠি লিখে বসবি না।'

নীলু মুখ নিচু করে হাসল।

'হাসছিস কেন?'

'এমনি হাসছি।'

'*চিঠি লিখবার কথা ভাবছিস না তো মনে মনে?*'

'উঁহু।'

নীলু মুখে উঁহু বললেও মনে মনে ঠিক করে ফেলল, গুছিয়ে একটা চিঠি লিখবে। দেখা যাক না কী হয়। কী লেখে লোকটি।

রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে সে সত্যি একটা চিঠি লিখে ফেলল। মোটামুটি বেশ দীর্ঘ চিঠি।

জনাব,
আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। লিখলাম কয়েক লাইন। এতে কি আপনার নিঃসঙ্গতা কাটবে? আমার বয়স আঠার। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমরা দু' বোন। আমার ছোট বোনটির নাম বিলু। সে হলিক্রস কলেজে পড়ে। আমরা দু' বোনই খুব সুন্দরী। এই যা, এটা আপনাকে লেখা ঠিক হল না। তাই না? নাকি সুন্দরী মেয়েদের চিঠি পেলে আপনার নিঃসঙ্গতা আরো দ্রুত কাটবে?

নীলু

চিঠিটি লিখেই তার মনে হল যে, এরকম লেখাটা ঠিক হচ্ছে না। চিঠির মধ্যে একটা বড়ো মিথ্যা আছে। সে সুন্দরী নয়। বিলুর জন্যে কথাটা ঠিক, তার জন্যে নয়।নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিতীয় চিঠিটি লিখল।

জনাব.
আমার নাম নীলু। আমার বয়স কুড়ি। আপনার নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আপনাকে লিখছি। কিন্তু চিঠিতে কি কারো নিঃসঙ্গতা কাটে? আপনার বয়স কত, এটা দয়া করে জানাবেন।

নীলু

দ্বিতীয় চিঠিটিও তার পছন্দ হল না। তার মনে হল সে যেন কিছুতেই গুছিয়ে আসল জিনিসটি লিখতে পারছে না। রাতে শুয়ে শুয়ে তার মনে হল, হঠাৎ করে সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কেন? চিঠি লেখারই–বা কী দরকার? সে নিজেও কি খুব নিঃসঙ্গ? হয়তো–না। এ বাড়িতে দু'টি মাত্র প্রাণী। বিলু আর বাবা। বাবা দিন–রাত নিজের ঘরেই থাকেন। মাসের প্রথম দিকের কয়েকটা দিন বাড়ি ভাড়ার টাকা আদায়ের জন্যে অল্প যা নড়াচড়া করেন। তারপর আবার নিজের ঘরেই বন্দী। আর বিলু তো আছে তার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব নিয়ে। শুধু মেয়ে বন্ধু নয়, তার আবার অনেক ছেলে বন্ধুও আছে।

মহানন্দে আছে বিলু। তবে সে একটু বাড়াবাড়ি করছে। কাল তার কাছে একটি ছেলে এসেছিল, সে রাত আটটা পর্যন্ত ছিল। এসব ভালো নয়। নীলু উঁকি দিয়ে দেখেছে ছেলেটি ফরফর করে সিগারেট টানছে। হাত নেড়ে-নেড়ে খুব কথা বলছে। আর নীলু হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ছে। ভাত খাওয়ার সময় নীলু কিছু বলবে না বলবে না করেও বলল, 'ছেলেটা কে রে?'

'কোন ছেলে?'

'ঐ যে রাত আটটা পর্যন্ত গল্প করলি।'

'ও, সে তো রুবির ভাই। মহা চালবাজ। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে, আসলে মহা গাধা।'

বলতে বলতে খিলখিল করে হাসে বিলু।

'মহা গাধা হলে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলি কেন?'

'যেতে চাচ্ছিল না, তো কী করব?'

বলতে বলতে বিলু আবার হাসল। বিলু এমন মেয়ে, যার ওপর কখনো রাগ করা যায় না। নীলু কখনো রাগ করতে পারে না। মাঝে মাঝে বাবা দু'-একটা কড়া কথা বলেন। তখন বিলু রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। সে এক মহা যন্ত্রণা। এক বার রাগ করে সে পুরো দু' দিন দরজা বন্ধ করে বসে ছিল। কত সাধাসাধি, কত অনুরোধ। শেষ পর্যন্ত মগবাজারের ছোটমামাকে আনতে হল। ছোটমামা বিলুর খুব খাতিরের মানুষ। তাঁর সব কথা সে শোনে। তিনি এসে যখন বললেন, 'দরজা না খুললে মা আমি কিন্তু আর আসব না। এই আমার শেষ আসা--' তখন দরজা খুলল। এরকম জেদী মেয়ে।

নীলুর কোনো জেদ-টেদ নেই। কালো এবং অসুন্দরী মেয়েদের জেদ কখনো
থাকে না।

এদের জীবন কাটাতে হয় একাকী। নীলু বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করল। ছোটবেলায় বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম আসত, এখন আর আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করতে হয়।

পাশের খাটে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে চোখের ওপর একটা গল্পের বই ধরে আছে বিলু। অনেক রাত পর্যন্ত সে পড়বে। পড়তে-পড়তে হঠাৎ এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে, বাতি নেভাবে না। মশারি ফেলবে না। নীলুকেই উঠে এসে বাতি নেভাতে হবে। মশারি ফেলতে হবে।

'বিলু ঘুমো, বাতি নেভা।'

'একটু পরে ঘুমাব।'

'কী পড়ছিস?'

'শীর্ষেন্দুর একটা বই। দারুণ!'

'দিনে পড়িস। আলো চোখে লাগছে।'

'দিনে আমার সময় কোথায়? তুমি ঘুমাও না।'

নীলু ঘুমাতে পারল না। শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইল বিলুর দিকে। দিনে দিনে কী যে সুন্দর হচ্ছে মেয়েটা! একই বাবা-মার দু' মেয়ে--এক জন এত সুন্দর আর অন্য জন এত অসুন্দর কেন? নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'আপা?'

'কী?'

'দারুণ বই, তুমি পড়ে দেখ।'

'প্রেমের?'

'হ্যাঁ। প্রেমের হলেও খুব সিরিয়াস জিনিস। দারুণ!'

'তাই নাকি?'

'হুঁ, এক জন খুব রূপবতী মেয়ের গল্প।'

'তোর মতো এক জন।'

'দুর, আমি আবার সুন্দর নাকি? আমাদের তিনতলার ভাড়াটের বৌটির মতো বলতে পার। রানু নাম, দেখেছ?'

'না তো, খুব সুন্দরী?'

'ওরে ব্বাপ, দারুণ! হেমা মালিনীর চেয়েও সুন্দরী।'

'তুই মেয়েটিকে এক বার আসতে বলিস তো আমাদের বাড়িতে। দেখব।'

'বলব। তুমি নিজে এক বার গেলেই পার। মেয়েটা ভালো। কথাবার্তায় খুব ভদ্র। ওর বরকে দেখেছ, আনিস সাহেব?'

'হুঁ।'

'ঐ লোকটা বোকা ধরনের। বোকার মতো কথাবার্তা। আমাকে আপনি-আপনি করে বলে।'

'কলেজে পড়িস, তোকে আপনি বলবে না?'

'ফ্রক-পরা কাউকে এরকম এক জন বুড়ো মানুষ আপনি বলবে নাকি?'

'বুড়ো নাকি?'

'চল্লিশের ওপর বয়স হবে।'

'মেয়েটার বয়স কত?'

'খুব কম। চোদ্দ-পনের হবে।'

বিলু বাতি নিভিয়ে দিল এবং নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ল। নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। কিছুতেই তার ঘুম এল না। ইদানীং তার ঘুম খুব কমে গেছে। রোজই মাঝরাত না হওয়া অবধি ঘুম আসে না।

রানু চুলায় ভাত চড়িয়ে বসার ঘরে এসে দেখে বাড়িঅলার বড়ো মেয়েটি ঘরের ভেতর।

'না জিজ্ঞেস করেই ঢুকে পড়লাম ভাই। আমার নাম নীলু।'

'আসুন, আসুন। আপনাকে আমি চিনি। আপনি বাড়িঅলার বড়ো মেয়ে। আজ ইউনিভার্সিটি যান নি?'

'উঁহু। আজ ক্লাস নেই। আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। কী করছিলেন?'

'ভাত রান্না করছি।'

'চলুন, রান্নাঘরে গিয়ে বসি। বিলুর কাছ থেকে আপনার খুব প্রশংসা শুনি।

বিলুর ধারণা আপনি হচ্ছেন হেমা মালিনী।'

রানু অবাক হয়ে বলল, 'হেমা মালিনীটি কে?'

'আছে এক জন। সিনেমা করে। সবাই বলে খুব সুন্দর। আমার কাছে সুন্দর লাগে না। চেহারাটা অহংকারী।'

রানু মুখ টিপে হাসতে-হাসতে বলল, 'সুন্দরী মেয়েরা তো অহংকারীই হয়।'

'আপনিও অহংকারী?'

রানু হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে আপনি-আপনি বলতে পারবেন না। তুমি করে বলতে হবে।'

নীলু লক্ষ করল মেয়েটি বেশ রোগা কিন্তু সত্যিই রূপসী। সচরাচর দেখা যায় না। চোখ দু'টি কপালের দিকে ওঠান বলে--দেবী প্রতিমার চোখের মতো লাগে। সমগ্র চেহারায় খুব সূক্ষ্ম হলেও কোথাও যেন একটি মূর্তি-মূর্তি ভাব আছে।

'কী দেখছেন?'

'তোমাকে দেখছি ভাই। তোমার চেহারায় একটা মূর্তি-মূর্তি ভাব আছে।'

রানু মুখ কালো করে ফেলল। নীলু অবাক হয়ে বলল, 'ও কি! তুমি মনে হয় মন খারাপ করলে?'

'না, মন খারাপ করব কেন?'

'কিন্তু এমন মুখ কালো করলে কেন? আমি কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হিসেবে তোমাকে বলেছি। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি খুব বেশি দেখি নি। তবে এক বার একটি বিহারী মেয়েকে দেখেছিলাম। আমার ছোটমামার বিয়েতে। অবশ্যি সে-মেয়েটি তোমার মতো রোগা ছিল না। ওর স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল।'

'আপনি কি একটু চা খাবেন?'

'তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন? তোমার কি মনে হয় আমার বয়স অনেক বেশি?'

'না, তা মনে হয় না।'

'তুমিও আমাকে তুমি বলবে। আর তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আমি মাঝে মাঝে তোমার কাছে আসব।'

রানু চায়ের কাপ সাজাতে সাজাতে মৃদু স্বরে বলল, 'আমাকে মূর্তি-মূর্তি লাগে, এটা বললে কেন?'

নীলু অবাক হয়ে বলল, 'এমনি বলেছি। টানাটানা চোখ তো, সে জন্যে। তুমি দেখি ভাই রাগ করেছ।'

'একটা কারণ আছে নীলু। তোমাকে আমি এক দিন সব বলব, তাহলেই বুঝবে। চায়ে কতটুকু চিনি খাও?'

'তিন চামচ।'

নীলু অনেকক্ষণ বসল, কিন্তু কথাবার্তা আর তেমন জমল না। রানু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কিছুতেই মন লাগাতে পারছে না। সহজ হতে পারছে না। নীলু বেশ কয়েক বার অন্য প্রসঙ্গ আনতে চেষ্টা করল। ভাসা-ভাসা জবাব দিল রানু। এবং একসময় হালকা স্বরে বলল, 'আমার একটা অসুখ আছে নীলু।'

'কি অসুখ?'

'মাঝে মাঝে আমি ভয় পাই।'

'ভয় পাই মানে?'

রানু মাথা নিচু করে বলল, 'ছোটবেলায় এক বার নদীতে গোসল করতে গিয়েছিলাম, তার পর থেকে এ রকম হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

রানু জবাব দিল না।

'বল, কী হয়েছে?'

'অন্য এক দিন বলব। আজ তুমি তোমার কথা বল।'

'আমার তো বলার মতো কোনো কথা নেই।'

'তোমার বন্ধুদের কথা বল।'

'আমার তেমন কোনো বন্ধুও নেই। আমি বলতে গেলে একা-একা থাকি। অসুন্দরী মেয়েদের বন্ধুটন্ধু থাকে না।'

'রঙ খারাপ হলে মানুষ অসুন্দর হয় না নীলু।'

'আমি নিজে কি, সেটা আমি ভালোই জানি।'

নীলু উঠে পড়ল। রানু বলল, 'আবার আসবে তো?'

'আসব। তুমি তোমার ভয়ের কথাটথা কি বলছিলে, সেই সব বলবে।'

'বলব।'

নীলু পাঠাবে না পাঠাবে না করেও চিঠিটি পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তার পরপরই দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। কে জানে, বুড়ো-হাবড়া লোকটি এক দিন হয়তো বাসায় এসে হাজির হবে। দারুণ লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা। নিতান্তই ছেলেমানুষী কাজ করা হয়েছে। চার-পাঁচ দিন নীলুর খুব খারাপ কাটল। দারুণ অস্বস্তি। বুড়োমতো কোনো মানুষকে আসতে দেখলেই চমকে উঠত, এটিই সেই লোক নাকি? যদি সত্যি সত্যি কেউ এসে পড়ে তাহলে সে ভেবে রেখেছে বলবে--এই চিঠি তো আমার নয়। অন্য কেউ তামাশা করে এই ঠিকানা দিয়েছে। আমি এ রকম অজানা-অচেনা কাউকে চিঠি লিখি না।

কেউ অবশ্যি এল না। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। চিঠিরও কোনো উত্তর নেই। লোকটি হয়তো চিঠি পায় নি। ডাকবিভাগের কল্যাণে আজকাল তো বেশির ভাগ চিঠিই প্রাপকের হাতে পৌঁছায় না। এতে ক্ষতি

যেমন হয়, লাভও তেমনি হয়। কিংবা হয়তো এমন হয়েছে ঐ লোক অসংখ্য চিঠি পেয়ে পছন্দমতো চিঠিগুলোর উত্তর দিয়েছে। নীলুর তিন লাইনের চিঠি তার পছন্দ হয় নি। সে হয়তো লম্বা লম্বা চমৎকার সব চিঠি পেয়েছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছু লেখা সব চিঠিতে।

দশ দিনের মাথায় নীলুর কাছে চিঠি এসে পড়ল। খুবই দামী একটা খামে চমৎকার প্যাডের কাগজে চিঠি। গোটা গোটা হাতের লেখা। কালির রঙ ঘন কালো। মাখন-রাঙা সে কাগজে লেখাগুলো মুক্তার মতো ফুটে আছে। এত সুন্দর হাতের লেখাও মানুষের হয়! চিঠিটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

কল্যাণীয়াসু
তোমার চমৎকার চিঠি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। এক জন ব্যথিত মানুষের আবেদনে তুমি সাড়া দিয়েছ--তোমাকে ধন্যবাদ। খুব সামান্য একটি উপহার পাঠালাম। প্লিজ, নাও।

আহমেদ সাবেত

উপহারটি সামান্য নয়। অত্যন্ত দামী একটি পিওর পারফিউমের শিশি।

নীলু ভেবে পেল না, এই লোকটি কি সবাইকে এরকম একটি উপহার পাঠিয়েছে? যারাই চিঠির জবাব দিয়েছে তারাই পেয়েছে? কিন্তু তাও কি সম্ভব? নাকি নীলু একাই চিঠির জবাব দিয়েছে? নীলুর বড়ো লজ্জা করতে লাগল। সে পারফিউমের শিশিটি লুকিয়ে রাখল, এবং খুব চেষ্টা করতে লাগল সমস্ত ব্যাপার ভুলে যেতে। সে চিঠিটি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে! কেন এমন একটা বাজে ঝামেলায় জড়াল?

কিন্তু দিন সাতেক পর নীলু আবার একটি চিঠি লিখল। একটি বেশ দীর্ঘ চিঠি। সেখানে শেষের দিকে লেখা--আপনি কে, কী করেন--কিছুই তো জানান নি। আপনার বিজ্ঞাপনটিও দেখছি না। তার মানে কি এই যে আপনার নিঃসঙ্গতা এখন দূর হয়েছে?

নীলু বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করল চিঠির জবাবের জন্যে। কিন্তু কোনো জবাব এল না। কেন জানি নীলুর বেশ মন খারাপ হল। আরেকটি চিঠি লেখার ইচ্ছা হতে লাগল। কিন্তু তাও কি হয়? একা-একা সে শুধু চিঠি লিখবে? তার এত কী গরজ পড়েছে?

৫

দুপুর-রাতে আনিসের ঘুম ভেঙে গেল। হাত বাড়াল অভ্যেস মতো। পাশে কেউ নেই। আনিস ডাকল, 'রানু, রানু।' কোনো সাড়া নেই। বাথরুম থেকে

একটানা পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। বাথরুমে নাকি? আনিস উঁকি দিল বাথরুমে--কেউ নেই। কোথায় গেল! আনিস গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'রানু।' বসার ঘর থেকে ক্ষীণ হাসির শব্দ এল। বসার ঘর অন্ধকার। রানু কি সেখানে একা--একা বসে আছে নাকি?

আনিস বসার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলেই সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভিয়ে ফেলল। রানু বসার ঘরের ছোট টেবিলে চুপচাপ বসে আছে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই।

'এই রানু।'

'উঁ।'

'কী হয়েছে? তোমার কাপড় কোথায়?'

'খুলে ফেলেছি। বড্ড গরম লাগছে।'

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। হিমশীতল হাত। একটু একটু যেন কাঁপছে।

'এস রানু, ঘুমাতে যাই।'

'আমার ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও।'

'কাল আমরা এক জন ডাক্তারের কাছে যাব, কেমন?'

'কেন?'

'তোমার শরীর ভালো না রানু।'

'আমার শরীর ভালোই আছে।'

'না, তুমি খুব অসুস্থ। এস আমার সঙ্গে। কাপড় পরে ঘুমুতে এস।'

রানু কোনো আপত্তি করল না। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এল। কাপড় পরল এবং বাধ্য মেয়ের মতো বিছানায় শুয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল আনিস। রানুর শরীর দ্রুত খারাপ হচ্ছে। আগে তো এরকম কখনো হয় নি। মিসির আলি–টালি নয়, বড়ো কোনো ডাক্তারকে দেখানো দরকার।

খুটখুট করে শব্দ হচ্ছে রান্নাঘরে। ইঁদুরের উপদ্রব। তবু কেন জানি শব্দটা অন্য রকম মনে হচ্ছে। যেন কেউ হাঁটছে রান্নাঘরে। থপ্‌থপ্ শব্দও হল কয়েক বার। আনিস বলল, 'কে?' রান্নাঘরের শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। আনিস বলল, 'কে? কে?' মনের ভুল নাকি? আনিস যেন স্পষ্ট শুনল রান্নাঘর থেকে কেউ এক জন বলল, 'আমি।' স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ। মেয়েলি স্বর। নাকি রানুই বলছে ঘুমের ঘোরে। এটাই হয়েছে। রানুরই গলা।

আনিস হাত বাড়িয়ে রানুকে কাছে টানল। রানু বলল, 'হাতটা সরিয়ে নাও, গরম লাগছে।' তার মানে কি রানু জেগে ছিল এতক্ষণ?

'রানু।'

'উঁ।'

'তুমি কি জেগে ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যখন বললাম কে কে, তখন কি তুমি বলেছ, আমি?'

রানু চুপ করে রইল। আনিস বলল, 'বল,বলেছ এরকম কিছু?'

'হ্যাঁ, বলেছি।'

'কিন্তু তুমি জবাব দিলে কেন? তোমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করি নি। আমি জানতে চাচ্ছিলাম রান্নাঘরে কেউ আছে কিনা।'

রানু ফিসফিস করে বলল, 'আমি তো রান্নাঘরেই ছিলাম। আমি রান্নাঘর থেকেই জবাব দিয়েছি।'

আনিস চুপ করে গেল। বিছানায় উঠে বসে পরপর দু'টি সিগারেট শেষ করল। বাথরুমে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রেখে এল। রান্নাঘরের বাতিও জ্বালিয়ে দিয়ে এল। থাকুক, সারা রাত বাতি জ্বালানো থাকুক।

'রানু।'

'কি?'

'কাল তুমি আমার সঙ্গে এক জন ডাক্তারের কাছে যাবে, কেমন?'

'ঠিক আছে, যাব।'

'ডাক্তার সাহেব যা-যা জানতে চান সব বলবে।'

রানু জবাব দিল না। মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্ত নির্বিঘ্ন ঘুম। কিন্তু রান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। আনিসের মনে হল সে স্পষ্ট চুড়ির টুনটুন শব্দ শুনছে। কাঁচের চুড়ির আওয়াজ। আনিস কয়েক বার ডাকল, 'কে, কে ওখানে?' কেউ কোনো জবাব দিল না। বাথরুম থেকে একটানা জল পড়ার শব্দ আসছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে কল ঠিক করে দিতে। এক জন কাজের মানুষ রাখতে হবে। পুরুষমানুষ নয়, মেয়েমানুষ। যে রাত-দিন থাকবে। আত্মীয়স্বজন কাউকে এনে রাখলে ভালো হত। কিন্তু আনিসের তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, যারা এখানে এসে থাকবে। আনিসের ঘুম এল শেষ রাতের দিকে।

মিসির সাহেবের সঙ্গে তারা প্রায় দু' ঘন্টা সময় কাটাল।

রানু খুব সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করল। এর প্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত মিসির সাহেবের। তিনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বললেন। এক পর্যায়ে রানু বলল, 'আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন, আমি আপনার মেয়ের বয়সী।'

'মেয়ের বয়সী হলে কি, আমার তো মেয়ে নেই। বিয়েই করি নি।'

রানু কিছু-একটা বলতে গিয়েও বলল না। ভদ্রলোক সেটি লক্ষ করলেন।

'তুমি কিছু বলতে চাচ্ছিলে?'

'জ্বি-না।'

'কিছু বলতে চাইলে বলতে পার।'

'না, আমি কিছু বলব না।'

মিসির সাহেব চায়ের ব্যবস্থা করলেন। চা খেতে খেতে নিতান্তই সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'আনিস সাহেব বলেছিলেন, তুমি যা স্বপ্নে দেখ তা-ই সত্যি হয়।'

'হুঁ।'

'যা স্বপ্নে দেখ তা-ই হয়?'

'শুধু স্বপ্ন না, যা আমার মনে আসে তা-ই হয়।'

'বল কী!'

'আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, না?'

'বিশ্বাস হবে না কেন? পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। পৃথিবীটা বড়ো অদ্ভুত।'

বলতে-বলতে মিসির আলি ড্রয়ার খুলে চৌকা ধরনের চারটি কার্ড বের করলেন। হাসিমুখে বললেন,'রানু, এই কার্ডগুলিতে ডিজাইন আঁকা আছে। আমি একেকটি টেবিলের ওপর রাখব, ডিজাইনগুলি থাকবে নিচে। তুমি না দেখে বলতে চেষ্টা করবে।'

রানু অবাক হয়ে বলল, 'না দেখে বলব কীভাবে?'

'চেষ্টা করে দেখ। পারতেও তো পার। বল দেখি এই কার্ডটিতে কী আঁকা আছে?'

'কি আশ্চর্য, কী করে বলব?'

'আন্দাজ কর। যা মনে আসে তা-ই বল।'

'একটা ক্রস চিহ্ন আছে। ঠিক হয়েছে?'

'তা বলব না। এবার বল এটিতে কী আছে?'

'খুব ছোট ছোট সার্কেল।'

'ক'টি বলতে পারবে?'

'মনে হচ্ছে তিনটি। চারটিও হতে পারে।'

মিসির সাহেব কার্ডগুলি ড্রয়ারে রেখে সিগারেট ধরালেন। তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হতে লাগল। আনিস বলল, 'ও কি বলতে পেরেছে?' মিসির সাহেব তার জবাব না দিয়ে বললেন, 'রানু, এবার তুমি বল প্রথম ভয়টা তুমি কীভাবে পেলে? সবকিছু বলবে, কিছুই বাদ দেবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।'

রানু চুপ করে রইল।

'তুমি নিশ্চয়ই চাও তোমার অসুখটা সেরে যাক। চাও না?'

'চাই।'

'তাহলে বল। কোনো কিছু বাদ দেবে না।'

রানু তাকাল আনিসের দিকে। মিসির আলি বললেন, 'আনিস সাহেব, আপনি না হয় পাশের ঘরে গিয়ে বসেন। ঐ ঘরে অনেক বইপত্র আছে, বসে-

বসে পড়তে থাকুন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কারেন্ট ইস্যুটা আছে, গতকালই এসেছে।'

রানু বলতে শুরু করল। মিসির আলি শুনতে লাগলেন চোখ বন্ধ করে। একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না। মাঝখানে এক বার শুধু বললেন, 'পানি খাবে? তৃষ্ণা পেয়েছে?' রানু মাথা নাড়ল। তিনি পানির জগ এবং গ্লাস নিয়ে এলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'চোখে-মুখে পানি দিয়ে নাও, ভালো লাগবে।' রানু সে-সব কিছুই করল না। শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। কথা বলতে লাগল স্পষ্ট স্বরে।

রানুর প্রথম গল্প

আমার বয়স তখন এগার-বার বৎসর। আমি মধুপুরে আমার এক চাচার বাড়িতে বেড়াতে গেছি। চাচাতো বোনের বিয়েতে। চাচাতো বোনটির নাম হচ্ছে অনুফা। খুবই ভালো মেয়ে। কিন্তু চাচা বিয়ে ঠিক করেছেন একটা বাজে ছেলের সঙ্গে। ছেলের প্রচুর জায়গা-টায়গা আছে, কিন্তু কিছুই করে না। দেখতেও বাজে, দাঁত উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ। দারুণ বেঁটে। অনুফা আপার এই নিয়ে খুব মন খারাপ। প্রায়ই এই নিয়ে কাঁদে। আমি তাকে সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি নিজে একটি বাচ্চা মেয়ে, তাকে কী সান্ত্বনা দেব? তবে আমার সঙ্গে অনুফা আপার খুব ভাব ছিল। আমাকে অনেক গোপন কথাটথা বলত।

যাই হোক, গায়ে হলুদের দিন খুব রঙ খেলা হল। আমাদের ওদিকে রঙ খেলা হচ্ছে-উঠোনে কাদা ফেলে তাতে গড়াগড়ি খাওয়া। সারা দিন রঙ খেলে কাদা মেখে সবাই ভূত হয়ে গেছি। ঠিক করা হল সবাই মিলে নদীতে গোসল সেরে আসবে। চাচা অবশ্যি আপত্তি করলেন--মেয়েছেলেরা নদীতে যাবে কী?

চাচার আপত্তি অবশ্যি টিকল না। আমরা মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে গোসল করতে গেলাম। বাড়ি থেকে অল্প কিছু দূরেই নদী। আমরা প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়ে, খুব হৈ-চৈ হচ্ছে। সবাই মিলে মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি। সেখানেও খুব কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হল। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হল, মনে হল এক জন কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। নির্ঘাত কেউ তামাশা করছে। আমি হাসতে-হাসতে বললাম--এ্যাই, ভালো হবে না। ছাড় বলছি, ছাড়। কিন্তু যে পা ধরেছে সে ছাড়ল না, হঠাৎ মনে হল সে টেনে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করছে। তখন আমি চিৎকার দিলাম। সবাই মনে করল কোনো একটা তামাশা হচ্ছে। কেউ কাছে এল না। কিন্তু ততক্ষণে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলেছে আর, আর...। [এই সময় মিসির সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছি তারপর কী হল।']

সবার প্রথম অনুফা আপা ছুটে এসে আমাকে ধরলেন, তারপর অন্যরা

ছুটে এল। যে আমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, সে আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে লাগল। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হবার পর শুনেছি ওরা আমাকে বহু কষ্টে টেনে পাড়ে তুলেছে এবং দেখেছে একটা মরা মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ঐ মরা মানুষটাকে গ্রামের লোকেরা নদীর পাড়ে মাটি চাপা দিয়েছিল। সেই সব কিছুই অবশ্যি আমি দেখি নি, শুনেছি। কারণ আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। চাচা আমার চিকিৎসার জন্যে আমাকে ঢাকা নিয়ে এসেছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল আমি বাঁচব না। কিন্তু বেঁচে গেলাম। এইটুকু আমার প্রথম ভয়ের গল্প।

রানু গল্প শেষ করে পুরো এক গ্লাস পানি খেল। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'ঐ লোককে তুমি দেখ নি?'

'জ্বি না।'

'গ্রামের অন্যরা তো দেখেছে, কী রকম ছিল দেখতে?'

'আমি জানি না, কাউকে জিজ্ঞেস করি নি। কেউ আমাকে কিছু বলে নি।'

'এর পর কি তুমি কখনো তোমার চাচার বাড়ি গিয়েছিলে?'

'জ্বি না, কখনো যাই নি।'

'আরেকটা কথা তুমি বলছিলে। ঐ লোকটি তোমার পায়জামা টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করছিল। তোমাকে যখন টেনে তোলা হল তখন কি পায়জামা পরনে ছিল?'

'জ্বি না, ছিল না।'

মিসির আলি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কোনো একটি জিনিস তুমি আমাকে বল নি। কিছু- একটা বাদ দিয়ে গেছ।'

রানু জবাব দিল না।

'যে–জিনিসটা বাদ দিয়েছ সেটা আমার শোনা দরকার। সেটা কী, বলবে!'

'অন্য আরেক দিন বলব।'

'ঠিক আছে, অন্য এক দিন শুনব। তোমাকে বলতে হবে না, আমি গিয়ে শুনে, আসব।'

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ বললেন, 'যখন তুমি একা থাক তখন কি কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলে?'

'হ্যাঁ।'

মিসির আলি খুব উৎসাহ বোধ করলেন।

'ব্যাপারটা গুছিয়ে বল।'

'মাঝে মাঝে কে যেন আমাকে নাম ধরে ডাকে।'

'পুরুষদের গলায়?'
'জ্বি না। মেয়েদের গলায়।'
'শুধু ডাকে, অন্য কিছু বলে না?'
'জ্বি—না।'
'এবং যে ডাকে তাঁকে কখনো দেখা যায় না।'
'জ্বি—না।'
'এটা প্রথম কখন হয়? অর্থাৎ প্রথম কখন শুনলে? নদীর ব্যাপারটা ঘটার আগেই?'
'হুঁ।'
'কত দিন আগে?'
'আমার ঠিক মনে নেই।'
'আচ্ছা ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই।'
রানুরা উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি ভারি গলায় বললেন, 'আবার দেখা হবে।' রানু কিছু বলল না। আনিস বলল, 'আমরা তাহলে যাই?'
'আচ্ছা, ঠিক আছে।'
মিসির আলি ওদের রিকশা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। ওরা রিকশায় উঠবার সময় তিনি হঠাৎ বললেন, 'রানু, যে তোমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, ওর নাম কী?'
'ওর নাম জালালউদ্দিন।'
'কি করে জানলে, ওর নাম জালালউদ্দিন?'
রানু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, পরে কথা হবে।'
রিকশায় ওরা দু' জনে কোনো কথা বলল না। আনিসের এক বার মনে হল রানু কাঁদছে। সে সিগারেট ধরিয়ে সহজ স্বরে বলল, 'ভদ্রলোককে তোমার কেমন লাগল রানু?'
'ভালো। বেশ ভালো লোক। উনি আসলে কী করেন?'
'উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন পার্ট–টাইম টিচার। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি পড়ান। খুব জ্ঞানী লোক।'
'ইউনিভার্সিটির টিচাররা এমন রোগা হয়, তা তো জানতাম না। আমার ধারণা ছিল তাঁরা খুব মোটাসোটা হন।'
রানু শব্দ করে হাসল। আনিস বলল, 'আজ বাইরে খাওয়াদাওয়া করলে কেমন হয়?'
'শুধু শুধু টাকা খরচ।'
'তোমার গিয়ে রান্না চড়াতে হবে না। চল না, কিছু পয়সা খরচ হোক।'
'কোথায় যাবে?'
'আছে আমার একটা চেনা জায়গা। নানরুটি আর কাবাব। কি বল?'

৬

মিসির আলি সাহেব দেখলেন তাঁর ঘরের সামনে চারটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো টিউটোরিয়েল ক্লাস আছে নাকি? আজ বুধবার, টিউটোরিয়েল ক্লাস থাকার কথা নয়। তবে কে জানে হয়তো নতুন রুটিন দিয়েছে। তিনি এখনো নোটিস পান নি।

'এই, তোমাদের কী ব্যাপার?'

মেয়েগুলি জড়োসড়ো হয়ে গেল।

'কি, তোমাদের সঙ্গে কোনো ক্লাস আছে?'

'জ্বি-না স্যার।'

'তাহলে কি? কিছু বলবে?'

'স্যার, নোটিস-বোর্ডে আপনি একটা নোটিস দিয়েছিলেন, সেই জন্যে এসেছি।'

'কিসের নোটিস?'

তিনি ভুরু কোঁচকালেন। মেয়েগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

'কি নোটিস দিয়েছিলাম?'

'স্যার, আপনি লিখেছেন--কারো এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশনের ক্ষমতা আছে কিনা আপনি পরীক্ষা করে বলে দেবেন।'

মিসির আলি সাহেবের সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ল। মাস দুয়েক আগে এরকম একটা নোটিস দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু এই প্রথম চার জনকে পাওয়া গেল, যারা উৎসাহী। এবং সব ক'টি মেয়ে। মেয়েগুলো রোগা। তার মানে কি অকল্টের ব্যাপারে রোগা মেয়েরাই বেশি উৎসাহী? তিনি মনে মনে একটা নোট তৈরি করলেন. এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হল বিষয়টি ইন্টারেস্টিং। একটা সার্ভে করা যেতে পারে।

'এস তোমরা। ঘরে এস। তোমরা তাহলে জানতে চাও তোমাদের ইএসপি আছে কি না?'

মেয়েগুলি কথা বলল না। যেন একটু ভয় পাচ্ছে। মুখ সবারই শুকনো।

'বস তোমরা। চেয়ারে আরাম করে বস।'

ওরা বসল। মিসির আলি সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। নিচু গলায় বললেন, 'সব মানুষের মধ্যেই ইএসপি কিছু পরিমাণ থাকে। টেলিপ্যাথির কথাই ধর। তোমাদের নিজেদেরই হয়তো এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। সহজ উদাহরণ হচ্ছে, ধর এক দিন তোমাদের কারো মনে হল আজ অমুকের সাথে দেখা হবে। যার সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে হচ্ছে, সে কিন্তু এখানে থাকে না। থাকে চিটাগাং। কিন্তু সত্যি সত্যি দেখা হয়ে গেল। কি, হয় না এরকম?'

মেয়েগুলো কথা বলল না। এর মধ্যে এক জন রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে

লাগল। মেয়েটি ঘামছে। নার্ভাস হয়ে পড়ছে মনে হয়। নিশ্চয়ই ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গেছে। মিসির আলি বিস্মিত হলেন। নার্ভাস মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বিষয়ের চর্চা এখনো বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না। বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই অনুমানের ওপর। তবে আমেরিকায় একটি ইউনিভার্সিটি আছে--ডিউক ইউনিভার্সিটি। ওরা কিছু কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ শুরু করেছে। মুশকিল হচ্ছে, ফলাফল সবসময় রিপ্রডিউসিবৃল্ নয়।'

মিসির আলি সাহেব ড্রয়ার খুলে দশটি চৌকো কার্ড টেবিলে বিছালেন। হাসিমুখে বললেন, 'পরীক্ষাটি খুব সহজ। এই কার্ডগুলোতে বিভিন্ন রকম চিহ্ন আছে। যেমন ধর ক্রস, স্কয়ার, ত্রিভুজ, বিন্দু। কোনটিতে কী আছে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করবে। দু'-এক বার কাকতালীয়ভাবে মিলে যাবে। তবে ফলাফল যদি স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের ইএসপি আছে। এখন এস দেখি, কে প্রথম বলবে? তোমার কী নাম?'

'নীলুফার।'

'হ্যাঁ নীলুফার, তুমিই প্রথম চেষ্টা কর। যা মনে আসে তা-ই বল।'

'আমার কিছু মনে আসছে না।'

'তাহলে অনুমান করে বল।'

মেয়েটি ঠিকমতো বলতে পারল না। তার সঙ্গীরাও না। মিসির আলি হাসতে- হাসতে বললেন, 'নাহ্, তোমাদের কারো কোনো ইএসপি নেই।' ওরা যেন তাতে খুশিই হল। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'না থাকাই ভালো। আধুনিক মানুষদের এ সব থাকতে নেই। এতে অনেক রকম জটিলতা হয়।'

'কি জটিলতা?'

'আছে, আছে।'

'বলুন না স্যার।'

মিসির আলি লক্ষ করলেন নীলুফার নামের মেয়েটিই কথা বলছে। স্পষ্ট সতেজ গলা।

'অন্য আরেক দিন বলব। আজ তোমরা যাও।'

নীলুফার বলল, 'এমন কিছু কি স্যার আছে, যা করলে ইএসপি হয়?'

'লোকজন বলে প্রেমে পড়লেও এই ক্ষমতাটা অসম্ভব বেড়ে যায়। আমি ঠিক জানি না। তোমরা যদি কেউ কখনো প্রেমে পড়, তাহলে এস, পরীক্ষা করে দেখব।'

কথাটা বলেই মিসির আলি অপ্রস্তুত বোধ করলেন। ছাত্রীদের এটা বলা ঠিক হয় নি। কথাবার্তায় তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। এরকম হালকা ভঙ্গিতে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

'স্যার, আমরা যাই?'

'আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা হবে।'

মিসির আলি নিচের টিচার্স লাউঞ্জে চা খেতে এলেন। বেলা প্রায় তিনটা। লাউঞ্জে লোকজন নেই। পলিটিক্যাল সায়েন্সের রশিদ সাহেব এক কোণায় বসে ছিলেন। তিনি অস্পষ্ট স্বরে ডাকলেন, 'এই যে মিসির সাহেব, অনেক দিন পর মনে হয় এলেন এদিকে। চা খাবেন?'

'হুঁ।'

'কে যেন বলছিল, আপনি নাকি ভূতে-ধরা সারাতে পারেন। ঠিক নাকি?'

'জ্বি না। আমি ওঝা নই।'

'রাগ করলেন নাকি? আমি কথার কথা বললাম।'

'না, রাগ করব কেন?'

'আচ্ছা মিসির আলি সাহেব, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

'না।'

রশিদ সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'আত্মা, আত্মায় বিশ্বাস করেন?'

'না ভাই, আমি এক জন নাস্তিক।'

'আত্মা নেই--এই জিনিসটা কি প্রমাণ করতে পারবেন? কী কী যুক্তি আছে আপনার হাতে?'

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রশিদ সাহেব বললেন, 'আত্মা যে আছে এর পক্ষে বিজ্ঞানীদের কিছু চমৎকার যুক্তি আছে।'

'থাকলে তো ভালোই। বিজ্ঞানীরা জড়জগৎ বাদ দিয়ে আত্মাটাত্মা নিয়ে উৎসাহী হলেই কিন্তু ঝামেলা। রশিদ সাহেব, আমার মাথা ধরেছে। এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। কিছু মনে করবেন না।'

মিসির আলি চা না খেয়েই উঠে পড়লেন। তাঁর সত্যি সত্যি মাথা ধরেছে। প্রচণ্ড ব্যথা। বড়ো রকমের কোনো অসুখের এটা পূর্বলক্ষণ।

৭

নীলু ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখে তার বিছানার উপর চমৎকার একটি প্যাকেট পড়ে আছে। ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেটে গোটা গোটা করে তার নাম লেখা। নীলুর বুক কেঁপে উঠল, বিলুর চোখে পড়ে নি তো? বিলুর খুব খারাপ অভ্যাস আছে, অন্যের চিঠি খুলে-খুলে পড়বে। হাসাহাসি করবে।

নীলু দরজা বন্ধ করেই প্যাকেটটি খুলল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু কী চমৎকার করেই না লেখা:

কল্যাণীয়াসু,
ইচ্ছা করেই তোমাকে আমি কম লিখি। তোমার চিঠি পড়ে পড়ে খুব মায়া জন্মে যায়। এ বয়সে আমার আর মায়া বাড়াতে ইচ্ছা করে না। মায়া বাড়ালেই কষ্ট পেতে হয়। আরেকটি সামান্য উপহার পাঠালাম। গ্রহণ করলে খুব খুঁশি হয়।

আহমেদ সাবেত

উপহারটি বড়ো সুন্দর। নীল রঙের একটি ডায়েরি। অসম্ভব নরম প্লাস্টিকের কভার, যেখানে ছোট্ট একটি শিশুর ছবি। পাতাগুলো হালকা গোলাপী। প্রতিটি পাতায় সুন্দর সুন্দর দু' লাইনের কবিতা। ডায়েরিটির প্রথম পাতায় ইংরেজিতে লেখা ঃ

'I Wish I could be eighteen again'

A. S.

পড়তে গিয়ে কেন জানি নীলুর চোখে জল এল। এক জন সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা মানুষের জন্যে মন কেমন করতে লাগল। লোকটি দেখতে কেমন কে জানে? সুন্দর নয় নিশ্চয়ই। বয়স্ক মানুষ, হয়তো চুলটুল পেকে গেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বয়স হচ্ছে তার মনে। মন যত দিন কাঁচা থাকে, তত দিন মানুষের বয়স বাড়ে না। এই লোকটির মন অসম্ভব নরম। শিশুর মতো নরম। নীলুর মনে হল এই লোকটি স্বামী হিসেবে অসাধারণ ছিল। তার স্ত্রীকে সে নিশ্চয়ই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছে।

নীলু রাতের বেলা দরজা বন্ধ করে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল--আপনি এমন কেন? নিজের কথা তো কিছুই লেখেন নি। অথচ আমি আমার সমস্ত কথা লিখে বসে আছি। তবু মনে হয় সব বুঝি লেখা হল না। অনেক কিছু বুঝি বাকি রয়ে গেল। আপনি আমাকে এত সুন্দর সুন্দর উপহার দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে কিছুই দিই নি। আমার কিছু-একটা দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি তো জানি না আপনি কী পছন্দ করেন। আচ্ছা, আপনি কি টাই পরেন? তাহলে লাল টকটকে একটা টাই আপনাকে দিতে পারি। জানেন, পুরুষমানুষের এই একটি জিনিসই আমি পছন্দ করি। কিন্তু হয়তো আপনি টাই পরেন না, ঢিলেঢালা ধরনের মানুষদের মতো চাদর গায়ে দেন। আপনার সম্পর্কে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। এক দিন আসুন না আমাদের বাসায়, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। জানেন, আমি খুব ভালো চা বানাতে পারি। অন্য কেউ চা বানিয়ে দিলে আমার বাবা খেতে পারেন না। সব সময় আমাকে বানাতে হয়। গত রোববারে কী হল, জানেন? রাত তিনটেয় বাবা আমাকে ডেকে তুলে বললেন--মা, এক কাপ চা বানা তো, বড্ড চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে।

'আপা, দরজা বন্ধ করে কী করছ?'

নীলু অপ্রস্তুত হয়ে দরজা খুলল। বিলু দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহজনকভাবে তাকাচ্ছে।

'কী করছিলে?'

'কিছু করছিলাম না।'

বিলু বিছানায় এসে বসল, 'আপা, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি।'

'কী পরিবর্তন?'

'অস্থির–অস্থির ভাব। লক্ষণ ভালো না আপা। বল তো কী হয়েছে?'

'কী আবার হবে? তোর শুধু উল্টোপাল্টা কথা।'

'কিছু–একটা হয়েছে আপা। আমি জানি।'

'কি যে বলিস!'

'আমার কাছে লুকোতে পারবে না আপা। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।'

'যা ভাগ, পাকামো করিস না।'

বিলু গেল না। কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বলল, 'রানু আপাকেও আমি বললাম তোমার পরিবর্তনের কথা। তারও ধারণা তুমি কারো প্রেমে পড়েছ।'

'হুঁ, আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তাছাড়া প্রেমটা আমার সঙ্গে করবে কে? চেহারার এই তো অবস্থা।'

'খারাপ অবস্থাটা কী? রঙটা একটু ময়লা। এছাড়া আর কি?'

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

'নিঃশ্বাস ফেলছ কেন আপা? নিজের চেহারা সম্পর্কে তোমার এমন খারাপ ধারণা থাকা উচিত না। সবাই তো আর রানু আপার মতো হয় না, হওয়া উচিত নয়।'

'উচিত নয় কেন?'

'সুন্দরী মেয়েদের অনেক রকম প্রবলেম থাকে।'

'কী প্রবলেম?'

'রানু আপার মাথা খারাপ—সেটা তুমি জান?'

'কী বলছিস এ সব!'

'ঠিকই বলছি। আকবরের মা এক দিন দুপুরে কি জন্যে যেন গিয়েছিল, শোনে রানু আপা নিজের মনে হাসছে এবং কথা বলছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কথাগুলো বলছে আবার দু' রকম গলায়। আকবরের মা প্রথম ভেবেছিল কেউ বোধহয় বেড়াতে এসেছে। শেষে ঘরে ঢুকে দেখে কেউ নেই।'

'সত্যি?'

'হুঁ। রহমান সাহেবের স্ত্রী বললেন, এক দিন নাকি আনিস সাহেব গভীর রাতে রহমান সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রীর খুব অসুখ, এই কথা বলে। রহমান সাহেব গিয়ে দেখেন অসুখটসুখ কিচ্ছু নেই, দিব্যি ভালো মানুষ।'

নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'রানুর মতো সুন্দরী হলে আমি পাগল হতেও রাজি।'

বিলু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'কথাটা ঠিক বলেছ আপা।'

রানু প্রসঙ্গে পাওয়া সব তথ্য লিখে রাখবার জন্যে মিসির আলি সাহেব মোটা একটা খাতা কিনে এনেছেন। খাতাটির প্রথম পাতায় লেখা--

'এক জন মানসিক রুগীর পর্যায়ক্রমিক মনোবিশ্লেষণ।' দ্বিতীয় পাতায় কিছু ব্যক্তিগত তথ্য। যেমন--

নাম : রানু আহমেদ।

বয়স : সতের বৎসর (রূপবতী)।

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা। (তের মাস আগে বিয়ে হয়)।

স্বাস্থ্য : রুগ্ণা।

ওজন : আশি পাউণ্ড।

স্বামী : আনিস আহমেদ। দি জেনিথ ইন্টারন্যাশনালের ডিউটি অফিসার। বয়স ৩৭। স্বাস্থ্য ভালো।

তৃতীয় পাতার হেডিংটি হচ্ছে-- 'অডিটরি হেলুসিনেশন।?' এর নিচে লাল কালি দিয়ে একটা বড়ো প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা। এই পাতায় অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, আবার কাটাকুটি করা হয়েছে। যেন মিসির আলি সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না কী লিখবেন। দু'টি লাইন শুধু পড়া যায়। লাইন দু'টির নিচে লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া।

'মেয়েটির অডিটরি হেলুসিনেশন হচ্ছে : সে একা থাকাকালীন শুনতে পায় কেউ যেন তাকে ডাকছে।'

পরের কয়েকটি পাতায় রানুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় লেখা। এ পাতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়, মিসির আলি নামের এই লোকটির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলিও লেখা আছে। যেমন এক জায়গায় লেখা--মেয়েটি বেশ কয়েক বার শাড়ির আঁচল টেনেছে। দু' বার শব্দ করে আঙুল ফুটিয়েছে। আমি লক্ষ করলাম মেয়েটি পানি খেল মাথা নিচু করে। বেশ খানিকটা নিচু করে। যেন পানি পান করার ব্যাপারটি সে আড়াল করতে চায়।

নদীতে গোসলের গল্পটি লেখা আছে। গল্পের শেষে বেশ কিছু প্রশ্ন করা আছে। যেমন---

*এক জন মৃত মানুষ পানিতে ভেসে থাকবে। ডুবে থাকবে না। গল্পে

মৃত মানুষটির ডুবে ডুবে চলার কথা আছে। এ রকম থাকার কথা নয়।

*পাজামা খুলে ফেলার কথা আছে। কিশোরীরা সাধারণত শক্ত গিঁট দিয়ে পাজামা পরে। গিঁট খুলতে হলে ফিতা টানতে হবে। ঐ মানুষটি কি ফিতা টেনেছিল, না পাজামাটাই টেনে নামিয়েছে?

* মৃত লোকটির কি কোনো পোস্ট মর্টেম হয়েছিল?

* তার আনুমানিক বয়স কত ছিল?

* প্রথম অসুস্থতার সময় কি মেয়েটি ঘুমের মধ্যে কোনো কথাবার্তা বলত? কী বলত?

*মেয়েটি বলল লোকটির নাম জালালউদ্দিন। কিভাবে বলল? লোকটির নাম তো জানার কথা নয়। নাকি পরে শুনেছে?

*জালালউদ্দিন জাতীয় নামের কারো সঙ্গে কি এই মেয়েটির পূর্বপরিচয় ছিল?

প্রশ্নের শেষে তিনটি মন্তব্য লেখা আছে। মন্তব্যগুলি সংক্ষিপ্ত। প্রথম মন্তব্য--মেয়েটি যে-ঘটনার কথা বলেছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয় মন্তব্য--এই ঘটনা অন্য যে-সব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেছে তাদের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করতে হবে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি লাল কালি দিয়ে আণ্ডারলাইন করা ও পাশে লেখা--অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় মন্তব্য--মেয়েটির অবশ্যই কিছু পরিমাণ এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশন আছে। সে কার্ডের সব ক'টি চিহ্ন সঠিকভাবে বলতে পেরেছে। আমি এরকম আগে কখনো দেখি নি। এই বিষয়ে আমার ধারণা হচ্ছে, মানসিকভাবে অসুস্থ রুগীদের এই দিকটি উন্নত হয়ে থাকে। আমি এর আগেও যে ক'টি অসুস্থ মানুষ দেখেছি, তাদের সবার মধ্যেই এই ক্ষমতাটি কিছু পরিমাণে লক্ষ করেছি। দি জার্নাল অব প্যারাসাইকোলজির তৃতীয় ভল্যুমে (১৯০৩) এই প্রসঙ্গে রিভিউ পেপার আছে। অথর জন নান এবং এফ টলম্যান।

৮

সোহাগী হাইস্কুলের হেডমাষ্টার সাহেব দারুণ অবাক হলেন। রানুর ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে এক ভদ্রলোক এসেছেন--এর মানে কী? এক যুগ আগে কী হয়েছিল না-হয়েছিল তা কি এখন আর কারো মনে আছে? আর মনে থাকলেও এইসব ব্যাপার নিয়ে এখন ঘাঁটাঘাঁটি করাটা বোধহয় ঠিক নয়। কিন্তু যে-ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে মুখের ওপর না বলতেও বাধছে। ভদ্রলোক হাজার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক। মানী লোক। তাছাড়া এত দূর এসেছেন, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। মুখে বলছেন রানু অসুস্থ এবং তিনি রানুর এক জন চিকিৎসক। কিন্তু এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য

মনে হচ্ছে না। কারণ মাসখানেক আগেই রানুকে তিনি দেখে এসেছেন। কিছুমাত্র অসুস্থ মনে হয় নি। আজ হঠাৎ এমন কী হয়েছে যে ঢাকা থেকে এই ভদ্রলোককে আসতে হল?

'রানুর কী হয়েছে বললেন?'

'মানসিকভাবে অসুস্থ।'

'আমি তো সেদিনই তাকে দেখে এলাম।'

'যখন দেখেছেন তখন হয়তো সুস্থই ছিল।'

'কী জানতে চান আপনি, বলেন।'

'নদীতে গোসলের সময় কী ঘটেছিল সেটা বলেন।'

'সে সব কি আর এখন মনে আছে?'

'ঘটনাটা বেশ সিরিয়াস এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে বহু বার আলোচিত হয়েছে, কাজেই মনে থাকার কথা। আপনার যা মনে আসে তাই বলেন।'

হেডমাষ্টার গম্ভীর স্বরে ঘটনাটা বললেন। রানুর গল্পের সঙ্গে তাঁর গল্পের কোনো অমিল লক্ষ করা গেল না। শুধু ভদ্রলোক বললেন, 'মেয়েরা গোসল করতে গিয়েছিল দুপুরে, সন্ধ্যায় নয়।'

'পাজামা খোলার ব্যাপারটি বলেন। পাজামাটা কি পাওয়া গিয়েছিল?'

'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'রানু বলছিল, নদীতে গোসল করবার সময় এই মরা মানুষটি তার পাজামা খুলে ফেলে।'

'আরে না না, কী বলেন!'

'ওর পরনে পাজামা ছিল?'

'হ্যাঁ, থাকবে না কেন?'

'আপনার ঠিক মনে আছে তো?'

'মনে থাকবে না কেন? পরিষ্কার মনে আছে। আপনি অন্য সবাইকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'ঐ মরা মানুষটি সম্পর্কে কী জানেন?'

'কিছুই জানি না রে ভাই। থানায় খবর দিয়েছিলাম। থানা হচ্ছে এখান থেকে দশ মাইল। সেই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না। থানাঅলারা আসে দু' দিন পরে। লাশ তখন পচে–গলে গিয়েছে। শিয়াল–কুকুর কামড়াকামড়ি করছে। থানাঅলারা এসে আমাদের লাশ পুঁতে ফেলতে বলে। আমরা নদীর ধারেই গর্ত করে পুঁতে ফেলি।'

'আচ্ছা, ঐ লাশটি তো উলঙ্গ ছিল, ঠিক না?'

'জ্বি না, ঠিক না। হলুদ রঙের একটা প্যান্ট ছিল আর গায়ে গেঞ্জি ছিল।'

মিসির সাহেবের ভুরু কুঞ্চিত হল।

'আপনার ঠিক মনে আছে তো ভাই?'

'আরে, এটা মনে না-থাকার কোনো কারণ আছে? পরিষ্কার মনে আছে।'

'লাশটি কি বুড়ো মানুষের ছিল?'

'জ্বি না, জোয়ান মানুষের লাশ।'

'আর কিছু মনে পড়ে?'

'আর কিছু তো নেই মনে পড়ার।'

'আপনার ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই। অনুফা যার নাম। শুনেছি ওর শ্বশুরবাড়ি কাছেই।'

'হরিণঘাটায়। আপনি যেতে চান হরিণঘাটা?'

'জ্বি।'

'কখন যাবেন?'

'আজকেই যেতে পারি। কত দূর এখান থেকে?'

'পনের মাইল। বেবিট্যাক্সি করে যেতে পারেন।'

'রাতে ফিরে আসতে পারব?'

'তা পারবেন।'

'বেশ, তাহলে আপনি আমাকে ঠিকানা দিন।'

'দেব। বাড়িতে চলেন, খাওয়াদাওয়া করেন।'

'আমি হোটেল থেকে খেয়েদেয়ে এসেছি।'

'তা কি হয়, অতিথি মানুষ! আসুন আসুন।'

ভদ্রলোক বাড়িতে নিয়ে গেলেন ঠিকই কিন্তু বড়োই গম্ভীর হয়ে রইলেন। মাথার ওপর হঠাৎ এসে পড়া উপদ্রবে তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত মনে হল। ভালো করে কোনো কথাই বললেন না। অকারণে বাড়ির এক জন কামলার ওপর প্রচণ্ড হম্বিতম্বি শুরু করলেন।

কিন্তু অনুফার বাড়িতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ঘটল। মেয়েটি আদর-যত্নের একটি মেলা বাধিয়ে ফেলল। মিসির আলি অবাক হয়ে দেখলেন, মেয়েটির স্বামী সন্ধ্যাবেলাতেই জাল নিয়ে পুকুরে নেমে গেছে। অনুফা পরিচিত মানুষের মতো আদুরে গলায় বলল, 'রাতে ফিরবেন কি--কাল সকালে যাবেন।' লোকজন মিসির আলিকে দেখতে এল। এরা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। মেয়েটিও মনে হয় বেশ ক্ষমতা নিয়ে আছে। সবাই তার কথা শুনছে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে তাঁকে গোসলের জন্যে গরম পানি করে দেওয়া হল। একটা বাটিতে নতুন একটা গায়ে মাখার সাবান। মোড়কটি পর্যন্ত ছেঁড়া হয় নি। বাংলাঘরে নতুন চাদর বিছিয়ে বিছানা করা হল। মেয়েটির বৃদ্ধ শ্বশুর একটি ফর্সী হুক্কাও এনে দিলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন, খবর না দিয়ে আসার জন্যে ঠিকমতো খাতির-যত্ন করতে না পেরে তিনি বড়োই শরমিন্দা। তবে যদি কালকের দিনটা থাকেন তবে তিনি হরিণঘাটার বিখ্যাত মাগুর মাছ খাওয়াবেন। খাওয়াতে না পারলে তিনি বাপের ব্যাটা না--ইত্যাদি

ইত্যাদি।

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি সত্যি সত্যি এক দিন থেকে গেলেন। মিসির আলি সাহেব এ রকম কখনো করেন না।

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'ভেতরে আসব?'

'এস রানু, এস।'

'গল্প করতে এলাম।'

'খুব ভালো করেছ।'

নীলু উঠে গিয়ে রানুর হাত ধরল। রানু বলল, 'তুমি কাঁদছিলে নাকি, চোখ ভেজা!' নীলু কিছু বলল না। রানু বলল, 'এত কিসের দুঃখ তোমার যে দুপুরবেলায় কাঁদতে হয়?'

'তোমার বুঝি কোনো দুঃখটুঃখ নেই?'

'উঁহুঁ। আমি খুব সুখী।'

রানু হাসতে লাগল। নীলু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি বলেছিলে, একটা খুব অদ্ভুত কথা আমাকে বলবে।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'হ্যাঁ। আজ সেটা বলতে হবে। তারপর আমি আমার একটা অদ্ভুত কথা বলব।'

রানু হাসতে লাগল।

'হাসছ কেন রানু?'

'তোমার অদ্ভুত কথাটা আমি জানি, এই জন্যে হাসছি।'

'কী আবোলতাবোল বলছ! তুমি জানবে কী?'

'জানি কিন্তু।'

নীলু গম্ভীর হয়ে বলল, 'জানলে বল তো।'

'তোমার এক জন প্রিয় মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে। ঠিক না?'

নীলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। রানু বলল, 'কি ভাই, বলতে পারলাম তো?'

'হ্যাঁ, পেরেছ।'

'ও কি বাসায় আসবে?'

'বলব তোমাকে। তার আগে তুমি বল, তুমি কী করে জানলে? বিলু তোমাকে বলেছে? কিন্তু বিলু তো কিছু জানে না।'

'আমাকে কেউ কিছু বলে নি।'

'তাহলে তুমি জানলে কী করে?'
'আমি স্বপ্ন দেখেছি?'
'স্বপ্ন দেখেছি মানে?'
'নীলু, মাঝে মাঝে আমি স্বপ্ন দেখি। সেগুলি ঠিক স্বপ্নও নয়। তবে অনেকটা স্বপ্নের মতো। সেগুলি সব সত্যি। গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম তুমি, একটি চিঠি পেয়ে খুব খুশি। সেই চিঠিতে একটি লাইন লেখা আছে, যার মানে হচ্ছে--তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে বা এই রকম কিছু।'
'এসব কি তুমি সত্যি সত্যি বলছ রানু?'
'হ্যাঁ। কবে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে?'
'আজ বিকেলে। আমি নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকানের সামনে একটা সবুজ রুমাল হতে দাঁড়িয়ে থাকব। তিনি আমাকে খুঁজে বের করবেন।'
'বাহ্, খুব মজার ব্যাপার তো!'
রানু হাসতে লাগল। এক সময় হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'শুধু গল্প-উপন্যাসেই এসব হয়। বাস্তবে এই প্রথম দেখছি। তোমার ভয় করছে না?'
'ভয় করবে কেন?'
'তোমার কিন্তু নীলু ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছি। বেশ ভয় করছে। করছে না?'
'নাহ্।'
রানু ইতস্তত করে বলল, 'ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত পার। আমি দূরে থাকব।'
'থাক, দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।'
মনে হল নীলু রানুর কথাবার্তা সহজভাবে নিতে পারছে না। তার চোখ-মুখ গম্ভীর। রানু বলল, 'কি, নেবে?'
'না। আমার একা যাবার কথা, একাই যাব।'
'আর যদি গিয়ে দেখ, খুব বাজে ধরনের একটা লোক। তখন কী করবে?'
'বাজে ধরনের লোক মানে?'
'অর্থাৎ যদি গিয়ে দেখ দাঁত পড়া, চুল পাকা এক বুড়ো?'
'তোমার কি সে রকম মনে হচ্ছে?'
রানু মাথা দুলিয়ে হাসল, কিছু বলল না। নীলুকে দেখে মনে হল রানুর ব্যবহারে সে বেশ বিরক্ত হচ্ছে। দুটো বাজতেই সে বলল, 'এবার তুমি যাও, আমি সাজগোজ করব।'
'এখনই? চারটা বাজতে তো দেরি আছে।'
'তোমার মতো সুন্দরী তো আমি না। আমাকে সব নিয়ে সাজতে হবে।'
রানু উঠে পড়ল। নীলু সত্যি সাজতে বসল। কিন্তু কী যে হয়েছে তার,

*চোখে পানি এসে কাজল ধুয়ে যাচ্ছে। আইল্যাশ পরার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একা-*একা পরা সম্ভব নয়। অনেক বেছেটেছে একটা শাড়ি পছন্দ করল। সাদার ওপর নীলের একটা প্রিন্ট। আগে সে কখনো পরে নি।

'নীলু মা, কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

নীলু তাকিয়ে দেখল--বাবা।

'কোথায় যাচ্ছ গো মা?'

'এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তোমার কি চা লাগবে?'

'হলে ভালো হত। থাক, তুই ব্যস্ত।'

'চা বানাতে আর কয় মিনিট লাগবে! তুমি বস, আমি বানিয়ে আনছি।'

নীলুর বাবা চেয়ার টেনে নীলুর ঘরেই বসলেন।

'চা কি চিনি ছাড়া আনব বাবা?'

'না, এক চামচ চিনি দিস। একটু-আধটু চিনি খেলে কিছু হবে না।'

নীলু চা নিয়ে এসে দেখে বাবা ঝিমুচ্ছেন। ঝিমুনিরও বেশি, প্রায় ঘুমাচ্ছেন বলা চলে। বাবা যেন বড়ো বেশি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। বড়ো মায়া লাগল নীলুর।

'বাবা, তোমার চা।'

'কোন বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিস মা?'

নীলু খানিক ইতস্তত করে বলল, 'তোমাকে আমি পরে বলব বাবা।'

'সন্ধ্যার আগেই আসবি তো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'গাড়ি নিয়ে যাবি?'

'না, গাড়ি নেব না।'

'নিয়ে যা না। ড্রাইভার তো দিনরাত বসে বসেই মায়না খায়।'

'বাবা, আমি গাড়ি নেব না।'

নীলুর সাজ শেষ হল ঠিক সাড়ে তিনটায়। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে তার পছন্দই হল। যে-মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে, সে বেশ রূপসী। তার মায়া-কাড়া দু'টি চমৎকার চোখ আছে। কিশোরীদের মতো ছোট একটি চিবুক। ভালোই তো। এ রকম একটি মেয়েকে পুরুষরা কি ভালোবাসে না? নাকের কাছে মুক্তোর মতো কিছু ঘামের বিন্দু। নীলু তার সবুজ রুমাল দিয়ে সাবধানে ঘাম মুছে ফেলল। তারপর উঠে এল তিনতলায়।

'রানু, রানু।'

রানু যেন তৈরি হয়েই ছিল। সে বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

'তুমি যাবে বলেছিলে আমার সঙ্গে। চল।'

'চল।'

রানু তালা লাগাল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি জানতে আমি আসব?'

'হ্যাঁ, জানতাম।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করল। কারো দেখা পাওয়া গেল না। এক সময় নীলু বলল, 'এখন চলে যেতে চাও রানু?'

'আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার তো এখনো যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে চল হাঁটি।'

তারা বেশ কয়েক বার নিউ মার্কেট চক্কর দিয়ে ফেলল। কেউ এগিয়ে এসে বলল না, 'তোমাদের মধ্যে নীলু কে?'

'রানু, তোমার কি হাঁটতে টায়ার্ড লাগছে?'

'না।'

'রানু, তুমি তো অনেক কিছু বুঝতে পার, তাই না?'

'মাঝে মাঝে পারি।'

'লোকটি এসেছে কিনা বুঝতে পারছ না?'

'না নীলু, পারছি না। আমি সব সময় পারি না।'

রানু লক্ষ করল নীলুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে তার সবুজ রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরল। রানু গাঢ় স্বরে বলল, 'কাঁদে না নীলু।'

'কান্না এলে কী করব?'

'মনটা শক্ত কর ভাই। পৃথিবীটা খুব ভালো জায়গা নয়।'

লোকজন তাকাচ্ছে ওদের দিকে। রানু নীলুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা।

তার প্রায় চার দিন পর নীলু একটি চিঠি পেল।

প্রিয় নীলু,

ঐদিন তোমাকে দেখলাম। তুমি তো ভারি মিথ্যুক! কেন বললে তুমি দেখতে সুন্দর নও? তোমাকে বর্ষার জলভারে নত আকাশের মতো লাগছিল। আমি ছুটে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার বান্ধবীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছি। কথা ছিল একা আসবে। তাই নয় কি?

শুধু আমরা দু' জন থাকব। আমাকে দেখে যদি তোমার কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাহলে কোনো একটি রেস্টুরেন্টে বসে দু' জনে চা খেতে-খেতে গল্প করব। আর যদি তোমার আমাকে পছন্দ না হয়, তাহলে তুমি তোমার সবুজ রুমালটি তোমার হ্যাণ্ডব্যাগে লুকিয়ে ফেলবে। তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি মন খারাপ করব ঠিকই কিন্তু বিদায় নেব হাসিমুখে। এবং আর কোনো দিনই তুমি আমাকে দেখবে না। তবে নীলু, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমাকে তুমি অপছন্দ করবে না। এ রকম মনে করার কোনোই কারণ নেই, তবু মনে হচ্ছে।

খুব সম্ভব উইশফুল থিংকিং, না মেয়ে?

নীলু চিঠিটি সমস্ত দিনে প্রায় এক শ' বার পড়ল এবং প্রতি বারই তার কাছে নতুন মনে হল। রাতে সে অদ্ভুত সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখল---যেন পুরনো আমলের একটি পালতোলা জাহাজে সে বসে আছে। জাহাজের পালটি গাঢ় সবুজ রঙের। প্রচণ্ড বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে জাহাজ ছুটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। নীলুর একটু ভয়-ভয় লাগছে, কারণ জাহাজে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু এক সময় বলল, 'আমার ভয় লাগছে এই জাহাজে। আর কেউ কি আছে?' সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারি পুরুষালি গলা শোনা গেল, 'ভয় নেই নীলু। আমি আছি।' স্বপ্ন এত সুন্দর হয়!

নীলুর ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাত সে আর ঘুমোতে পারল না। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিলু জেগে উঠে বলল, 'কী হয়েছে রে আপা?'

নীলু ভেজা গলায় বলল, 'পেট ব্যথা করছে। এখন একটু কম। তুই ঘুমো।'

১০

অনুফার কাছ থেকে নতুন কিছু জানা গেল না। সেও খুব জোর দিয়ে বলল, রানুর পরনে পায়জামা ছিল, এবং মৃত লোকটির পরনেও কাপড় ছিল।

'আপনি লোকটিকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি করে বলছেন কেন? মুরুব্বি মানুষ আপনি। আমি আপনার মেয়ের বয়েসী।'

'লোকটিকে কেমন দেখলে বল তো।'

'চাচা, আমার কিছু মনে নেই। সেই সময় আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। পরদিন আমার বিয়ে।'

'হ্যাঁ, তা আমি জানি। লোকটিকে নদীর পারে পুঁতে রাখা হয়, তাই না?'

'জ্বি। তারপর অনেক দিন কেউ ওদিকে যেত না। সবাই বলাবলি করত, রাতে কী জানি দেখতে পায়।'

'কী দেখতে পায়?'

'ছায়া ছায়া কী নাকি দেখে। তবে এই সব সত্যি না চাচা। সব মনগড়া।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। ভূত- প্রেত বলে কিছু নেই।'

মিসির আলি বড়োই অবাক হলেন। গ্রামের কোনো মেয়ে এইভাবে চিন্তা

করে না। এততটা মুক্তচিন্তা তাদের থাকার কথা নয়। মিসির আলি বললেন, 'তুমি পড়াশোনা কত দূর করেছ?'

'চাচা, আমি আই·এ· পড়ার সময় আমার বিয়ে হয়। তারপর আর পড়াশোনা হয় নি। গ্রামে বিয়ে হয়েছে তো। পড়াশোনা করার আমার খুব শখ ছিল।'

'মানুষের সব শখ মেটা উচিত নয়। একটা কোনো ডিসস্যাটিসফেকশন থাকা দরকার।'

'কেন?'

'তাহলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। সব শখ মিটে গেলে বেঁচে থাকার প্রেরণা নষ্ট হয়ে যায়। যে-সব মানুষের শখ মিটে গেছে, তারা খুব অসুখী মানুষ।'

অনুফা চুপ করে রইল। মিসির আলি মৃদু স্বরে বললেন, 'এবার রানুর কথা বল।'

'কী কথা জানতে চান?'

'সব কথা।'

'ও খুব অদ্ভুত মেয়ে। ও মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারে।'

'কীভাবে বলে?'

'তা জানি না, তবে বলতে পারে। এক বার কী হয়েছে, শোনেন। আমি আর ও গল্প করছি, সে হঠাৎ গল্প থামিয়ে বলল--কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাড়িতে শ্রীপুরের খালারা বেড়াতে আসবেন। আর সত্যি সত্যি তাঁরা এলেন।'

'এটা তো এমনিতেও হতে পারে। মানুষ বেড়াতে আসে না?'

'তা আসে। কিন্তু শ্রীপুরের খালা পাঁচ বছর পর প্রথম এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কী-একটা ঝগড়া চলছিল।

'ও, তাই নাকি?'

'জ্বি। আরেক গল্প বলি শোনেন, তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে রানুদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছি--না, এটা আপনাকে বলা যাবে না।'

'বলা যাবে না কেন?'

'গল্পটা ভালো না।'

'থাক, তাহলে অন্য গল্প বল।'

অনুফার স্বামীকেও মিসির আলি সাহেবের বেশ লাগল। গোঁয়ারগোবিন্দ ধরনের লোক। স্ত্রীর খুবই অনুগত। সে মিসির আলিকে নিয়ে প্রচুর ঘুরল। লোকটির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও দেখা গেল। মধুপুর থানার ওসি সাহেব ওর কথাতেই পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখালেন যে একটি মরা লাশ পাওয়ার খবরে এফআইআর করা হয়েছিল। তখন ওসি ছিলেন ব্রজগোপাল

হালদার, তাঁর নোটে লেখা--

একটি কলেরায় মৃত মানুষের লাশ (৩০/৩৫) মধুপুরের নিমশাসা গ্রামে পাওয়া যায়। লাশটির পচন ধরিয়া গিয়াছিল। প্রাথমিক পরীক্ষার পর আমি লাশটি পুঁতিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেই। লাশটির কোনো পরিচয় জানা যায় নাই।

মিসির আলি বললেন, 'কলেরায় মৃত, এটা বোঝা গেল কী করে?'

ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সেটা আমি কী করে বলব? রিপোর্ট তো আমার লেখা না। ব্রজগোপাল বাবুকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জানবেন।'

'তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'পুলিশ ডাইরেক্টরেটে খোঁজ করেন। তবে এই সব খোঁজাখুঁজির কোনো অর্থ নেই। দশ বৎসর আগের ঘটনা মনে করে বসে আছেন নাকি? পুলিশকে আপনার কী মনে করেন বলেন তো?'

'ঘটনাটা অস্বাভাবিক। সে জন্যই হয়তো তাঁর মনে থাকবে।'

'একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে পানিতে, এর মধ্যে আপনি অস্বাভাবিক কী দেখলেন? বাংলাদেশে প্রতি দিন কয়টা ডেড বডি পাওয়া যায় জানেন?'

'জ্বি না, জানি না।'

'পুলিশের লাইনে ডেড বডি পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা, বুঝলেন?'

মিসির আলি মধুপুরে আরো এক দিন থাকলেন। দেখে এলেন, যে-জায়গায় লোকটিকে পোঁতা হয়েছিল সেই জায়গা। দেখার মতো কিছু নয়। ঘন কাঁটাবন হয়েছে, যার মানে হচ্ছে এই জায়গাটিকে বেশ কিছু দিন লোকজন ভয়ের চোখে দেখেছে। হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

মিসির আলি অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন—যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়। নতুন কোনো তথ্য, যা কাজে লাগবে। কিন্তু কিছুই জানা গেল না। দশ বৎসর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়।

মধুপুর থেকে তিনি গেলেন রানুদের আদি বাড়িতে। সেখানে যাবার তাঁর একটি উদ্দেশ্য, খুঁজে দেখা--জালালউদ্দিন নামে কাউকে পাওয়া যায় কিনা। এই লোকটিকে পাওয়া খুবই প্রয়োজন।

আনিস লক্ষ করল, রানু ইদানীং বেশ স্বাভাবিক। এর প্রধান কারণ বোধহয় বাড়িঅলার দু'টি মেয়ে। ওদের সঙ্গে সে বেশ মিলেমিশে আছে। গল্পের বই আনছে। ভালোমন্দ কিছু রান্না হলেই আগ্রহ করে নিচে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়িঅলাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা আনিসের পছন্দ নয়। বাড়িঅলাদের সে সব সময় শত্রুপক্ষ বলেই মনে করে। কয়েক বার ভেবেছিল বলবে মেলামেশাটা কমাতে। না বলে ভালোই হয়েছে, এতে যদি অসুখটা চাপা পড়ে তো ভালোই।

কাজের একটি ছেলে পাওয়া গেছে--জিত মিয়া। এই ছেলেটিও রানুকে

বেশ ব্যস্ত রাখছে। ছেলেটির বয়স দশ–এগার, তবে মহাবোকা। কোনো কাজই করতে পারে না। করার আগ্রহও নেই। রানু ক্রমাগত বকাঝকা করেও কিছু করাতে পারে না। তবে তার সময় বেশ কেটে যায়।

সন্ধ্যাবেলা সে আবার জিতু মিয়াকে নিয়ে পড়াতে বসে। জিতু ঘুমঘুম চোখে পড়ে 'স্বরে অ স্বরে আ।' এই পড়াটি গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে। জিতু মিয়া কিছুই মনে রাখতে পারছে না। কিন্তু তাতে রানুর উৎসাহে ভাঁটা পড়ছে না।

আনিস এক দিন ঠাট্টা করে বলেছে, 'তুমি দেখি একে বিদ্যাসাগর বানিয়ে ফেলছ।' রানু তাতে বেশ রাগ করেছে। গম্ভীর হয়ে বলেছে, 'ঠাট্টা করছ কেন? বিদ্যাসাগর তো একদিন হতেও পারে।'

অবশ্য অদূর–ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ভবিষ্যৎ–বিদ্যাসাগর রোজ রাতেই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ছে। এবং রানু প্লেটে খাবার বেড়ে প্রতি রাতেই প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি আনিসের ভালো লাগে না। কিন্তু সে কিছু বলে না। থাকুক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত।

এর মধ্যে এক দিন আনিস গিয়েছিল মিসির আলি সাহেবের কাছে। ভদ্রলোক বেশ কিছু দিন ঢাকায় ছিলেন না। সবে ফিরেছেন। তাঁর চোখ হলুদ, গা হলুদ। আনিস অবাক হয়ে বলেছে, 'হয়েছে কী আপনার?'

'জণ্ডিস। জণ্ডিস বাধিয়ে বসেছি।'

'বলেন কী!'

'ইনফেকটাস হেপাটাইটিস। লিভারের অবস্থা কাহিল রে ভাই। আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'আর ভয়টয় পাচ্ছেন না?'

'জ্বি না।'

'খুব ভালো খবর। আমি একটু সুস্থ হলেই যাব আপনার বাসায়।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আমি কিছু খোঁজখবর পেয়েছি। মনে হয় আপনার স্ত্রীর সমস্যাটি ধরতে পেরেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, একটু ভালো হলেই এ নিয়ে কথা বলব।'

রানু মিসির আলি সাহেবের জণ্ডিসের খবরে খুবই মন খারাপ করল।

'আহা, বেচারা একা--একা কষ্ট করছে। চল এক দিন দেখে আসি। যাবে?'

'ঠিক আছে, যাব এক দিন।'

'কবে যাবে? কাল যাবে?'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জণ্ডিস যখন হয়েছে, তখন বেশ কিছু দিন থাকবে। এক দিন দেখে এলেই হবে।'

'আমি এই অসুখের ভালো ওষুধ জানি। অড়হড়ের পাতার রস। সকালবেলা এক গ্লাস করে খেলে তিন দিনে অসুখ সেরে যাবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার দাদা এই ওষুধটা দিতেন। তুমি কিছু অড়হড়ের পাতা ঐ লোকটিকে দিয়ে এস না।'

'ঢাকা শহরে আমি অড়হড়ের পাতা কোথায় পাব? কী যে বল!'

'খুঁজলেই পাবে। জংলা গাছ সব জায়গায় হয়।'

আনিস যথেষ্ট বিরক্ত হল। রানুর এই একটা প্রবলেম--কোনো একটা জিনিস মাথায় ঢুকলে ওটা নিয়েই থাকবে। আনিস বলল, 'আচ্ছা দেখি।'

'দেখাদেখি না, তুমি খুঁজবে। আর শোন, কাল তো তোমার অফিস নেই, চল ওনাকে দেখে আসি।'

'এত ব্যস্ত কেন? ভদ্রলোক তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না।'

রানু থেমে থেমে বলল, 'আমি অন্য একটা কারণে যেতে চাই।'

'কি কারণ?'

'ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যে মধুপুর গিয়েছিলেন, কী খোঁজ পেলেন জানতে ইচ্ছা করছে।'

'মধুপুরের খবর পেলে কীভাবে? স্বপ্নে?'

'না, স্বপ্নটপ্ন না। অনুফা চিঠি দিয়েছে।'

'কবে চিঠি পেয়েছ?'

'গতকাল।'

আনিস চুপ করে গেল। রানু তার নিজের চিঠিপত্রের কথা আনিসকে কখনো বলে না। বিয়ের পর রানু তার আত্মীয়স্বজনের যত চিঠিপত্র পেয়েছে তার কোনোটিই সে আনিসকে পড়তে দেয় নি। এ নিয়ে আনিসের গোপন ক্ষোভ আছে।

'কি, আমাকে নিয়ে যাবে?'

'আমি আগে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন।'

মিসির আলিকে পাওয়া গেল না। বাড়িতে তাঁর এক ছোট ভাই ছিল, সে বলল, 'ভাইয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা বেশি ভালো না। বিলরুবিন নাইন পয়েন্ট ফাইভ। লিভার খুবই ডেমেজড।'

১১

মিসির আলি হাসপাতালে এসেছেন একগাদা বই নিয়ে। তাঁর ধারণা ছিল বই পড়ে সময়টা খুব খারাপ কাটবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-রকম হয় নি। ডাক্তাররা বই পড়তে নিষেধ করেন নি, কিন্তু দেখা গেল বই পড়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাথার ভেতর ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা নিয়ে বই পড়ার কোনো মানে হয় না। তবু তিনি মৃত্যু-বিষয়ক একটি বই পড়ে ফেললেন, এবং মৃত্যু ব্যাপারটিতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। তাঁর স্বভাবই হচ্ছে কোনো বিষয় এক বার মনে ধরে গেলে সে-বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত পড়াশোনা করতে চেষ্টা করেন।

মৃত্যু সাবজেক্টটি তাঁর পছন্দ হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন না। বইপত্র নেই। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে কিছু থাকার কথা, কিন্তু আনাবেন কাকে দিয়ে? তাঁকে কেউ দেখতে আসছে না। তিনি এমন কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তি নন যে তাঁর অসুস্থতার খবরে মানুষের ঢল নামবে। তা ছাড়া অসুখের খবর তিনি কাউকে জানান নি। হাসপাতালে ভর্তি হবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু ঘরে দেখাশোনার লোক নেই। কাজের মেয়েটি তিনি মধুপুর থাকাকালীন বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে। এমন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় কি?

বিকালবেলা তাঁর কাছে কেউ আসে না। সবারই আত্মীয়স্বজন আসে দেখতে, তাঁর কাছে কেউ আসে না। এই সময়টা তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন এবং এখনো মানুষের সঙ্গ পাবার জন্যে তাঁর মন কাঁদে দেখে নিজের কাছেই লজ্জিত বোধ করেন।

আজ সারা দিন মিসির আলির খুব খারাপ কেটেছে। তাঁর রুমমেট ছাব্বিশ বছরের ছেলেটি সকাল ন'টায় বিনা নোটিশে মারা গেছে। মৃত্যু যে এত দ্রুত মানুষকে ছুঁয়ে দিতে পারে তা তাঁর ধারণাতেও ছিল না। ছেলেটা ভোরবেলায় নাশতা চেয়েছে, তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তাও বলেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'আজ কেমন আছ?'

'আজ বেশ ভালো।'

'লিভার ব্যথা করছে না?'

'নাহ্, তবে তলপেটের দিকে একটা চাপা ব্যথা আছে।'

'খুব বেশি?'

'না, খুব বেশি না। আপনি এটা কী বই পড়ছেন?'

'এটা একটা সায়েন্স ফিকশন--"ফ্রাইডে দি থার্টিন্থ"। বেশ ভালো বই। তুমি পড়বে?'

'জ্বি-না। ইংরেজি বই আমার ভালো লাগে না। বাংলা উপন্যাস পড়ি।'

'কার লেখা ভালো লাগে? এ দেশের--মানে বাংলায়, কার লেখা

তোমার পছন্দ?'

'নিমাই ভট্টচার্য।'

'তাই নাকি?'

ছেলেটি আর জবাব না দিয়ে কাৎরাতে থাকে। সকাল সাড়ে আটটায় বলল, 'এক জন ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা দেখবেন?' তিনি অনেকক্ষণ বোতাম টিপলেন, কেউ এল না। শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলেন ডিউটি রুমে। ফিরে এসে দেখেন ছেলেটি মরে পড়ে আছে।

মৃত্যুর সময় পাশে কেউ থাকবে না, এর চেয়ে ভয়াবহ বোধহয় আর কিছু নেই। শেষ বিদায় নেবার সময় অন্তত কোনো এক জন মানুষকে বলে যাওয়ার দরকার। নিঃসঙ্গ ঘর থেকে একা-একা চলে যাওয়া যায় না। যাওয়া উচিত নয়। এটা হৃদয়হীন ব্যাপার।

এত দিন যে ছেলেটি ছিল, এখন আর সে নেই। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তার সমস্ত চিহ্ন এ ঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিছানায় নতুন বালিশ ও চাদর দিয়ে গেছে--হয়তো সন্ধ্যার মধ্যে কোনো নতুন পেশেন্ট এসে পড়বে।

মিসির আলি সমস্ত দিন কিছু খেতে পারলেন না। বিকেলের দিকে তাঁর গায়ে বেশ টেম্পারেচার হল। প্রথম বারের মতো মনে হল এক জন কেউ তাঁকে দেখতে এলে খারাপ লাগবে না। ভালোই লাগবে। কেউ না এলে এক জন রোগী হলেও আসুক, একা-একা এই কেবিনে রাত কাটানো যাবে না। ঠিক এই সময় ইতস্তত ভঙ্গিতে রানু এসে ঢুকল।

'আপনি ভালো আছেন?'

'না, ভালো না। তুমি কোত্থেকে?'

'বাসা থেকে। ইশ্! আপনার একি অবস্থা!'

'অবস্থা খারাপ ঠিকই। আনিস সাহেব কোথায়?'

'ও আসে নি, আমি একাই এলাম। ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি।'

'বস তুমি। ঐ চেয়ারটায় বস। ফ্লাস্কে চা আছে। খেতে চাইলে খেতে পার।'

'উঁহু, চা-টা খাব না। আপনার কাছে একটা খবর জানতে এসেছি।'

'কোন খবরটি?'

'মধুপুরে গিয়ে আপনি কী জানলেন?'

'তেমন কিছু জানতে পারি নি।'

'তবু যা জেনেছেন তা-ই বলুন। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে। অনুফা লিখেছে, আপনি নাকি হাজার হাজার মানুষকে নানা রকম প্রশ্ন করেছেন।'

মিসির আলি হাসলেন।

'হাসলে হবে না, আমাকে বলতে হবে।'

'প্রথম যে জিনিসটি জানলাম--সেটি হচ্ছে, তুমি অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছ।'

'আমি কোনো তথ্য দিই নি।'

'তুমি নিজে হয়তো জান না সেগুলো ভুল। যেমন পায়জামা খোলার ব্যাপারটি--এরকম কোনো কিছু ঘটে নি।

রানু চোখ লাল করে বলল, 'ঘটেছে।'

'না রানু, ঘটে নি। এটা তোমার কল্পনা। তাছাড়া তুমি উলঙ্গ একটি ডেড বডির কথা বলেছ--সেটাও ঠিক না।'

'কিন্তু আমি জানি এগুলো ঠিক।'

'না রানু। এই সব তুমি নিজে ভেবেছ এবং আমার ধারণা এ-জাতীয় স্বপ্ন তুমি মাঝে মাঝে দেখ। দেখ না?'

'কী রকম স্বপ্নের কথা বলছেন?'

মিসির আলি কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন। স্পষ্ট গলায় বললেন, 'তুমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখ না--এক জন নগ্ন মানুষ তোমার কাপড় খোলার চেষ্টা করছে?'

রানু উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে থাকল।

'বল রানু। জবাব দাও।'

'হ্যাঁ, দেখি।'

'কখনো কি ভেবে দেখেছ এ রকম স্বপ্ন কেন দেখ?'

'না, ভাবি নি।'

'আমি ভেবেছি। এবং কারণটাও খুঁজে বের করেছি। আজ সেটা বলতে চাই না, অন্য এক দিন বলব।'

'না, আপনি আমাকে আজই বলেন।'

মিসির আলি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'চা খেতে-খেতে শোন। চায়ে ক্যাফিন আছে। ক্যাফিন তোমার নার্ভগুলোকে এ্যাকটিভ রাখবে।'

রানু চায়ের পেয়ালা নিল কিন্তু চুমুক দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বলতে লাগলেন, 'রানু, তোমাকে নিয়ে এই গল্পটি আমি তৈরি করেছি। তুমি মন দিয়ে শোন। তুমি যখন বেশ ছোট--নয়,দশ বা এগার বছর বয়স, তখন এক জন বয়স্ক লোক তোমাকে ভুলিয়েভালিয়ে নির্জন কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের গ্রামে এ রকম একটা নির্জন জায়গার খোঁজে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে জঙ্গলের কাছে একটা ভাঙা গোবিন্দ-মন্দির দেখেছি। মনে হয় ঐ জায়গাটাই হবে। কারণ সাপের ভয়ে ওখানে কেউ যেত না। রানু, তুমি কি আমার কথা শুনছ?'

'শুনছি।'

'তারপর সেই বয়স্ক মানুষটি মন্দিরে তোমাকে নিয়ে গেল।'

'আমাকে কেউ নিয়ে যায় নি। আমি নিজেই গিয়েছিলাম। ঐ মন্দিরে খুব সুন্দর একটি দেবী মূর্তি আছে। আমি ঐ মূর্তি দেখার জন্যে যেতাম।'

'তারপর কী হয়েছে বল।'

রানু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তীব্র স্বরে বলল,'আমি বলব না, আপনি বলুন।'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ঐ লোকটি তখন টেনে তোমার পায়জামা খুলে ফেলল।'

রানুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ঐ লোকটির নাম ছিল জালালউদ্দিন।'

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, 'তোমার অসুখ শুরু হল সেদিন থেকে। তোমার মনের মধ্যে ব্যাপারটি গেঁথে গেল, পরবর্তী সময়ে গোসলের সময় যখন মরা মানুষটি তোমার পায়ে লেগে গেল, তখন তোমার মনে পড়ল মন্দিরের দৃশ্য। বুঝতে পারছ?'

রানু জবাব দিল না।

'অসুখের মূল কারণটি আলোয় নিয়ে এলেই অসুখ সেরে যায়; এজন্যেই আমি এটা তোমাকে বললাম। তুমি নিজেও এখন গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করবে। তোমার অসুখ সেরে যাবে।'

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'আপনি কি ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'বলেছি।'

'ও কী বলেছে?'

'তেমন কিছু বলে নি।'

'না, বলেছে, আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন না। এতটা যখন বলেছেন, তখন বাকিটাও বলুন।'

রানু তীব্র চোখে তাকাল। মিসির আলি বললেন, 'দেখ রানু, আমি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ। অলৌকিক কোনো কিছুতে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি সব কিছুরই একটি ব্যাখ্যা আছে। জালালউদ্দিন যা বলেছে, তাও নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করা যায়।'

'ব্যাখ্যা পরে করবেন। আগে বলুন সে কী বলেছে।'

'সে বলেছে, হঠাৎ সে দেখে মূর্তিটি ছুটে এসে তোমার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। তোমার গা থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। জালালউদ্দিন তখন ছুটে পালিয়ে যায়।'

'আপনি জালালউদ্দিনের কথা বিশ্বাস করেন না?'

'না। ওর মনে পাপবোধ ছিল। মন্দিরটন্দির নিয়ে মূর্খ মানুষদের মনে অনেক রকম ভয়–ভীতি আছে। তা থেকেই সে একটা হেলুসিনেশন দেখেছে। তুমি নিজে তো কিছু দেখ নি।'

'না।'

'তাহলেই হল। জালালউদ্দিন কী দেখেছে না-দেখেছে সেটা তার প্রবলেম, তোমার নয়।'

রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু একটা জিনিস কি জানেন? ঐ ঘটনার পর থেকে আমি অসম্ভব সুন্দর হয়ে গেলাম।'

মিসির আলি শব্দ করে হাসলেন। হাসতে-হাসতে বললেন,'সুন্দর তুমি সব সময়ই ছিলে। ঘটনাটি ঘটেছে তোমার বয়ঃসন্ধিতে। বয়ঃসন্ধির পর মেয়েদের রূপ খুলতে শুরু করে। এখানেও তাই হয়েছে।'

'কিন্তু ঐ দেবী মূর্তিটিকে এর পর আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।'

'তুমি কিন্তু খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ রানু। মূর্তিটি চুরি গেছে, কেউ নিয়ে পালিয়ে গেছে, ব্যস।'

'মূর্তিটি চুরি যায় নি।'

'তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না--একটা পাথরের মূর্তি তোমার মধ্যে ঢুকে আছে? কি, কর?'

রানু তীব্র কণ্ঠে বলল, 'আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলুন, আমাকে কি অনেকটা মূর্তির মতো দেখায় না?'

'না রানু, মূর্তির মতো দেখাবে কেন? অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী--এর বেশি কিছু না। তোমার মতো রূপবতী মেয়ে এ দেশেই আছে এবং তারা সবাই রক্ত-মাংসের মানুষ।'

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি বললেন, 'চলে যাচ্ছ রানু?'

'হ্যাঁ।'

'অসুখ সারলে তোমাদের ওখানে এক বার যাব।'

'না, আপনি আসবেন না। আপনার আসার কোনো দরকার নেই।'

রানু ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিসির আলি ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং।' তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যতটা সহজ মনে হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না। তিনি মৃত্যু বিষয়ক বইটি আবার পড়তে শুরু করলেন। সাবজেক্টটি তাঁকে বেশ আকর্ষণ করেছে। ফ্যাসিনেটিং টপিক।

১২

গভীর রাতে আনিস জেগে উঠল। শুনশান নীরবতা চারদিকে। রানু হাত-পা ছড়িয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো ঘুমোচ্ছে। জানালার আলো এসে পড়েছে তার মুখে। অদ্ভুত সুন্দর একটি মুখ। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। আনিস ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। বাথরুমে যেতে হবে।

বাথরুমে পানি জমে আছে। পাইপ জাম হয়ে গেছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে। আনিস নোংরা পানি বাঁচিয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই শুনল ঝুমঝুম করে শব্দ হচ্ছে। নূপুর বাজছে যেন। এর মানে কী? মনের ভুল

কি? মনের ভুল হবার কথা নয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে নূপুর পায়ে দিয়ে ঝমঝম করতে করতে কেউ–এক জন এঘর–ওঘর করছে। শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছে। মনের ভুল হবার কথা নয়।

বাথরুমের দরজা খুলতেই শব্দটা চট করে থেমে গেল। শুধু একটা তীব্র ফুলের গন্ধ আনিসকে অভিভূত করে ফেলল। একটু আগেও তো এ রকম সৌরভ ছিল না। আনিসের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিস্ময়ের ঘোর অবশ্যি বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। আনিসের মনে পড়ল একতলার বাগানে হাস্নাহেনার প্রকাণ্ড একটা ঝাড় আছে। বাতাসের ঝাপটায় ফুলের গন্ধই উড়ে এসেছে বারান্দায়। আনিস কিছুক্ষণ একা–একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল––নূপুরের শব্দ আবার যদি পাওয়া যায়।

দোতলার একটা বাচ্চা ছেলে শুধু কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। একটা রিক্শা গেল টুনটুন করে। ব্যস, আর কিছু শোনা গেল না।

শোবার ঘরে রানু ঘুমোচ্ছে। মড়ার মতো। জানালা খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। আনিস জানালা বন্ধ করতে গিয়ে শুনল, রান্নাঘর থেকে জিতু মিয়া সাড়াশব্দ দিচ্ছে। কান্না চাপার আওয়াজ।

'জিতু মিয়া।'

জিতু ফুঁপিয়ে উঠল। আনিস রান্নাঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাল। জিতু মশারির ভেতর জবুথবু হয়ে বসে আছে।

'জিতু, কি হয়েছে রে?'

'কিছু হয় নাই।'

'বসে আছিস কেন?'

'ঘুম আহে না।'

'স্বপ্ন দেখেছিস?'

জিতু মাথা নাড়ল।

'কী স্বপ্ন?'

'এক জন মাইয়া মানুষ পাকের ঘরে হাঁটতে আছিল।'

'এই দেখেছিস স্বপ্নে?'

'স্বপ্নে দেখি নাই। নিজের চোখে দেখলাম।'

'দূর ব্যাটা, অন্ধকারে তুই মানুষ দেখলি কীভাবে? যা ঘুমো।'

জিতু শুয়ে পড়ল। আনিস বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, আমি জেগে আছি, ঘুমো তুই।'

'আচ্ছা।'

'আর শোন, রান্নাঘরে বাতি জ্বালানো থাকুক।'

'আচ্ছা।'

জিতু শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল।

আনিস একটি সিগারেট ধরাল। ঘুম চটে গেছে। তাকে এখন দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হবে। এক পেয়ালা চা খেতে পারলে মন্দ হত না। রাত তো বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা। বাকি রাতটা তার জেগেই কাটবে মনে হয়। সিগারেট টানতে ভালো লাগছে না। পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে।

ঘুমের মধ্যে রানু শব্দ করে হাসল। আনিস মৃদু স্বরে ডাকল, 'এই রানু।' রানু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'কি?'

'জেগে আছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কি আশ্চর্য, কখন জাগলে?'

'অনেকক্ষণ। তুমি বাথরুমে গেলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে।'

আমাকে ডাকলে না কেন?'

'শুধু শুধু ডাকব কেন?'

আনিস সিগারেট টানতে লাগল। রানু বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। জানালা বন্ধ করলে কেন?'

'গরম কোথায়? বেশ ঠাণ্ডা তো!'

'আমার গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড় না।'

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে ফ্যান ছাড়ব কি, কী যে বল!'

রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি যখন বাথরুমে ছিলে তখন কি নুপুরের শব্দ শুনেছ?'

আনিস ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'না তো, কেন?'

'না, এমনি। আমি শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম।'

'ঘুমাও রানু।'

'আমার ঘুম আসছে না।'

'ঘুম না এলে উঠে বস, গল্প করি। চা খাওয়া যেতে পারে, কি বল?'

রানু উঠে বসল কিন্তু জবাব দিল না। আনিস দেখল রানু কোন ফাঁকে গায়ের কাপড় খুলে ফেলেছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। তুমি আমার দিকে তাকিও না, প্লীজ।'

'এই সব কী রানু? ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে আছে।'

'কী করব, বড্ড গরম লাগছে। তুমি বরং রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে সব অন্ধকার করে দাও।'

'না, বাতি জ্বালানো থাক।'

আনিস দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। রানু বলল, 'আমাদের গ্রামে একটা মন্দির আছে, তার গল্প এখন শুনবে না?'

'আহ্, মন্দির-ফন্দিরের গল্প এখন শুনব না।'

'আহ্, শোন না। আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আমি যখন খুব ছোট, তখন একা-একা যেতাম সেখানে।'

'কি মন্দির? কালী–মন্দির?'

'নাহ্, বিষ্ণু–মন্দির বলত ওরা। তবে কোনো বিষ্ণুমূর্তি ছিল না। একটি দেবী ছিল। হিন্দুরা বলত রুকমিনী দেবী।'

'তুমি মন্দিরে যেতে কী জন্যে?'

'এমনি যেতাম। ছোট বাচ্চা পুতুল খেলে না?'

'কী করতে সেখানে?'

'দেবী–মূর্তির সাথে গল্পগুজব করতাম। ছেলেমানুষী খেলা আর কি!'

বলতে-বলতে রানু খিলখিল করে হেসে উঠল। আনিস স্পষ্ট শুনল সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম করে কোথাও নূপুর বাজছে। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

'কী শুনব?'

'নূপুরের শব্দ শুনছ না?'

আনিস দৃঢ় স্বরে বলল, 'না। তুমি ঘুমাও রানু।'

'আমার ঘুম আসছে না।'

'শুয়ে থাক। তুমি অসুস্থ।'

রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি অসুস্থ।'

'তোমাকে খুব বড়ো ডাক্তার দেখাব আমি।'

'আচ্ছা।'

'এখন শুয়ে থাক।'

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'আমি ঐ দেবীকে গান গেয়ে শোনাতাম।'

'ঐ সব অন্য দিন শুনব।'

'আজ রাতে আমার বলতে ইচ্ছে করছে।'

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। আনিস অবাক হয়ে বলল, 'তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে।'

'হুঁ, বড্ড গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড়বে?'

আনিস উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। ঘর ভর্তি হয়ে গেল ফুলের গন্ধে। আর তখনি রানু অত্যন্ত নিচু গলায় গুনগুন করে কী যেন গাইতে লাগল। অদ্ভুত অপার্থিব কোনো একটা সুর—যা এ জগতের কিছু নয়। অন্য কোনো ভুবনের। রান্নাঘর থেকে জিতু ডাকতে লাগল, 'ও ভাইজান, ভাইজান!'

আনিস রানুকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে গায়ের চাদর টেনে দিল। জিতুকে বলল, এ ঘরে যেন না আসে। তারপর নেমে গেল নিচে, বাড়িঅলার মেয়েটিকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে।

নীলু এল সঙ্গে সঙ্গে। আনিস দেখল রানু শিশুর মতো ঘুমাচ্ছে। জিতু মিয়া শুধু জেগে আছে। কাঁদছে ব্যাকুল হয়ে। নীলুর সঙ্গে তার বাবাও আসছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'হয়েছেটা কি?' আনিস ভাঙা গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না, কেমন যেন করছে।'

'কী করছে?'

আনিস জবাব দিল না। নীলু বলল, 'বাবা, তুমি শুয়ে থাক গিয়ে, আমি এখানে থাকি। রাত তো বেশি নেই।' ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিচে নেমে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'হাসপাতালে নিতে হলে বলবেন, ড্রাইভারকে ডেকে তুলব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রানু বাকি রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল। এক বারও জাগল না। নীলু সারাক্ষণ তার পাশে রইল। আনিসের সঙ্গে তার কথাবার্তা কিছু হল না। আনিস বসার ঘরের সোফায় বসে ঝিমুতে লাগল।

১৩

মিসির আলি লোকটির ধৈর্য প্রায় সীমাহীন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি দ্বিতীয় দফায় রানুদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক ভদ্রলোক, জয়নাল সাহেব। উদ্দেশ্য রুকমিনী দেবীর মন্দির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

জয়নাল সাহেব মন্দির দেখে বিশেষ উল্লসিত হলেন না। তিন শ' বৎসরের বেশি এর বয়স হবে না। এ রকম ভগ্নস্তূপ এ দেশে অসংখ্য আছে। মিসির আলি বললেন, 'তেমন পুরনো নয় বলছেন?'

'না রে ভাই। ইটের সাইজ দেখলেই বুঝবেন। ভেঙেটেঙে কি অবস্থা হয়েছে দেখেন।'

'যত্ন হয় নি। মন্দির যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হয়তো মারা গেছেন কিংবা তাঁর উৎসাহ মিইয়ে গেছে।'

গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া গেল--পালবাবুদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। পালরা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তার পরপরই তাদের ভাগ্যে বিপর্যয় শুরু হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে পালরা নির্বংশ হয়ে পড়ে। দেবীকে তুষ্ট করার জন্যে তখন এক রাতে কুমারী বলির আয়োজন করা হয়। বারো বছরের একটা কুমারী কন্যাকে অমাবস্যার রাত্রিতে মন্দিরের সামনে বলি দেওয়া হয়। দেবীর তুষ্টি হয় না তাতেও। পাথরের মূর্তি এত সহজে বোধহয় তুষ্ট হয় না। তবে গ্রামের মানুষেরা নাকি বলি দেওয়া মেয়েটিকে এর পর থেকে গ্রামময় ছুটোছুটি করতে দেখে। ময়মনসিংহ থেকে ইংরেজ পুলিশ সুপার এসে মন্দির তালাবন্ধ করে পালদের দুই ভাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে যান।

পালরা অত্যন্ত ক্ষমতাবান ছিল। কাজেই ছাড়া পেয়ে এক সময় আবার গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু মন্দির তালাবন্ধই পড়ে থাকে।

ইতিহাস এইটুকুই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা গেল না। দু–এক ঘর নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা ছিল, তারা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। হরিশ মণ্ডল বলল, 'বাবু, আমরা কেউ ঐ দিকে যাই না। ঐ মন্দিরে গেলে নির্বংশ হতে হয়, কে যাবে বলেন?'

'আপনি তো শিক্ষিত লোক, এই সব বিশ্বাস করেন?'

'করি না, কিন্তু যাইও না।'

'মূর্তিটা আপনি দেখেছেন?'

'আমি দেখি নাই, তবে আমার জ্যাঠা দেখেছে।'

'তিনি কি নির্বংশ হয়েছেন?'

'না, তাঁর তিন ছেলে। এক ছেলে নান্দিনা হাইস্কুলের হেড মাষ্টার।'

'মূর্তিটা কেমন ছিল বলতে পারেন?'

'শ্বেতপাথরের মূর্তি। কৃষ্ণনগরের কারিগরের তৈরি। একটা হাত ভাঙা ছিল।'

'মূর্তি নাকি হঠাৎ উধাও হয়েছে?'

'কেউ চুরিটুরি করে নিয়ে বিক্রি করে ফেলেছে। গ্রামে চোরের তো অভাব নাই। এরকম একটা মূর্তিতে হাজারখানিক টাকা হেসেখেলে আসবে। সাহেবরা নগদ দাম দিয়ে কিনবে।'

'আচ্ছা, একটা বাচ্চা মেয়েকে যে বলি দেওয়া হয়েছিল, সে নাকি অমাবস্যার রাত্রে ঘুরে বেড়ায়?'

'বলে তো সবাই। চিৎকার করে কাঁদে। আমি শুনি নাই। অনেকে শুনেছে।'

অমাবস্যার জন্যে মিসির আলিকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হল। তিনি অমাবস্যার রাত্রে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আর একটা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে রইলেন। তিনি কিছুই শুনলেন না। শেয়ালের ডাক শোনা গেল অবশ্যি। শেষ রাত্রের দিকে প্রচণ্ড বাতাস বইতে লাগল। বাতাসে শিস দেবার মতো শব্দ হল। সে–সব নিতান্তই লৌকিক শব্দ। অন্য জগতের কিছু নয়। রাত শেষ হবার আগে আগে বর্ষণ শুরু হল। ছাতা নিয়ে যান নি। মন্দিরের ছাদ ভাঙা। আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। মিসির আলি কাক–ভেজা হয়ে গেলেন।

ঢাকায় ফিরলেন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। ডাক্তার পরীক্ষা করে শুকনো মুখে বললেন, 'মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া। একটা লাংস এফেকডেড, ভোগাবে।'

মিসির আলিকে সত্যি সত্যি ভোগাল। তিনি দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

১৪

বইপাড়াতে এ সময় লোকজন তেমন থাকে না। আজ যেন আরো নির্জন। নীলু একা-একা কিছুক্ষণ হাঁটল। তার খুব ঘাম হচ্ছে। বারবার সবুজ রুমালটি বের করতে হচ্ছে। চারটা দশ বাজে। চিঠিতে লিখেছে সে চারটার মধ্যেই আসবে, কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু অবশ্যি কারো মুখের দিকে তাকাতেও পারছে না। কাউকে তাকাতে দেখলেই বুকের মধ্যে ধক করে উঠছে।

নীলু একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। গল্পের বই তার তেমন ভালো লাগে না। ভালো লাগে বিলুর। বিলুর জন্যে একটা কিছু কিনলে হয়। কিন্তু কী কিনবে? সবই হয়তো ওর পড়া। ঐ দিন শীর্ষেন্দুর কী-একটা বইয়ের কথা বলছিল। নামটা মনে নেই।

'আচ্ছা, আপনাদের কাছে শীর্ষেন্দুর কোনো বই আছে?'

'জ্বি না। আমরা বিদেশি বই রাখি না।'

নীলু অন্য একটা ঘরে ঢুকল। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে একটা কবিতার বই কিনে ফেলল। অপরিচিত কবি, তবে প্রচ্ছদটি সুন্দর। একটি মেয়ের ছবি। সুন্দর ছবি। নামটি সুন্দর--'প্রেম নেই'। কেমন অদ্ভুত নাম। 'প্রেম নেই' আবার কী? প্রেম থাকবে না কেন?

দাড়িঅলা এক জন রোগা ভদ্রলোক তখন থেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। লোকটির কাঁধে একটি ব্যাগ। এই কি সে! নীলুর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। নীলু বইয়ের দাম দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল। তার পেছনে ফেরারও সাহস নেই। পেছনে ফিরলেই সে হয়তো দেখবে বুড়ো দাড়িঅলা গুটি গুটি আসছে।

না, লোকটি আসছে না। নীলুর মনে হল, ভয়ানক মোটা এবং বেঁটে এক জন কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু আসছে তার পিছু পিছু। নীলুর তৃষ্ণা পেয়ে গেল। বড্ড টেনশান। বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয়? কিন্তু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। নীলু ঘড়ি দেখল, পাঁচটা পাঁচ। তার মানে কি যে সে আসবে না? কথা ছিল নীলু থাকবে ঠিক এক ঘন্টা।

সে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ভালোই হয়েছে। দেখা না হওয়াটাই বোধ- হয় ভালো। দেখা হবার মধ্যে একটা আশাভঙ্গের ব্যাপার আছে। না-দেখার রহস্যময়তাটাই নাহয় থাকুক। নীলু ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

'নীলু।'

নীলু দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি ভালো আছ নীলু?'

চকচকে লাল টাই পরা যে-ছেলেটি হাসছে, সে কে? লম্বা স্বাস্থ্যবান একটি তরুণ। ঝলমল করছে। তার লাল টাই উড়ছে। বাতাসে মিষ্টি ঘ্রাণ

আসছে। সেন্টের গন্ধ। পুরুষ মানুষের গা থেকে আসা সেন্টের গন্ধ নীলুর পছন্দ নয়। কিন্তু আজ এত ভালো লাগছে কেন!

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বল।'

'আপনি বলেছিলেন আপনি বুড়ো।'

'আমরা সবাই কিছু কিছু মিথ্যা বলি। আমাকে নীলু নামের একটি মেয়ে লিখেছিল সে দেখতে কুৎসিত।'

লোকটি হাসছে হা হা করে। এত সুন্দর করেও মানুষ হাসতে পারে! নীলুর এক ধরনের কষ্ট হতে লাগল। মনে হতে লাগল সমস্তটাই একটা সুন্দর স্বপ্ন, খুবই ক্ষণস্থায়ী। যেন এক্ষুণি স্বপ্ন ভেঙে যাবে। নীলু দেখবে সে জেগে উঠেছে, পাশের বিছানায় বিলু ঘুমাচ্ছে মশারি না ফেলে। কিন্তু সে রকম কিছু হল না। ছেলেটি হাসিমুখে বলল, 'কোথাও বসে এক কাপ চা খেলে কেমন হয়? খাবে?'

নীলু মাথা নাড়ল--সে খাবে।

'তুমি কিন্তু সবুজ রুমালটি ব্যাগে ভরে ফেলছ। আমি যেতে ঠিক সাহস পাচ্ছি না।'

নীলু অস্বাভাবিক ব্যস্ত হয়ে রুমাল বের করতে গেল। একটা লিপস্টিক, একটা ছোট চিরুনি, কিছু খুচরো পয়সা গড়িয়ে পড়ল নিচে। ছেলেটি হাসিমুখে সেগুলি কুড়োচ্ছে। নীলু মনে মনে বলল--যেন এটা স্বপ্ন না হয়। আর স্বপ্ন হলেও যেন স্বপ্নটা অনেকক্ষণ থাকে। নীলুর খুব কান্না পেতে লাগল।

নিউ মার্কেটের ভেতর চা খাওয়ার তেমন ভালো জায়গা নেই। ওরা বলাকা বিল্‌ডিংয়ের দোতলায় গেল। চমৎকার জায়গা। অন্ধকার-অন্ধকার চারদিক। পরিচ্ছন্ন টেবিল। সুন্দর একটি মিউজিক হচ্ছে।

'চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে নীলু?'

'নাহ্।'

'ওরা ভালো সমুচা করে। সমুচা দিতে বলি? আমার খিদে পেয়েছে। কি, বলব?'

'বলুন।'

ছেলেটি হাসল। নীলুর খুব ইচ্ছা করছিল, জিজ্ঞেস করে--হাসছ কেন তুমি? আমি কি হাস্যকর কিছু করেছি? কিন্তু নীলু কিছু বলল না। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আসলে আমি বিজ্ঞাপনটা মজা করবার জন্যে দিয়েছিলাম, কেউ জবাব দেবে ভাবি নি।'

'আমি ছাড়া কেউ কি লিখেছিল?'

'তা লিখেছে। মনে হচ্ছে এ-দেশের মেয়েদের কাজকর্ম বিশেষ নেই। সুযোগ পেলেই ওরা চিঠি লেখে। এই কথা বললাম বলে তুমি আবার রাগ করলে না তো?'

'নাহ্।'

'গুড। আমি কিন্তু শুধু তোমার চিঠির জবাব দিয়েছি। অন্য কারোর চিঠির জবাব দিই নি। আমার কথা বিশ্বাস করছ তো?'

'করছি।'

বেয়ারা চায়ের পট দিয়ে গেল। ছেলেটি বলল, 'দাও, আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি। ঘরে বানাবে মেয়েরা, কিন্তু বাইরে পুরুষেরা--এই নিয়ম।'

নীলু লক্ষ করল ছেলেটি তার কাপে তিন চামচ চিনি দিয়েছে। নীলু এক বার লিখেছে সে চায়ে তিন চামচ চিনি খায়। ছেলেটি সেটা মনে রেখেছে। কী আশ্চর্য!

'চায়ে এত চিনি খাওয়া কিন্তু ভালো না।'

নীলু কিছু বলল না।

'এর পর থেকে চিনি কম খাবে।'

নীলু ঘাড় নাড়ল।

তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল। নীলু এক বার বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, উঠি?'

ছেলেটি বলল, 'আরেকটু বস, আমি বাসায় পৌঁছে দেব, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।' নীলু আর কিছু বলল না।

'একটু দেরি হলে তোমাকে আবার বাসায় বকবে না তো?'

'নাহ্, বকবে না। আমি মাঝে মাঝে অনেক রাত করে বাসায় ফিরি।'

'সেটা ঠিক না নীলু। শহর বড়ো হচ্ছে, ক্রাইম বাড়ছে। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'ঐ দিন কী হল জান--আমার পরিচিত এক মহিলার কান থেকে টেনে দুল নিয়ে গেছে, রক্তারক্তি কাণ্ড!'

'আমি বাইরে গেলে গয়নাটয়না পরি না।'

'না পরাই উচিত। আচ্ছা নীলু, তুমি কি আজ তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে?'

'আপনি যদি চান, দেব।'

'আমি নিশ্চয়ই চাই। তুমি কি চাও?'

'চাই' বলতে গিয়ে নীলুর চোখ ভিজে উঠল। ছেলেটিকে এখন কত-না পরিচিত মনে হচ্ছে। সে যদি এখন হাত বাড়িয়ে নীলুর হাত স্পর্শ করে তাহলে কেমন লাগবে নীলুর? ভালোই লাগবে। কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। সে এমন কিছুই করবে না।

'নীলু, আমি তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছিলাম। কিন্তু তার আগে বল, তুমি কী এনেছ? তুমি বলেছিলে লাল টাই আনবে। ভুলে গেছ, না?'

'না, ভুলব কেন?'

'আমি তোমার জন্যেই লাল টাই পরে এসেছি। যদিও লাল রং আমার

পছন্দ নয়। আমার পছন্দ হচ্ছে--নীল।'

'নীল আমারও পছন্দ।'

'তবে হাল্কা নীল, কড়া নীল নয়।'

নীলু এই প্রথম অল্প হাসল। হাল্কা নীল তার নিজেরও পছন্দ। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আমার সবচে অপছন্দ হচ্ছে সবুজ রং। কিন্তু দেখ, আজ সবুজ রংটাও খারাপ লাগছে না।'

তারা উঠে দাঁড়াল সাড়ে আটটার দিকে। হেঁটে হেঁটে এল নিউমার্কেটের গেটে। ছোট্ট একটা হোণ্ডা সিভিক সেখানে পার্ক করা। ছেলেটি ঘড়ি দেখে বলল, 'রাত কি বেশি হয়ে গেল নীলু?'

'না, বেশি হয় নি।'

'তোমার বাবা দুশ্চিন্তা না করলে হয়। আমি চাই না আমার জন্যে কেউ বকা খাক। অবশ্যি এক-আধ দিন বকা খেলে কিছু যায় আসে না, কি বল?'

নীলু হাসল। ছেলেটিও হাসল। মার্জিত হাসি।

'সরাসরি বাসায় যাবে, নাকি যাবার আগে আইসক্রিম খাবে? ধানমণ্ডিতে একটা ভালো আইসক্রিমের দোকান দিয়েছে।'

'আজ আর যাব না।'

'ঠিক আছে, চল বাসায় পৌঁছে দিই।'

ছেলেটি নীলুকে তাদের গেটের কাছে নামিয়ে দিল। নীলুর খুব ইচ্ছে করছিল তাকে বসতে বলে, কিন্তু তার বড্ড লজ্জা করল। বিলু নানান প্রশ্ন শুরু করবে।

১৫

'স্যার, ভেতরে আসব?'

'এস। কি ব্যাপার?'

মিসির আলি মেয়েটিকে ঠিক চিনতে পারলেন না। তিনি কখনো তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের চিনতে পারেন না।

'স্যার, আমার নাম নীলু, নীলুফার।'

'ও আচ্ছা।'

মিসির আলি পরিচিত ভঙ্গিতে হাসলেন। কিন্তু নামটি তাঁর কাছে অপরিচিত লাগছে। এও এক সমস্যা। কারো নাম তিনি মনে রাখতে পারেন না। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। নাম মনে না করতে পারার একটিই কারণ--মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। আগ্রহ থাকলে নাম মনে থাকত।

'স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সেকেণ্ড ইয়ারের। এক দিন এসেছিলাম আমরা চার বন্ধু।'

'ও হ্যাঁ। এসেছিলে তোমরা। মনে পড়েছে। আজ কী ব্যাপার?'

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল। তার মানে কি? কমবয়েসী মেয়েদের তিনি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। তরলমতি মেয়েরা মাঝে মাঝে অনেক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে বসে।

'তোমার কী ব্যাপার বল।'

'স্যার, আমি ঐ ইএসপির টেস্টটা আবার দিতে চাই।'

'এক বার তো দিয়েছ। আবার কেন?'

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। এই মেয়েটির মতিগতি তিনি বুঝতে পারছেন না।

'স্যার, আমার মনে হয়, এবার পরীক্ষা করলে দেখা যাবে--আমার ইএসপি আছে।'

'এ রকম মনে হবার কারণ কী?'

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। লক্ষণ ভালো নয়। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি। অন্য এক দিন এস।'

মেয়েটি তবুও কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি কি অন্য কিছু বলতে চাও?'

'জ্বি না স্যার। আমি যাই। স্লামালিকুম।'

মিসির আলি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। এ মেয়েটিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। এরা সহজেই একটা ঝামেলা বাঁধিয়ে দিতে পারে। এরকম সুযোগ দেওয়া ঠিক না।

বারটায় একটা ক্লাস ছিল। মিসির আলি গিয়ে দেখলেন কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই। কোনো স্ট্রাইক হচ্ছে কি? এ রকম কিছু শোনেন নি। সামনে হয়তো টার্ম পরীক্ষা আছে। টার্ম পরীক্ষা থাকলে ছাত্ররা দল বেঁধে আসা বন্ধ করে দেয়। মিসির আলি ভ্রূ কুঁচকে খালি ক্লাসে মিনিট পাঁচেক বসে রইলেন। গত রাতে অসুস্থ শরীরে এই ক্লাসটির জন্যে পড়াশোনা করেছেন। এ অবস্থা হবে জানলে সকাল-সকাল শুয়ে পড়তে পারতেন। ছাত্রশূন্য একটি ক্লাসে তিনি খাতাপত্র নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন--হাস্যকর দৃশ্য। অনেকেই করিডোর দিয়ে হাঁটবার সময় তাঁকে কৌতূহলী হয়ে দেখল। পাগলটাগল ভাবছে বোধহয়। মিসির আলি উঠে পড়লেন।

আজকের দিনটিই শুরু হয়েছে খারাপভাবে। একটি কাজও ঠিকমতো হচ্ছে না। মিসির আলি ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কপালের মাঝখানে ব্যথা শুরু হল। এই উপসর্গটি নতুন। ব্লাড প্রেশারট্রেশার হয়েছে বোধহয়। ডাক্তার দেখাতে হবে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন তিনটার দিকে। এই অসময়েও বসার ঘরে কে যেন বসে আছে। সমস্ত দিনটিই যে খারাপ যাবে, এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। গ্রামের

বাড়ি থেকে টাকাপয়সা চাইতে কেউ এসেছে নির্ঘাত।

'কে?'

'জ্বি, আমি আনিস।'

'আনিস সাহেব, আপনি এই সময়ে! অফিস নেই?'

'ছুটি নিয়ে এলাম।'

'ব্যাপার কি?'

'রানুর শরীরটা বেশি খারাপ। ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'ভালোই করেছেন। বসেন, চা-টা দিয়েছে?'

'জ্বি, চা খেয়েছি। আপনার ভাই ছিলেন এতক্ষণ।'

'বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।'

লোকটি জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। মিসির আলি লক্ষ করলেন তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। তার মানে রাতে ঘুমাতে পারছে না। এ রকম হওয়ার কথা নয়। মিসির আলি চিন্তিত মুখে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল।

'এখন বলেন, ব্যাপারটা কি?'

আনিস ইতস্তত করে বলল, 'ভূতপ্রেত বলে সত্যি কিছু আছে?'

'এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

আনিস মুখ কালো করে বলল, 'অনেক রকম কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। আমি কনফিউজড হয়ে গেছি।'

'অর্থাৎ এখন ভূতপ্রেত বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?'

আনিস চুপ করে রইল।

'এর কারণটা বলেন, শুনি।'

'নানারকম শব্দ হয় ঘরে।'

'তাই নাকি? আপনি নিজে শোনেন?'

'জ্বি, শুনি। গন্ধও পাই, ফুলের গন্ধ।'

'আপনি পান, না আপনার স্ত্রী পান?'

'রানু প্রথম পায়, তারপর আমি পাই।'

মিসির আলি চুরুট ধরালেন। আনিস বলল, 'গত রাতে ঘরের মধ্যে কেউ যেন নূপুর পায়ে হাঁটছিল।'

'এই নূপুরের শব্দ প্রথম কে শোনে? আপনার স্ত্রী?'

'জ্বি।'

'তারপর আপনাকে বলার পর আপনি শুনতে পান।'

'জ্বি।'

'আনিস সাহেব, এটাকে বলা হয় ইনডিউসড অডিটরি হেলুসিনেশন। আপনার মন দুর্বল। আপনার স্ত্রী যখন বলেন শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, তখন আপনিও তা শুনতে থাকেন। ব্যাপারটি আপনার মনোজগতে। আসলে কোনো

শব্দ হচ্ছে না।'

আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যদি এক বার আসেন আমাদের বাসায়, আপনি নিজেও শুনবেন।'

'না ভাই, আমি শুনব না। আমি খুব শক্ত ধরনের মানুষ। খুবই যুক্তিবাদী লোক আমি।'

'আপনি আসেন-না এক বার।'

'ঠিক আছে, যাব।'

'কবে আসবেন? আজ আসতে পারবেন?'

'আমি কাল–পরশুর মধ্যে এক বার যাব।'

'আমাদের বাড়িঅলার খুব সুন্দর ফুলের বাগান আছে। প্রচুর গোলাপও আছে। বিকেলের দিকে গেলে সেটাও দেখতে পারবেন।'

মিসির আলি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বড়ো ফুলের বাগান?'

'জ্বি।'

'আনিস সাহেব, এমন কি হতে পারে না, বাতাসে নিচের বাগান থেকে ফুলের সৌরভ ভেসে আসে? সেই সৌরভকে আপনি একটি আধ্যাত্মিক রূপ দেন। হতে পারে?'

'পারে, কিন্তু শব্দটা?'

'কোনো একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্ক খুব অদ্ভুত জিনিস, আনিস সাহেব। সে আপনাকে এমন সব জিনিস দেখাতে বা শোনাতে পারে যার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি কি উঠবেন?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যান। আমার নিজেরও মাথা ধরেছে। দুটো পেরাসিটামল খেয়েছি, লাভ হচ্ছে না। জ্বর আসবে বলে মনে হয়। শরীরটা গেছে। বেশি দিন বাঁচব না।'

১৬

পত্রিকা খুলে নীলু অবাক হল। সেই বিজ্ঞাপনটি আবার ছাপা হয়েছে। কথাগুলি এক। জি পি ও বক্স নাম্বারও ৭৩। শিরোনামটিও আগের মতো–'কেউ কি আসবেন?' এর মানে কী? নীলুর ধারণা ছিল এই বিজ্ঞাপনটি আর কোনো দিন ছাপা হবে না। এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না। নীলুর ইচ্ছা হল দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাঁদার। সে মুখ কালো করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় তার জন্যে একটা বড়ো ধরনের চমক অপেক্ষা করছিল। মিসির আলি সাহেব দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, 'এখানে কি

আনিস সাহেব থাকেন?'

'স্যার আপনি? আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'ও ইয়ে তুমি। আমার ছাত্রী? কোন ইয়ার?'

'থার্ড ইয়ার স্যার। নীলু আমার নাম। নীলুফার।'

'ও, আচ্ছা। নীলুফার--তোমাদের তেতলায় আনিস সাহেব থাকেন নাকি?'

'জ্বি।'

'তাঁর কাছে এসেছি। উঠবার রাস্তা কোন দিকে?'

নীলু তাঁকে সঙ্গে করে তিনতলায় নিয়ে গেল।

'ফেরবার পথে আমাদের বাসা হয়ে যাবেন স্যার। যেতেই হবে।'

'আচ্ছা দেখি।'

'দেখাদেখি না স্যার, আপনি আসবেন।'

আনিস ঘরে ছিল না। রানু তাঁকে নিয়ে বসাল। সে খুবই অবাক হয়েছে। মিসির আলি বললেন, 'খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'আপনি–আপনি করে বলছেন কেন?'

'ও আচ্ছা, তুমি-তুমি করে বলতাম, তাই না? ঠিক আছে। এখন বল, আমাকে দেখে অবাক হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব অবাক হয়েছ?'

'জ্বি। আপনি আসবেন ভাবতেই পারি নি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'তুমি তো শুনেছি সব কিছু আগে বলে দিতে পার; এটি তো পারার কথা ছিল।'

রানু থেমে থেমে বলল, 'আপনি লোকটি বেশ অদ্ভুত।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনার যুক্তিও খুব ভালো, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।'

'বিশ্বাস করলেই পার। আনিস সাহেব কখন আসবেন?'

'এসে পড়বে।'

'আমাকে একটু চা খাওয়াও। আর শোন, তোমাদের একটা কাজের ছেলে আছে নাকি? ওকে পাঠাও তো আমার কাছে।'

'ওকে কী জন্যে?'

'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

মিসির আলি ঃ কি নাম?

জিতু : জিতু মিয়া।

মিসির আলি : দেশ কোথায়?

জিতু : টাঙ্গাইল।

মিসির আলি : শুনলাম দু'—এক দিন আগে তুমি নাকি রাতের বেলা কি-একটা দেখে ভয় পেয়েছ?

জিতু : জ্বি, পাইছি।

মিসির আলি : কী দেখেছ?

জিতু : পাকের ঘরে এক জন মেয়েমানুষ। হাঁটাচলা করতাছে।

মিসির আলি : সুন্দরী?

জিতু : জ্বি, খুব সুন্দর।

মিসির আলি : রান্নাঘরে তো বাতি জ্বালানো ছিল?

জিতু : জ্বি—না।

মিসির আলি : অন্ধকারে তুমি মানুষ কীভাবে দেখলে?

জিতু : নিশ্চুপ।

মিসির আলি ঃ আমার মনে হয় জিনিসটা তুমি স্বপ্নে দেখেছ।

জিতু : নিশ্চুপ।

মিসির আলি : আচ্ছা জিতু মিয়া, তুমি যাও। শোন, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এস আমার জন্যে। ক্যাপস্টান। নাও, টাকাটা নাও।

জিতু মিয়া চলে গেল। রানু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ইউনিভার্সিটির সব মাষ্টাররাই কি আপনার মতো বুদ্ধিমান?'

'না। আমার নিজের বুদ্ধি একটু বেশি। আচ্ছা, এখন যে খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে এই শব্দটার কথাই কি আনিস সাহেব আমাকে বলেন?'

রানু জবাব দিল না। মিসির আলি কান পেতে শুনলেন।

'শব্দটা তো বেশ স্পষ্ট। রান্নাঘর থেকে আসছে না?'

'হুঁ।'

'এই শব্দটার কথাই আনিস সাহেব বলেন, তাই না?'

'বোধহয়। আপনি রান্নাঘর দেখবেন? আপনি যাওয়ামাত্রই শব্দ থেমে যাবে।'

'শব্দটা বেশির ভাগই রান্নাঘরে হয়?'

'জ্বি।'

'ইঁদুর মারা কিছু বিষ ছড়িয়ে দিও। আর শব্দ হবে না। ওটা ইঁদুরের শব্দ। রান্নাঘরে খাবারের লোভে ঘোরাঘুরি করে। সেজন্যেই শব্দটা বেশি হয় রান্নাঘরে। বুঝলে?'

'হুঁ।'

'যুক্তিটা পছন্দ হচ্ছে না মনে হয়।'

'যুক্তি ভালোই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

'নাহ্, এখন উঠব। আনিস সাহেব মনে হয় আজ আর আসবেন না।'

'না, আপনি আরেকটু বসুন। আপনাকে একটা গল্প বলব।'

'আজ আর না, রানু। মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরলেও আপনাকে শুনতে হবে। বসুন, আমি চা আনছি। প্যারাসিটামল খাবেন?'

'ঠিক আছে।'

চা আসবার আগেই আনিস এসে পড়ল। তার অফিসে নাকি কী-একটা ঝামেলা হয়েছে। দশ হাজার টাকার একটা চেকের হিসেবে গণ্ডগোল। চেকটা ইস্যু হয়েছে আনিসের অফিস থেকে। আনিসের চোখে-মুখে ক্লান্তি। মিসির আলি বললেন, 'আপনি বিশ্রামটিশ্রাম করেন। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি রানুর কাছ থেকে একটা গল্প শুনব।'

'কী গল্প?'

'জানি না কী গল্প। ভয়ের কিছু হবে।'

রানু বলল, 'না, ভয়ের না। তুমি গোসলটোসল সেরে এসে চা খাও।'

'আমি গল্পটা শুনতে পারব না?'

'নাহ্। সব গল্প সবার জন্যে না।'

আনিসের কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল। সে কিছু বলল না। বাথরুমে ঢুকে পড়ল। রানু তার গল্প শুরু করল খুব শান্ত গলায়। মিসির আলি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগলেন।

রানুর দ্বিতীয় গল্প

আমার তখন মাত্র বিয়ে হয়েছে। সপ্তাহখানেকও হয় নি। সেই সময় এক কাণ্ড হল।

আমার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণ মাসের ছ' তারিখে। ঘটনাটা ঘটল শ্রাবণ মাসের চোদ্দ তারিখ। সকালবেলা আমার এক মামাশ্বশুর এসে ওকে নিয়ে গেলেন মাছ মারতে। নৌকায় করে মাছ মারা হবে। নৌকা বড়ো গাঙ দিয়ে যাবে সোনাপোতার বিলে। বঁড়শি ফেললেই সেখানে বড়ো-বড়ো বোয়াল মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালের বোয়ালের কোনো স্বাদ নেই জানেন তো। কিন্তু সোনাপোতার বোয়ালে বর্ষাকালেই নাকি সবচেয়ে বেশি তেল হয়।

দুপুরের পর থেকেই হঠাৎ করে খুব দিন খারাপ হল। বিকেল থেকে বাতাস বইতে লাগল। আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওরা আর ফেরে না। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল।

আমাদের বাড়িটা হচ্ছে কাঠের। কাঠের দোতলা। আমি একা-একা দোতলায় উঠে গেলাম। দোতলার কোণার দিকের একটা ঘরে আজেবাজে জিনিস-রাখা হয়। স্টোররুমের মতো। কেউ সেখানে যায়টায় না। আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ একটি মেয়ের কথা শুনতে পেলাম। মেয়েটি খুব নিচুস্বরে বলল---সোনাপোতার বিলে ওদের নৌকা ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই ডুবেছে। এটা শোনার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

মিসির আলি বললেন, 'এইটুকুই গল্প?'

'হ্যাঁ।'

'গল্পের কোনো বিশেষত্ব লক্ষ করলাম না।'

'বিশেষত্ব হচ্ছে, সেদিন সন্ধ্যায় ওদের সত্যি সত্যি নৌকাডুবি হয়েছিল। এর কোনো ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে?'

'আছে। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, কাজেই তোমার মনে ছিল অমঙ্গলের আশঙ্কা। অবচেতন মনে ছিল নৌকাডুবির কথা। অবচেতন মনই কথা বলেছে তোমার সঙ্গে। মানুষের মন খুব বিচিত্র রানু। আমি উঠলাম।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'একতলার নীলু নামের যে-মেয়েটি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে সে আপনার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছে। যাবার সময় ওর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।'

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তাতে কি?'

রানু বলল, 'নীলু এই মুহূর্তে কি ভাবছে তা আমি বলতে পারব। ওকে জিজ্ঞেস করলেই দেখবেন আমি ঠিকই বলেছি। আমি অনেক কিছুই বলতে পারি।'

'নীলু কি ভাবছে?'

'নীলু ভাবছে এক জন অত্যন্ত সুপুরুষ যুবকের কথা।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। এক জন অবিবাহিত যুবতী এক জন সুপুরুষ যুবকের কথাই ভাবে। এটা বলার জন্যে কোনো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দরকার হয় না, রানু।'

মিসির আলি নেমে গেলেন। নীলু সত্যি সত্যি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে খুব অনুরোধ করল যাতে স্যার এক কাপ চা খেয়ে যান। কিন্তু মিসির আলি বসলেন না। তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। প্যারাসিটামল কাজ করছে না। সারা জীবন তিনি এত ওষুধ খেয়েছেন যে ওষুধ তাঁর ওপর এখন আর কাজ করে না। খুব খারাপ লক্ষণ।

১৭

নীলুর বাবা বারান্দায় বসে ছিলেন। নীলুকে বেরুতে দেখে তিনি ডাকলেন, 'নীলু, কোথায় যাচ্ছ মা?'

'একটু বাইরে যাচ্ছি।'

কিন্তু এইটুকু বলতেই নীলুর গলা কেঁপে গেল। গাল লাল হল। তিনি তা লক্ষ করলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, 'বাইরে কোথায়?' নীলু জবাব দিল না।

'কখন ফিরবে মা?'

'আটটা বাজার আগেই ফিরব।'

'গাড়ি নিয়ে যাও।'

'গাড়ি লাগবে না। তোমার কিছু লাগবে বাবা, চা বানিয়ে দিয়ে যাব?'

'না, চা লাগবে না। একটু সকাল-সকাল ফিরিস মা। শরীরটা ভালো না।'

'সকাল-সকালই ফিরব।'

বিকেলের আলো নরম হয়ে এসেছে। সব কিছু দেখতে অন্য রকম লাগল নীলুর চোখে। নিউমার্কেটের পরিচিত ঘরগুলিও যেন অচেনা। যেন ওদের এক ধরনের রহস্যময়তা ঘিরে আছে।

'কেমন আছ নীলু?'

নীলু তৎক্ষণাৎ তাকাতে পারল না। তার লজ্জা করতে লাগল। তার ভয় ছিল আজ হয়তো সে আসবে না। প্রিয়জনদের দেখা তো এত সহজে পাওয়া যায় না।

'আজ তুমি দেরি করে এসেছ। পাঁচ মিনিট দেরি। তোমার তার জন্যে শাস্তি হওয়া দরকার।'

'কী শাস্তি?'

'সেটা আমরা চা খেতে-খেতে ঠিক করব। খুব চায়ের পিপাসা হয়েছে।'

'কোথায় চা খাবেন?'

'এইখানে কোথায়ও। আর শোন নীলু, চা খেতে-খেতে তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরি কথা।'

'এখন বলুন। হাঁটতে হাঁটতে বলুন।

'নাহ্। এই কথা হাঁটতে হাঁটতে বলা যায় না। বলতে হয় মুখোমুখি বসে। চোখের দিকে তাকিয়ে।'

নীলুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। সে কোনো-মতে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন কোথাও বসি।'

'কি বলতে চাই তা কি বুঝতে পারছ?'

'নাহ্।'

'বুঝতে পারছ, নীলু। মেয়েরা এইসব জিনিস খুব ভালো বুঝতে পারে।'

নীলুর গা কাঁপতে লাগল; অন্য এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে। অন্য এক ধরনের সুখ। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই। চারিদিকে সীমাহীন শূন্যতা। শুধু তারা দু' জন হাঁটছে। হেঁটেই চলেছে। কেমন যেন এক ধরনের কষ্টও হচ্ছে বুকের মধ্যে।

ওরা একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসল।

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে?'

'না।'

'খাও না। কিছু খাও।'

সে বয়কে ডেকে কী যেন বলল। নীলু শুনতে পেল না। কোনো কিছুতেই তার মন বসছে না। সব তার কাছে অস্পষ্ট লাগছে।

'কি নীলু, কিছু বল। চুপ করে আছ কেন?'

'কী বলব?'

'যা ইচ্ছা বল।'

নীলু ইতস্তত করে বলল, 'আপনি ঐ বিজ্ঞাপনটা আবার দিয়েছেন কেন?'

সে হাসল শব্দ করে।

'দেখেছ বিজ্ঞাপনটা?'

'হ্যাঁ।'

'মন খারাপ হয়েছে?'

নীলু কিছু বলল না।

'বল, মন খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

সে আবার শব্দ করে হাসল। তার পর ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি পত্রিকার অফিসে টাকা দিয়ে রেখেছিলাম। কথা ছিল প্রতি মাসে দু' বার করে ছাপবে। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর তার আর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেটা বলা হয় নি। আগামী কাল বন্ধ করে দেব। এখন খুশি তো?'

নীলু জবাব দিল না।

'বল, এখন তুমি খুশি? এইভাবে চুপ করে থাকলে হবে না, কথা বলতে হবে। বল, তুমি খুশি?'

'হুঁ।'

সে আরেক দফা চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। খানিকক্ষণ দু' জনেই কোনো কথা বলল না। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আছে। পৃথিবী বড়ো সুন্দর গ্রহ। এতে বেঁচে থাকতে সুখ আছে।

'নীলু।'

'হুঁ।'

'তোমাকে যে-কথাটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটি বলি?'

'বলুন।'

'দেখ নীলু, সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও এক সময় এক জন অন্য জনকে চিনতে পারে না। আবার এমনও হয়, এক পলকের দেখায় একে অন্যকে চিনে ফেলে। ঠিক না?'

নীলু জবাব দিল না।

'বল, ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে প্রথম দিন দেখেই . . .'

সে চুপ করে গেল। নীলুর চোখে জল এল।

'নীলু,আজ যদি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, তাহলে তোমার আপত্তি আছে?'

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। জবাব দিল না। সে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। সে তার চোখের জল তাকে দেখাতে চায় না।

'বল নীলু, আপত্তি আছে?'

'আমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আটটার আগেই আমরা বাড়ি ফিরব। এস উঠি।'

সে নীলুর হাত ধরল। ভালোবাসার স্পর্শ, যার জন্যে তরুণীরা সারা জীবন প্রতীক্ষা করে থাকে।

১৮

রানু আজ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দিন প্রায় শেষ। আকাশ লালচে হতে শুরু করেছে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বারান্দায় বিলু হাঁটছে একা-একা। রানুর কেমন জানি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। যেন কোথাও কিছু একটা অস্বাভাবিকতা আছে, সে ধরতে পারছে না। নিচে থেকে বিলু ডাকল, 'রানু ভাবী, চা খেলে নেমে এস, চা হচ্ছে।'

'চা খাব না।'

'আস না বাবা। ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার বলব। কুইক।'

রানু নেমে গেল। তার মাথায় সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছুই ভালো লাগছে না। বমিবমি ভাব হচ্ছে।

বারান্দায় নীলুর বাবাও ছিলেন। ওপর থেকে তাঁকে দেখা যায় নি। তিনি নরম স্বরে বললেন, 'এখন তুমি কেমন আছ মা?'

'জ্বি, ভালো।'

'আমি আনিস সাহেবকে বলেছি বড়ো এক জন ডাক্তার দেখাতে। পিজির এক জন প্রফেসর আছেন, আমার আত্মীয়, তাঁকে আমি বলে দেখতে পারি। তুমি আলাপ করো আনিসের সাথে, কেমন?'

'জ্বি, করব।'

বিলু বলল, 'বাবা, ঘরে গিয়ে তুমি চা খাও। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমরা দু' জন বাগানে বসি।' ভদ্রলোক চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

রানু বলল, 'নীলু কোথায়?'

'ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছে।'

বন্ধুর বাড়ি যাওয়া এমন কোনো ব্যাপার নয়, তবু কেন জানি রানুর বুকে

ধক করে একটা ধাক্কা লাগল। ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হতে লাগল মাথায়। বিলু বলল, 'রানু ভাবী, তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। টপ সিক্রেট, কাউকে বলবে না।'

'না, বলব না।'

'ইভেন নীলু আপাকেও নয়। কারণ কথাটা তাকে নিয়েই।'

'ঠিক আছে, কাউকে বলব না।'

'নীলু আপা ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছে। আজকে সকালে টের পেয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। নীলু আপার ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি। জনৈক ভদ্রলোক দারুণ সব রোমান্টিক চিঠি লিখেছে নীলু আপাকে। খুব লদকালদকি।'

বিলু হাসল। রানু কিছু বলল না। তার মাথায় যন্ত্রণাটা ক্রমেই বাড়ছে।

'দু'—একটা চিঠি পড়ে দেখতে চাও?'

'না, না। অন্যের চিঠি।'

'আহ্, পড় না, কেউ তো জানতে পারছে না। আমরা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট রাখব, তাহলেই তো হল।'

'না বিলু, আমি চিঠি পড়ব না।'

'পড়ব না বললে হবে না। পড়তেই হবে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি। যে-আলো আছে তাতে দিব্যি পড়তে পারবে।'

বিলু ঘর থেকে চিঠি নিয়ে এল। রানু চিঠিটি হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিলু অবাক হয়ে বলল, 'কি হয়েছে?'

'না, কিছু হয় নি।'

'এ রকম করছ কেন?'

'মাথা ধরেছে। বড্ড মাথা ধরেছে।'

'প্যারাসিটামল এনে দেব? তুমি চিঠিটা পড়ে আমাকে বল ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার কী ধারণা।'

রানু চিঠি পড়ল। বিলু বলল, 'বল তোমার কি মনে হয়?'

রানু কিছু বলল না। এক হাতে মাথার চুল টেনে ধরল।

'তোমার কী হয়েছে?'

'বড্ড শরীর খারাপ লাগছে। আমি এখন যাই।'

'চা খাবে না?'

'না। বিলু, নীলু কখন ফিরবে—বলে গেছে?'

'না। সন্ধ্যার আগে আগেই ফিরবে বোধহয়। তোমার কি শরীর বেশি খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে যাও, শুয়ে থাক গিয়ে।'

রানু উপরে উঠে এল। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছে হল না। শুয়ে

পড়ল বিছানায়। আনিস আজ ফিরতে দেরি করবে। তার অফিসে কী-সব নাকি ঝামেলা হচ্ছে। রানু ডাকল, 'জিতু--জিতু মিয়া।' কেউ সাড়া দিল না। জিতু কি বাসায় নেই? 'জিতু-জিতু।' কোনো উত্তর নেই। জিতু মিয়া ইদানীং বেশ লায়েক হয়েছে। রানু কিছু বলে না বলেই হয়তো বিকেলে খেলতে গিয়ে সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেরে। বকাঝকা তার গায়ে লাগে না।

রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর। নিশ্চয়ই ইঁদুর। তবু রানু বলল, 'কে?' খুটখুট শব্দ থেমে গেল। ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই গন্ধটা আবার পাওয়া যাচ্ছে। কড়া ফুলের গন্ধ। রানুর ইচ্ছে হল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। রানু দুর্বল গলায় ডাকল, 'জিতু, জিতু মিয়া।' আর ঠিক তখন কে এক জন ডাকল, 'রানু--রানু।' এই ডাক রানুর চেনা। এই জীবনে সে অনেক বার শুনেছে। তবে এটা কিছু নয়। প্রফেসর সাহেব বলছেন 'অডিটরি হেলুসিনেশন'। আসলেই তাই। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

'রানু--রানু।'

'কে? তুমি কে?'

রানুর মনে হল কেউ এক জন যেন এগিয়ে আসছে। তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট পা নিশ্চয়ই। হালকা শব্দ। পায়ে কি নূপুর আছে? নূপুর বাজছে?

'রানু।'

রানু চোখ বন্ধ করে ফেলল। এসব সত্যি নয়, চোখের ভুল। রানু দুর্বল গলায় বলল, 'তুমি কে?'

'আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?'

'না।'

কিশোরীর গলায় মৃদু হাসি শোনা গেল।

'তাকাও রানু। তাকালেই চিনবে।'

'আমি চিনতে চাই না।'

'তোমার বন্ধু নীলুর খুব বিপদ, রানু। এক দিন তোমার যে বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল, তার চেয়েও অনেক বড়ো বিপদ।'

দরজায় ধাক্কা পড়ছে। জিতু এসেছে বোধহয়। রানু তাকাল, কোথাও কেউ নেই। ফুলের গন্ধ কমে আসছে। জিতু মিয়া বাইরে থেকে ডাকল, 'আম্মা আম্মা।' রানু উঠে দরজা খুলল।

'আপনের কী হইছে?'

'কিছু হয় নি।'

রানু এসে শুয়ে পড়ল। তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল। কখন আসবে আনিস? কখন আসবে?

'জিতু।'

'জ্বি।'

'নিচে গিয়ে দেখে আয় তো--নীলু ফিরেছে নাকি।'

জিতু ফিরে এসে জানাল এখনও আসে নি। রানু একটি নিঃশ্বাস ফেলে ঘড়ি দেখল, আটটা বাজতে চার মিনিট বাকি। কখন আসবে আনিস?

১৯

সারাটা পথ নীলু চুপ করে রইল। এক বার সে বলল, 'কি ব্যাপার, এত চুপচাপ যে?' নীলু তারও জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সে আছে একটা ঘোরের মধ্যে।

'গান শুনবে? গান দেব?'

নীলু মাথা নাড়ল। সেটা হাঁ কি না, তাও স্পষ্ট হল না।

'কী গান শুনবে? কান্ট্রি মিউজিক? কান্ট্রি মিউজিকে কার গান তোমার পছন্দ?'

নীলু জবাব দিল না।

'আমার ফেবারিট হচ্ছে জন ডেনভার। জন ডেনভারের রকি মাউন্টেন হাই গানটা শুনেছ?'

'না।'

'খুব সুন্দর। অপূর্ব মেলোডি!'

সে ক্যাসেট টিপে দিতেই জন ডেনবারের অপূর্ব কণ্ঠ শোনা গেল, 'ক্যালিফোর্নিয়া রকি মাউন্টেন হাই।'

'কেমন লাগছে নীলু?'

'ভালো।'

'শুধু ভালো না। বেশ ভালো।'

সেও জন ডেনভারের সঙ্গে গুনগুন করতে লাগল। নীলুর মনে হল, ওর গানের গলাও তো চমৎকার! এক বার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে--গান জানেন কিনা। কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গাড়ি কোন দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছে তাও সে লক্ষ করছে না। এক বার শুধু ট্রাফিক সিগনালে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এক জন ভিখিরি এসে ভিক্ষা চাইল। সে ধমকে উঠল কড়া গলায়। তারপর আবার গাড়ি চলল। নীলু ফিসফিস করে বলল, 'কটা বাজে?'

'সাতটা পঁয়ত্রিশ। তোমাকে আটটার আগেই পৌছে দেব।'

'আপনার বাড়ি মনে হয় অনেক দূর?'

'শহর থেকে একটু দূরে বাড়ি করেছি। কোলাহল ভালো লাগে না। ফার ফ্রম দি মেডিং ক্রাউড কার লেখা জান?'

'নাহ্।'

'টমাস হার্ডির। পড়ে দেখবে, চমৎকার! অথচ ট্র্যাজেডি হচ্ছে, টমাস হার্ডিকেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নি। তুমি তাঁর কোনো বই পড়েছ?'

'না।'

'পড়ে দেখবে। খুব রোমান্টিক ধরনের রাইটিং।'

গাড়ি ছুটে চলেছে মীরপুর রোড ধরে। হঠাৎ নীলু বলল, 'আমার ভালো লাগছে না।'

'কী বললে?'

'আমার ভালো লাগছে না, আমি বাসায় যাব।'

সে তাকাল নীলুর দিক। একটি হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটের ভল্যুম বাড়িয়ে দিল। গাড়ির গতি কমল না।

'আমি বাসায় যাব।'

'আটটার সময় আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব।'

'না, আজ আমি কোথাও যাব না। প্লিজ গাড়িটা থামান, আমি নেমে পড়ব।'

'কেন?'

'আমার ভালো লাগছে না। প্লিজ।'

সে তাকাল নীলুর দিকে। নীলু শিউরে উঠল। এ কেমন চাউনি! যেন মানুষ নয়, অন্য কিছু।

'প্লিজ, গাড়িটা একটু থামান।'

'কোনো রকম ঝামেলা না-করে চুপচাপ বসে থাক। কোনো রকম শব্দ করবে না।'

'আপনি এরকম করে কথা বলছেন কেন?'

গাড়ির গতি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ঝড়ের গতিতে পাশ দিয়ে দুটো ট্রাক গেল। লোকটি তার একটি হাত রাখল নীলুর উরুতে। নীলু শিউরে উঠে দরজার দিকে সরে গেল। লোকটি হাসল। এ কেমন হাসি!

'গাড়ি থামান। আমি চিৎকার করব।'

'কেউ এখন তোমার চিৎকার শুনবে না।'

'আপনি কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'আমি ভয় দেখাচ্ছি না।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করে গাড়িতে উঠেছি।'

'আরো কিছুক্ষণ থাক। বেশিক্ষণ নয়, এসে পড়েছি বলে।'

'কী করবেন আপনি?'

'তেমন কিছু না।'

নীলু এক হাতে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। লোকটি তাকিয়ে দেখল কিন্তু বাধা দিল না। দরজা খোলা গেল না। নীলু প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করল, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু বলতে পারল না। প্রচুর ঘামতে লাগল। প্রচণ্ড তৃষ্ণা

বোধ হল।

২০

আনিস এল রাত সাড়ে আটটায়। ঘর অন্ধকার। কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই। রানু বাতিটাতি নিভিয়ে অন্ধকারে বসে আছে। জিতু মিয়া মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছে।

'রানু, কী হয়েছে?'

রানু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'তুমি এত দেরি করলে!'

'কেন, কী হয়েছে?'

'নীলুর বড়ো বিপদ।'

আনিস কিছু বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকাল। রানু থেমে থেমে বলল, 'নীলুর খুব বিপদ।'

'কিসের বিপদ? কী বলছ তুমি?'

রানুর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না।

'রানু, তুমি শান্ত হয়ে বস। তারপর ধীরেসুস্থে বল--কী ব্যাপার। কী হয়েছে নীলুর?'

'ও এক জন খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। লোকটা ওকে মেরে ফেলবে।'

রানু ফোঁপাতে লাগল। আনিস কিছুই বুঝতে পারল না। নীলুর বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই তার কথা হয়েছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি, এত দেরি যে?' যার মেয়ের এত বড়ো বিপদ সে এরকম স্বাভাবিক থাকবে কী করে?

আনিস বলল, 'ওরা তো কিছু বলল না।'

'ওরা কিচ্ছু জানে না। আমি জানি, বিশ্বাস কর--আমি জানি।'

'আমাকে কী করতে বল?'

'আমি বুঝতে পারছি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'জিনিসটা কি তুমি স্বপ্নে দেখেছ?'

'না। কিন্তু আমি দেখেছি।'

'কী দেখেছ?'

'আমি সেটা তোমাকে বলতে পারব না।'

'তুমি যদি চাও আমি নিচে গিয়ে ওদের বলতে পারি। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করবেন না।'

রানু চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে রইল। ওর শরীর অল্প অল্প করে কাঁপছে। আনিস বলল, 'নাকি মিসির আলি সাহেবের কাছে যাবে? উনি

কোনো একটা বুদ্ধি দিতে পারেন। যাবে?'

রানু কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি নিজে কি আমার কথা বিশ্বাস করছ?'

'হ্যাঁ, করছি।'

একতলার বারান্দায় বিলু বসে ছিল। ওদের নামতে দেখেই বিলু বলল, 'ভাবী, নীলু আপা এখনো ফিরছে না। বাবা খুব দুশ্চিন্তা করছেন।'

রানু কিছু বলল না।

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ ভাবী?'

রানু তারও কোনো জবাব দিল না। রিকশায় উঠেই সে বলল, 'আমাকে ধরে রাখ, খুব ভালো লাগছে।'

আনিস তার কোমর জড়িয়ে বসে রইল। রানুর গা শীতল। রানু খুব ঘামছে। জ্বর নেমে গেছে।

২১

রানু চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

'আগে আপনি বলুন--আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'বিশ্বাসও করছি না, আবার অবিশ্বাসও করছি না। তুমি নিজে যা সত্যি বলে মনে করছ, তা-ই বলছ। তবে আমি এত সহজে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু যদি সত্যি হয়, তখন?'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগলেন।

'বলুন, যদি আমার কথা সত্যি হয়--যদি মেয়েটা মারা যায়?'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ঠিক এই মুহূর্তে কী করা যায়, তা তো বুঝতে পারছি না। মেয়েটি কোথায় আছে তা তো তুমি জান না। নাকি জান?'

'না, জানি না।'

'ছেলেটির নামধামও জান না।'

'ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর। আমার এ রকম মনে হচ্ছে।'

'এই শহরে খুব কম করে হলেও দশ হাজার সুন্দর ছেলে আছে।'

'আমরা কিছুই করব না?'

'পুলিশের কাছে গিয়ে বলতে পারি একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে এবং আশঙ্কা করা যাচ্ছে দুষ্ট লোকের খপ্পরে পড়েছে। কিন্তু তাতেও একটা মুশকিল আছে, ২৪ ঘন্টা পার না হলে পুলিশ কাউকে মিসিং পারসন হিসাবে গণ্য

করে না।'

রানু আবার বলল, 'কিছুই করা যাবে না?'

মিসির আলি গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। তিনি লক্ষ করলেন রানুর চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

'রানু, তুমি যদি ঐ লোকটির কোনো ঠিকানা কোনোভাবে এনে দিতে পার, তাহলে একটা চেষ্টা চালানো যেতে পারে।'

'ঠিকানা কোথায় পাব?'

'তা তো রানু আমি জানি না। যেভাবে খবরটি পেয়েছ, সেইভাবেই যদি পাও।'

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, বসে থেকে কী করব?'

নীলুদের সব ক'টি ঘরে আলো জ্বলছে। রাত প্রায় এগারটা বাজে। নীলুর বাবা পাথরের মূর্তির মতো বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। রানুদের ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। রানু মাথা নিচু করে তিন তলায় উঠে গেল। নীলুদের ঘরে ঘনঘন টেলিফোন বাজছে। দু'টি গাড়ি এসে থামল। মনে হয় ওরা খুঁজতে শুরু করেছেন। পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই লোক গিয়েছে। নীলুর বাবা অস্থির ভঙ্গিতে বাগানে হাঁটছেন।

২২

ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু দু' শ পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলছে ঘরে। চারদিক ঝলমল করছে। লোকটি একটি চেয়ারে বসে আছে। নীলু লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কারণ লোকটি বসে আছে তার পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাবার কোনো উপায় নেই নীলুর। নাইলনের চিকন দড়ি তার গা কেটে বসে গেছে। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। মাঝে মাঝে দূরের রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীলু থেমে থেমে বলল, 'আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

'আমি আপনার কোনো ক্ষতি করি নি। কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? প্লিজ, আমাকে যেতে দিন! আমি কাউকে কিছু বলব না। কেউ আপনার কথা জানবে না।'

পেছনের চেয়ার একটু নড়ে উঠল। ভারি গলায় লোকটি কথা বলল, 'কেউ জানলেও আমার কিছু যায় আসে না।'

'কেন আপনি এরকম করছেন?'.

'আমি এক জন অসুস্থ মানুষ। মাঝে মাঝে আমাকে এ রকম করতে হয়।'

'আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। নীলু চাপা স্বরে ডাকল, 'মা, মাগো!'

'চুপ করে থাক, কথা বলবে না।'

'কেন এরকম করছেন আপনি?'

'আমি এক জন অসুস্থ মানুষ। পৃথিবীতে কিছু অসুস্থ মানুষ থাকে।'

'আপনি কি আমার মতো আরো অনেক মেয়েকে এই ভাবে ফাঁদ পেতে এনেছেন?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি এগিয়ে এসে নীলুর গায়ে হাত রাখল। এই কি সেই ভালোবাসার স্পর্শ? নীলু ডাকল, 'মা, মাগো।'

'চুপ করে থাক।'

'আপনি মানুষ না অন্য কিছু?'

'বেশির ভাগ সময়ই আমি মানুষ থাকি, মাঝে মাঝে অন্য রকম হয়ে যাই।'

লোকটি শব্দ করে হাসল। কী কুৎসিত হাসি! ঘরে একটুও বাতাস নেই। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নীলু প্রাণপণে তার একটা হাত ছুটিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। যতই চেষ্টা করছে দড়িগুলো ততই যেন কেটে কেটে বসে যাচ্ছে।

'কেন, কেন আপনি এরকম করছেন?'

'বলেছি তো নীলু। অনেক বার বললাম তোমাকে। আমি অসুস্থ।'

'কী করবেন আপনি?'

'অন্যদের যা করেছি তা-ই করব।'

'কী করেছেন অন্যদের?'

লোকটি হেসে উঠল। নীলু কাতর স্বরে বলল, 'আপনি দয়া করুন, আমি আপনার পায়ে পড়ি। প্লিজ। আমি আপনার কথা কাউকে বলব না।'

'তা কি হয়?'

'বিশ্বাস করুন। আমি আমার কথা রাখি। কাউকে আমি আপনার কথা বলব না।'

লোকটি ফিরে যাচ্ছে। নীলু কি বেঁচে যাবে? লোকটি কি তাকে ছেড়ে দেবে? নীলু গুছিয়ে চিন্তা করতে পারছে না। সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। লোকটি একটি ড্রয়ার খুলল। ঘর অন্ধকার, নীলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে নিশ্চিত জানে, তার হাতে ধারাল কিছু একটা আছে। ক্ষুর জাতীয় কিছু। লোকটি সেটি বাঁ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। আসবে, সে এক সময় এগিয়ে আসবে তার কাছে। খুব কাছে কোথাও রিকশার টুনটুন

শোনা গেল। নীলু প্রাণপণে চেঁচাল, 'বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না।

২৩

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। বারবার বলতে লাগল, 'উফ্, বড্ড গরম লাগছে।' আনিস সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিল, ফ্যান ছেড়ে দিল, তবু তার গরম কমল না। রানু কাতর স্বরে বলল, 'তুমি আমাকে ধরে থাক, আমার বড্ড ভয় লাগছে।'

'এই তো আমি তোমাকে ধরে আছি। কিসের এত ভয়, রানু?'

'আমার সামনে ঐ লোকটি বসে আছে--আমি স্পষ্ট দেখছি। ওর হাতে একটা ক্ষুর।'

রানু ফোঁপাতে শুরু করল। ওকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় ততই ভালো। আনিস ডাকল, 'জিতু--জিতু মিয়া।' কিন্তু জিতু মিয়ার ঘুম ভাঙল না। রানু বলল, 'তুমি আমাকে একা রেখে কোথাও যেতে পারবে না। আমার বড়ো ভয় লাগছে।'

'কোনো ভয় নেই রানু।'

'লোকটি ক্ষুর হাতে বসে আছে। তবু তুমি বলছ ভয় নেই?'

'এই সব তোমার কল্পনা। এস, তোমার মাথায় একটু পানি দিই?'

'তুমি কোথাও যেতে পারবে না। ঐ লোকটি এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে থাক। আরও শক্ত করে ধর।'

আনিস তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমি তোমাকে একটি কথা কখনো বলি নি। এক বার এক জন লোক আমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'রানু, এখন তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। দয়া করে চুপ করে থাক।'

'না, আমি বলতে চাই।'

'সকাল হোক। সকাল হলেই শুনব।'

'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় এক জন কেউ আমার সঙ্গে থাকে।'

'রানু, চুপ করে থাক।'

'না, আমি চুপ করে থাকব না। আমার বলতে ইচ্ছে করছে। যে আমার সঙ্গে থাকে তার সঙ্গে আমি অনেক বার কথা বলেছি। কিন্তু আজ সে কিছুতেই আসছে না।'

'তার আসার কোনো দরকার নেই।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, তার আসার খুব দরকার।'

রাত দেড়টার দিকে নিচ থেকে বিলুর কান্না শোনা যেতে লাগল। অনেক লোকজনের ভিড়। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। রানু বলল, 'বিলু কাঁদছে। বড়ো খারাপ লাগছে আমার।'

'রানু, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি জিতুকে ডেকে দিচ্ছি।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'আমি এক জন ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার মোটেই ভালো লাগছে না।'

'তুমি আমাকে ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবে না।'

রানুর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। এক সময় বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। আনিস ছুটে গেল ডাক্তার আনতে। বড়ো রাস্তার মোড়ে এক জন ডাক্তারের বাসা আছে। ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। আনিস ফিরে এসে ঘরে ঢোকবার মুখেই তীব্র ফুলের গন্ধ পেল। ঘরের বাতি নেভান। কে নিভিয়েছে বাতি? আনিস ঢুকতেই রানু বলল, 'ও এসেছে।'

'কে? কে এসেছে?'

'তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?'

আনিস এগিয়ে এসে রানুর হাত ধরল। গা ভীষণ গরম। রানু বলল, 'ও নীলুর কাছে যাবে।'

'রানু শুয়ে থাক।'

'উঁহু শোব কী ভাবে? ও একা যেতে ভয় পাচ্ছে। আমিও যাব ওর সঙ্গে। ও আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

বলতে-বলতে রানু খিলখিল করে হাসল।

আনিস বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, 'রহমান সাহেব, রহমান সাহেব। ভাই, একটু আসুন, আমার বড়ো বিপদ।'

রহমান সাহেব ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'আপনি একটু আসুন, আমার স্ত্রী কেমন যেন করছে।'

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে এলেন। এবং ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে বললেন, 'নূপুরের শব্দ না?' রানু কিশোরী মেয়ের গলায় খিলখিল করে হাসল।

'কি হয়েছে ওনার?'

'আপনি একটু বসুন ওর পাশে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।'

আনিস ছুটে বেরিয়ে গেল। ফুলের সৌরভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। রানু হাসিমুখে বলল, 'আমার সময় বেশি নেই, ঐ লোকটি এগিয়ে আসছে।'

'কোন লোক?'

'আপনি চিনবেন না। না-চেনাই ভালো।'

ভদ্রমহিলা রানুর হাত ধরলেন। উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না।

আনিস ডাক্তার নিয়ে ফেরার আগেই রানু মারা গেল।

২৪

ঘর অন্ধকার। কিন্তু চোখে অন্ধকার সয়ে আসছে। আবছা মতো সব কিছু দেখা যায়। বাড়িটা কোথায়? শহর থেকে অনেক দূরে কি? কোনো শব্দ নেই। কত রাত এখন? বাড়িতে এখন ওরা কী করছে? বিলু কি ঘুমিয়েছে মশারি ফেলে? না, না--আজ কেউ ঘুমায় নি, আজ সবাই ছোটাছুটি করছে। সবাই খুঁজছে নীলুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো পুলিশের গাড়ির শব্দ শোনা যাবে। বাবা এসে বলবেন--কোনো ভয় নেই মা-মণি।

চেয়ার নড়ার শব্দ হল। লোকটি কি উঠে দাঁড়িয়েছে? তার হাতে ওটা কী? নীলু মনে মনে বলল, 'বাবা, আমি এক জন অসুস্থ লোকের হাতে আটকা পড়েছি, আমাকে তোমরা বাঁচাও। আমার আর মোটেও সময় নেই বাবা। তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

লোকটি এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে সে খুব ধীর গতিতে এগিয়ে এল সামনে। এখন নীলু আবছাভাবে লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে। কী সুন্দর একটি মুখ! নীলু বিড়বিড় করে বলল,'প্লিজ, দয়া করুন।' লোকটি অদ্ভুত শব্দ করল। এটি কি হাসির শব্দ? নীলুর গা গোলাচ্ছে। নীলু চিৎ হয়ে থাকা অবস্থাতেই মুখ ভর্তি করে বমি করল। দুঃস্বপ্ন, সমস্তটাই একটা দুঃস্বপ্ন। এক্ষুণি ঘুম ভেঙে যাবে। আর নীলু দেখবে--বিলু বাতি জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বুকের ওপর একটা গল্পের বই। এখানে যা ঘটছে, তা সত্যি হতেই পারে না।

লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। নীলু চাপা গলায় বলল, 'আমার গায়ে হাত দেবেন না, প্লিজ।' লোকটি হেসে উঠছে শব্দ করে। আর ঠিক তখনই নূপুরের শব্দ শোনা গেল। যেন কেউ এক জন এসে ঢুকেছে এ ঘরে।

লোকটি ভারি গলায় বলল, 'কে, কে ওখানে?' তার উত্তরে অল্পবয়সী একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। লোকটি চেঁচাল,--'কে, কে?' কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু ঘরের শেষ প্রান্তের একটা জানালা খুলে ভয়ানক শীতল একটা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। সে হাওয়ায় ভেসে এল অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ।

নীলুর মনে হল একটি মেয়ে যেন নূপুর পায়ে দিয়ে তার চার পাশ দিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। ঘুরতে-ঘুরতে এক বার মেয়েটি তাকে স্পর্শ করল আর তক্ষুণি নীলুর মনে হল-- আর কোনো ভয় নেই।

নীলু দেখল লোকটি ক্রমেই দেয়ালের দিকে সরে যাচ্ছে। এক বার সে

চাপা স্বরে বলল, 'তুমি কে?' মিষ্টি একটি হাসি শোনা গেল তখন। ফুলের গন্ধ আরো তীব্র হল। অন্য কোনো ভুবন থেকে ভেসে এল নূপুরের ধ্বনি। লোকটি গা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এসব কী হচ্ছে! কে, এখানে কে?' কেউ তার কথার জবাব দিল না। একটি দুষ্টু মেয়ে শুধু হাসতে লাগল। ভীষণ দুষ্টু একটি মেয়ে। তার পায়ে নূপুর। তার গায়ে অপার্থিব এক ফুলের গন্ধ। মেয়েটি এবার দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটির দিকে। লোকটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, 'এইসব কি? কে কে?' তার উত্তরে সমস্ত ঘরময় মিষ্টি খিলখিল হাসি ঝমঝম করতে লাগল। লোকটি চাপা গলায় বলে উঠল, 'আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও।' দুষ্টু মেয়েটি আবার হাসল, যেন খুব একটা মজার কথা।

পরিশিষ্ট

থার্ড ইয়ার অনার্সের এই ক্লাসটি মিসির আলি সাহেবকে দেওয়া হয়েছে। সাইকোলজি ফিফ্‌থ পেপার। মিসির আলি হাসিমুখে ক্লাসে ঢুকলেন। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। রানু বসে আছে সেকেণ্ড বেঞ্চে। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। তিনি মেয়েটির দিকে তাকালেন এবং তাকিয়ে রইলেন। মনে হল মেয়েটির ঠোঁটের কোণায় হাসি লেগে আছে। মিসির আলি কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমার নাম কী?'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। স্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমার নাম নীলু। নীলুফার। রোল নাম্বার থার্টি টু।'

'আমি একটি মেয়েকে চিনতাম। তুমি দেখতে অবিকল তার মতো।'

নীলুফার শান্ত স্বরে বলল, 'আমি জানি।'

মিসির আলি সাহেব কপালের ঘাম মুছলেন। সমস্ত ব্যাপারটি ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-করতে বললেন, 'আমি তোমাদের পড়াব ফিফ্‌থ পেপার। খুব ইন্টারেস্টিং একটি টপিক--'

রানুর মতো দেখতে মেয়েটি তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি।

'দেবী'র দ্বিতীয় খণ্ড : নিশীথিনী।

এইসব দিন রাত্রি

১

সন্ধ্যার পর থেকে নীলুর কেমন যেন লাগতে লাগল। কেমন এক ধরনের অস্বস্তি। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে যে-রকম লাগে সে-রকম। সমস্ত শরীর ঝিম ধরে আছে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির বারান্দাটা সুন্দর। কল্যাণপুরের দিকে শহর তেমন বাড়তে শুরু করে নি। গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। বারান্দায় দাঁড়ালে ঝিলের মতো খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে। গত শীতের আগের শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস নেমেছিল। কী অদ্ভুত দৃশ্য! এ বৎসর নামবে কিনা কে জানে। বোধহয় না। শহর এগিয়ে আসছে। পাখিরা শহর পছন্দ করে না।

ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বেশ শীত পড়েছে এবার। আজকালের মধ্যেই লেপ নামাতে হবে। নীলু শাড়ির আঁচলে মাথা ঢেকে দূরে ঝিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

বসার ঘরে তার ননদ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। "কখগ ও চছজ দুইটি সমকোণী ত্রিভুজ। ইহাদের কখ ও চছ বাহু দুইটি সমান। প্রমাণ কর যে ....।" মিষ্টি গলা শাহানার। পড়াটা শুনতেও গানের মতো লাগছে। আজ কি ওর প্রাইভেট মাষ্টারের আসার তারিখ? আজ বুধবার না মঙ্গলবার? নীলু মনে করতে পারল না। ভদ্রলোক বুধবারে আসেন। নীলু মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল যেন আজ বুধবার না হয়।

বুধবার হলেই ভদ্রলোক আসবেন। এবং নীলুকে সারাক্ষণ তাদের আশেপাশে বসে থাকতে হবে। নজর রাখতে হবে। কারণ শাহানা গত সপ্তাহে চোখ-মুখ লাল করে তাকে বলেছে, 'ভাবী, এই স্যারের কাছে আমি পড়ব

না।'

নীলু অবাক হয়ে বলেছে, 'কেন?'

'স্যারটা ভালো না ভাবী। চেয়ারের নিচে পা দিয়ে সারাক্ষণ আমার পা ছুঁতে চায়।'

'কী যে বল! হঠাৎ হয়তো লেগে গেছে।'

'না ভাবী, হঠাৎ না। আমি যতই পা সরিয়ে নিই, সে ততই নিজের পা এগিয়ে দেয়।'

নীলু আর কিছু বলে নি। কিন্তু বললেই তো আর মাষ্টার বদলানো যায় না। এত কম টাকায় পাওয়াও যাবে না কাউকে। মাষ্টার ছাড়া চলবেও না। প্রিটেস্টে শাহানা অঙ্কে পেয়েছে এগারো। তাদের বড়ো আপা গম্ভীর হয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, শাহানাকে যেন ইলেকটিভ অঙ্কে কোচ করানো হয়। প্রাইভেট মাষ্টার জোগাড় করতে হয়েছে বহু ঝামেলা করে। কিন্তু বুড়োমতো এই ভদ্রলোকের এ কী কাণ্ড! অথচ ভালোমানুষের মতো চেহারা। পড়ায়ও ভালো। কত ধরনের মানুষ থাকে সংসারে!

নীলু ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। আবার ভেতরে যেতেও ইচ্ছা করছে না। কেন জানি ইচ্ছা হচ্ছে চেঁচিয়ে কাঁদতে। এ-রকম তার কখনো হয় না। নীলুর একটু ভয়-ভয় করতে লাগল।

বাড়িতে সে এবং শাহানা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সবাই খিলগাঁয়ে এক বিয়ের দাওয়াতে গেছে। রাত এগারটার আগে ফিরবে না। কিংবা কে জানে হয়তো আরো রাত হবে। বারোটা-একটা বাজবে।

শাহানা ভেতর থেকে ডাকল, 'ভাবী, একটু শুনে যাও তো।' নীলু ভেতরে ঢুকল।

'জানালায় কে যেন খটখট করছে ভাবী। আমার ভয়-ভয় লাগছে। তুমি এখানে বসে থাক।'

নীলু বসল তার পাশে। শাহানা বলল, 'তোমাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন ভাবী?'

'কি রকম দেখাচ্ছে?'

'মুখটা কি রকম কালো কালো লাগছে।'

'কালো মানুষ, কালো কালো তো লাগবেই।'

শাহানা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভাবীর দিকে। ভাবী কালো ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা আছে। আর এত সুন্দর ভাবীর চোখ! শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

'এ-রকম তাকিয়ে আছ কেন শাহানা?'

শাহানা লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। নীলু বলল, 'আজ কী বার, মঙ্গলবার না বুধবার?'

'মঙ্গলবার।'

'তোমার স্যার আজ আসবে না তো?'

'না।'

শাহানা ইতস্তত করে বলল, 'স্যারের কথাটা তুমি কাউকে বল নি তো ভাবী?'

'না।'

'কাউকে বলবে না। বড়ো লজ্জার ব্যাপার। তুমি ভাবী ভদ্রলোককে নিষেধ করে দাও। প্রাইভেট মাষ্টার আমার লাগবে না।'

নীলু কিছু বলল না। আড়চোখে দেখল, শাহানার ফর্সা গাল লাল হয়ে আছে। এই মেয়েটা বড়ো সহজেই লজ্জা পায়। তার এ জন্যে লজ্জা পাবার কী আছে?

নীলু উঠে দাঁড়াল। শাহানা বলল, 'যাচ্ছ কোথায় ভাবী?'

'যাচ্ছি না। সোফায় একটু শোব। শরীরটা ভালো লাগছে না শাহানা।'

'কি হয়েছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

শাহানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারও কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল--সে-সব কিছু না তো? তিন বছর আগে একদিন বিকেলবেলা ভাবী তার চুল বেণী করে দিচ্ছিল। হঠাৎ ক্লান্ত স্বরে বলল, 'শাহানা, মাকে একটু ডাক তো, শরীরটা কেমন যেন করছে।'

দেখতে দেখতে নেতিয়ে পড়ল সে। কী কাণ্ড, কী ছোটাছুটি। পেটে তিন মাসের বাচ্চা। ডাক্তার এসে বললেন, এ্যাবোরশন হয়ে গেছে। হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। পনের দিন হাসপাতালে থেকে কাঠির মতো হয়ে সে ফিরে এল।

ডাক্তার ভয় ধরিয়ে দিলেন। বলে দিলেন খুব সাবধানে থাকতে হবে। এ্যাবোরশন হবার একটা স্বাভাবিক টেণ্ডেন্সি তার আছে। কিছু কিছু মেয়ের থাকে এ-রকম।

শাহানা লক্ষ করল, নীলু খুব ঘামছে। সে-রকম কিছু না তো? সে ভয়ে ভয়ে ডাকল, 'ভাবী!' নীলু তাকাল, কিছু বলল না।

'ভাবী, সে-রকম কিছু না তো?'

'না বোধহয়। ডাক্তার বলেছিল, সাত মাস পার হলে ভয় নেই।'

'তোমার এখন কত দিন? আট মাস না?'

'হুঁ।'

'পানি খাবে ভাবী?'

'না।'

'ভাবী, বাড়িওয়ালাদের বাসায় গিয়ে কাউকে ডেকে আনব?'

'না। কাউকে ডাকতে হবে না।'

শাহানা একটা বালিশ এবং চাদর এনে দিল। মৃদুস্বরে বলল, 'সোফার উপরই শুয়ে থাক। চুল টেনে দেব?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। তুমি পড়তে বস তো। আমার শরীর এখন ভালোই।'

'সত্যি বলছ?'

'হুঁ। শুধু শুধু মিথ্যা বলব কেন?'

শাহানার পড়ায় আর মন বসছে না। ভাবী কেমন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। এমন মায়া লাগছে দেখতে! শাহানার মনে হল, এই পরিবারে এসে ভাবী ঠিক সুখী হয় নি। বিয়ের পর সব মেয়েরাই নিজের একটা আলাদা সংসার চায়। ভাবীও নিশ্চয়ই চায়। কিন্তু এখানে ভাবীর কোনো আলাদা সংসার নেই।

মাসের এক তারিখে সংসারের পুরো টাকাটা মা'র হাতে তুলে দেয়। সব কেনাকাটা হয় মা'র হাতে। ডাল রান্না হবে না আলুভাজা হবে, এই সামান্য জিনিসটাও মাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। মা'র মেজাজের দিকে লক্ষ রেখেই ভাবী সব কিছু করে, তবু মাঝে মাঝে মা এমন খারাপ ব্যবহার করেন যে শাহানার নিজেরই লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করে।

একবার ভাবী তার নিজের মা'র অসুখের খবর শুনে এক শ'টা টাকা পাঠাল মানিঅর্ডার করে। তার রশিদ এসে পড়ল মা'র হাতে। তিনি এমন হৈচৈ শুরু করলেন, সব টাকাপয়সা পাচার হয়ে যাচ্ছে গোপনে। নিজেদের যেখানে চলে না ----- ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবী লজ্জায় অপমানে নীল হয়ে গেল। কিন্তু একটি কথাও বলল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে লাগল। ভাবী না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হলে কী যে কাণ্ড হত কে জানে! খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিত নিশ্চয়ই। কিন্তু ভাবী খুব স্বাভাবিক। যেন তেমন কিছু হয় নি। বিকেলে ঠিকই রান্না করল। রাতে সবাইকে খাইয়ে নিজে শাশুড়ির সঙ্গে খেতে বসল।

মা তখন আবার টাকার প্রসঙ্গ তুললেন, 'বৌমা শোন, কিছু কিছু মেয়ে আছে, স্বামীর বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করতে পারে না। সুযোগ পেলেই বাপের বাড়িতে যা পারে পাচার করতে চেষ্টা করে। মনে করে সেটাই আসল জায়গা। এটা ঠিক না। বিয়ের পর বাড়ি একটাই—স্বামীরবাড়ি।'

ভাবী শান্ত স্বরে বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না মা। আমি আর পাঠাব না। আর যেটা পাঠিয়েছি, সেটা সংসারের টাকা না। আমার নিজের টাকা।'

'তোমার আবার টাকা এল কোথেকে।'

'ও আমাকে মাঝে মাঝে কিছু হাতখরচ দেয়। সেটা আমি খরচ করি না।'

'তোমার আবার আলাদা হাতখরচের দরকারটা কি? তুমি তো আর স্কুল-কলেজে যাও না যে রিকশা ভাড়া, বাস ভাড়া লাগবে? আর হাতখরচের সেই টাকাও তো সংসারের টাকা, ঠিক না?'

জানালায় আবার খটখট শব্দ হচ্ছে। শাহানা ভয়ে ভয়ে ডাকল, 'ভাবী, ও ভাবী।' নীলু উঠে বসল।

'কি?'

'জানালায় কিসের যেন শব্দ হচ্ছে।'

'বাতাসের শব্দ। তুমি দেখ তো শাহানা ক'টা বাজে?'

'আটটা।'

'মাত্র আটটা?'

'কী হয়েছে ভাবী?'

নীলু জবাব দিল না। হঠাৎ তলপেটে একটা তীব্র ও তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা বোধ করল। অন্য কোনো শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। এর জাত আলাদা। নীলুর চোখ ভিজে গেল। সোফা আঁকড়ে ধরে সে ব্যথার ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করল।

'এ--রকম করছ কেন ভাবী?'

নীলু ক্ষীণস্বরে বলল, 'মরে যাচ্ছি শাহানা!' শাহানা কী করবে ভেবে পেল না। তার গা কাঁপতে লাগল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাড়িওয়ালার এক ভাগ্নে চিলেকোঠার ঘরটায় থাকে। সে নাকি? শাহানা গলা ফাটিয়ে ডাকল, 'আনিস ভাই, আনিস ভাই।' কেউ জবাব দিল না।

শাহানা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাস্তায় বাতি নেই। সে ছুটে গেল ডানদিকের একতলা বাড়িতে। বাড়িওয়ালা রশীদ সাহেব তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে থাকেন। সে বাড়ি তালা-বন্ধ। দোতলার বাড়িতেও কোনো পুরুষমানুষ নেই। রোগা এক জন মহিলা (যাকে শাহানা আগে কোনো দিন দেখে নি) বিরক্ত স্বরে বলল, 'ছোটাছুটি করে তো লাভ হবে না--টেলিফোন কর হাসপাতালে।'

'কোথায় আছে টেলিফোন?'

'রাস্তার ওপাশে হলুদ রঙের বাড়িটাতে যাও। বাড়ির সামনে কাঁঠাল গাছ আছে। চিনতে পারছ?'

শাহানা চিনতে পারল না--তবু ছুটে গেল। হলুদ বাড়ি। সামনে কাঁঠাল গাছ। রাস্তার দু' পাশেই ঘন অন্ধকার। শীতের জন্যে দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছে সবাই। কেমন ভুতুড়ে লাগছে চারদিক। পান-বিড়ির একটি দোকানে কয়েক জন ছোকরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে শাহানাকে। এক জন বুড়ো রিকশাওয়ালাও গভীর মনযোগে তাকিয়ে আছে।

'এই শাহানা। কি ব্যাপার?'

শাহানা কয়েক মুহূর্ত আনিসকে চিনতেই পারল না।

'খালিপায়ে কোথায় যাচ্ছ?'

'বড়ো বিপদ আনিস ভাই। ভাবী যেন কেমন করছে।'

'বাসায় কেউ নেই?'

'না।'

'তুমি বাসায় যাও, আমি বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসি।'

আনিস দৌড়ে গেল বড়ো রাস্তার মোড়ের দিকে। সেখানে মাঝে মাঝে বেবিট্যাক্সি পাওয়া যায়।

নীলুকে পিজিতে নেয়া হল রাত ন'টায়। মরণাপন্ন রোগীকে ডাক্তাররা নিতান্ত অবহেলায় ইমার্জেন্সিতে ফেলে রাখেন বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, সেটা বোধহয় ঠিক না।

দু'জন ডাক্তার নীলুকে তৎক্ষণাৎ অপারেশন টেবিলে নিয়ে গেলেন। একজন আনিসকে বললেন, "রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ, প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে। রক্ত লাগবে। রক্তের ব্যবস্থা করুন।'

শাহানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। আনিস কোনো কারণ ছাড়াই এক বার তিন তলায় উঠছে, এক বার নিচে নেমে যাচ্ছে। রক্তের ব্যবস্থা কী ভাবে করতে হয়, সে কিছুই জানে না।

রাত ন'টা একচল্লিশ মিনিটে এক জন ডাক্তার এসে শাহানাকে বললেন, 'খুকি, কান্না থামাও। মেয়ে হয়েছে একটি। রোগী ভালোই আছে।'

'বাচ্চাটি? বাচ্চাটি?'

'খুব ভালো না, তবে ঠিক হয়ে যাবে।'

দাড়ি-গোঁফওয়ালা ডাক্তারটি হাসলেন। শাহানার ইচ্ছা হল সে প্রচণ্ড চিৎকার করে ঢাকা শহরের সবাইকে জানিয়ে দেয়, তোমরা শোন, আমাদের ভাবীর একটি মেয়ে হয়েছে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, সে বড়ো ভয় পেয়েছে।

ট্যাঁ-ট্যাঁ করে একটি বাচ্চা কাঁদছে। এটি কি তার বাচ্চা? এক জন নার্স কী যেন বলছে, কিছুই কানে যাচ্ছে না। নীলু চোখ মেলতে চেষ্টা করল, চোখ পাথরের মতো ভারি। কিছুতেই মেলে রাখা যাচ্ছে না। রাজ্যের ঘুম চোখে। চারপাশে কারা যেন হাঁটাহাঁটি করছে। মুখের ঠিক উপরে হলুদ আলো। চোখ বন্ধ, তবুও সে আলো কেমন করে যেন চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

কাঁদছে! একটা ছোট্ট শিশু কেমন অদ্ভুত শব্দে কাঁদছে। বড়ো দেখতে ইচ্ছা করছে। নীলু ঘুমের অতলে তলিয়ে যাবার আগে পরিষ্কার শুনল, শাহানা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছে--ভাবী, তাকিয়ে দেখ তোমার বাবুকে।

নীলু ঘুমের মধ্যেই হাসতে চেষ্টা করল। নতুন শিশুটি কঠিন কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পৃথিবীর কোনো কিছুই এখন আর তার ভালো লাগছে না। পৃথিবীর আশা, আনন্দ, সুখ একদিন হয়তো তাকে স্পর্শ করবে, কিন্তু আজ

করছে না। সে তার ছোট ছোট হাত মুঠি পাকিয়ে ক্রমাগত কাঁদছে।

২

বাবু হাত–পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে।

ঘুমের মধ্যেই কী কারণে যেন তার নিচের ঠোঁট বেঁকে গেল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল নীলু। কী অপূর্ব দৃশ্য! এমন মায়া লাগে! চোখে পানি এসে যায়, বুকের কাছটায় ব্যথা–ব্যথা করে। নীলু মৃদুস্বরে ডাকল, 'এই বাবু এই।' বাবুর বাঁকা ঠোঁট আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আহ্ কেন এত মায়া লাগে? নীলু নিচু হয়ে তার কপালে চুমু খেল। কেমন বাসি শিউলি ফুলের গন্ধ বাবুর গায়ে। কী অদ্ভুত সেই গন্ধ!

'ভাবী।'

নীলু চমকে সরে গেল। কারো সামনে বাবুকে আদর করতে তার বড়ো লজ্জা লাগে। শাহানা হাসিমুখে দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

'বাবু জেগেছে ভাবী?'

'নাহ্।'

'জাগলেই আমাকে খবর দেবে। আমি কোলে নেব।'

'ঠিক আছে, দেব।'

'এ তো দেখি রাতদিনই ঘুমায়! এত ঘুমায় কেন?'

'কি জানি।'

শাহানা এসে বসল বাবুর পাশে।

'কী ছোট ছোট কান দেখেছ? ইঁদুরের কানের মতো। তাই না ভাবী?'

'হুঁ।'

'ছোট কান যাদের, তাদের রাগ খুব বেশি হয়। ওর খুব রাগ হবে, মা'র চেয়েও ও বেশি রাগী হবে।'

নীলু কিছু বলল না। শাহানা বাবুর হাত ধরে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ইতস্তত করে বলল, 'ওকে কোলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে একটু বসব ভাবী?'

'ঘুম ভাঙার আগেই?'

'হুঁ।'

'ঠিক আছে, নিয়ে যাও। এসো, আমি কোলে তুলে দিই।'

শাহানা হাত পেতে বসল। নীলু ছোট একটা নিঃশ্বাস গোপন করল। বাবুকে সে খুব কম সময়ের জন্যেই কাছে পায়। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই তার শাশুড়ি মনোয়ারা এসে বাবুকে নিয়ে যান।

রোদ উঠলেই বাচ্চাকে তেল মাখাতে বসেন। তেল মাখানো এত প্রবল বেগে চলে যে নীলুর ভয়–ভয় লাগে। পট করে একটা নরম হাড় হয়তো

ভেঙে যাবে। তেল মাখানোতেই শেষ নয়। তিনি নাক ঠিক করতে বসেন, দীর্ঘ সময় ধরে নাক টিপে টিপে ধরেন, যাতে ভবিষ্যতে বাচ্চার খাঁড়া নাক হয়। তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে থুতনিতে অল্প অল্প চাপ দেন দীর্ঘ সময় ধরে। এরকম করলে বাচ্চার মুখ পরবর্তী সময়ে ফজলি আমের মতো হবে না।

বেলা এগারটার দিকে বাবুর গোসল হয়। নীলুর খুব ইচ্ছা গোসলটি সে নিজে করায়, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে সুযোগ পায় নি। এক দিন ভয়ে-ভয়ে বলেছিল, 'আমার কাছে দিন মা, আমি করিয়ে দিই।'

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এসব পারবে না। কানে পানি ঢুকবে। কান পচবে। তোমাকে যেটা করতে বলছি, সেটা কর। গরম পানি মিশিয়ে গোসলের পানিটাকে কুসুম গরম কর।'

পানি কুসুম গরম করাও একটা দীর্ঘ ঝামেলার কাজ। লাল প্লাস্টিকের গামলায় নীলু কেতলি থেকে গরম পানি ঢালে। মনোয়ারা হাত ডুবিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এ কি কাণ্ড বৌমা! এ তো আগুন-গরম পানি! যাও, ঠাণ্ডা পানি এনে মেশাও।'

ঠাণ্ডা পানি মেশানোর পর তিনি আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'এ তো দেখি বরফের মতো ঠাণ্ডা করে ফেললে। কোনো একটা কাজও কি ঠিক মতো পার না?'

গোসলের পরপরই বাচ্চার খিদে পায়। সেই দুধ খাওয়ানোর পর্বেও মনোয়ারা পাশে বসে থাকেন। নীলুর বড়ো লজ্জা লাগে। কিন্তু কোনো উপায় নেই।

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারটা ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেদিকে লক্ষ রাখেন।

'এ কি বৌমা, বুকের সঙ্গে এভাবে চেপে ধরে আছ কেন? দম বন্ধ করে মারতে চাও নাকি? মাথাটা আরেকটু উঁচু করে ধর। আহ্ আঁচল ধরে এত টানাটানি করছ কেন? এখানে পুরুষমানুষ কি কেউ আছে যে লজ্জায় মরে যাচ্ছ?'

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর মনোয়ারা খানিকক্ষণের জন্যে ঘুমুতে যান। তখন আসেন নীলুর শ্বশুর হোসেন সাহেব। তিনি মাস ছয়েক হল রিটায়ার করেছেন। ঘরে বসে থাকার নতুন জীবনযাত্রায় এখনো নিজেকে পুরোপুরি অভ্যস্ত করে তুলতে পারেন নি। নানান ধরনের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করছেন। কোনোটিতেই সফল হন নি। ইদানীং হোমিওপ্যাথির বইটই খুব পড়ছেন। তাঁর ধারণা হয়েছে, হোমিওপ্যাথির পরে চিকিৎসাশাস্ত্রে এখনো কিছু তৈরি হয় নি। ঠিক মতো লক্ষণ বিচারটাই হচ্ছে আসল কথা।

নীলু তার শ্বশুরকে খুবই পছন্দ করে। সব সময় চেষ্টা করে তাঁর জন্যে বাড়তি কিছু করতে। সেটা কখনো সম্ভব হয় না। বাঁধা আয়ের বড় সংসারে

কারো জন্যে বাড়তি কিছু করা যায় না।

দুপুরে মনোয়ারা ঘুমিয়ে পড়লে হোসেন সাহেব আসেন। দরজার বাইরে থেকে চাপা গলায় বলেন, 'টুনী কি ঘুমাচ্ছে বৌমা?'

'জ্বি, বাবা। আসুন।'

তিনি এসে হাসিমুখে বিছানার পাশে বসেন। নিচুস্বরে ডাকেন, 'টুনি, টুনি। টুনটুনি, ঝুনঝুনি, খুনখুনি, শুনশুনি।'

বাবুর এখনো নাম ঠিক হয় নি। যখন যার যা ইচ্ছা তাই ডাকে।

একমাত্র হোসেন সাহেব প্রথম দিন থেকে টুনি ডেকে আসছেন।

এই নাম মনোয়ারার মোটেই পছন্দ নয়। প্রথম দিনেই তিনি বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'কী টুনি টুনি করছ? টুনি একটা নাম নাকি?'

'টুনি নামটা খারাপ কি?'

'টুনি নামের ছেলেপুলেরা বড়ো হয় না। টুনটুনি পাখির মতো ছোট থাকে।'

'মানুষের বাচ্চা বড়ো হয়ে মানুষের মতোই হবে। কারো নাম হাতি রাখলেই সে হাতির মতো হবে নাকি?'

'বাজে তর্ক করবে না।'

'বাজে তর্ক কী করলাম?'

'আমার সামনে তুমি টুনি ডাকবে না, ব্যস। যদি ডাকতে ইচ্ছা হয় আড়ালে ডাকবে।'

হোসেন সাহেব প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্ত্রীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেন। এই একটি ক্ষেত্রে করেন নি। দিনের মধ্যে বেশ কয়েক বার তিনি বেশ উঁচুস্বরেই ডাকেন।—টুনি, টুনি। ব্যাপারটা উদ্দেশ্যমূলক। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে একটা চাল চালছেন। নিজের পছন্দের নামটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। তাঁর সাধনা যে পুরোপুরি বিফলে যাচ্ছে, সেটা বলা ঠিক হবে না। তিনি ছাড়াও এ বাড়ির লোকজনও এক-আধ বার মনের ভুলে টুনি বলে ফেলছে। মনোয়ারা নিজেই একদিন বলেছেন।

হোসেন সাহেবের ধারণা, এ-রকম ভুল এরা করতেই থাকবে এবং একসময় টুনি নামটিই স্থায়ী হবে।

হোসেন সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'দেখতে কার মতো হয়েছে বৌমা?'

'বুঝতে পারছি না তো। সবাই বলছে ওর বাবার মতোই হয়েছে।'

'শফিকের মতো হয়েছে? আরে না। শফিকের সাথে কোনো মিল নেই। তোমার সাথে কিছু মিল আছে। গায়ের রঙটা পেয়েছে তোমার শাশুড়ির। একেবারে গোলাপের মতো রঙ।'

নীলু হাসি গোপন করবার জন্যে মুখ অন্য দিকে ফেরাল। সে বুড়ো মানুষটির এই দুর্বলতাটা খুব ভালো জানে, ফাঁক পেলেই তিনি স্ত্রীর প্রসঙ্গে

একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। এখন যেমন হয়েছেন। নীলু বলল, 'চা খাবেন বাবা? এক কাপ চা করে দিই?'

'দাও। চিনি দিও না। চিনিটা শরীরের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর।'

'তাই নাকি বাবা?'

'হুঁ। চিনি যেমন ক্ষতি করে, লবণও সে-রকম ক্ষতি করে। এই জন্যে প্রেসার হলে লবণ খাওয়া কমাতে বলে ডাক্তারেরা। সাদা রঙের সব খাদ্যদ্রব্যই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।'

নীলু হেসে বলল, 'দুধ? দুধও তো সাদা।'

হোসেন সাহেব অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বসে রইলেন। নীলুর নিজের কাছেই খারাপ লাগতে লাগল। দুধের প্রসঙ্গটা না তুললেও হত।

'আপনার চায়ে দুধ দেব বাবা?'

নীলু তার শ্বশুরকে খুব ভালো মতোই চেনে। লিকার চা এক চুমুক খেয়েই তিনি বলবেন,'এক চামচ চিনি দাও তো মা।' চিনি দেবার পর বলবেন,'আধ চামচ দুধও দাও, কেমন কষা-কষা লাগছে চাটা। জ্বাল বোধহয় বেশি হয়েছে।'

নীলু চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকে দেখল, হোসেন সাহেব বাবুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। তিনি নীলুকে দেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন,'হাত-পা নাড়ানাড়ি করছিল। ভাবলাম, উঠে পড়ে কিনা। কোলে নিতেই শান্ত।'

'চা নিন বাবা।'

চায়ে চুমুক দিয়ে হোসেন সাহেব তৃপ্তির স্বরে বললেন, 'আহ্ ফাস ক্লাস চা হয়েছে মা, একটু বোধহয় চিনি দিয়েছ?'

'এক চামচ দিয়েছি।'

'ভালো করেছ। বিনা চিনির চা বিষের মতো লাগে।'

নীলু বলল, 'সিগারেট খাবেন? দেব?'

'দেখি, দাও। তোমার শাশুড়ি উঠে না পড়লে হয়।'

'উনার উঠতে দেরি আছে।'

নীলু ড্রয়ার খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। হোসেন সাহেব এবং নীলুর মধ্যে এই গোপন ব্যাপার আছে। মনোয়ারা যখন ঘুমিয়ে থাকেন কিংবা বাইরে কোথাও যান, তখন হোসেন সাহেব ইতস্তত করে বলেন, 'বৌমা, দেখ তো শফিক তার সিগারটের প্যাকেট ফেলে গেছে কিনা। ফেলে গেলে দাও একটা।'

শফিক সিগারেটের প্যাকেট ফেলে যাবার লোক না। নীলু তার শ্বশুরের জন্যে সিগারেট আনিয়ে আলাদা লুকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে শফিকের ছোট ভাই রফিক সেখানে ভাগ বসায়।

'ভাবী, গোপন জায়গা থেকে একটা সিগারেট ছাড় তো।'

নীলু এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে,'আমার কাছে নেই।'

'দাও না ভাবী, প্লিজ। এ-রকম কর কেন?'

উপায় নেই, দিতে হয়। রফিক আয়েস করে সিগারেটে টান দিয়ে বলে, 'তোমার চেহারা এত মায়া-মায়া, কিন্তু আচার-আচরণ এত কঠিন কেন?'

'কঠিন কোথায়? দিলাম তো একটা।'

'তুমি বলেই একটা দিলে, পৃথিবীর অন্য সব ভাবীরা গোটা একটা প্যাকেট আনিয়ে দিত।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এখন শোন ভাবী, তুমি তোমার মেয়েলি বুদ্ধি দিয়ে একটা সমস্যার সমাধান কর। একটা কঠিন সমস্যা।'

রফিক আজগুবি একটা সমস্যা হাজির করবে। সেই সমস্যার কোনো আগা নেই, মাথা নেই। যেমন, গত সপ্তাহেই সে গম্ভীর মুখে বলল, 'আচ্ছা ভাবী, ধর একটা ছেলের একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। খুবই পছন্দ। রীতিমত 'লভ' যাকে বলে। এখন ছেলেটা মেয়েটাকে সেই কথাটা বলতে চায়, বা নিজের অনভূতির ব্যাপারটা মেয়েটাকে বুঝতে দিতে চায়। কী ভাবে সেটা করা উচিত?'

নীলু হাসিমুখে বলল,'মেয়েটা কে?'

'মেয়ে যেই হোক। তুমি সমস্যাটার সমাধান কর।'

'ছেলেটা একটা চিঠি লিখবে কিংবা বলবে মুখে।'

'তুমি একেবারে পাগল-ছাগলের মতো কথা বলছ ভাবী। আমি চাচ্ছি একটা ইউনিক কিছু। যেখানে হাই ড্রামা থাকবে, সাসপেন্স থাকবে।'

'তাহলে এক কাজ কর। মেয়েটার সামনে হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়। তারপর গড়াগড়ি খেতে থাক। যখন চারদিকে লোকজন জমে যাবে এবং মেয়েটিও এসে পাশে দাঁড়াবে তখন ফিসফিস করে বল ---- ।'

'একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে তোমার কাছ থেকে এরকম ঠাট্টা-তামাশা আশা করি নি। মোস্ট আনফরচুনেট।'

'খুব সিরিয়াস নাকি?'

রফিক জবাব না দিয়ে উঠে পড়ে।

ভাইয়ে ভাইয়ে এমন অমিল হয় কী করে, নীলু প্রায়ই ভাবে। শফিকের সঙ্গে রফিকের কোনো মিল নেই। শফিক উত্তর মেরু হলে রফিক দক্ষিণ মেরু।

শফিকের চরিত্রে হালকা কোনো ব্যাপারই নেই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবে। কনকনে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল সারবে। নাশতা খেয়ে অফিসের জন্যে তৈরি হবে। এক ফাঁকে শুধু বলবে—নীলু দেখ তো পত্রিকা এসেছে নাকি। সকালবেলা কথাবার্তা এই পর্যন্তই। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে হ্যাঁ হুঁ ছাড়া অন্য কোনো জবাব দেবে না।

পারিবারিক সমস্যার ব্যাপারগুলি সে শুনবে খুব মন দিয়ে। কখনোই

কোনো প্রশ্ন করবে না। সমস্যার সমাধান করবে এক লাইনে। নীলু প্রথম দিকে বলত, 'কথা কম বল কেন? কথা বলতে কি তোমার কষ্ট হয়?' শফিক বলত,'না, কষ্ট হয় না।'

'তাহলে? দিন–রাত মুখ বন্ধ করে থাক কী ভাবে?'

'অন্যের কথা শুনতেই আমার বেশি ভালো লাগে।'

এটাও সত্যি নয়। সবাই মিলে হয়তো কথাবার্তা বলছে, হঠাৎ দেখা যাবে শফিক নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে। যেন কোথাও তার কোনো ভূমিকা নেই।

ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়েছে, এই নিয়েও তার তেমন কোনো উৎসাহ নেই। শাহানা একবার বলল, 'ভাইয়া, তুমি তো কখনো বাবুকে কোলে নাও না।' সে হেসে বলেছে, 'ছোট বাচ্চা, ঘাড় শক্ত হয় নি, এই জন্যেই নিই না। একটু বড়ো হোক--বড়োসড়ো হলে দেখবি, কোল থেকে আর নামাব না।'

নীলুর প্রায়ই মনে হয় শফিকের ভেতর মায়া–মমতাটা বোধহয় একটু কম। একটু না, হয়তো অনেকটাই কম। নীলুর যখন এবোরশন হল, কী ভয়াবহ অবস্থা। হাসপাতালেই কাটাতে হল পনের দিনের মতো। এই পনের দিনে শফিক তাকে দেখতে গেল মাত্র তিন দিন। যেন বাইরের কোনো অল্প পরিচিতি আত্মীয় তাকে দেখতে গিয়েছে। চার–পাঁচ মিনিট বসেই উঠে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'যাই নীলু?'

নীলুর চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। সে কিছু বলল না। চোখের পানি গোপন করবার জন্যে অন্য দিকে তাকাল। শাহানা অবাক হয়ে বলল, 'এখনই যাবে কি ভাইয়া, এইমাত্র তো এলে!'

'বসে থেকে করব কী?'

'ভাবীর সঙ্গে গল্প কর।'

শফিক অবাক হয়ে বলেছে, 'কী গল্প করব?'

মানুষ এমন অদ্ভুত হয় কেন? প্রায় পাঁচ বছর হয়েছে তাদের বিয়ের। এই দীর্ঘ দিনে এক বারও সে বলে নি—নীলু, এই নাও তোমার জন্যে একটা শাড়ি কিনলাম।

এই যে সংসারে নতুন একটি বাবু এসেছে—সবার মধ্যে কত আনন্দ, কত উত্তেজনা, অথচ শফিক নির্বিকার। রাতের খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে ঘন্টাখানিক বারান্দায় চুপচাপ বসে থাকবে, তারপর অত্যন্ত সহজভাবে ঘুমুতে যাবে। নীলু মাঝে মাঝে কথাবার্তা চালাবার চেষ্টা করে।

'বাবুর জন্যে কোনো নামটাম ভেবেছ?'

'তোমরাই ঠিক কর একটা।'

'বাবা টুনি রাখতে চান। টুনি কেমন লাগে তোমার?'

'ভালোই তো। টুনিই রাখ।'

'মা'র টুনি নাম একেবারেই পছন্দ না। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে তাঁর লেগে যাচ্ছে।'

শফিক হাই তুলে বলে, 'সামান্য একটা নাম নিয়ে এত ঝামেলা কেন?'

'নামটাকে এত সামান্য ভাবছ কেন? সারা জীবন এটা থাকবে। এক জীবনে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে এই নামে ডাকবে। নামটা তো একটা গুরুত্বপুর্ণ জিনিস। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। তুমি মাঝে মাঝে খুব গুছিয়ে কথা বল।'

নীলুর আরো কত কথা বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু শফিকের নিঃশ্বাস অল্প সময়ের মধ্যেই ভারি হয়ে ওঠে।

সে ইদানীং খুব পরিশ্রম করছে। জয়দেবপুরে তাদের নাকি কি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। রোজ তিনটার সময় মতিঝিল থেকে চলে যেতে হয় জয়দেবপুরে। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা-দশটা। খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিছানায় যেতে-না-যেতেই ঘুম।

নীলুর ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকে। ঘরে একটা জিরো পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে সারা রাত। নামেই জিরো পাওয়ার, আসলে বেশ আলো। স্পষ্ট সবকিছু দেখা যায়। সে প্রায়ই চুপচাপ বসে বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এত ভালো লাগে তাকিয়ে থাকতে। লাল কম্বলের ফাঁকে টুকটুকে ফর্সা একটা মুখ। ভাগ্যিস মেয়েটি তার মতো কালো হয় নি। ওর চাচার রং পেয়েছে। নীলুর মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে সারা রাত বাবুকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে। সে তার মেয়ের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথাবার্তাও বলে, 'কি হয়েছে সোনামনি। ওমা ওমা, ঠোঁট বাঁকা করছে কেন আবার, স্বপ্ন দেখছ মা? ভয়ের স্বপ্ন? দূর বোকা মেয়ে, এই তো আমি পাশে। এই তো তোমার হাত ধরে বসে আছি।'

উষ্ণ একটি শয্যা। এক পাশে মা, অন্য পাশে বাবা, তবু ছোট বাবু মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে বা অন্য কোনো কারণে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে। সে কান্না সহজে থামে না।

মনোয়ারা উঠে দরজায় ধাক্কা দেন, 'কী হয়েছে, এই বৌমা?'

'কিছু না মা, এমনি কাঁদছে।'

'আহ্ দরজাটা খোল না। দেখি কী ব্যাপার।'

শফিক ঘুম-ঘুম চোখে দরজা খুলে দেয়। মনোয়ারা বিরক্ত স্বরে বলেন, 'নিশ্চয়ই পিঁপড়া কামড়েছে। কত বার বলি—শোবার সময় বিছানার চাদর ভালো করে ঝাড়বে। কোনো একটা কাজও ঠিকমতো করতে পার না কেন?'

পিঁপড়া খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু দু'টি মশা পাওয়া যায়। রক্ত খেয়ে লাল হয়ে আছে।

'বৌমা, শোবার আগে মশারিটাও দেখে নিতে পার না?'

বাচ্চা কাঁদতেই থাকে। হোসেন সাহেব টর্চ হাতে উপস্থিত হন। গম্ভীর

গলায় বলেন, 'পেট ব্যথা। পেট ব্যথার কান্না এ-রকম থেমে থেমে হয়। এক ডোজ আর্নিকা টু হানড্রেড খেলে আরাম হবে।'

মনোয়ারা চোখ লাল করে তাকাতেই তিনি চুপ করে যান। চটি ফটফট করতে করতে রফিক এসে উপস্থিত হয়।

'বড্ড বেশি ক্রাইং হচ্ছে। হোয়াট হ্যাপেণ্ড? দেখি, আমার কোলে দাও তো ভাবী। এক মিনিটের মধ্যে কুল ডাউন করে দিচ্ছি।'

মনোয়ারা ধমকে ওঠেন, 'ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না। যা এখান থেকে।'

'আমি অসুবিধা কী করলাম? এ রকম শকুন চক্ষুতে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

কান্না যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করে থেমে যায়। বাবু হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুতে শুরু করে। কে বলবে এই কয়েক মিনিট আগেই সে রীতিমতো একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিল।

রফিক হাই তুলে বলে, 'কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে, এখন ঘুমানো মুশকিল হবে। এক কাপ চা খেলে মন্দ হত না। কি বল ভাবী?'

নীলু জবাব দেয় না। হোসেন সাহেব ক্ষীণস্বরে রফিককে সমর্থন করেন।

'দুধ চিনি ছাড়া হালকা লিকারের এক কাপ চা খাওয়া যায়। আইডিয়াটা খারাপ না।'

মনোয়ারা রাগী গলায় বলেন, 'ঘুমুতে আস। রাত দুটোর সময় চা বানাতে হবে? মাথাটা খারাপ হয়েছে নাকি?'

হোসেন সাহেব ঘুমুতে যান। নীলু সত্যি সত্যি রাত দুটোর সময় চা বানাতে যায়। চারদিকে শুনশান নীরবতা। গ্যাসের চুলার নীল আগুন জ্বলছে। বিজবিজ শব্দ হচ্ছে কেতলিতে। কেন জানি অন্য রকম একটা ভাব আসে নীলুর মনে। অন্য এক ধরনের আনন্দ। পৃথিবীটাকে বড়ো সুন্দর মনে হয়। ছোটখাট দুঃখ তো থাকবেই, তবু সব কিছু ছাড়িয়ে আমাদের চারদিকে গভীর একটা আনন্দ আছে। এটা যে আছে, তা সব সময় ধরা পড়ে না। কিছু রহস্যময় মুহূর্তেই শুধু ধরা পড়ে।

গাঢ় আনন্দে নীলুর চোখ ভিজে ওঠে। সে গায়ের চাদর দিয়ে চোখ মোছে। রফিক চায়ের তাগাদা দিতে এসে দৃশ্যটি দেখে থমকে দাঁড়ায়।

'কাঁদছ কেন ভাবী?'

'কাঁদছি না।'

রফিক ইতস্তত করে বলল, 'এ বাড়ির আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালবাসি, এই কথাটা কি তুমি জান?'

'জানি।'

'এর পরও যদি দুপুর রাতে একা একা কাঁদ, তাহলে খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আর কাঁদবে না।'

নীলু হাসল।

'তুমি যদি চাও তাহলে একটা খুব মজার গল্প বলে তোমাকে হাসাবার চেষ্টা করতে পারি।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা কর।'

রফিক কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে মৃদুস্বরে বলল, 'কাল ভোরে তুমি আমাকে এক শ'টা টাকা দিতে পার? ধার। আমি দুই সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দেব। অনেস্ট।'

'এইটা তোমার মজার গল্প?'

'মজার গল্পটা একটু পরে বলছি। আগে সমস্যার কথাটা বলে নিই। ভাবী, পারবে?'

'এক শ' পারব না।। পঞ্চাশ দিলে হয়?'

'বাকি পঞ্চাশ পাব কোথায়?'

'খুব যদি দরকার হয়, তাহলে তোমার ভাইকে বলে দেখতে পারি। বলব?'

'বল। তবে ভাবী, আমার কথা বলতে পারবে না। বলবে, তোমার নিজের দরকার।'

'ঠিক আছে, বলব। এখন শোনাও তোমার হাসির গল্প।'

তারা দু' জন চায়ের কাপ হাতে বসার ঘরে এসে বসল। রফিক তার নতুন গজানো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে গল্প শুরু করল:

'এক লোক মসজিদে গেছে নামাজ পড়তে। বদনায় পানি বেশি ছিল না, কাজেই একটি মাত্র পা ধোয়া গেল।

নামাজ যখন শুরু হল তখন দেখা গেল ঐ লোক বকের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে। অন্য পা-টি গুটিয়ে রেখেছে। তখন ইমাম সাহেব......"

এই পর্যন্ত শুনেই নীলু মুখে শাড়ির আঁচল গুজে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। রফিক বিরক্ত স্বরে বলল, 'গল্প না-শুনেই হাসছ যে? সবটা শুনে নাও। মেয়েছেলেদের সাথে হাসির গল্প বলাও একটা মুসিবত। না শুনেই হাসি। হোয়াট ইজ দিস?'

৩

পুরানো ঢাকার ঘিঞ্জির মধ্যে যে এমন একটি বিশাল এবং আধুনিক ধরনের বাড়ি থাকতে পারে, সেটা রফিকের কল্পনাতেও আসে নি। সে গেটের ভেতরে পা দেবে কি দেবে না, বুঝতে পারল না। এ জাতীয় বাড়িতে কুকুর থাকবেই। এসব কুকুররা আবার কোনো একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কারণেই বোধহয় মানুষদের মধ্যে যে শ্রেণীর একটা ব্যাপার আছে, সেটা চমৎকার

বুঝে ফেলে। কোনো আগন্তুক তাদের মুনিবের শ্রেণীর চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর হলেই কামড়াবার জন্যে ছুটে আসে।

বাড়ির গেট বন্ধ। তবে গেটের ভেতরও আবার ছোট গেট আছে, মাথা নিচু করে যার ভেতর দিয়ে ঢুকতে হয়। রফিক তাই করল এবং আশ্চর্য, সত্যি সত্যি একটি কুকুরের ডাক শোনা গেল। ভয়াবহ কিছু নয়, মৃদু গর্জন। রফিক চট করে মাথাটা টেনে নিল।

গেটের দারোয়ান বলল, 'ও কিছু করবে না। আসেন। কাকে চান?'

বড়োলোকের বাড়িতে ঢোকার এই আরেক ফ্যাকড়া—জায়গায় জায়গায় জবাবদিহি করে ঢুকতে হবে। গেটে একবার বলতে হবে। বাড়িতে বেল টিপলে দ্বিতীয় এক ব্যক্তি আসবে, তাকেও বলতে হবে। তারপর তাকে বসানো হবে, এবং দীর্ঘ সময় বসে থাকতে হবে। বড়োলোকেরা চট করে দেখা দেন না।

'কার কাছে যাবেন?'

এই দারোয়ানটির বাড়ি বোধহয় রাজশাহী--টাজশাহীর দিকে হবে। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলছে। চেহারাও মাই ডিয়ার টাইপের। রফিক হাসিমুখে বলল, 'রহমান সাহেব কি আছেন?'

'জ্বি—না, উনি নাই। সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না।

'তাঁর মেয়ে কি আছে?'

'জ্বি, আপামনি আছেন। যান, সোজা চলে যান। দরজার বাঁ দিকে কলিং বেল আছে। কুকুর কিছু করবে না।'

রফিক খুব সহজ ভঙ্গিতে হাঁটবার চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরটা আসছে সঙ্গে সঙ্গে। বিশাল পর্বতের মতো একটা জন্তু। তার চোখে গভীর সন্দেহ। বোধহয় টের পেয়ে ফেলেছে, এই লোক তাদের সমাজের না। এবং এই লোকের পকেটে আছে মাত্র দু'টি পাঁচ টাকার নোট, যার একটি ছেঁড়া বলে কেউ নিতে চাচ্ছে না। গত এক সপ্তাহে কয়েক বার ভিড়ের মধ্যে বাস কনডাকটারের হাতে গছিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কাজ হয় নি।

রফিক বেল টিপে দাঁড়িয়ে রইল। কুকুরটা বড়ো বিরক্ত করছে। তাকে শুঁকে শুঁকে দেখছে। সে বহু কষ্টে কুকুরটার পেটে প্রচণ্ড একটা কিক দেবার ইচ্ছা দমন করল। কলিং বেল নষ্ট কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কারোর কোনো সাড়া নেই। রফিক দ্বিতীয় বার বেল টিপল।

তাকে অবাক করে দরজা খুলল শারমিন। শারমিনকে আজ অন্য দিনের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর লাগছে। নিজের বাড়িতে আছে বলেই হয়তো চেহারায় কোনো কাঠিন্য নেই। চুল বাঁধা নয়। পিঠময় ছড়ানো। সাধারণ একটা সুতির শাড়ি এলোমেলো করে পরা। রফিক বলল, 'চিনতে পারছেন তো?'

'চিনতে পারব না কেন? আসুন, ভেতরে আসুন।'

রফিক হড়বড় করে বলল,'আগামসি লেনে এসেছিলাম একটা কাজে। তারপর ভাবলাম এত কাছে যখন এসেছি, তখন বরং দেখেই যাই।'

'ভালো করেছেন। আমি যে এখানে থাকি, সেটা জানলেন কীভাবে?'

রফিক জবাব দিল না। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। বসার ঘরটা তেমন জমকাল নয়, বরং বলা চলে বেশ সাধারণ। বেতের তিনটি সোফা। পাশে ছোট ছোট কফি টেবিল। কার্পেটটিও বিবর্ণ। বাড়ির সঙ্গে খাপ খায় না। শারমিন হাসিমুখে বলল, 'এত মন দিয়ে কী দেখছেন?'

'আপনাদের বসবার ঘরটা আরো জমকাল হবে ভেবেছিলাম।'

'এটা ড্রইং রুম না। এটা হচ্ছে এন্ট্রি রুম। বসবার ঘরে ঢোকবার আগের ঘর।'

'বলেন কি!'

'ব্রিটিশ আমলের বাড়ি। ওদের মতো করে বানানো হয়েছে। এমন কি বসবার ঘরে একটা ফায়ার প্লেস পর্যন্ত আছে।'

'মাই গড!'

'আসুন, আপনাকে দেখাই।'

বসবার ঘরে ঢুকে রফিকের মন খারাপ হয়ে গেল। কোনো এক জন মানুষের এত বেশি টাকা থাকবে এবং অন্য এক জনের পকেটে থাকবে দু'টি পাঁচ টাকার নোট, যার একটি ছেঁড়া বলে চালানো যাচ্ছে না।

শারমিন বলল, 'এবার পছন্দ হয়েছে বসবার ঘর?'

'হুঁ।'

'তাহলে মুখ এমন গম্ভীর করে আছেন কেন? ক্লাসে তো আপনার কথার যন্ত্রণাতে সবাই অস্থির।'

রফিক ফ্যাকাসেভাবে হাসল।

'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

রফিক বসল। বসতে বসতে বলল,'আপনারা এতটা বড়োলোক, আমি বুঝতে পারি নি।'

'বুঝতে পারলে আসতেন না?'

রফিক সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনার এখানে সিগারেট খাওয়া যাবে?'

'যাবে না কেন, এটা তো আর মসজিদ না। খান। তারপর বলুন কোনো কাজে এসেছেন, না এমনিতেই এসেছেন?'

শারমিনের মুখ হাসি-হাসি। রফিক বেশ অবাক হল। এই মেয়েটি ক্লাসে প্রায় কোনো কথাই বলে না। ছেলেরা কেউ কাছে গেলে চোখ-মুখ কঠিন করে রাখে। অথচ এখন কেমন সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে। আরেকটি জিনিস দেখেও রফিক অবাক হল, শারমিনের পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। সাত-আট টাকায় যে-সব পাওয়া যায়, সে-সব। তার ধারণা,

এ–রকম বাড়িতে যারা থাকে, তারা ঘরে সাধারণত জয়পুরী ঘাসের স্যাণ্ডেল পরে।

শারমিন বলল, 'চুপ্ করে আছেন কেন? বলুন, কোনো কাজে এসেছেন কি?'

'না, কোনো কাজে আসি নি।'

'গল্প করবার জন্যে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, গল্প করুন, এমন স্টিফ হয়ে আছেন কেন? আমার মনে হয় এই ড্রইং রুমটায় আপনি ঠিক ইজি ফিল করছেন না। আমার নিজের একটি বসার ঘর আছে, আমি আমার নিজের মতো করে সাজিয়েছি। চলুন , ওখানে বসি। এই ঘরটা আমার নিজেরো ভালো লাগে না, কেমন যেন স্টাফি মনে হয়।'

শারমিনের নিজের বসবার ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রলিতে করে একটি কাজের মেয়ে চা নিয়ে এল। চমৎকার একটি রূপোর থালায় ফ্রুট কেক। অন্য একটি প্লেটে শিউলি ফুলের মতো ধবধবে সাদা সন্দেশ।

'এই সন্দেশ ঘরে তৈরী। আমাদের রমিজ ভাইয়ের করা, এক বার খেলে সারা জীবন মনে থাকবে। এর একটি নাম আছে। নামটি আমার দেয়া—গোলাপ বাহার। সন্দেশে গোলাপের গন্ধ আছে।'

'খাবার জিনিসে ফুলের গন্ধ আমার ভালো লাগে না। ফুলের গন্ধ থাকবে ফুলে। সন্দেশে থাকবে সন্দেশের গন্ধ।'

শারমিন খিলখিল করে হেসে উঠল। এত সুন্দর হয় মানুষের হাসি! রফিক তাকিয়ে রইল মুগ্ধ চোখে।

'আপনি খুব ভালো দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মদিন। এই কেক অবশ্যি জন্মদিনের কেক না। জন্মদিনের কেক বাবা সন্ধ্যাবেলা নিয়ে আসবেন। আপনি নিশ্চয়ই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবেন?'

'না, আমি এখন উঠব।'

রফিক উঠে দাঁড়াল।

'এখনই উঠবেন কি! চা তো শেষ করেন নি।'

'অনেক দূর যেতে হবে।'

'কত দূর?'

'আমরা থাকি কল্যাণপুর। শহরের বাইরে।'

শারমিন মুখ টিপে বলল, 'ফার ফ্রম দি মেডিং ক্রাউড?'

'না, সে–রকম কিছু না। ঐদিকে বাড়িভাড়া কম। আচ্ছা, যাই তাহলে?'

'এক মিনিট দাঁড়ান। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, আপনাকে পৌছে দেবে।'

'পৌছে দিতে হবে না।'

'দাঁড়ান তো। এ-রকম করছেন কেন?'

রফিককে পৌঁছে দেবার জন্যে চমৎকার একটি লাল রঙের গাড়ি বের হল। রফিক বিব্রত বোধ করতে লাগল।

শারমিন হাসিমুখে বলল, 'আবার যদি কখনো আপনার বন্ধুর বাড়িতে আসেন, তাহলে এদিকে আসতে পারেন। আমি খুশিই হব। কেউ কখনো আসে না।'

'আসে না কেন?'

'খুব যাদের টাকাপয়সা আছে, তাদের কেউ পছন্দ করে না। আমার বন্ধুবান্ধবরা এক বার এসে দ্বিতীয় বার আসতে চায় না। আজ আমার জন্মদিন, অথচ কাউকে আমি আসতে বলি নি। আপনি হঠাৎ করে এলেন।'

রফিক ইতস্তত করে বলল, 'আপনার জন্যে একটা বই এনেছিলাম।' শারমিন অবাক হয়ে বলল,'আমার জন্যে! কেন?' রফিক জবাব দিতে পারল না। পলিথিনের ব্যাগে মোড়া বইটি এগিয়ে দিল।

একটা কবিতার বই—এই বসন্তে। সবচে অবাক কাণ্ড হচ্ছে, বইটিতে লেখা—শারমিনের জন্মদিনে। তার মানে, জন্মদিনের কথাটা রফিক জানত। রফিক বলল, 'যাই শারমিন।'

শারমিন কিছু বলল না। সে বড়োই অবাক হয়েছে এবং তার কেমন যেন লজ্জা লজ্জাও করছে। কোথায় যেন সূক্ষ্মভাবে মন খারাপ হবার মতো একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

এই ছেলেটিকে সে পছন্দ করে। দারুণ হুজুগে ছেলে। সারাক্ষণই একটা-না-একটা হৈচৈ নিয়ে আছে। গত মাসে সে হঠাৎ ঘোষণা করল—"এটা হচ্ছে সাম্যের যুগ। কবি নজরুলের ভাষায় পুরুষ-রমণীতে কোনো ভেদাভেদ নেই। কিন্তু এই আমাদের ক্লাসেই ব্যাপারটা উল্টো। এ ক্লাসের সব কয়টা মেয়ে প্রথম দিকের দু'সারি চেয়ারে এসে বসবে। এই দু'সারি ওদের জন্য রিজার্ভড। এখন থেকে এটা বাতিল। মেয়েদের জন্যে এখন আর আলাদা জায়গা থাকবে না। যে আগে আসবে, সে আগে বসবে।"

ক্লাশের সব ছেলেরা হৈহৈ করে তাকে খুব সাপোর্ট দিল। কাজের সময় সবাই পিছিয়ে গেল। শুধু রফিককে দেখা গেল মেয়েদের মাঝখানে বইখাতা নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, তুমি এদের মধ্যে কেন?' ক্লাসে দারুণ হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল। স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যাও যাও, নিজের জায়গায় গিয়ে বস। সবার চেষ্টা কীভাবে মেয়েদের বিরক্ত করা যায়। এটা ভালো না। মেয়েদের দিকে মন দেবার সময় অনেক পাবে, এখন পড়াশোনার দিকে মন দাও।' আবার হাসির ঝড় উঠল।

আবার এক দিন সে ডায়াসে উঠে গম্ভীর গলায় এক বক্তৃতা দিয়ে বসল, 'আমরা ছেলেদের তুই তুই করে বলি অথচ মেয়েদের বলি আপনি করে। আজ এই বারই সেপ্টেম্বরের সকালবেলা আমি ঘোষণা করছি এখন থেকে

আমরা মেয়েদেরও তুই করে বলব।'

ক্লাসে নাসরিন হচ্ছে সবচে গম্ভীর ধরনের মেয়ে। মেয়ে না বলে বলা উচিত মহিলা। দু'টি বাচ্চা আছে তার। রফিক নাসরিনের কাছে গিয়ে বলল, 'নাসরিন, তুই কেমন আছিস?' নাসরিন রেগেমেগে অস্থির। চোখ-মুখ লাল করে বলল, 'আমার সঙ্গে ফাজলামি করবেন না।' মেয়েদের তুই ডাকার ব্যাপারে এখানেই চাপা পড়ে গেল। এক ধমকেই উৎসাহ মিইয়ে গেল রফিকের। কত বিচিত্র ধরনের মানুষই না আছে!

শারমিন অলস ভঙ্গিতে বাড়ির পেছনের দিকে রওনা হল। সেখানে তিনটা বড়ো বরই গাছ আছে। রোদের মধ্যে হাঁটতে ভালো লাগছে। বিশাল এ্যালসেশিয়নটি আসছে তার পেছনে পেছনে। শারমিন তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যালো মার্টি সাহেব?' কুকুরটি লেজ নাড়াল।

'চমৎকার একটি সকাল, কি বল মার্টি?'

মার্টি মাথা নাড়াল। যেন সে শারমিনের কথার অর্থ বুঝতে পারছে।

'চমৎকার একটি সকালে সম্পূর্ণ অকারণে মাঝে মাঝে মানুষদের মন খারাপ হয়। তাদের কিছুই ভালো লাগে না। তোমাদেরও কি সে-রকম হয়?'

মার্টি সাহেব লেজ নাড়াল। যার কোনো অর্থ বোঝা গেল না।

কুল গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকলে কেমন হয়?

শারমিন তাই করল। মার্টি সাহেবের বসে থাকার পরিকল্পনাটা মনে ধরল না। সে রওনা হল গেটের দিকে।

গাছ ঝেঁপে কুল হয়েছে। পাকা কুলের গন্ধে ম.ম করছে চারদিক। খাবার লোক নেই। প্রকাণ্ড এই বাড়িতে তারা দু'টিমাত্র মানুষ—সে এবং বাবা। চার-পাঁচ জন কাজের মানুষ আছে, ড্রাইভার এবং দারোয়ান আছে, কিন্তু ওদের থাকার জায়গা ভিন্ন। গেটের কাছে তাদের জন্যে বড় একটা ঘর তৈরি আছে।

সব কিছুই মানুষের অভ্যেস হয়ে যায়। এই বিরাট বাড়িতে কত দীর্ঘ দিন ধরেই তারা দু' জন থাকছে। খুব ছোটবেলায় সে ঘুমাত। বাবার সঙ্গে। কোনো কোনো রাতে ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে কাঁদত। বাবা বলতেন,' এই তো আমি, তোমার হাত ধরে আছি। কোনো ভয় নেই। স্বপ্ন দেখেছ?

'হুঁ।'

'কী স্বপ্ন?'

'ভূতের স্বপ্ন।'

'দূর বোকা মেয়ে, ভূত আছে নাকি পৃথিবীতে? ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই।'

'বাতি জ্বালিয়ে রাখ, বাবা।'

বাবা বাতি জ্বালিয়ে দিতেন।

'বাথরুম করব।'

তিনি তাকে কোলে করে বাথরুমে নিয়ে যেতেন।

শারমিনের প্রায়ই মনে হয় পৃথিবীর কোনো বাবা বোধহয় তার বাবার মতো নয়। কোনো বাবা তাঁর মেয়েকে এতটা ভালোবাসেন না। সেই কবে শারমিনের মা মারা গেলেন। বাবা তখন যুবক মানুষ, সাতাশ-আঠাশ বছর বয়স। কিন্তু মেয়ের কষ্ট হবে এই ভেবে দ্বিতীয় বার বিয়ে করলেন না।

তাঁর অর্থ বিত্ত কোনো কিছুর অভাব ছিল না। ইচ্ছা করলেই তিনি মেয়ের দেখাশোনার জন্যে কয়েক ডজন কাজের লোক রাখতে পারতেন। তাও তিনি করেন নি। মেয়ের প্রতিটি প্রয়োজন নিজে মেটাতে চেষ্টা করেছেন।

রোজ নিজে তাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন। ক্লাস শেষ হলে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেন। ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত সন্ধ্যার পর পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন। মায়ের ভালোবাসার অভাব তিনি একা মেটাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু অভাব আছে, যা কিছুতেই বোধহয় মেটে না। চাপা পড়ে থাকে শুধু।

'আফামনি! আপনের টেলিফোন।'

'কে করেছে?'

'বড়ো সার।'

শারমিন উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরল।

'কি করছিলে মা-মনি?'

'কিছু না। কুল গাছের নিচে বসে রোদ পোহাচ্ছিলাম।'

'বন্ধুবান্ধব কাউকে আসতে বলেছ?'

'না বাবা। আমরা দু' জনেই জন্মদিন করব। তুমি কখন আসবে?'

'সাতটার মধ্যে এসে পড়ব। খুব বেশি দেরি হলে সাড়ে সাত।'

'না, এত দেরি করলে চলবে না। তোমাকে আসতে হবে ছ'টার মধ্যে। পজিটিভলি?

'আজ রাতে কি আমরা বাইরে খাচ্ছি?'

'না, ঘরেই খাবে। আমি রান্না করব বাবা।'

'চমৎকার! কী রান্না হচ্ছে?'

'তা বলব না। একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'খাওয়া যাবে তো মা?'

'যাবে। যাবে না কেন?'

রহমান সাহেব হাসতে লাগলেন। শারমিন বলল, 'তুমি কিন্তু ছ'টার মধ্যে আসবে।'

'হ্যাঁ, আসব। আর শোন মা, আমেরিকায় একটি কল বুক করে সাব্বিরের সঙ্গে কথা বল।'

শারমিন লজ্জিত স্বরে বলল, 'কেন?'

'জন্মদিন উপলক্ষে কথা বলা।'

'সে তো উনি আমাকে করবেন। আমি কেন করব?'

'তাও তো ঠিক।'

'তুমি আসছ তো বাবা। সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিন্তু পাঁচটার সময় আবার তোমাকে টেলিফোন করব। মনে করিয়ে দেবার জন্যে।'

'ঠিক আছে, মনে করিয়ে দিও।'

শারমিন টেলিফোন রেখে দিল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকায় একটা কল বুক করল। সেখানে এখন বাজে রাত বারটা। সাব্বিরকে পাওয়া যাবার কথা। শারমিন একবার ভাবল নিজের পরিচয় না দিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললে কেমন হয়।

'হ্যালো। কে?'

'গলা শুনে বুঝতে পারছেন না কে?'

'ও, শারমিন, কী ব্যাপার?'

'কোনো ব্যাপার নেই। আপনার গলা এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'ভাঙা ভাঙা। মনে হচ্ছে কোনো কারণে খুব কান্নাকাটি করেছেন।'

'কী যে পাগলের মতো কথা বল!'

শারমিন খিলখিল করে হাসল। হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনাকে লিখেছিলাম কয়েকটা সায়েন্স ফিকশন পাঠাতে, আপনি পাঠিয়েছেন ভূতের উপন্যাস।'

'স্টিফান কিং পাঠিয়েছি। খুব ভালো লেখা।'

'ভূতের গল্প পড়ে শেষে রাতে ভয়ে মরি আর কি! আপনি সায়েন্স ফিকশন পাঠাবেন। এসিমভের নতুন কোনো বই।'

'ঠিক আছে। আর শোন, তোমাকে যে একটা জিনিস পাঠাতে বলেছিলাম, সেটা তো পাঠালে না।'

শারমিন লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

'ঐ সব পাঠানো যাবে না।'

'যাবে না বললে হবে না। পাঠাবে।'

শারমিন কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, 'আজ কিন্তু আমার জন্মদিন।'

'তাই নাকি? মাই গড, আমার মনেই ছিল না।'

'তা থাকবে কেন?' আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি।'

'না, রাখবে না। অনেক কথা আছে।'

শারমিন হাসল।

৪

শাহানার স্যার এসেছেন। শাহানা অনেকক্ষণ ধরেই উশখুশ করছে। ভাবীর এসে কাছেই কোথাও বসবার কথা। কিন্তু ভাবী আসছে না। স্যার ভারি গলায় বললেন, 'এত ছটফট করছ কেন, কি হয়েছে?'

'কিছু হয় নি স্যার।'

'তাহলে মন দিয়ে শোন কি বলছি। এ কিউব প্লাস বি কিউব.........'

'স্যার, আমি একটু আসছি।'

শাহানা উঠে রান্নাঘরে গেল। নীলু ভাত চড়িয়েছে। সাধারণত সন্ধ্যার আগেই ভাত হয়ে যায়, আজ দেরি হচ্ছে। বাসাবো থেকে নীলুর এক খালাশাশুড়ি এসেছিলেন। মাত্র কিছুক্ষণ আগে গেলেন।

'ভাবী।'

'কী ব্যাপার?'

'একটু এসে বস না ভাবী। স্যার এসেছেন।'

'ভাত চড়িয়েছি শাহানা, বাবাকে বল।'

'বাবা রশীদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন। স্যারকে বলে দিই আজ পড়ব না?'

'ঠিক আছে। তোমার যদি পড়তে ইচ্ছা না করে, বলে দাও।'

শাহানা দাঁড়িয়ে রইল।

'কি, আর কিছু বলবে?'

'তুমি এসে বলে দাও না ভাবী।'

'আমি কেন?'

শাহানা ইতস্তত করে বলল, 'বলে দাও আমি আর তাঁর কাছে পড়ব না। আজও সে-রকম হয়েছে ভাবী।'

'ভুলে হয়। সামান্য জিনিসটাকে এত বড়ো করে দেখছ কেন?'

শাহানা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ভুলে না ভাবী।'

'ঠিক আছে। চল, বলব ওনাকে।'

'আমি যাব না। তুমি একা গিয়ে বলবে।'

'আর পড়াতে হবে না' শুনে মাস্টার সাহেব কিছু বললেন না। নীলুর ধারণা ছিল জিজ্ঞেস করবেন—কেন? কিন্তু তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

'আপনার পাওনা টাকাটা আপনি সামনের মাসের তিন তারিখে এসে নিয়েযাবেন।'

মাস্টার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

'বসুন, চা খেয়ে যান।'

মাস্টার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বসলেন। শাহানা নিজেই চা এনে দিল। চায়ের সঙ্গে দেবার মতো কিছু ছিল না। শুধু চা দিতে শাহানার লজ্জা লাগছিল।

মাষ্টার সাহেব খুব আগ্রহ করে চা খেলেন। মৃদু স্বরে বললেন,'যাই শাহানা, মন দিয়ে পড়বে।'

শাহানার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন এক জন ভাল টিচার, কিন্তু কী বাজে একটা স্বভাব! নিশ্চয়ই আরো অনেক জায়গা থেকে তাঁকে এভাবে বিদায় নিতে হয়েছে।

শাহানার আজ আর বই নিয়ে বসতে ইচ্ছা করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে ভাবীর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু এখন সেখানে মা আছেন।

রান্নাঘরে গেলেই মাষ্টার চলে গেল কেন সেই প্রশ্ন উঠবে। শাহানার ঠিক এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছা করছে না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল, মা চড়া গলায় চেঁচাচ্ছেন–

'মনটা কত ছোট দেখ বৌমা। বাবুর মুখ দেখে দশটা টাকা দিয়ে গেল, তাও ময়লা একটা নোট। হাতে নিলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়।'

'বাদ দেন মা।'

'কেন, বাদ দেব কেন? তার নাতনীর মুখ দেখে দেড় শ' টাকা খরচ করে আঙটি দিয়েছি। তার ছোট মেয়ের বিয়ের সময় তিন শ' টাকা খরচ করে জামদানি দিয়েছি। আমার টাকা কি গাছে ফলে? বল বৌমা, গাছে ফলে?'

'সবাই টাকা খরচ করতে পারে না, মা।'

'বাজে কথা বলবে না। খরচ ঠিকই করতে পারে। নিজের বেলায় পারে। পঁচিশ বছর ধরে দেখছি তো। নাড়িনক্ষত্র জানি। যাও বৌমা, ঐ দশ টাকাটা তুমি রাস্তায় ফেলে দিয়ে আস, আমার আলমারির উপর আছে।'

'বাদ দেন মা।'

'তোমাকে ফেলতে বলেছি ফেলে দিয়ে আস। ঐ দশ টাকা নিয়ে আমি স্বর্গে যাব না।'

নীলু বেরিয়ে আসতেই শাহানা ফিসফিস করে বলল,'আমাকে দিয়ে দিও ভাবী।'

'এস, নিয়ে যাও। আর একটু বাবুর কাছে গিয়ে বস, এক্ষুণি দুধ খাবার জন্যে কাঁদবে।'

বাবুর পাশে শফিক বসে ছিল। গভীর মনযোগে সে ফাইল দেখছে। আজ সারাটা দিন তার নষ্ট হয়েছে। হিসাবে কোথাও জট পাকিয়ে গেছে। হিসাবপত্র দেখার দায়িত্ব মণীন্দ্রনাথের। সে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে।

'ভাইয়া, আসব ভেতরে?'

'আয়।'

'কী করছ?'

'একটা ফাইল দেখছি।'

'বসি একটু?'

শফিক অবাক হয়ে বলল, 'বোস্। জিজ্ঞেস করছিস কেন?'

'তোমাকে কেমন জানি ভয়-ভয় লাগে ভাইয়া। সারাক্ষণ এমন গম্ভীর হয়ে থাক।'

শফিক হাসল।

'অফিসে সবাই নিশ্চয়ই তোমাকে ভয় পায়। পায় না?'

'পায় বোধহয়। জানি না।'

'তুমি মাষ্টার হলে ছাত্রদের অবস্থা কাহিল হয়ে যেত ভাইয়া।'

শফিক ফাইলে মন দিল। হিসাবের জটটা না-খুললে কিছুতেই আর মন বসবে না। মণীন্দ্র মহা ঝামেলা লাগিয়ে রেখে গেছে।

'ভাইয়া, একটা কথা শোন।'

'পরে শুনব। কাজটা শেষ করে নিই।'

কথা না-বলে চুপচাপ বসে থাকা মুশকিল। শাহানা উশখুশ করতে লাগল।

'কাজ শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে ভাইয়া?'

শফিক জবাব দিল না। শাহানা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

রান্না শেষ হতে রাত ন'টা বাজল। নীলু এসে বলল, 'শাহানা, চট করে যাও তো, আনিসকে বলে আস খাবার দেওয়া হয়েছে।'

শাহানা অবাক হয়ে তাকাল।

'আমি আজ রাতে ওকে খেতে বলেছি।'

'কেন ভাবী?'

'এমনি বলেছি। খেতে বলার জন্যে আবার বিরাট কোনো কারণ লাগবে নাকি? যাও, বলে আস।'

'সিঁড়ি দিয়ে একা একা উঠতে ভয় লাগবে ভাবী। তুমি দরজা খুলে একটু দাঁড়িয়ে থাক।'

আনিস চিলেকোঠার ঘরে থাকে। খাওয়াদাওয়া করে বাড়িওয়ালা রশিদ সাহেবের বাসায়। রশিদ সাহেবের সঙ্গে তার ক্ষীণ একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক মোটেই জোরালো নয়। এক সময় আশ্রয় দিয়েছিলেন। চেষ্টাচরিত্র করে সিটি কলেজে ভর্তিও করিয়েছেন। গত বৎসর আই. এ. ফেল করেছে এবং পড়াশোনা করবে না বলে জানিয়েছে। এ-রকম এক জনকে ঘরে রেখে পোষার কোনো মানে হয় না। রশিদ সাহেব এখন প্রাণপণ চেষ্টা করছেন আনিসকে ঝেড়ে ফেলতে। পারছেন না। আনিসের এ জায়গা ছেড়ে নতুন কোথাও যাবার জায়গা নেই। জোর করে তাকে বের করে দেবার মতো নিষ্ঠুরতা তিনি দেখাতে পারছেন না।

তাছাড়া ছেলে হিসেবে আনিসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তাঁর নেই। অত্যন্ত ভদ্র ছেলে। চেহারা ভালো। আচার-ব্যবহার ভালো। চায়ের দোকানে

বসে বিড়ি ফোঁকে না। মেয়েদের দেখে শিস দেয় না। রশিদ সাহেবের মনে একটা গোপন পরিকল্পনা ছিল, আনিসকে পড়াশোনা করিয়ে নিজের কাছেই রেখে দেবেন। বীণার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবেন। মেয়ে-জামাই তাঁর কাছেই থাকবে।

রশিদ সাহেবের স্ত্রী সেই পরিকল্পনা একেবারেই পছন্দ করেন নি। স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় রেগে অস্থির হয়েছেন। তাঁর মেয়ে কালো নয়, কানা-খোঁড়া নয়, তাকে হাভাতে ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে? দশটা-পাঁচটা মেয়েও তার না। একটিমাত্র মেয়ে। তার বিয়ে হবে চাকর শ্রেণীর একটি ছেলের সাথে? দেশে কি ডাক্তার ইনজিনিয়ারের অভাব হয়েছে, না তাদের সহায়-সম্পদ নেই? ঢাকা শহরে তিনটি বাড়ি, গ্রামের সম্পত্তি সবই তো তাঁর মেয়েই পাবে।

আনিসের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুরু থেকেই খারাপ ছিল। ইদানীং তিনি তাকে সহ্য করতে পারছেন না। কারণটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি লক্ষ করেছেন, আনিস খেতে বসলে বীণা এটা-সেটা তার পাতে তুলে দিতে চেষ্টা করে।

তিনি এক দিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'ওর খাওয়ার সময় তোর থাকার দরকার কী? তুই কেন থালাবাটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করিস?'

বীণা অবাক হয়ে বলেছে, 'একটা লোক একা একা বসে খাবে?'

'এক একা কোথায়? আকবরের মা আছে, রহিম আছে। তোর যাবার দরকারটা কী?'

'অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে। এতে লাই দেওয়া হয়। লাই দিলেই এরা মাথায় উঠবে। খবরদার, তুই যাবি না।'

বীণা এর পরেও গিয়েছে। তিনি মনের মধ্যে একটা ভয় অনুভব করেছেন। সমবয়েসী দু'টি ছেলেমেয়ের ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া ঠিক না। বয়স খুব খারাপ জিনিস। একটা বয়সে সবাইকে ভালো লাগে।

আনিস ঘর অন্ধকার করে বসে ছিল। শাহানা বাইরে থেকে ভয়-পাওয়া গলায় ডাকল, 'আনিস ভাই?'

'এস শাহানা।'

'ঘর অন্ধকার কেন?'

'বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে।'

'আপনি আসুন, ভাত দেওয়া হয়েছে।'

'ভেতরে এস শাহানা। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'না, আমি ভেতরে আসব না।'

'কেন?'

শাহানা জবাব দিল না। আনিস বের হতেই শাহানা বলল, 'দরজা

লাগাবেন না?'

'অন্ধকারে তালাচাবি খুঁজে পাব না। থাকুক। চোর আমার ঘরে আসবে না। নেবার মতো কিছু নেই।'

সিঁড়ি অন্ধকার। এর মধ্যে কে আবার পানি ফেলে রেখেছে। শাহানা খুব সাবধানে পা ফেলছে। এক বার পিছলে পড়ার মতো হল। আনিস বলল, 'আমার হাত ধর শাহানা। পিছলে পড়ে হাত ভাঙবে।' শাহানা কঠিন স্বরে বলল, 'হাত ধরতে হবে না। আমি ভালোই দেখতে পাচ্ছি।' আনিস হাসল। অন্ধকারে তার হাসি দেখা গেল না।

আনিসকে খেতে বলা হয়েছে শুনে মনোয়ারা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। হুট করে কাউকে খেতে বলার অর্থটা কী? কোনো উপলক্ষ-টুপলক্ষ থাকলেও একটা কথা। হঠাৎ তার মর্জি হল, ওমনি খেতে বলা হল! দুপুর-রাতে শাহানাকে পাঠান হল ডেকে আনতে?

নীলুর এটা আজ নতুন না। আগেও বেশ কয়েক বার আনিসকে খেতে বলেছে। প্রথম বার তিনি নীলুকে তেমন কিছু বলেন নি। শুধু শুকনো গলায় বলেছেন, 'কাউকে দাওয়াত-টাওয়াত করতে হলে আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। বুঝলে বৌমা?'

নীলু বলেছে, 'দাওয়াত না তো। ঘরে যা রান্না হয়েছে তাই খাবে।'

'সেটাও আমাকে জানিও।'

নীলু কোনো উত্তর দেয় নি, কিন্তু আবার খেতে বলেছে এবং তাঁকে কিছুই বলে নি। শাশুড়ির কথার অবাধ্য হবার মেয়ে নীলু না, কিন্তু এই একটি ব্যাপারে সে মনে হয় ইচ্ছা করেই অবাধ্য হচ্ছে। মনোয়ারার মনে হল, এটা নীলুর একটা ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা। জানিয়ে দেওয়া যে, সেও এই সংসারের কর্ত্রী, তারও অধিকার আছে।

মনোয়ারা গম্ভীর মুখে শফিকের ঘরে ঢুকলেন। শফিক চোখ তুলে তাকাল, কিছু বলল না।

'কী করছিস?'

'কিছু করছি না।'

'ভাত খেতে দেওয়া হয়েছে, খেতে যা।'

শফিক উঠে দাঁড়াল। মনোয়ারা শীতল গলায় বললেন, 'বৌমা দেখলাম আনিস ছোঁড়াটাকে খেতে বলেছে। তুই বৌমাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর তো, কেন বলেছে?'

'এমনি বলেছে। জিজ্ঞেস করবার দরকার কী?'

মনোয়ারা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। শফিক বলল, 'ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার কিছু না।'

'কিছু না তো তুমি এমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন?'

মনোয়ারা তার জবাব দিলেন না। চলে গেলেন রান্নাঘরে। নীলু ব্যস্ত হয়ে

বাটিতে তরকারি ঢালছে। আয়োজন খুবই সামান্য। ছোট মাছের তরকারি, একটা সব্জি ও ডাল। তরকারি মনে হয় কম পড়ে যাবে। হোসেন সাহেব দরাজ গলায় বললেন, 'ছোট মাছের তরকারিটা বড়ো ভালো হয়েছে। আরো নিয়ে আস। নতুন টমেটো দিয়ে রাঁধলে যে-কোনো জিনিস ভালো হয়।' নীলু পড়েছে মুশকিলে। তরকারি কিছুই নেই। মনোয়ারাকে ঢুকতে দেখে বলল, 'আপনিও ওদের সঙ্গে বসে পড়ুন না মা।'

'না, আমি আজ আর খাব না।'

'কেন?'

'শরীর ভালো লাগছে না, এই জন্যে খাব না। তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে নাকি?'

নীলু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কোনো করণে তার শাশুড়ি রেগে আছেন, সে কারণটা ধরতে পারছে না।

'তরকারি তো সবটাই ঢেলে ফেললে। রফিক খাবে কী?'

'ওকে একটা ডিম ভেজে দেব মা। ছোট মাছ সে এমনিতেই পছন্দ করে না।'

'করুক আর না-করুক, একটা জিনিস রান্না হয়েছে, সেটা তাকে দেবে না? সে তো আর কাজের লোক না, এই বাড়িরই ছেলে। না, তুমি সেটা মনে কর না?'

নীলু বড়ো লজ্জায় পড়ে গেল। মা'র গলা যেভাবে উচুঁতে উঠছে, তাতে মনে হয় খাবার ঘর থেকে সবই শোনা যাচ্ছে।

'হাগারের পাগারের লোকজন ধরে ধরে আনলে খাবার তো কম পড়বেই। এটা তো আর হোটেল না।'

নীলু কী বলবে ভেবে পেল না। এখন কিছু বলা মানেই তাঁকে আরো রাগিয়ে দেওয়া।

'শোন বৌমা, তোমাকে আরেকটা কথা বলি, শাহানা এখন বড়ো হয়েছে। কাউকে ডেকে আনার জন্যে রাত-দুপুরে তাকে ছাদে পাঠানো যায় না। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

নীলুর চোখে পানি এসে গেল। মনোয়ারা তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। চোখের পানি তাঁকে বিন্দুমাত্রও নরম করতে পারল না। হোসেন সাহেব দরজায় এসে উঁকি দিলেন।

'কই বৌমা, তরকারির কথা বলছিলাম।'

'আনছি, বাবা।'

মনোয়ারা না খেয়েই ঘুমুতে গেলেন। খাওয়া নিয়ে তাঁকে পিড়াপিড়ির সাহস নীলুর হল না। সে নিজেও না খেয়ে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে বসে রইল রফিকের জন্যে। ইদানীং রফিক ফিরতে রোজ এগারটা-বারটা বাজাচ্ছে।

নীলুকে বলা আছে খাবার ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। কিন্তু তাতে লাভ নেই—উঠে এসে দরজা তো খুলতেই হবে।

এখন সাড়ে বারটা বাজে। আজ বোধহয় আর আসবে না। নীলু ঘুমুতে গেল। বাবু কেমন দু' হাত উপরে তুলে ঘুমাচ্ছে। কম্বল সরে গেছে গা থেকে। টুকটুকে ফর্সা পা বের হয়ে আছে। ফ্লানেলের পায়জামা বানাতে হবে, যাতে কম্বল সরে গেলেও ঠাণ্ডা না লাগে।

'নীলু, তোমার একটা চিঠি আছে, দিতে মনে ছিল না। দেখ টেবিলের উপর।'

নীলু অবাক হয়ে বলল, 'তুমি জেগে ছিলে নাকি?'

'হুঁ।'

'বাবুর গা থেকে কম্বল সরে গেছে, তুলে দাও নি কেন?'

শফিক কিছু বলল না। নীলু চিঠি নিয়ে আবার বসার ঘরে চলে এল। চিঠি মা'র কাছ থেকে এসেছে। কাজেই এই চিঠি পড়তে পড়তে অনেক বার চোখ ভিজে উঠবে। আড়ালে পড়াই ভালো। মা তার সব চিঠিই শফিকের ঠিকানায় পাঠান। হয়তো ভাবেন, এভাবে পাঠালে অন্য কেউ পড়বে না।

আমার মা-মনি,

মাগো, তোমার সোনামনিকে এখনও দেখিতে আসিতে পারিলাম না। যত বার মনে হয় তত বার কষ্ট পাই। কি করিব মা, হাত-পা বাঁধা। বজলুর হাতে টাকা নাই। আসা-যাওয়ার খরচ আছে। এই দিকে বৌমাও অসুস্থ। ঘরে কাজের লোক নাই। সব কিছু আমাকেই দেখাশুনা করিতে হয়। লক্ষী মা আমার, রাগ করিও না। ফেব্রুয়ারি মাসে যেভাবেই হউক আসিব। আর মা শোন, তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি যে নাম রাখিতে বলেন সেই নামই রাখিও। তাঁহাদের অখুশি করিয়া কোনো কাজ করিও না। এই দিককার খবর ভালোই। বিলু বেড়াইতে আসিয়াছিল। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়া বৌমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হইয়াছে। দোষ বৌমার। মেয়েটা কয়েক দিন ভাইয়ের বাসায় থাকিতে চাহিয়াছিল, রাগারাগির জন্য পারে নাই। তুমি তাহাকে চিঠিপত্র দাও না কেন মা? মেয়েটা বড়ো দুঃখী। তাহাকে নিয়মিত চিঠি দিও।

বড়ো জামাইয়ের স্বভাব-চরিত্র আগের মতোই আছে। বিলুর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই বললেই চলে। বুঝিতে পারি না, আল্লাহ্‌ পাক কেন আমার জন্যই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট জমা করিয়া রাখিয়াছেন।

যাই হোক মা, তুমি এইসব নিয়া চিন্তা করিও না। জামাইয়ের যত্ন নিও। তোমার সোনার সংসারের কথা যখন ভাবি, তখন মনে বড়ো শান্তি পাই। তুমি বড়ো ভাগ্যবতী মা। আল্লাহ্‌র কাছে সবুর স্বীকার করিও। না হইলে আল্লাহ পাক নারাজ হইবেন।

সুদীর্ঘ চিঠি। নীলু চিঠি শেষ করে দীর্ঘ সময় একা একা বসে রইল। মাকে কিছু টাকা পাঠাতে পারলে হত। এই মাসে সম্ভব হবে না। শফিকের হাতে কোনো টাকাপয়সা নেই।

সংসারের খরচ বেড়েছে, আয় বাড়ে নি। ক্রমে ক্রমেই শফিকের উপর চাপ বাড়ছে। এই চাপ আরো বাড়বে। সামনের দিনগুলি কেমন হবে কে জানে। গত মাসে সে নীলুকে হাতখরচের টাকা দেয় নি। লজ্জিত মুখে বলেছে, এই মাসে দিতে পারলাম না নীলু। এদিকে রফিক বলে রেখেছে—যেভাবেই হোক দু'শ' টাকা দিতে হবে ভাবী। নয়তো একেবারে বেইজ্জত হব।

প্রতি বৎসর শীতের সময় দেশের বাড়ি থেকে কিছু চাল আসে, এবার তাও আসে নি। কেন আসে নি কে জানে?

বাবু উঠে পড়েছে। প্রচণ্ড জোর তার গলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সবাইকে জাগিয়ে তুলবে। নীলু নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল। মনোয়ারার ঘুম ভেঙে গেছে—তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচাচ্ছেন, 'কী হয়েছে? ও বৌমা, কী হয়েছে?'

৫

রফিকের মনে ক্ষীণ আশা ছিল, শারমিনের আচার-আচরণে একটি পরিবর্তন লক্ষ করবে। বড়ো ধরনের কিছু না হলেও চোখে পড়বার মতো। পরিচিত ভঙ্গিতে একটু হাসবে কিংবা করিডোরে দেখা হয়ে গেলে বলবে--কী, কেমন আছেন?

অথচ শারমিন আগে যেমন ছিল এখনো তেমন। গম্ভীর হয়ে ক্লাসে আসে। লেকচার শেষ হওয়ামাত্রই বিদায়। রফিকের আশা ছিল, ডিপার্টমেন্টাল পিকনিকে সে যাবে, তখন এক ফাঁকে কিছু কথাবার্তা বলা যাবে। কী ধরনের কথাবার্তা বলবে, তাও সে ভেবে রেখেছে। যেমন,

'জন্মদিন কেমন হল?'

'ভালোই। কবিতার বইটির জন্যে ধন্যবাদ। আমি ভাবতেই পারি নি আপনি আমার জন্মদিন কবে সেটা জনেন।'

'অনেক ঝামেলা করে বের করেছি। গরজটা যখন আমার।'

'আপনার গরজ, তার মানে?'

'মানে কিছু নেই।'

ভেবে রাখা কথা কিছুই বলা হয় নি। শারমিন যায় নি পিকনিকে, অথচ এক শ' টাকা চাঁদা দিয়েছে। চাঁদা দিয়ে না যাওয়া হচ্ছে একটা বড়লোকী দেখানো। রাগে গা জ্বলে গেছে রফিকের। পিকনিকের সমস্ত আয়োজনটা তার করা। টাকাটা ফেরত দিয়ে অপমান করে দু'-একটা কড়া কড়া কথা বলা

যায়। খুব ঠাণ্ডা গলায় বলা যেতে পারে, ''আপনার টাকা আছে জানি। কিন্তু টাকার খেলাটা এভাবে না দেখালেও পারতেন। টাকার খেলা আর যাকে দেখান, দেখান--আমাদের দেখাবেননা।''

রফিক ভেবে পেল না, কথাটা ইউনিভার্সিটিতে বললে ভালো হবে, না বাড়িতে গিয়ে বলবে। অনেক ভেবেচিন্তে সে বাড়িতে যাওয়াই ঠিক করল। অকারণে তো যাচ্ছে না, একটা কাজে যাচ্ছে। ইতস্তত বোধ করার কিছুই নেই।

কিন্তু রফিক ইতস্তত করতে লাগল। গেটের কাছে এসেও মনে হল কাজটা ঠিক হচ্ছে না, ফিরে যাওয়াই ভালো। আবার ফিরে যেতেও ইচ্ছা করছে না। এত দূর এসে ফিরে যাবার মানে হয় না।

'রহমান সাহেবের মেয়ে বাসায় আছে?'

'জ্বি, আছেন। যান, কুকুর কিছু করবে না। আপনি সোজা চলে যান। কলিং বেল টিপ দেন।'

দারোয়ান তাকে চিনতে পারছে না। তার চেহারা কি এতই সাধারণ যে মাত্র দু' সপ্তাহ আগে দেখাও গুবলেট করে ফেলেছে। দারোয়ান একা নয়, কুকুরটা পর্যন্ত তাকে চিনতে পারছে না। অথচ নিম্নশ্রেণীর পশুদের নাকি স্মৃতিশক্তি খুব ভালো। এক বার কোনো একটি জিনিসের ঘ্রাণ নিলে একটা কুকুর নাকি সারা জীবন সেটা মনে রাখে। এই কুকুরটার সেদিন সর্দি ছিল বোধ হয়। সেদিন যেমন শুঁকতে শুঁকতে আসছিল, আজও তাই আসছে।

গতবার বেল টিপতেই দরজা খুলে দিয়েছিল শারমিন। আজও তাই হবে নাকি?

না, সে-রকম হল না। বয়স্কা এক জন মহিলা দরজা খুলল। কাজের মেয়ে, না আত্মীয়স্বজনদের কেউ? আত্মীয়স্বজনদের কেউ হলে সালাম দেয়া দরকার। রফিক নরম স্বরে বলল, 'শারমিন আছে?'

'জ্বি, আছে।'

'একটু বলেন, রফিক এসেছে।'

'বসেন। খবর দেই।'

রফিক এন্ট্রিরুমে বসে রইল। তার মনে হতে লাগল---যেসব কড়া কড়া কথা সে ভেবে রেখেছে সেসব বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। কারো বাড়িতে এসে অভদ্র হওয়া যায় না। তাছাড়া পিকনিকে না-যাবার তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। অসুখবিসুখ হতে পারে। জরুরী কাজকর্ম থাকতে পারে, না-জেনে হাউ হাউ করা ঠিক না। রফিক বেশ অনেকক্ষণ বসে রইল।

যে-মহিলাটি বসতে বলেছে সে এল না, অল্পবয়েসী একটি মেয়ে এসে বলল, 'আপামনি বাসায় নাই।'

'তার মানে!'

রফিকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না।

মেয়েটি দ্বিতীয় বার বলল, 'আপামনি বাসায় নাই।' রফিক উঠে দাঁড়াল। কিছু একটা বলা উচিত। কিন্তু কিছুই মনে আসছে না।

'তোমার আপাকে বলবে, মিথ্যা কথা বলবার কোনো দরকার ছিল না। দেখা করবে না বললেই চলে যেতাম।'

রফিকের ইচ্ছা করছে ছুটে পালিয়ে যেতে, কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাকে হেঁটে হেঁটে গেট পর্যন্ত যেতে হবে। এই বিশাল বাড়ির কম্পাউণ্ড থেকে বেরুতেও সময় লাগবে।

'রফিক, তোমার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?'

'না।'

'সারাদিন শুয়ে আছ। ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার কিছু না।'

'আমার তো মনে হয় তোমার জ্বরটর কিছু হয়েছে। চোখ লাল।'

'তোমার মনে হলেই তো হবে না ভাবী। আমারো মনে হতে হবে। আমার মনে হচ্ছে শরীর ঠিকই আছে।'

'তুমি উঠে আস, তোমাকে ডাকছেন।'

'কে ডাকছেন?'

'কবির মামা। ঘন্টাখানিক আগে এসেছেন। কী, আসবে না?'

'কবির মামা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। এসেছেন যখন, ইনশাআল্লাহ মাসখানিক থাকবেন। ধীরেসুস্থে আসছি।'

রফিক তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

কবির মামার বয়স প্রায় ষাট। ছোটখাট মানুষ। থুতনিতে অল্প কিছু দাড়ি আছে। মাথার চুল, দাড়ি—সমস্তটাই ধবধবে সাদা। স্বাস্থ্য বয়সের তুলনায় অনেক ভালো, এবং যতটা-না ভালো, তিনি নিজে মনে করেন তার চেয়েও ভালো--যার জন্যে মাঝে মাঝে গুরুতর ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

আজও এ-রকম একটা ঝামেলা বাধিয়েছেন। ছ'টা ঝুনা নারিকেল নিয়ে কমলাপুর রেল ষ্টেশন থেকে কল্যাণপুর পায়ে হেঁটে চলে এসেছেন। এ-রকম একটা কাণ্ড করার পেছনে একমাত্র যুক্তি হচ্ছে, কোনো বাস কণ্ডাকটার নারিকেল হাতে বাসে উঠতে দিতে রাজি হয় নি। এক জন রাজি হয়েছিল, কিন্তু সে নারিকেলের জন্যে আলাদা ভাড়া দাবি করায় কবির মামা রেগে আগুন হয়ে যান এবং হাঁটতে শুরু করেন। কল্যাণপুর এসে পৌছতে তার পৌনে চার ঘন্টা সময় লাগে।

বাসায় ঢুকেই তিনি সোফায় লম্বা হয়ে পড়েছেন। উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। কোমরের একটা পুরানো ব্যথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

মনোয়ারা বললেন, 'পিঠে তেল মালিশ করে দেবে?'

'দিক। বৌমাকে বল তেল গরম করতে। হোসেন কোথায়?'

'পেনশনের টাকা তুলতে গেছে। এসে পড়বে।'

'আসুক, তার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে।'

'চা করে দিক?'

'চা না। লেবু দিয়ে এক গ্লাস সরবত করে আনতে বল।'

নীলু পিঠে তেল মালিশ করতে বসল। কবির মামা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'মানুষের সেবা আমি নিই না, লজ্জা লাগে। কিন্তু মা, তোমার সেবা নিতে লজ্জা লাগে না। মনে হয় এই সেবাটাতে আমার অধিকার আছে।'

'অধিকার তো আছেই।'

'না গো মা,অধিকার নেই। দুই মাস আগে তোমার একটা মেয়ে হল। আমাকে কেউ একটা খবর দেয় নি। এখানে এসে জানলাম মেয়ে হবার খবর।'

নীলু খুব লজ্জা পেল। মনোয়ারা সরে গেলেন। কবির মামা গম্ভীর গলায় বললেন, 'বুঝলে বৌমা, সত্যিকার আত্মীয়তা সম্পর্ক নেই তো, সে জন্যেই এই অবস্থা। যখন উপস্থিত হই, তখন আমার কথা মনে হয়। শফিকের বিয়ের কার্ড পাই বিয়ের এক সপ্তাহ পর।

নীলু চুপ করে রইল।

'বিয়ের পর হঠাৎ মনে পড়েছে—আরে, কবির মামাকে তো বলা হয় নি--তখন একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছে।'

নীলু দৃঢ়স্বরে বলল,' আর এ-রকম ভুল হবে না মামা।'

'না হওয়াই উচিত। ভালোবাসার জবাব ভালোবাসা দিয়েই দিতে হয়। রফিক আসছে না কেন? এই রফিক, রফিক।'

রফিক উঁকি দিল।

'আছ কেমন মামা?'

'ভালোই আছি।'

'কোমর ভেঙে ফেলেছ নাকি?'

কবির মামা জবাব দিলেন না।

'দেখি , পা'টা দাও, সালাম করি। নয়তো পরে ক্যাটক্যাট করবে।'

'তোর অসুখবিসুখ নাকি?'

'না।'

'এ-রকম গম্ভীর হয়ে আছিস কেন? মনে হয় বিরক্ত।'

'বিরক্ত না হয়ে উপায় আছে? তুমি এসেছ, ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে তোমাকে। সোফায় আমি ঘুমাতে পারি না।'

'আয়েশী হয়ে গেছিস মনে হয়? পরীক্ষা কবে?'

'এপ্রিল মাসে।'

'প্রিপারেশন কেমন?'

'সেকেণ্ড ক্লাস টাইপ। আমি তো মামা লাইফ লং সেকেণ্ড ক্লাস ছাত্র।

পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাইলে কর।'

'পড়াশোনার আলাপ করতে ভালো লাগে না?'

'না।'

'যা আমার সামনে থেকে।'

রফিক খুশি মনেই বের হয়ে গেল। কবির মামা বহু কষ্টে উঠে বসলেন। ব্যথা অনেকখানি কমেছে। এখন আর একে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। এসব জিনিস প্রশ্রয় দিলেই বাড়ে।

'এবার তোমার কন্যাকে নিয়ে এসো গো মা।'

নীলু তার মেয়েকে নিয়ে এল।

'চশমাটা দাও। চশমা ছাড়া ভালো দেখি না।'

বাবুকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বারবার বলতে লাগলেন--'তোমার এই মেয়ে শাহানার মতো রূপসী হবে। বড়ো সুন্দর। গোলাপ ফুলের মতো লাগছে।'

'আপনি মামা দোয়া করবেন।'

'এই যুগে মা, দোয়াতে কাজ হয় না। কোনো যুগেই হয় না। কাজ হয় কর্মে। কর্ম ঠিক রাখবে, তাহলেই হবে। নাম কী রেখেছ মেয়ের?'

'এখনো রাখা হয় নি। বাবা রেখেছেন টুনি।'

'টুনি ফুনি আবার কী রকম নাম?'

'আপনি একটা নাম রাখেন মামা।'

'আমার নাম কি আর পছন্দ হবে?'

'পছন্দ হবে, আপনি রাখেন।'

কবির মামা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'তোজল্লি। তোজল্লি রাখ। এর মানে হচ্ছে আল্লাহ্‌র জ্যোতি।'

নীলুর মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক তোজল্লি ধরনের নাম সে আশা করে নি।

'নাম পছন্দ হয়েছে তো মা?'

'জ্বি, হয়েছে।'

'তাহলে তোজল্লিই রাখ।'

তিনি ফতুয়ার পকেট থেকে একটা এক শ' টাকার নোট বের করে মেয়ের মুখ দেখলেন। এই এক শ' টাকাই ছিল তাঁর সঙ্গে।

রাতে কবির মামার জ্বর এসে গেল। বেশ ভালো জ্বর। হোসেন সাহেব বললেন, 'এক ডোজ আর্নিকা খাবে? ব্যথা সেরে যাবে।'

তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কয়েকটা জিনিসে আমার বিশ্বাস নেই, হোমিওপ্যাথি তার মধ্যে একটা।'

'তাহলে ডাক্তার ডেকে আনুক।'

'এই দুপুর রাতে ডাক্তার ডাকতে হবে না। তোমরা ঘুমাতে যাও।'

রাতে তিনি কিছু খেলেন না। নীলু এক গ্লাস দুধ নিয়ে গিয়েছিল। তিনি

ছুঁয়েও দেখলেন না।

'দুধ শিশুদের খাবার, মা। দেশে দুধের অভাব। আমরা বুড়োরাই যদি সব দুধ খেয়ে ফেলি, ওরা খাবে কী?'

রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি এক গ্লাস দুধ খেলে ওদের কম পড়বে না।'

'এক গ্লাস এক গ্লাস করেই লক্ষ গ্লাস হয়। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু বিচার করতে হয়। একটা রাত উপোস দিলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। উপোসের মতো বড়ো অষুধ কিছু নেই।'

কবির মামার ঢাকা আসার উদ্দেশ্য দ্বিতীয় দিনে জানা গেল। তাঁর মাথায় বিরাট একটা পরিকল্পনা এসেছে। তিনি নীলগঞ্জকে সুখী নীলগঞ্জ বানাতে চান। নীলগঞ্জের সব মানুষকে তিনি সুখী দেখতে চান। সেখানে কোনো দুঃখ থাকবে না। সবাই দু' বেলা ভাত খাবে। সবটাই তিনি করবেন স্বেচ্ছাশ্রমের বিনিময়ে। তাঁর পুরানো ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। মনোয়ারা বললেন, 'আপনার তো ভাইজান এখন বিশ্রামের সময়। রিটায়ার করেছেন, এখন বিশ্রাম করবেন।'

'শুয়ে থাকলেই বুঝি বিশ্রাম হয়? বিশ্রাম হচ্ছে কাজে। একটা ভালো কাজ করার মধ্যে বিশ্রাম আছে। শফিক, কী বলিস?'

শফিক কিছু বলল না।

'হোসেন, তোমার কি মত?'

'ভালোই তো।'

'ভালোই তো বলছ কেন? আইডিয়া পছন্দ হচ্ছে না? মরবার আগে যদি এটা করে যেতে পারি তাহলে কাজের মতো কাজ হয়। কিছুই তো করলাম না জীবনে।'

'কিছুই কর নি—কথাটা তো ঠিক বললে না। হাজার হাজার ছাত্র তৈরি করেছ। এটা তো কম না।'

'নীলগঞ্জের এই কাজটাও করতে চাই। আমাকে দেখে অন্যরা উৎসাহী হবে। বাংলাদেশে হাজার হাজার নীলগঞ্জ হবে। দেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ঠিক কিনা বল।'

'ঠিক।'

'একটা বড়ো জাবদা খাতা কিনেছি। ছাত্রদের সব নাম--ঠিকানা বের করে করে লিখছি। এদের সবার কাছে চিঠি দেব, তারপর দেখা করব। কাজে নেমে পড়তে হবে। কত দিন বাঁচি তার ঠিক নেই কোনো।'

তিনি সবার সঙ্গেই মহা উৎসাহে নীলগঞ্জ নিয়ে আলাপ করলেন। রফিক শুধু বাদ পড়ল। রফিকের সঙ্গেও তুলতে চেয়েছিলেন, রফিক হাই তুলে বলল, 'এইসব বোগাস আদর্শবাদী স্বপ্নের কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না, মামা।'

'বোগাস!'

'বোগাস তো বটেই। এক জন রিটার্য়ার্ড স্কুলমাষ্টার বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে ফেলবে?'

'বাংলাদেশের কথা তো বলছি না। নীলগঞ্জের কথা বলছি।'

'তোমাকে দিয়ে এসব হবে না মামা। এই বয়সে খামোকা দৌড়াদৌড়ি করে শরীর নষ্ট করবে। এমনিতেই কোমর ভেঙে কাত হয়ে আছ।'

কবির মামা দু'দিন ঢাকা থাকলেন। ফিরে যাবার ভাড়া ছিল না। শফিকের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা ধার করলেন।

ধারের টাকা সাত দিনের মধ্যে ফেরত এল। মনি অর্ডারের কুপনে তোজল্লি নামের আরবি বানান, বুৎপত্তিগত অর্থ বিশদভাবে লেখা। সেই সঙ্গে লেখা-- 'আমার পুরনো কোনো ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলে অবশ্যই তার নাম-ঠিকানা লিখে রাখবে। ভুল হয় না যেন।'

সব মানুষের মধ্যেই কিছু রহস্য থাকে।

অমীমাংসিত রহস্য। কবির মামার মধ্যে সেই রহস্যের পরিমাণ কিছু বেশি। তাঁর বাড়ি চব্বিশ পরগণার বারাসাতে। বারাসাত থেকে এগার মাইল দূরে বনগ্রামের এক স্কুলে মাষ্টারি করতেন। ভাদ্র মাসের এক ভোরবেলায় হঠাৎ তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য এসে গেল। ক্যাম্বিসের ব্যাগ এবং একটি ছাতা নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। কাউকে কিছু বলে গেলেন না।

পথে বিধু মল্লিকের সঙ্গে দেখা। বিধু মল্লিক বলল, 'সাত সকালে কোথায় যান?' মাষ্টার তার জবাবে ফ্যাকাসেভাবে হাসলেন। পরিষ্কার কিছু বললেন না। বিধু মল্লিক বলল, 'হাবড়া যান নাকি?'

'হুঁ।'

'রাতে ফিরবেন না?'

'হুঁ, ফিরব।'

কিন্তু তিনি ফিরলেন না। সেটা বাংলা তেরশ বাহান্ন সন। ভারতবর্ষের ক্রান্তিকাল। দীর্ঘদিন তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

প্রায় এক যুগ পর ইংরেজি উনিশ শ' চুয়ান্ন সনে তাঁকে দেখা গেল ময়মনসিংহের নীলগঞ্জে। মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। অত্যন্ত রাশভারি প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু কাজকর্মে খুব উৎসাহ। ছ' মাসের মধ্যে স্কুলের চেহারা পাল্টে ফেললেন। কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে স্কুল কম্পাউণ্ডের সামনে চমৎকার একটা ফুলের বাগান করলেন। গ্রামের লোকজন বলাবলি করতে লাগল--তেলেসমাতি কাণ্ড। করছে কী পাগলা মাষ্টার?

সেবার শীতে ময়মনসিংহ থেকে স্কুল ইন্সপেক্টর জমীর আলি সাহেব স্কুল ইন্সপেক্‌শনে এলেন। বাগান দেখে অবাক হয়ে বললেন,'এই বাগান

আপনার করা?'

'জ্বি, স্যার।'

'নিজের হাতেই করেছেন?'

'ছাত্ররা সাহায্য করেছে। নিজেও করেছি।'

জমীর আলি সাহেব ফিরে গিয়ে স্কুলের সরকারী সাহায্য বাড়িয়ে দিলেন। শুধু তাই না, ময়মনসিংহ জেলার সব ক'টি মাইনর স্কুলের হেড মাষ্টারকে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠালেন। যার সারমর্ম হচ্ছে--ছাত্রদের মানসিক বিকাশ সাধনের জন্যে প্রতিটি স্কুলে ফুলের বাগান থাকা বাঞ্ছনীয়। ফুল ছাত্রদের মনোজগতের উন্নতি ও সৌন্দর্যস্পৃহা বৃদ্ধির সহায়ক ইত্যাদি।

অজ পাড়াগাঁর একটি দরিদ্র দীনহীন স্কুলে রকমারি ফুলের সমারোহ জমীর আলি সাহেবকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল, যার জন্যে তিনি পরের বছরই আবার স্কুল ইন্সপেক্শনে এলেন এবং স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন ফুলের কোনো চিহ্নই কোথাও নেই। সে জায়গায় নানা ধরনের সবজির চাষ করা হয়েছে। জমীর আলি থমথমে গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার?' কবির মাষ্টার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দরিদ্র দেশে ফুলের বিলাসিতা ঠিক না। শাক-সবজি বিক্রি করে কিছু পয়সা হয়। সেই পয়সা ছাত্রদের পিছনে খরচ করা হয়। সবাই এখানে খুব দরিদ্র।'

জমীর আলি রাগী গলায় বললেন, 'দরিদ্রদের সৌন্দর্যবোধ থাকবে না?'

'জ্বি-না। আগে পেটে ভাত, তারপর অন্য কিছু। এখানে আমার অনেক ছাত্র আছে, যারা আজ স্কুলে না-খেয়ে এসেছে।'

জমীর আলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,'ফুলগাছগুলি আপনি কি নিজের হাতেই নষ্ট করেছেন?'

'জ্বি স্যার।'

'আপনার কষ্ট হয় নি?'

'জ্বি-না।'

'পাগল নাকি আপনি! আমি কত জায়গায় আপনার ফুলের বাগানের প্রশংসা করেছি, আর আপনি কিনা সব উপড়ে লাউ, কুমড়া লাগিয়েছেন, আবার বলছেন কষ্ট হয় নি। আপনাকে বোঝা মুশকিল। ইউ আর এ ভেরি স্ট্রেঞ্জ ম্যান।'

নীলগঞ্জের লোকেরাও বোধহয় তাঁকে বিচিত্র মানুষ হিসেবেই জানে। জীবন প্রায় পার করে দিয়েছেন এখানে। এখানকার সবাই তাঁকে চেনে, পাগলা মাষ্টার হিসেবে। দেখে একটু অন্য রকম চোখে। শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সঙ্গে তাদের সেই দৃষ্টিতে কিছু ভয়ও হয়তো থাকে।

গ্রাম্য বড়ো বড়ো সালিসিগুলিতে তাঁকে থাকতে হয়। সমস্যার যখন কোনো রকম মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন এক জন কেউ বলে--মাষ্টার সাব যা বলেন, তা-ই। কবির মাষ্টারকে তখন কিছু একটা

বলতে হয়। এবং তাঁর কথাই হয় সালিসির শেষ কথা। তাঁর মীমাংসা যাদের পছন্দ হয় না, তারাও চুপ করে থাকে। শুকনো মুখে বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে, মাষ্টার সাব বলছেন, এর উপর আর কথা কী? মাষ্টার সাবের কথার একটা ইজ্জত আছে না?' এক জন মানুষের জন্যে এটা হয়তো তেমন বড়ো কোনো সম্মান নয়, আবার হয়তো ঠিক তুচ্ছ করবার মতোও কিছু নয়।

ভাটি অঞ্চলের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে নীলগঞ্জের একজন কেউ। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার বিবাদ। স্ত্রীকে নাইয়র যেতে দিচ্ছে না। দু' বছর হয়ে গেল বাপের বাড়ি যেতে পারছে না মেয়েটি। কোনো উপায় না-দেখে এক সময় সে মাষ্টার সাহেবের কাছে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াবে।

মাষ্টার সাহেব বলবেন, 'কার বাড়ির বৌ তুমি? কোনো দিন তো দেখি নি।' বৌটি ক্ষীণস্বরে বলবে, 'মিয়াবাড়ির।'

'ও, আচ্ছা—সোলায়মানের বৌ। বাটিতে করে কী এনেছ গো মা?'

'মাছের সালুন।'

'ভালো, খুব ভালো। রাত্রে আরাম করে খাব। রেখে দাও।'

বৌটি তরকারির বাটি রেখে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'আর কিছু বলতে চাও নাকি? বলে ফেল, মা। ছেলের কাছে লজ্জার কিছু নেই।'

বৌটি তার সমস্যার কথা বলে। মাষ্টার সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, রাত্রে যাব এক বার তোমাদের বাড়ি। চারটা ডাল-ভাত খাব তোমাদের ওখানে।'

মাষ্টার সাহেব যান রাতের বেলা। সোলায়মানকে ডেকে প্রচণ্ড একটা ধমক দেন, 'চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। বাচ্চা মেয়ে আটকে রেখে খুব বাহাদুরি দেখাচ্ছে। কাল ভোরেই যেন নৌকা ঠিক হয়।'

নৌকা ঠিক হয় ভোরবেলাতেই। আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে দীর্ঘদিন পর বৌটি রওনা হয় বাপের বাড়ি।

এক জন ভিনদেশী মাষ্টারের এই ক্ষমতাও তো তুচ্ছ করার মতো নয়। এ ধরনের ক্ষমতা হঠাৎ করে আসে না, অর্জন করতে হয়। কবির মাষ্টার তা করেছেন।

৬

কেনাকাটা করতে নীলু কখনো একা একা আসে না। তার সঙ্গে থাকে শাহানা কিংবা রফিক। আজ সে এসেছে একা। এবং আসার সময় সারা পথেই মনে হয়েছে গিয়ে দেখবে নিউ মার্কেট বন্ধ। সে লক্ষ করেছে, যেদিনই কোনো একটা বিশেষ কিছু কেনাকাটার থাকে, সেদিনই নিউমার্কেট থাকে

বন্ধ। হয় সোমবার পড়ে যায়, কিংবা মঙ্গলবার। আজ অবশ্যি বুধবার। কে জানে এখন হয়তো নিউ মার্কেট বুধবারেই বন্ধ থাকে। অনেক দিন এদিকে আসা হয় না।

নিউ মার্কেট খোলাই ছিল। দুপুরবেলার দিকে শুধু বয়স্কা মহিলারাই বাজার করতে আসে নাকি? নীলু লক্ষ করল, তার চারদিকে খালাম্মা শ্রেণীর মহিলা। দরদাম করছে, কেনাকাটা বিশেষ করছে না। সময় কাটাবার জন্যেই আসে বোধহয়।

এক জন চকমকে শাড়ি পরা মহিলা সবকিছুর দাম জানতে জানতে এগুচ্ছে। নীলুর বেশ মজা লাগল। সে তার পেছনে পেছনে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগল। অনেক দিন পর সে ঘর থেকে বের হয়েছে। ভালোই লাগছে তার। সেও অন্যদের মতো দরদাম শুরু করল। একটা ট্রাইসাইকেলের দাম করল।

'কত টাকা?'

'তের শ' টাকা।'

'এত দাম! বলেন কি!'

'বিদেশি জিনিস--আমেরিকান। দেশিটা দেখবেন আপা?'

'আচ্ছা দেখান।'

দোকানি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখাতে লাগল। নীলুর মায়াই লাগল। সে কিছু কিনবে না। শুধু শুধু বেচারাকে কষ্ট দিচ্ছে। এত টাকা দিয়ে বাবুর জন্যে ট্রাইসাইকেল কেনার প্রশ্নই ওঠে না।

'জাপানি সাইকেল দেখবেন আপা? মিডিয়াম দামের মধ্যে পাবেন।'

'দেখান দেখি কেমন।'

নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। একটা সাইকেল কিনতে পারলে ভালোই হত। বলে দেখবে নাকি শফিককে? না, বলাটা ঠিক হবে না। শফিক কিনে দিতে পারবে না। শেষে কষ্ট পাবে। কাউকে কষ্ট দিতে তার ভালো লাগে না।

'এই, নীলু না? এখানে কী করছিস?'

নীলু তাকিয়ে রইল, মেয়েটিকে চিনতে পারল না।

'এমন করে তাকাচ্ছিস কেন? চিনতে পারছিস না নাকি? চিনতে না-পারলে চড় খাবি।'

'বন্যা না?'

বন্যা এত লোকজনের মধ্যেও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। প্রায় ন' বছর পর দেখা। স্কুলজীবনের তার সবচে প্রিয় বন্ধু। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় দু' জনে এক বার প্রতিজ্ঞা করেছিল, সারা জীবন তারা বিয়ে করবে না। কোনো পুরুষের অধীনে থাকবে না। স্বাধীনভাবে বেঁচে থেকে পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে, মেয়েরাও ইচ্ছা করলে একা একা থাকতে পারে। প্রতিজ্ঞা করবার পর

কী ভেবে যেন দু' জন খানিকক্ষণ কেঁদেছিল।

বন্যা, নীলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বিয়ে করেছিস, তাই না?'

'হুঁ। তুই?'

'আমিও করেছি। এখন বল্, আমাকে চিনতে পারিস নি কেন?'

বন্যা আগের মতোই আছে, তবুও কেমন যেন অন্য রকম লাগছে। কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তনটা ধরা যাচ্ছে না। বন্যা বলল, 'কী, কথা বলছিস না কেন? আমার মধ্যে কোনো চেঞ্জ দেখছিস?'

'না, তেমন কিছু দেখছি না।'

'বলিস কি! ববকাট করেছি। গাদাখানিক চুল কেটে ফেলে দিয়েছি। তোর চোখেই পড়ল না! তোর হয়েছেটা কী বল তো?'

তাই তো! পিঠভর্তি চুল ছিল বন্যার। চুলে নজর লাগবে বলে বন্যার মা কী একটা তাবিজও তার গলায় দিয়ে রেখেছিলেন। এই নিয়ে ক্লাসে কত হাসাহাসি।

'চুল কেটে ফেললি কেন?'

'হাসবেণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে কেটে ফেলেছি।'

'বলিস কি!'

'হ্যাঁ। আমার জিনিস আমি কাটব, ওর বলার কী?'

'তুই এখনো আগের মতোই পাগল আছিস।'

'আর তুই আছিস আগের মতোই বোকা। চল যাই, চা খাব।'

'কোথায় চা খাবি?'

'কোথায় আবার, রেস্টুরেন্টে।'

'একা একা চা খাব নাকি আমরা?'

বন্যা বিরক্ত মুখে বলল, 'দু'টা মেয়ে যাচ্ছি আমরা, একা বলছিস কেন? আজ তুই সারা দিন থাকবি আমার সঙ্গে। ম্যাটিনিতে ছবি দেখবি?'

নীলু হকচকিয়ে গেল। বন্যা বলল, 'নাকি স্বামীর অনুমতি ছাড়া মুভি দেখা যাবে না।?'

'তা না। ঘরে বাচ্চা আছে।'

'এর মধ্যে বাচ্চাও বাধিয়ে ফেলেছিস? এমন গাধা কেন তুই?'

বন্যা তাকে নিয়ে অসঙ্কোচে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পুরুষদের ভঙ্গিতে ডাকল, 'এই বয়, আমাদের দু' কাপ চা দাও।' নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'এত পুরুষদের মধ্যে বসে চা খেতে তোর অস্বস্তি লাগবে না?'

'অস্বস্তির কী আছে? ওরা কি আমাদের খেয়ে ফেলবে নাকি?'

'কেমন তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।'

'তাকাক না।'

'তুই আগের চেয়ে অনেক স্মার্ট হয়েছিস।'

'স্মার্ট হতে হয়েছে। চাকরি করি তো। নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে

মিশতে হয়।'

'চাকরি করিস?'

'করব না? তোর মতো ঘরে বসে বছরে বছরে বাচ্চা দেব নাকি?'

নীলুর এই কথাটা ভালো লাগল না। বন্যা এমনভাবে বলছে, যেন বাচ্চা হওয়াটা একটা অপরাধ। কিন্তু বন্যাকে বড়ো ভালো লাগছে। আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে।

'কোথায় চাকরি করছিস?'

'ইরানিয়ান এম্বেসিতে। রিসিপশনিস্ট।

নীলু একবার ভাবল জিগ্যেস করে বেতন কত, কিন্তু জিগ্যেস করল না। বন্যা বলল, 'বেতন কত জিগ্যেস করলি না? নাকি জিগ্যেস করতে লজ্জা লাগল?'

'বেতন কত?'

'তিন হাজার টাকা। যাতায়াতের একটা এ্যালাউন্স পাই। মেডিকেল এ্যালাউন্স আছে। সব মিলিয়ে চার হাজার টাকার মতো।'

'বলিস কি!'

'বেতন ভালোই। নিজের টাকা খরচ করি। ওর কাছে চাইতে হয় না। আগে ভাইয়ের বাড়িতে যাবার জন্যে পাঁচ টাকা রিকশা ভাড়া পর্যন্ত চাইতে হত। আর সে দিত এমনভাবে, যেন দয়া করছে, ভিক্ষা দিচ্ছে। এখন সে মাসের শেষে আমার কাছে ধার চায়।'

বন্যা আশেপাশের টেবিলের সবাইকে সচকিত করে হেসে উঠল। নীলুর অস্বস্তি লাগতে লাগল। লোকগুলি কী ভাবছে, কে জানে। নীলু বলল, 'আজ তোর অফিস নেই?'

'না। আজ ইরানের কী একটা জাতীয় উৎসব। নওরোজ নাকি কি যেন বলে। চল যাই সিনেমা দেখি।'

'না রে, সিনেমা দেখব না।'

'না দেখলে না দেখবি। আমি একাই যাব।'

বন্যা উঠে গেল বিল দিতে। নীলু দুঃখিত হয়ে লক্ষ করল, বন্যা এক বারও জিজ্ঞেস করল না--তোর ছেলেমেয়ে ক'টি, ওদের নাম কী? নীলু বলল, 'বন্যা, তুই এক বার আমার বাসায় আসিস। আমার বাবুকে দেখে যাবি।'

'যাব। ঠিকানাটা বল, লিখে নিই।'

বন্যা ঠিকানাটা লিখে নিল নিরুৎসাহ ভঙ্গিতে। যেন নেহায়েত লেখার জন্যেই লেখা। বন্যা বলল, 'তুই এখন কী করবি? বাসায় যাবি?'

'একটা জিনিস কিনব, তারপর বাসায় যাব।'

'কী জিনিস?'

'আগামীকাল ওর জন্মদিন, সেই উপলক্ষে ওর জন্যে কিছু একটা

কিনব।'

'ও ও করছিস কেন? নাম ধরে ডাকিস না? তুই এমন গ্রাম্য মেয়েদের মতো করছিস কেন? পড়াশোনা করে এই লাভ হল তোর? কোন পর্যন্ত পড়েছিস?'

'বি. এ. পাশ করেছি। এম. এ. ভর্তি হয়েছিলাম, তারপর বিয়ে হয়ে গেল।'

'আর সঙ্গে সঙ্গে সংসারে ঢুকে পড়লি? পড়াশোনা মাথায় উঠল।'

নীলু কিছু বলল না। বন্যা বলল, 'জন্মদিনের জন্যে কিছু কেনার দরকার নেই, ওতে বেশি লাই দেওয়া হয়। তাছাড়া উপহারটা তুই তোর হাসবেন্ডের টাকাতেই কিনছিস। তুই নিজের টাকায় তো দিতে পারছিস না।'

'নিজের টাকা পাব কোথায়?'

'চাকরি করলেই পাবি।'

'চাকরি আমাকে কে দেবে?'

'চেষ্টা না করেই বলছিস কে দেবে! চেষ্টা করেছিস কখনো?'

নীলু কিছু বলল না। হাঁটতে লাগল বন্যার সঙ্গে সঙ্গে। বন্যা বলল, 'সব অফিসেই এখন মেয়েদের কোটা আছে। চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়। ছেলেদের চাকরি পাওয়া সমস্যা, মেয়েদের চাকরি সমস্যা নয়। তুই সত্যি সত্যি চাইলে আমি চেষ্টা করতে পারি। চাস নাকি?'

নীলু কিছু বলল না। বন্যা চলে গেল মুভি দেখতে। ঘরে তার এখন ফিরতে ভালো লাগছে না।

নীলু একা একা ঘুরতে লাগল। তার হাতে টাকা আছে মাত্র দু' শ'। দু' শ' টাকায় পছন্দসই কিছু পাওয়া যায় না। হালকা বাদামী রঙের একটা শার্ট পাওয়া গেল। খুব পছন্দ হল নীলুর, কিন্তু দাম চাইল তিন শ' টাকা। এর নিচে নাকি এক পয়সাও নামা যাবে না। নীলু মন খারাপ করে শেষ পর্যন্ত একটা লাইটার কিনল এক শ' পঁচাত্তুর টাকায়। শার্টটা কেনা হল না, এইজন্যে মনে একটা আফসোস বিঁধে রইল। ওকে শার্টটায় খুব মানাত।

শফিক লাইটার দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। নীলু বলল, 'পছন্দ না হলে ওরা ফেরত নেবে। পছন্দ হয় নি?'

'পছন্দ হয়েছে।'

'তাহলে এমন মুখ কালো করে আছ কেন? নাও, একটা সিগারেট মুখে নাও, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।'

শফিক একটা সিগারেট বের করে ম্লান গলায় বলল, 'টাকাপয়সার এমন টানাটানি, এর মধ্যে এতগুলি টাকা বাজে খরচ করার কোনো মানে হয় না।'

নীলুর খুব মন খারাপ হয়ে গেল। চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। শফিক বলল, 'এইসব জিনিস খুব হারায়। এক সপ্তাহের মধ্যেই দেখবে

হারিয়ে ফেলেছি। কই, ধরিয়ে দাও।'

নীলু সিগারেট ধরিয়ে দিল। এবং কিছুক্ষণ পরই বারান্দায় গিয়ে চোখ মুছে এল। অকারণে অন্যকে চোখের জল দেখানোর কোনো মানে হয় না।

বাবু জেগে উঠেছে। কাঁদছে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে। নীলু ঘরে ঢুকে বাবুকে কোলে তুলে নিল। ওর গা একটু গরম। কোলে উঠেও কান্না থামছে না। হাত মুঠি করে কেঁদে কেঁদে উঠছে। শফিক বলল, 'ওকে অন্য ঘরে নিয়ে যাও, বড়ো বিরক্ত করছে।'

নীলু বসার ঘরে চলে এল। শাহানা পড়ছে বসার ঘরে। সে পড়া বন্ধ করে উঠে এল, 'আমার কোলে দাও ভাবী। আমি কান্না থামিয়ে দিচ্ছি। এক মিনিট লাগবে।'

'তুমি পড়াশোনা কর, কান্না থামাতে হবে না।'

'আহা ভাবী , দাও না। প্লিজ।'

শাহানা সত্যি সত্যি কান্না থামিয়ে দিল। চিন্তিত মুখে বলল, 'ওর গা বেশ গরম, ভাবী।'

'হুঁ। একটু গরম।'

'বাবাকে শুনিও না। বাবা শুনলেই বেলাডোনা-ফোনা খাইয়ে দেবে।' শাহানা খিলখিল করে হেসে উঠল। নীলু হাসল না।

'এত গম্ভীর হয়ে আছ কেন ভাবী?'

'এমনি। কারণ নেই কোনো।'

'মন খারাপ নাকি?'

'না।'

'আজ শুনলাম পোলাও রান্না হচ্ছে। ব্যাপার কী ভাবী? মা খুব চেঁচামেচি করছিল, মাসের শেষে এত খরচ।'

'চেঁচামেচি কখন করলেন?'

'তুমি বাইরে ছিলে--নিউ মার্কেটে' আজ কি কোনো বিশেষ দিন ভাবী?'

'বিশেষ দিন আর কি, তোমার ভাইয়ের জন্মদিন।'

শাহানা মুখ টিপে হাসতে লাগল। নীলু বলল,'হাসছ কেন?'

'এমনি হাসছি। ভাবী, তুমি ভাইয়াকে খুব ভালবাস, তাই না?'

নীলু লজ্জিত হয়ে পড়ল। বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। নীলু বলল, 'ওকে শুইয়ে দাও শাহানা, ঘুমুচ্ছে।'

'থাকুক না একটু। কী আরাম করে ঘুমাচ্ছে, দেখ না।'

'পড়াশোনা কর শাহানা। বাবুকে নিয়ে ঘুরতে দেখলে মা রেগে যাবেন।'

'রাগুক, আমি কেয়ার করি না।'

নীলু রান্নাঘরে উঁকি দিল। মনোয়ারা বিরক্ত মুখে কী যেন জ্বাল দিচ্ছিলেন। নীলুকে দেখেই রেগে উঠলেন, ' হঠাৎ করে তোমার এমন পোলাও খাবার

শখ হল কেন বল তো?'

নীলু বড়ো লজ্জা পেল।

'সংসারের এই অবস্থা! এর মধ্যে হুটহাট করে এত বাজার করা ঠিক না। সবাই অবুঝ হলে চলে? বাড়িওয়ালা বাড়িভাড়া বাড়িয়েছে।'

'আবার?'

'হ্যাঁ। এক শ' টাকা বাড়িয়েছে। আর কি মিষ্টি মিষ্টি কথা! আমাকে ডাকছে বড়ো আপা। ইচ্ছা করছিল এক চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিই।'

নীলু হাসতে গিয়েও হাসল না। মনোয়ারা নিজের মনে গজগজ করতে লাগলেন, 'ঢাকা শহরে চাকরিবাকরি করতে হলে নিজের বাড়ি থাকতে হয়। ভাড়াবাড়িতে থেকে ঢাকা শহরে চাকরি করা যায় না।'

নীলু অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'এক দিন হয়তো বাড়ি হবে।'

মনোয়ারা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'হবেটা কী ভাবে? আকাশ থেকে টুপ করে একটা পড়বে নাকি? না তোমরা আলাউদ্দিনের চেরাগটেরাগ পেয়েছ? যাও, তোমার শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করে এস তো, তিনি এখন দয়া করে ভাত খাবেন কিনা। না খেলে কখন ওনার মর্জি হবে?'

মনোয়ারা আজ বিকাল থেকে হোসেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। এ রকম তিনি প্রায়ই করেন এবং হোসেন সাহেব বড়োই কাবু হয়ে পড়েন। স্ত্রীর রাগ ভাঙানোর জন্যে সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম কায়দা করেন। আজ কিছুই করছেন না। সন্ধ্যা থেকে চাদর গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালানো হয় নি।

নীলু মৃদুস্বরে ডাকল, 'বাবা।'

হোসেন সাহেব উঠে বসলেন।

'মা জিজ্ঞেস করেছেন, ভাত খাবেন কিনা।'

'খাব। বলে আস, খাব।'

'মা'র সঙ্গে কথা বলা বন্ধ নাকি?'

'হুঁ।'

'কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে?'

'তেমন কিছু না। পেনশন তুলতে গিয়েছিলাম, তুলতে পারি নি। তাতেই তোমার মা গেছে ক্ষেপে। বললাম, কাল তুলব। এই ভিড়ের মধ্যে আমি বুড়ো মানুষ ধাক্কা-ধাক্কি করতে পারি নাকি?'

'তা তো ঠিকই।'

'এই জিনিসটা তোমার শাশুড়িকে বোঝাব কীভাবে? অন্যদেরও যে ছোটখাটো প্রবলেম হতে পারে, এটা সে বুঝবে না। কী মুশকিল বল তো দেখি!'

হোসেন সাহেব চাদর গায়ে দিলেন। বাতি জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি কিছু বলবেন। নীলু তার শ্বশুরের এই

ইতস্তত ভঙ্গিটি খুব ভালো চেনে।

'কিছু বলবেন বাবা?'

'হুঁ। ছাদে চল তো মা আমার সঙ্গে। তোমার শাশুড়ি যেন আবার না দেখে। বড়ো সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মহিলা, তিলকে তাল করবে।'

তারা নিঃশব্দে ছাদে উঠে এল। হোসেন সাহেব নির্জন ছাদেও গলা নিচু করে তাঁর সমস্যার কথা বললেন। সেই সমস্যার কথা শুনে নীলুর মাথায় বাড়ি পড়ল।

হোসেন সাহেব পেনশন না তুলে ফিরে এসেছেন কথাটা ঠিক না। পেনশনের সাত শ' এগারো টাকা তেত্রিশ পয়সা যথারীতি তুলেছেন। এবং একটা রিক্সা নিয়ে গিয়েছিলেন বায়তুল মুকাররমে এক পাউণ্ডের একটা ফ্রুট কেক কেনবার জন্যে। ফ্রুট কেকও ঠিকই কিনেছেন, দাম দিতে গিয়ে দেখেন পকেট ফাঁকা--একটা পয়সাও নেই। নীলু শুকনো গলায় বলল, 'ভালো করে পকেট দেখেছেন?'

'খুব কম হলেও দশ বার করে প্রতিটি পকেট দেখলাম। পকেটে টাকা না থাকলে টাকা পাওয়া যাবে না। এক বার খোঁজাও যা, এক শ' বার খোঁজাও তা।'

'তা ঠিক।'

'এখন কী করি, তুমি বল বৌমা। কাল তো তোমার শাশুড়ি ঠেলেঠুলে আমাকে আবার পাঠাবে। পাঠাবে না?'

'হুঁ, পাঠাবেন।'

'চিন্তায় আমার খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কী করব, একটা বুদ্ধি দাও মা।'

নীলু ক্ষীণস্বরে বলল, 'সত্যি কথাটা বললে কেমন হয় বাবা?'

হোসেন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'সত্যি কথা বললে উপায় আছে? আমাকে টিকতে দেবে এ বাড়িতে? তুমি তোমার শাশুড়িকে কতটুকু চেন? আমি চিনি চল্লিশ বছর ধরে।'

নীলু চুপ করে রইল। হোসেন সাহেব বললেন, 'তুমি বরং শফিককে আজ রাতে কথাটা বল। সে কাল সাত শ' টাকা জোগাড় করে রাখুক। আমি তার অফিস থেকে নিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে, বলব।'

'এইটাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। এর আর দ্বিতীয় কোনো সমাধান নেই।'

হোসেন সাহেব হৃষ্টচিত্তে নিচে নেমে এলেন। তাঁর মনের মেঘ কেটে গেছে। খেতে বসে রান্নার খুব প্রশংসা করলেন। তাঁর কলেজ জীবনের দু' একটা মজার মজার গল্প বললেন। খাওয়াদাওয়ার পর বাড়িওয়ালার বাসায় রওনা হলেন। খানিকক্ষণ টিভি দেখবেন।

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'লজ্জা লাগে না পরের বাড়িতে বসে টিভি দেখতে?'

'এর মধ্যে লজ্জার কী আছে?'

'রোজ রোজ অন্যের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই?'

'না, কিছুই নেই। তাছাড়া ওরা আমাকে পছন্দ করে। বাড়িওয়ালার মেয়েটা আমাকে চাচাজান ডাকে। রশীদ সাহেবও আমাকে খুব খাতির করে।'

'বাজে বকবক করবে না। দুনিয়াসুদ্ধ লোক তোমাকে খাতির করে। যা মনে আসে বলেই খালাস। আজ কোথাও যেতে পারবে না, বসে থাক এখানে।'

'বসে থেকে করবটা কী?'

'যা ইচ্ছা কর।'

হোসেন সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, তবে খুব একটা বিচলিত হলেন না। মনোয়ারা কথা বলা শুরু করেছেন, এটা একটা সুলক্ষণ। তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথি বই নিয়ে বসলেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করলেন। এক ফাঁকে নীলুর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেনে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি একজন সুখী পরিতৃপ্ত মানুষ। তাঁর কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই। এই পৃথিবীতে বাস করতে পেরে তিনি আনন্দিত।

শাহানা লক্ষ করল, বই পড়তে পড়তে হোসেন সাহেব গুনগুন করে গান গাইছেন। গানের কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, তবে ''না গো না গো'' এই শব্দগুলি আছে। শাহানার বড়ো মজা লাগল। বাবার মনে এত ফুর্তি কেন কে জানে। মাঝে মাঝেই তাঁর মধ্যে এমন ফুর্তির ভাব আসে! শাহানা বলল, 'তোমাকে এত খুশি-খুশি লাগছে কেন বাবা?' হোসেন সাহেব জবাব না দিয়ে পা নাচাতে লাগলেন।

নীলু পেনশনের ব্যাপারটা কী করে বলবে বুঝতে পারছে না। আজকের দিনটিতে শফিককে কোনো খারাপ খবর দিতে ইচ্ছা করছে না। হঠাৎ করে বেচারা এক দিনের মধ্যে সাত শ' টাকা জোগাড় করবে কী ভাবে?

শফিক ঘুমুবার আয়োজন করছে। শেষ সিগারেটটি ধরিয়েছে। এখন সে খানিকক্ষণ পায়চারি করবে। নীলু হালকা গলায় বলল, 'আজ আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল--বন্যা নাম।' শফিক কিছু বলল না। নীলু বলল, 'তোমাকে তো তার কথা বলেছিলাম, এক পুলিশ ইন্সপেকটরেব মেয়ে। খুব ছটফট করত। সারাক্ষণ কথা বলত। ক্লাসে ওর নাম ছিল ফরফরানি। প্রায় ন' বছর পর ওর সঙ্গে দেখা। অবিকল আগের মতোই আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। সারাক্ষণ বকবক করেছে। ও আবার চাকরিও করে--চার হাজার

টাকার মতো পায়।'

শফিক কিছু বলল না। মশারি তুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সহজ স্বরে বলল, 'বাতি নিভিয়ে দাও নীলু। তোমার ঘুমুতে দেরি আছে নাকি?'

'না, আমিও শোব।'

নীলু বাতি নিভিয়ে শফিকের গা ঘেঁষে ঘুমুতে গেল। শফিক হেসে বলল, 'কী ব্যাপার, আজ আমার সঙ্গে কেন?' নীলু লজ্জিত স্বরে বলল, 'কেন, তোমার সঙ্গে আমি ঘুমাই না? তুমিই তো টুনিকে রেখে দাও মাঝখানে।'

শফিক হাত বাড়িয়ে নীলুকে আকর্ষণ করল। পুরুষদের এই আকর্ষণের অর্থ পৃথিবীর সব নারীদেরই জানা। নীলু জড়িয়ে ধরল শফিককে। চারদিক অন্য রকম হতে শুরু করল। শারীরিক ভালবাসাও এক ধরনের ভালবাসা। এ ভালবাসাও নীলুর ভালো লাগে। এই সময়টাতেই শফিক তরল ভঙ্গিতে কিছু কথাবার্তা বলে। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়। হাসির কথা বললে হাসে।

'আমার এই বন্ধু কী বলছিল, জান?'

'কী বলছিল?'

'আমাকে বলছিল একটা চাকরি–টাকরি জোগাড় করতে। চেষ্টা করলেই নাকি পাওয়া যায়।'

'তুমি কী বললে?'

'আমি আবার কী বলব? কিছুই বলি নি।'

নীলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'চাকরি একটা পেলে মন্দ হয় না, কী বল?'

'ভালোই হয়। সংসারের টানাটানি দূর হয়।'

'চেষ্টা করে দেখব নাকি?'

শফিক তরল স্বরে বলল, 'তুমি কি চাকরি করতে পারবে?'

'পারব না কেন?'

'চাকরি করার মেয়ে অন্য রকম হয়। তুমি সেই টাইপ না। তুমি গৃহী টাইপ মেয়ে।'

'আমি ঠিকই পারব। গৃহী টাইপ হই আর যাই হই।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

শফিক এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। নানা রকম স্বপ্ন দেখতে লাগল। মন্দ হয় না একটা চাকরি পেলে। সংসারের কষ্ট দূর হয়। মাসে মাসে মাকে কিছু টাকা পাঠানো যায়। একটা টেলিভিশন কেনা যায়। টিভি দেখার জন্যে বাবাকে তাহলে আর রোজ রোজ অন্যের বাড়ি যেতে হয় না। রফিকের হঠাৎ আসা আব্দার মেটানো যায়। শাহানাকে গলার একটা চেইন বানিয়ে দেওয়া যায়। এত বড়ো মেয়ে, অথচ কানে দু'টি ছোট্ট ফুল ছাড়া কোনো সোনার গয়না নেই। গয়না দূরের কথা, একটা ভালো শাড়ি পর্যন্ত নেই। গত ঈদে সে লাজুক ভঙ্গিতে বলেছিল, 'ভাবী, আমাকে একটা

কমলা রঙের রাজশাহী সিল্কের শাড়ি কিনে দেবে?'

নীলু বলেছে, 'হ্যাঁ, দেব। নিশ্চয়ই দেব।'

'আমাদের ক্লাসের অরুণার এ–রকম একটা শাড়ি আছে। অবিকল সে–রকম একটা শাড়ি চাই।'

'ঠিক আছে।'

'তোমাকে আমি প্রিন্টটা দেখিয়ে দেব।'

শাহানা প্রিন্ট দেখিয়েও দিল, কিন্তু সেই শাড়ি কেনা হল না। হল না বলা ঠিক না, বলা উচিত কিনে দেওয়া গেল না। শাহানা কিছুই বলল না। শুধু নীলু লজ্জায় এবং দুঃখে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে ঈদের দিন ভোরবেলায় দীর্ঘ সময় কেঁদেছিল। কত রকমের দুঃখই না আছে মানুষের!

এক দিন শাহানার হয়তো খুব বড়ো লোকের ঘরে বিয়ে হবে। ভাইয়ের বাড়ির ছোটখাট দুঃখ–কষ্ট মনেই থাকবে না। কিন্তু নীলুর মনে তো এই দুঃখ থাকবেই। প্রতিটি ঈদের দিনে ভোরবেলা মনে পড়বে।

নীলু সাবধানে বিছানা ছেড়ে উঠল। একটা বেজেছে। বাবুর জেগে ওঠার সময় হয়েছে। এক্ষুণি দুধ খাওয়ার জন্যে কাঁদতে শুরু করবে। দুধ বানিয়ে রাখাই ভালো।

বসার ঘরে শাহানা পড়ছে। খুব খাটাখাটনি করছে। নিশ্চয়ই ভালো করবে পরীক্ষায়। নীলু দরজা খুলে বেরুতেই শাহানা বলল, 'তুমি এখনো জেগে আছ?'

'হুঁ। পড়াশোনায় দারণ উৎসাহ দেখি।'

'তুমি কি চাও, আমি ফেল করি?'

'না, তা চাই না। পড়তে পড়তে মাথা খারাপ করে ফেল, তাও চাই না।'

শাহানা বই বন্ধ করে উঠে এল।

'ভাবী, একটা কথা বলব?'

'বল।'

'বাবা তোমাকে ছাদে নিয়ে কী বলল?'

'তেমন কিছু না।'

'না ভাবী, বল। তোমার পায়ে পড়ি।'

নীলু অল্প হেসে বলল, 'তোমার বিয়ের ব্যাপারে কথা বললাম।'

'সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না ভাবী।'

'ঠাট্টা কোথায়, সত্যি কথা বললাম।'

না ভাবী, বল কী ব্যাপার?'

'বললাম তো, একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ছেলে বিলেতে ডাক্তারি পড়ে। দেখতে খুব সুন্দর। ছবি আছে আমার কাছে, তুমি চাইলে ছবি দেখাতে পারি।'

'কসম বল।'

'কসম।'

'তিন কসম।'

'তিন কসম আবার কী।'

শাহানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। সে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। তার মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল। নীলু হাসতে হাসতে বলল, 'ঠাট্টা করছিলাম। মনে হয় তোমার আশাভঙ্গ হয়েছে?'

শাহানা ছুটে এসে নীলুর চুল টেনে দিল, 'কেন তুমি এমন আজেবাজে ঠাট্টা কর! আমি প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। দেখ, এখনো আমার গা কাঁপছে।' নীলু শাহানাকে জড়িয়ে ধরল।

৭

বুধবারটা রফিকের জন্যে খুব লাকি। বুধবারে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারে। এইদিন কোনো অঘটন ঘটবে না। কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেখা হবে। বাসে উঠলে জানালার পাশে বসার সিট পাওয়া যাবে। বাসের কণ্ডাক্টার ভাংতি হিসেবে তাকে দেবে চকচকে নতুন নোট।

আজ বুধবার, কিন্তু তবু অঘটন ঘটল। ফার্মগেটে বাস থেকে নামার সময় নতুন পাঞ্জাবিটা ফস করে পেটের কাছে ছিঁড়ে গেল। অনেকখানি ছিঁড়ল। রফিকের সঙ্গের শুকনো ভদ্রলোক বললেন, 'কণ্ডাক্টারকে একটা চড় দেন ভাই। তাড়াতাড়ি করেন, বাস ছেড়ে দেবে।'

রফিক অবাক হয়ে বলল, 'তাকে চড় দেব কেন? সে তো ছেঁড়ে নি।'

'সে না ছিঁড়ুক, তার বাস তো ছিঁড়েছে।'

অকাট্য যুক্তি। কিন্তু বাস ছেড়ে দিয়েছে। রফিক বিমর্ষ মুখে স্টেডিয়ামের দিকে এগুতে লাগল। তার প্ল্যান-প্রোগ্রাম বদলাতে হবে। ছেঁড়া পাঞ্জাবি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না। সবচে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে, একটা বই কিনে পেটের কাছে ধরে রাখা। অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার।

রফিক নিউজ স্ট্যাণ্ড থেকে এক কপি বিচিত্রা কিনে উঠে দাঁড়ানোমাত্র মেয়েলি গলা শোনা গেল--রফিক সাহেব।

সে তাকিয়ে দেখে--শারমিন। হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি গায়ে। লাল টুকটুকে একটা শাল। হাতে পাটের ব্যাগ। শারমিন বলল, 'এভাবে তাকাচ্ছেন, যেন আমাকে চিনতে পারছেন না।'

'চিনতে পারছি।'

'আমি তখন থেকে লক্ষ করছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। দেখলাম পেটে হাত দিয়ে খুব চিন্তিত মুখে আপনি হাঁটছেন। কি

হয়েছে আপনার?'

রফিক কিছু বলল না।

'আপনার শরীর খারাপ করেছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

'শরীর ঠিকই আছে। বাস থেকে নামার সময় পাঞ্জাবি ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়াটা হাত দিয়ে ঢেকে হাঁটছি।'

শারমিন হেসে ফেলল। রফিক বিরক্ত মুখে বলল, 'আপনি হাসছেন!'

'সরি, আর হাসব না।'

'এখানে কী করছেন?'

'বই কিনতে এসেছি। বিদেশে কিছু বই পাঠাতে হবে। এক জন চেয়েছে।'

'কী বই? গল্প-উপন্যাস?'

'না, সে গল্প-উপন্যাস পড়ে না। সিরিয়াস ধরনের বই পড়ে।'

'একটা ডিকশনারি কিনে পাঠিয়ে দিন।'

শারমিন খিলখিল করে হেসে ফেলল। রফিকের মনে হল, বুধবার দিনটি আসলে তার জন্যে ভালোই।

'রফিক সাহেব, আপনার কাজ না থাকলে আসুন আমার সঙ্গে, বই পছন্দ করে দেবেন। আছে কোনো কাজ?'

'না, কাজ নাই কোনো। আর থাকলেই-বা কি?'

তারা হাঁটতে শুরু করল। শারমিনের হাঁটার ভঙ্গি স্বাভাবিক। কোনো রকম সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই। যেন তারা দীর্ঘদিনের বন্ধু। শারমিন হালকা গলায় বলল, 'ঐদিন আপনি খুব রাগ করেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ'

'খুব বেশি রাগ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'এখনো রাগ আছে?'

'আছে।'

'কী করলে আপনার রাগ কমবে?'

'আপনি যদি আজ সারা দিন আমার সঙ্গে থাকেন, তাহলে রাগ কমবে।'

শারমিন চমকে তাকাল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। রফিক বলল, 'এখন বোধহয় আপনি রাগ করেছেন, তাই না?'

'না, আমি রাগ করি নি।'

'তাহলে কি আজ সারা দিন থাকবেন আমার সঙ্গে? বাজার শেষ করে আমরা চিড়িয়াখানায় যেতে পারি।'

শারমিন হেসে ফেলল। রফিক বলল, 'হাসছেন কেন?'

'চিড়িয়াখানায় যাবার কথা শুনে হাসছি।'

'তাহলে অন্য কোথাও, মিউজিয়ামে কিংবা সোনার গাঁয়ে যেতে পারি।

প্রাচীন বাংলার রাজধানী।'

'আজ আপনার এত ঘোরাঘুরির শখ হয়েছে কেন?'

'কারণ, আজ আমার জন্মদিন।'

বলেই রফিকের একটু খারাপ লাগল। একটা মিথ্যা কথা বলা হল। কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কপটতা করতে ইচ্ছা করে না। রফিক সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। জন্মদিন প্রসঙ্গে এই মিথ্যা কথাটা বলে তার খুব খারাপ লাগছে।

'আপনার জন্মদিন আজ? বাহ্, বেশ মজা তো! খুব ভালো দিনে দেখা হল আপনার সঙ্গে। আসুন, আপনাকে একটা গিফ্‌ট কিনে দেব। আপনি কিন্তু না বলতে পারবেন না।'

রফিক কিছু বলল না।

'আপনাকে খুব সুন্দর একটা পাঞ্জাবি কিনে দেব। ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরা কেউ আমার পাশে পাশে হাঁটলে আমার ভালো লাগে না।'

শারমিন আবার হেসে উঠল। কিশোরীদের মতো হাসি। রিনরিন করে কানে বাজে। হঠাৎ করে মন খারাপ করে দেয়।

রফিক মৃদুস্বরে বলল, 'শারমিন, আমার জন্মদিনের কথাটা মিথ্যা। আজ আমার জন্মদিন নয়।'

'জন্মদিন নয়, তাহলে জন্মদিনের কথাটা কেন বললেন?'

'আমার ধারণা ছিল, এটা বললে আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন।'

'আমার থাকাটা এত জরুরি কেন?'

রফিক কোনো জবাব দিল না। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যার জবাব সরাসরি দেওয়া যায় না। শারমিন দ্বিতীয় বার বলল, 'বলুন, কেন আপনি চান আমি আজ সারা দিন আপনার সঙ্গে থাকি।'

'জানি না, কেন চাই।'

শারমিন হালকা গলায় বলল, 'আমরা সারা জীবনে অনেক কিছুই চাই, কিন্তু সবকিছু পাই না। আমি সব সময় স্বপ্ন দেখি, আমার অনেকগুলি ভাইবোন। সবাই হৈচৈ ছোটাছুটি করছে, ঝগড়া করছে। কিন্তু থাকি একা একা। আমার কী মনে হয় জানেন, কেউ যদি তীব্রভাবে কোনো জিনিস চায়, সে সেটা পায় না। কোনো কিছুর জন্যেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকা ঠিক না। বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'চলুন, পাঞ্জাবি কিনি। জন্মদিন উপলক্ষেই দিলাম। এ্যাডভান্স গিফ্‌ট।'

'না, কোনো দরকার নেই। আচ্ছা, আমি যাই।'

'চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

শারমিন বলল, 'রফিক সাহেব, আপনাকে একটা কথা বলা দরকার।

আসুন কোথাও বসে কথাটা বলি। এখানে কোনো ভালো রেস্টুরেন্ট আছে?'

'না, এদিকে তেমন কিছু নেই।'

'চলুন, কোনো একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলি এই সময় ফাঁকা থাকে। আসবেন?'

'চলুন যাই।'

রফিক, শারমিনের সহজ-স্বাভাবিক আচার-আচরণের প্রশংসা করল। এই মেয়েটি জানে, সে কী বলছে, কী করছে। এটা খুব বড়ো কথা। বেশির ভাগ মানুষই জানে না, সে কী করছে, কী বলছে।

শারমিন বলল, 'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন? এরা খুব ভালো সমুসা জাতীয় একটা খাবার তৈরি করে। চায়ের সঙ্গে ভালো লাগবে। দিতে বলি?'

'বলুন।'

শারমিন খাবারের কথা বলল। অস্বস্তির সঙ্গে এদিক-ওদিক খানিকক্ষণ তাকাল। যেন কী বলবে তা একটু গুছিয়ে নিচ্ছে। রফিক বলল, 'বলুন, কী বলবেন।'

'আপনি এত গম্ভীর হয়ে থাকলে বলি কী করে? সহজ হয়ে বসুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ভাইভা দিতে এসেছেন।'

রফিক হাসতে চেষ্টা করল। শারমিন কী বলবে, তা সে বুঝতে চেষ্টা করছে।

শারমিন চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'সাব্বির আহমেদ নামে এক জন ভদ্রলোক আছেন। পি-এইচ. ডি করছেন আমেরিকায়। অত্যন্ত ভালো ছাত্র এবং আমার বাবা তাঁকে খুব পছন্দ করেন। আমি নিজেও করি। পছন্দ করার মতোই মানুষ। তাঁর মাকে আমি চাচী ডাকি। যখন আমার কোনো কারণে খুব মন খারাপ লাগে, তখন আমি ওনার কাছে যাই, মন ভালো করবার জন্যে। বুঝতেই পারছেন ইনি কেমন মহিলা। পারছেন না?'

'পারছি।'

'ঐ সাব্বির আহমেদ ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, যখন আমি কলেজে পড়ি, তখন থেকে। সে জুলাই মাসে দেশে ফিরবে--তখন আমাদের বিয়ে হবে।'

রফিক কিছু বলল না। শারমিন মৃদুস্বরে বলল, 'আমি সুখী হতে চাই। এবং আমি জানি এই বিয়ে আমার জন্যে সুখ নিয়ে আসবে। আমার ইনট্যুশন তাই বলে।'

রফিক সিগারেট ধরাল। শারমিন বলল, 'আমি আসলে এক জন দুঃখী মেয়ে। আমি সুখ চাই, সুখী হতে চাই।'

'সবাই চায়।'

'হ্যাঁ, সবাই চায়। তবে আমি বোধহয় একটু বেশি চাই।'

সে মুখ নিচু করে হাসল। রফিক বলল, 'কঠিন কঠিন বইগুলি ঐ

ভদ্রলোকের জন্যে কিনবেন?'

'হ্যাঁ। আপনার কথামতো একটা ডিকশনারিও কিনে দেব। ওর খুব মেজাজ খারাপ হবে।'

রফিক হেসে ফেলল। শারমিন বলল, 'বই পছন্দ করবার জন্যে আপনি আসবেন তো আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, আসব।'

'কেনাকাটার পর আপনার কথামতো আমরা ঘুরে বেড়াব। সারা দিন ঘুরব।'

'তার দরকার নেই।'

'দরকার আছে। আজ আমার খুব ঘুরতে ইচ্ছা হচ্ছে। এবং আরেকটা কথা, রফিক সাহেব।'

'বলুন।'

'এখন থেকে আমরা তুমি-তুমি করে বলব। আপনি-আপনি শুনতে খারাপ লাগছে।'

'ঠিক আছে।'

'প্রথম প্রথম বলতে হয়তো একটু অস্বস্তি লাগবে, পরে আর লাগবে না।'

সত্যি সত্যি তারা সারা দিন ঘুরে বেড়াল। চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখার পর শারমিনের ইচ্ছা হল, প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনার গাঁ দেখবে। রফিক বলল, 'ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। সন্ধ্যা হয়ে যাবে।'

'হোক সন্ধ্যা, আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সঙ্গে গাড়ি আছে, অসুবিধা কী?'

উৎসাহে ও আনন্দে শারমিন ঝলমল করছে। এই আনন্দের উৎসটি কোথায়, কে জানে? সারা পথ হাত নেড়ে নেড়ে সে অনেক গল্প করতে লাগল। তুচ্ছ সব কথা--এতেই একেক বার সে হাসতে হাসতে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে।

রফিক মুটামুটি চুপচাপই আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে একটা ঘোরের মধ্যে আছে। পরিষ্কারভাবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

সোনার গাঁ যাওয়ার পথে শারমিনের চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল। পথের পাশে গাড়ি থামিয়ে তারা চা খেল। শারমিন বলল, 'কেমন গ্রাম-গ্রাম চারদিক, তাই না?'

'এটা তো গ্রামই। গ্রাম-গ্রাম তো লাগবেই।'

'তুমি কখনো গ্রামে গিয়েছ রফিক?'

'যাব না কেন, অনেক বার গিয়েছি।'

'আমি কখনো গ্রাম দেখি নি। এক বার তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব।'

'বেশ তো।'

'গ্রামের জোছনা নাকি খুব সুন্দর হয়?'

'হয় বোধহয়, আমার এমন কাব্য ভাব নেই। মন দিয়ে দেখি নি কখনো।'

তেমন কোনো হাসির কথা নয়, কিন্তু খিলখিল করে হেসে উঠল শারমিন, যেন খুব মজার কথা।. রফিক বলল, 'তোমার সাব্বির সাহেব কি তোমাকে আমার সঙ্গে গ্রামে যেতে দেবেন?'

'দেবে না কেন? নিশ্চয়ই দেবে।'

'দেখা যাবে।'

'ওর মধ্যে কেনো প্রিজুডিস নেই।'

'না থাকলেই ভালো।'

'আর সে খুব ভাবুক ধরনের, রাতদিন বই নিয়ে থাকে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে হঠাৎ রোমান্টিক হতে চেষ্টা করে, সেটা আরো হাস্যকর লাগে।'

'দু' একটি উদাহরণ দাও, শুনি।'

'না, থাক, আমার লজ্জা করবে।'

'আহ্, লজ্জার কী আছে এর মধ্যে?'

শারমিন গম্ভীর হয়ে বলল, 'যেমন, গত মাসে হঠাৎ চিঠি লিখল--শারমিন, তুমি অবশ্যই তোমার মাথার একগাছি চুল খামে ভরে পাঠাবে।'

বলেই শারমিন লজ্জা পেল। সন্ধ্যার আলোয় তার লজ্জারাঙা মুখ দেখতে বড়ো ভালো লাগল রফিকের। তার জীবনে এই দিনটি বিশেষ দিন হয়ে থাকবে। একটি গোপন সঞ্চয়। রফিক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করল। তার মনে হল, সুখ এবং দুঃখ একসঙ্গে মিশে থাকে, এমন ঘটনার সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশি।

শারমিন বাড়ি ফিরল রাত আটটায়। রহমান সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাকে দেখেই বললেন, 'কোথায় ছিলে মা?'

'ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমেরিকায় পাঠাবার জন্যে কিছু বই কিনলাম, তারপর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে নিয়ে খুব ঘুরলাম।'

'খবর তো দেবে। খুব চিন্তা করছিলাম।'

'আই এ্যাম সরি।'

'একটা টেলিফোন করে দিলেই হত।'

'একদম মনে হয় নি। প্লীজ বাবা, রাগ করো না।'

শারমিন বাবাকে জড়িয়ে ধরল। রহমান সাহেব হেসে ফেললেন।

'খুব ভালো বন্ধু বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক দিন পর দেখা হল?'

'হ্যাঁ।'

'বাসায় নিয়ে এলে না কেন?'

'নিয়ে আসব এক দিন।'

'সাব্বিরের চিঠি এসেছে। তোমার টেবিলে রেখে এসেছি।'

'থ্যাংক্‌স্‌।'

'কিছু বইপত্রও বোধহয় পাঠিয়েছে। বিরাট একটা প্যাকেট দেখলাম।'

'ভূতের বই পাঠাতে বলেছিলাম--তাই পাঠিয়েছে।'

সাব্বিরের চিঠিগুলো সাধারণত ছোট হয়। "তুমি কেমন আছ? আমি ভালো। এখানকার ওয়েদার এখন বেশ চমৎকার।" এতেই শেষ।

কিন্তু এবারের চিঠিটি বেশ দীর্ঘ। ওয়েদার ভালো ছাড়াও অনেক কিছু লেখা। শারমিন লক্ষ করল, চিঠি পড়তে তার কেমন যেন আগের মতো ভালো লাগছে না। জড়ানো ধরনের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে তার সত্যি সত্যি হাই উঠল।

পাঠানো বইগুলিও খুলে দেখতে ইচ্ছা করছে না। এরকম হচ্ছে কেন? দায়িত্ব পালনের মতো করে সে চিঠি শেষ করল। বইয়ের প্যাকেট খুলে বইগুলি উল্টেপাল্টে দেখল। রাত দশটার দিকে গেল বাবার ঘরে। শোবার আগে 'গুড নাইট' জানাতে।

রহমান সাহেব বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে চুরুট টানছিলেন। ঘরে একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ। রাতের খাবারের পর তিনি সাধারণত এক পেগ হুইস্কি খেয়ে থাকেন।

শারমিনকে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসলেন। আদুরে গলায় বললেন 'ঘুমুতে যাচ্ছ মা?'

'হুঁ।'

'বস, একটু।'

শারমিন বসল।

'কী লিখেছে সাব্বির? কেমন আছে সে?'

'ভালোই আছে।'

'কবে আসবে কিছু লিখেছে?'

'না।'

'আমি ভাবছি ওকে লিখব জুন-জুলাইয়ের দিকে এক বার দেশে আসতে। বাই দিস টাইম তোমার এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্টও নিশ্চয়ই বের হয়ে যাবে। হবে না?'

'হ্যাঁ, হবে। আগস্টেই হবার কথা।'

'গুড। তাই লিখব। যাও মা, এখন ঘুমুতে যাও। মনে হয় অনেক রাত হয়েছে।'

শারমিন উঠে দাঁড়াল এবং হঠাৎ রহমান সাহেবকে অবাক করে দিয়ে

শান্ত স্বরে বলল, 'বাবা, আমি ঠিক করেছি, সাব্বির ভাইকে বিয়ে করব না।'

রহমান সাহেব পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর চেহারা বা বসে থাকার ভঙ্গিতে পরিবর্তন হল না। চুরুট নিভে গিয়েছিল, তিনি চুরুট ধরালেন এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বললেন, 'এই নিয়ে আমি কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব, এখন ঘুমুতে যাও।'

শারমিন নড়ল না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। রহমান সাহেব শীতল কণ্ঠে বললেন, 'ঘুমুতে যাও শারমিন।'

শারমিন ঘর ছেড়ে গেল। রহমান সাহেব সাধারণত এগারটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। আজ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন। রাত একটায় বারান্দায় হাঁটতে গিয়ে দেখেন, শারমিনের ঘরেও বাতি জ্বলছে। এক বার ভাবলেন, ডাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকলেন না।

ছোটবেলায় শারমিন মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে বাতি জ্বালিয়ে বিছানায় বসে থাকত। তিনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতেন, 'ভয় পাচ্ছ মা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সঙ্গে ঘুমুবে?'

'না।'

'মজনুর মাকে বলব তোমার ঘরে ঘুমুতে? মেঝেতে বিছানা পেতে সে ঘুমুবে।'

'না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, সে না–হয় দরজার বাইরে ঘুমাক।'

'না, দরকার নেই।'

শারমিন অত্যন্ত জেদী। তাকে দেখে অবশ্যি খুব নরম ধরনের মেয়ে বলেই মনে হয়। রহমান সাহেব অত্যন্ত চিন্তিত বোধ করলেন। শারমিনের ভেতর এক ধরনের দৃঢ়তা আছে, যাকে তিনি ভয় করেন। তার সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করতে হবে। সেজন্যে তাঁকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার মতো বাজে ব্যাপার আর কিছুই নেই।

ভোরবেলা শারমিনকে খুব স্বাভাবিক মনে হল। নিজের হাতে বাবার জন্যে বেড টি নিয়ে এল। মার্টিকে খাবার দিয়ে বাগানে বেড়াতে গেল। তার রোজকার অভ্যাস হচ্ছে টেবিলে নাশতা না দেয়া পর্যন্ত বাগানে হাঁটা। তার সঙ্গে হাঁটবে মার্টি। মার্টি খানিকক্ষণ হাঁটবে আবার দৌড়ে গিয়ে তার খাবার খাবে, আবার ছুটে আসবে শারমিনের কাছে।

নাশতার টেবিলে রহমান সাহেব শারমিনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করলেন। চেহারায় রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি নেই। ভোরবেলায় গোসল করেছে। স্নিগ্ধ একটা ভাব এসেছে চেহারায়। রহমান সাহেব চা খেতে খেতে বললেন, 'কাল রাতে তুমি একটি প্রসঙ্গ তুলেছিলে, আমরা কি সেটা নিয়ে এখন আলাপ

করব?'

শারমিন মৃদুস্বরে বলল, 'আলাপ করার দরকার নেই।'

'আমি কি লিখব সাব্বিরকে আসবার জন্যে?'

'হ্যাঁ, লেখ।'

'কোনো কারণে কি তোমার মন বিক্ষিপ্ত?'

'না।'

রহমান সাহেব নিঃশব্দে চা পান পর্ব শেষ করলেন। চুরুট ধরালেন এবং একসময় ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'চল আমরা বরং বেড়িয়ে আসি কোনো জায়গা থেকে। যাবে?'

'যাব।'

'কোথায় যেতে চাও?'

'আমি জানি না, তুমি ঠিক কর।'

'নেপালে যাবে? হিমালয়-কন্যা নেপাল।'

'যাব।'

'বেশ, আমি ব্যবস্থা করছি।'

শারমিনরা পরের সোমবারেই সাত দিনের জন্যে নেপাল চলে গেল। বেড়াতে যাবার জন্যে সময়টা ভালো নয়। প্রচণ্ড শীত, কিন্তু তবু ঢাকা ছেড়ে বেরোতে পেরে শারমিনের ভালোই লাগল। কেমন যেন হাঁপ ধরে গিয়েছিল।

নেপাল থেকে সে সুন্দর একটি চিঠি লিখল সাব্বিরকে।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমরা বেশ ক'দিন হল নেপালে এসেছি। চমৎকার জায়গা। আপনিও চলে আসুন। আপনি এলে আমার আরো ভালো লাগবে। কিছুদিন ধরেই আমার কেন জানি খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে। আপনি এলে রাত-দিন আপনার সঙ্গে গল্প করব। আপনার যত কাজই থাকুক, সব ফেলে রেখে আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে। গোমড়ামুখের প্রফেসর আমার এতটুকুও পছন্দ নয়।

বিনীতা
শারমিন

৮

টুনির বয়স এখন ন' মাস।

ন' মাস বয়েসী বাচ্চারা বাবা, মা, দুদু এই জাতীয় কথা বলতে শেখে, কিন্তু টুনির ব্যাপারটা হয়েছে এই রকম, সে শুধু শিখেছে একটি শব্দ--জেজে। যাই দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠে এবং হাত নেড়ে বলে ওঠে, জেজে।

তাকে কথা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে শাহানা। শাহানার পরীক্ষা হয়ে গেছে। কাজেই প্রচুর অবসর। শাহানা ঘোষণা করেছে, এক মাসের মধ্যে টুনিকে সব কথা শিখিয়ে ফেলবে।

শাহানা টুনিকে সোফায় গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়েছে। টুনি তাকে লক্ষ করছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শাহানা তার মনযোগ আরো ভালোভাবে আকর্ষণ করবার জন্যে কিছুক্ষণ হাত নাড়ল, তারপর বলল, 'বল তো টুনি—মামা।'

টুনি তার দু'টি দাঁত বের করে ফিক করে হেসে ফেলল, তারপর গম্ভীর হয়ে বলল--জেজে।

'উহুঁ, জেজে নয়। বল মামা।'

'জেজে, জেজে।'

'হল না। বোকা মেয়ে, বল, মা মা।'

'জে জে। জে.......'

'মোটেও হচ্ছে না। ইচ্ছা করলেই তুমি পারবে। তোমার কত বুদ্ধি!'

'জে জে। জে.......'

'হচ্ছে না।'

'জেজে, জেজে, জেজে।'

শাহানা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। টুনি হাত বাড়িয়ে দিল। সে কোলে উঠতে চায়। দু'টি জিনিস সে খুব ভালো শিখেছে--কোল এবং ছাদ। কোলে উঠেই সে দরজার দিকে দেখাবে। দরজা খোলামাত্র ছাদের দিকে হাত বাড়াবে।

ছাদে নিয়ে ছেড়ে দিলে সে নিজের মনে হামাগুড়ি দেবে। মাঝে মাঝে একা একা দাঁড়াতে গিয়ে ধপ করে পড়ে যাবে। ব্যথা পেলেও কাঁদবে না। অবাক হয়ে বলবে--জেজে, জেজে।

শাহানা টুনিকে কোলে নিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'ভাবী, আমি ওকে একটু ছাদে নিয়ে যাচ্ছি।' কেউ তার কথার কোনো জবাব দিল না। নীলু রান্না ঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। মনোয়ারা গেছেন ডেনটিস্টের কাছে। কাল রাত থেকে তাঁর দাঁতে ব্যথা। আজ গেছেন দাঁত ফেলে আসতে।

শাহানা ছাদে উঠে গেল। রাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। ছাদ ভেজা। টুনিকে নামানোর প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু সে নেমে পড়ার জন্যে ছটফট করছে। শাহানা আনিসের ঘরে উঁকি দিল।

আনিস তিনকোণা একটা কাঠের বাক্সে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক মারছিল। শাহানাকে দেখেই চট করে বিছানার চাদর টেনে বাক্স ঢেকে ফেলল. শাহানা অবাক হয়ে বলল, 'এটা আবার কী!'

আনিস বলল, 'আমার ম্যাজিকের বাক্স। পাবলিককে দেখানো নিষেধ আছে।'

ম্যাজিকের ব্যাপারটি অল্প কিছু দিন হল শুরু হয়েছে। আনিস মনস্থির

করেছে, সে ম্যাজিশিয়ান হবে। পড়াশোনায় তার মাথা নেই। এই লাইনে কিছু করতে পারবে না। তার ধারণা, ম্যাজিকের লাইনে সে উন্নতি করবে।

রশীদ সাহেব মহা বিরক্ত হয়েছেন। কোনো ভদ্রলোকের ছেলে ম্যাজিশিয়ান হতে চায়, এটা ভাবলেই তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়। সার্কাস, ম্যাজিক এইসব হচ্ছে ফালতু লোকের কাজ। ভদ্রলোকের কাজ না। আনিসকে তিনি ঘাড় ধরেই বের করে দিতেন, কিন্তু মেয়ের জন্যে পারেন নি। বীণা আনিসকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে শুনেই খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে এমন একটা কাণ্ড করেছে যে, তিনি রীতিমত হকচকিয়ে গেছেন। স্ত্রীকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছেন,'প্রেম-ফ্রেম না তো?' লতিফা রেগে গিয়ে বলেছেন, 'কী পাগলের মতো কথা বল। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি তোমার? চাকর শ্রেণীর একটা লোকের সঙ্গে তোমার মেয়ে প্রেম করবে? এসব নিয়ে আর কোনোদিন কোনো কথা বলবে না।'

'আনিসকে কি চলে যেতে বলব?'

'থাক, চলে যেতে বলার দরকার নেই। তবে, ওর এ বাড়িতে ঢোকা আমি বন্ধ করছি।'

'কীভাবে?'

'আমি ব্যবস্থা করব, তুমি দেখ না।'

ব্যবস্থা তিনি কী করলেন ঠিক জানা গেল না। শুধু দেখা গেল আনিস একটা কেরোসিন কুকার কিনেছে। নিজের রান্না এখন নিজেই রাঁধছে।

আনিসের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে লতিফা বেশ কিছু দিন স্কুল ছুটি হবার সময়টায় স্কুলগেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। যদি আনিসকে দেখা যায়। না, দেখা গেল না।

বীণার একটা তালাবন্ধ স্যুটকেস আছে। চাবি জোগাড় করে গোপনে একদিন সেই স্যুটকেস খুললেন, যদি চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায়। আনিসের কোনো চিঠি পাওয়া গেল না, তবে পাশা নামের একটি ছেলের কুৎসিত ধরনের একটা চিঠি পাওয়া গেল। সেই চিঠি পড়ে তাঁর রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড়। কী সর্বনাশ!

লতিফা চিঠির কথা কাউকে বলতে পারলেন না। এটি এমনই এক চিঠি, যা কাউকে দেখানো যায় না, কারো সঙ্গে এ নিয়ে গল্পও করা যায় না। বীণা সেই চিঠি স্যুটকেসের পকেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছে কেন কে জানে?

টুনিকে কোলে নিয়ে শাহানা কৌতূহলী হয়ে আনিসের ঘরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র দেখছে। সে বলল, 'সবই কি আপনার ম্যাজিকের জিনিস নাকি আনিস ভাই?'

'হুঁ।'

'ঐ আংটাগুলি কী?'

'লিংকিং রিঙ। একটা চাইনিজ ট্রিক। একটার ভেতর দিয়ে একটা ঢুকে যায়, আবার বের হয়ে আসে।'

'তাই নাকি? দেখানো না।'

'এখন দেখান যাবে না, প্রাকটিস নেই। পুরোপুরি ওস্তাদ না হয়ে আমি কোনো ম্যাজিক দেখাব না। বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, ভেতরে আস।'

'না।'

'না, কেন?'

'ইচ্ছা করছে না।'

'প্লিজ, আস। চা বানিয়ে খাওয়াব, আমার ঘরে এখন চা বানানোর সব সরঞ্জাম আছে।'

'চা আমি খাই না।'

টুনিকে কোলে নিয়ে শাহানা নিচে নেমে গেল।

নীলু রান্না চড়াতে গিয়ে দেখল, লবণ নেই। কাজের কোনো লোক নেই। এমন মুশকিল হয় একেক বার। এখন লবণের জন্যে পাঠাতে হবে রফিককে, সে বোধহয় এখনো ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙালে সে রাগ করবে। দশটা বেজে যাচ্ছে, শফিকের অফিসে যাবার সময় হয়ে এল। আজ না খেয়েই অফিসে যেতে হবে।

নীলু উঠে এল। রফিককে অনুরোধ-টনুরোধ করে পাঠাতে হবে, এছাড়া উপায় নেই।

রফিকের ঘরের সামনে এসে নীলু থমকে দাঁড়াল। দরজায় নোটিশ ঝুলছে--রাত তিনটা দশ মিনিটে ঘুমাতে যাচ্ছি। কেউ যেন সকাল এগারটার আগে না ডাকে। ডাকলে খুনাখুনি হয়ে যাবে।

উপায় নেই। নীলু দরজায় ধাক্কা দিল। রফিক চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

'আমি।'

'ভাবী, তুমি অন্ধ নাকি? নোটিশ দেখছ না?'

'দেখছি। উপায় নেই আমার, প্লিজ উঠে আস।'

'কী করতে হবে?'

'লবণ এনে দিতে হবে। রান্না চড়াতে পারছি না।'

রফিক অত্যন্ত বিরক্ত মুখে দরজা খুলল। বিড়বিড় করে বলল, 'ভোর রাতে তোমাকে রান্না চড়াতে হয় কেন বল তো? তোমাদের যন্ত্রণায় শান্তিতে একটু ঘুমাবার উপায় নেই।'

রফিকের দাড়ি অনেকখানি বড়ো হয়েছে। তাকে দাড়িতে এখন ভালোই লাগছে। স্বাস্থ্যও আগের চেয়ে একটু ভালো হয়েছে। পড়াশোনায় ঝামেলা চুকেছে, এই শান্তিতেই বোধহয়।

এম. এ. পরীক্ষায় রফিকের রেজাল্ট বেশ ভালো হয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাস থার্ড। সে সেকেণ্ড ক্লাস আশা করেছিল, তবে নিচের দিকে। রেজাল্ট বের

হবার পর অন্যদের চেয়েও সে নিজে বেশি অবাক হয়েছে। নীলুকে বলেছে, 'আরেকটু খাটাখাটনি করলে ফার্স্ট ক্লাস মেরে দিতে পারতাম ভাবী। কী, পারতাম না?'

'হ্যাঁ, তা তো পারতেই।'

'আমি যে এক জন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, তা আগে বুঝতে পারি নি। আগে বুঝতে পারলে রাতদিন পড়তাম। আর তো পড়ার স্কোপ নাই। শেষ পরীক্ষাটাও দিয়ে দিলাম।'

'বিসিএস-এর জন্যে পড়। বিসিএস দাও।'

'বিসিএস আমার হবে না, ভাবী। ভাইবাতে আউট করে দেবে।'

'কেন?'

'বিসিএস-এ চেহারা-টেহারা দেখে। আমার তো সেই দিক দিয়ে জিরো। শর্ট। বোকা-বোকা চাউনি। তাও দাড়িটা থাকায় রক্ষা!'

'তোমার কি ধারণা, দাড়ি রাখায় তোমাকে খুব হ্যাণ্ডসাম লাগছে?'

'হ্যাণ্ডসাম না লাগলেও ইন্টেলিজেন্ট লাগছে। চেহারায় একটা শার্পনেস চলে এসেছে। কী, আসে নি? একটা অনেস্ট ওপিনিয়ন দাও তো ভাবী'

চাকরির চেষ্টা সে বেশ করছে। তিনটি ইন্টারভ্যু দিয়েছে এ পর্যন্ত। একটা সিলেট চা বাগানে, বাকি দুটি ব্যাঙ্কে। চা বাগানের ইন্টারভ্যু খুব ভালো হয়েছিল। রফিকের ধারণা ছিল, সেখানেই হবে। হয় নি। ব্যাঙ্কের ইন্টারভ্যু ভালো হয় নি। তাকে জিজ্ঞেস করেছে, বাংলাদেশের আয়তন কত? সে বলতে পারে নি। ইন্টারভ্যু বোর্ডের এক ভদ্রলোক বললেন এম এ পাশ করেছেন, আর বাংলাদেশের আয়তন কত এটা জানেন না? আওয়ামী লীগের ছয় দফা কী কী বলতে পারবেন? এটাতেও সে গণ্ডগোল করে ফেলল। ভদ্রলোক বিরক্ত স্বরে বললেন, 'ইন্টারভ্যু বোর্ড একটু প্রিপেয়ার্ড হয়ে ফেস করবেন। পড়াশোনা করে তারপর আসবেন।'

রফিক এরপর অবশ্যি আটঘাঁট বেঁধে নেমেছে। জেনারেল নলেজের বই কিনে এনেছে তিনটি। নোট করছে, পড়ছে। উৎসাহের সীমা নেই।

শফিক অফিসের কাপড় পরে খাবার ঘরে আসতেই নীলু লজ্জিত মুখে বলল, 'আজ রান্না শেষ হয় নি এখনো।' শফিক কিছু বলল না। কিন্তু তার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, সে কিছুটা বিরক্ত।

'লবণ ছিল না। রফিক লবণ আনতে গিয়ে অনেকখানি দেরি করল। তুমি আজ ক্যানটিনে খেয়ে নিও।'

'ঠিক আছে।'

নীলু ইতস্তত করে বলল, 'আর ঐ চায়ের দাওয়াতের কথাটা মনে আছে?'

'কোন দাওয়াত?'

'ঐ যে, আমার বন্ধু বন্যা চায়ের দাওয়াত দিয়েছে আমাদের দু' জনকে। ওদের ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি। রাতে তোমাকে বলেছিলাম।'

'ক'টার সময় যাবার কথা?'

'চারটায়।'

'ঐ সময় তো আমি থাকব টঙ্গি। ছ'টা পর্যন্ত ফিল্ডে কাজ।'

'এক দিন না গেলে হয় না?'

'আরে না। না গেলে হবে কেন?'

'আমি একাই যাব?'

'যদি যেতেই হয়, একা যাও। কিংবা রফিককে বল, পৌঁছে দেবে।'

নীলু কিছু বলল না। তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, শফিক হয়তো যেতে রাজি হবে। অনেক দিন তারা একসঙ্গে কোথাও যায় না। রাতে দাওয়াতের কথা শুনে হাই তুলে বলেছিল, 'আচ্ছা, দেখি।' তার মানে যাওয়া যেতে পারে। এখন মনে হচ্ছে আচ্ছা দেখির মানে—সম্ভব না। নীলু ঘরের কাজ শেষ করতে লাগল। একাই যাবে সে। এবং ফিরবে সন্ধ্যা পার করে। এমন দেরি করবে, যাতে সবাই চিন্তায় পড়ে যায়।

মনোয়ারা দাঁত দেখাতে সেই সকালে গিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি। এটাও একটা চিন্তার ব্যাপার। কোনো ঝামেলা হয়েছে কিনা কে জানে। এত দেরি হবার তো কথা নয়।

নীলু রান্না শেষ করে ময়লা কাপড় ধুতে ঢুকল বাথরুমে। যেদিনই সে কাপড় ভেজায়, সেদিনই আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। শাশুড়ি চেঁচামেচি করতে থাকেন, দিনক্ষণ দেখে কাপড় ভেজাতে পার না। এ কি বিশ্রী অভ্যাস তোমার বৌমা, বৃষ্টি-বাদলা ছাড়া তুমি কাপড় ধুতে পার না! এক কথা কত বার করে বলব তোমাকে?'

আজ অবশ্যি বৃষ্টি হবে না, কড়া রোদ উঠেছে। ঘন্টা দু'-এক এ-রকম থাকলে সব কাপড় শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাবে।

বালতিতে ভেজা কাপড় নিয়ে নীলু ছাদে গেল। আনিস ছাদে হাঁটতে হাঁটতে সিগারেট টানছিল। নীলুকে আসতে দেখেই সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল।

নীলু বলল, 'যাদুকরের খবর কী?'

'কোনো খবর নেই ভাবী। রান্না চড়িয়েছি।'

'কী রান্না আজ?'

'ভাত আর ডিম ভাজা।'

'রোজ রোজ ডিম ভাজা খেতে অরুচি লাগে না?'

'না। কাপড় আমার কাছে দিন ভাবী, আমি মেলে দিচ্ছি।'

'তোমার মেলতে হবে না। এটা মেয়েদের কাজ।'

'মেয়েদের কাজ বলে আলাদা কিছু আছে?'

'আছে। এখনো আছে। তোমার ম্যাজিক কেমন চলছে?'

'ভালোই চলছে ভাবী। এখন পামিং শিখছি।'

'কী শিখছ?'

'পামিং। অর্থাৎ হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখার কৌশল।'

'এইসব কৌশল আমরা কবে দেখতে পাব?'

'খুব শিগগিরই পাবেন।'

'পিসি সরকার হচ্ছ তাহলে?'

'হ্যাঁ ভাবী। আপনি হাসছেন—আমি কিন্তু সত্যি সত্যি হব।'

'নিশ্চয়ই হবে। হবে না কেন? সেদিন আমরা সবাইকে বলব, যাদুকর আনিস সাহেবকে আমরা ছোটবেলা থেকেই চিনতাম। তিনি আমাদের দোতলার চিলেকোঠায় থাকতেন।'

'ভাবী, আপনি মনে-মনে হাসছেন।'

'না ভাই, হাসছি না।'

শফিকের অফিস মতিঝিলে—বিটা ফার্মাসিউটিক্যালস এণ্ড ইনসেক্টিসাইড। নেদারল্যাণ্ডের একটা ওষুধ তৈরির কারখানা। মূল কারখানাটি তেজগাঁয়। এখন সেটি আরো বাড়ানো হচ্ছে। টঙ্গিতে নতুন একটি কারখানা হচ্ছে।

বিদেশি কোম্পানিগুলোতে যেমন সাহেবী কায়দাকানুন থাকে, এখানে সে-রকম নয়। দেশীয় অফিসগুলির মতই ঢিলাঢালা ভাব, স্যারেনসেন হচ্ছে একমাত্র বিদেশি। বাংলাদেশে কোম্পানির বড়োকর্তা। স্যারেনসেনের বাড়ি নরওয়েতে, পড়াশোনা করেছে ফ্রান্সে। ইংরেজি ভালো বলতে পারে না।

বিদেশিদের সম্পর্কে আমাদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে—এরা অত্যন্ত কর্মঠ। সময় সম্পর্কে সচেতন। কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না--ইত্যাদি। স্যারেনসেনের সঙ্গে এর কোনোটাই মেলে না। লোকটি মহা ফাঁকিবাজ। কাজ কিছুই বোঝে না, অকারণে চেঁচায়।

শফিক অফিসে ঢুকেই শোনে সাহেব খুব রেগে আছে। সবাইকে বকাবকি করছে। শফিক অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

'কে জানে কেন? কয়েক বার আপনার খোঁজ করেছে। যান স্যার, দেখা করে আসেন।'

শফিক ঘরে ঢুকতেই সাহেব চেঁচিয়ে উঠল, 'কি, ব্যাপার শফিক, এত দেরি কেন?'

'দেরি না, তুমিই চলে এসেছ সকাল-সকাল। মনে হচ্ছে তুমি কোনো কারণে আপসেট।'

'আপসেট হব না! তুমি পড়ে দেখ, হল্যাণ্ডের হোম অফিস থেকে কী লিখেছে।'

'কী লিখেছে?'

'আহ্, পড়তে বলছি পড়। জিজ্ঞেস করছ কেন?'

এমন মেজাজ খারাপ করার মতো কোনো চিঠি নয়। হেড অফিস জানতে চেয়েছে লট নং ৩৭২-এর স্যাম্পল কেন এখনো পাঠানো হয় নি। র‍্যানডম স্যাম্পলিং করা হচ্ছে না এবং আনুষঙ্গিক অন্য কাজও আটকে আছে, কাজেই---।

শফিক বলল, 'স্যাম্পল যথাসময়ে পাঠানো হয়েছে। শিপমেন্টের ঝামেলায় হয়তো পৌঁছয় নি। এই নিয়ে আপসেট হওয়ার কিছুই নেই।'

'পাঠানো হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই পাঠানো হয়েছে। কাগজপত্র এনে দেখাচ্ছি তোমাকে।'

'দেখানোর দরকার নেই। তুমি একটা চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা কর। চিঠিতে লেখা থাকবে, এত তারিখে স্যাম্পল শিপমেন্ট করা হয়েছে। তোমরা যদি না পাও, আমাদের অবিলম্বে জানাও।'

'ঠিক আছে।'

'চিঠি না। একটা টেলেক্স করে দাও।'

'টেলেক্সই করব।'

স্যারেনসেন মুহূর্তের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অমায়িক গলায় বলল, 'কফি খাবে নাকি?'

'না, কফি খাব না।'

'টঙ্গির কাজ কেমন এগুচ্ছে?'

'ভালোই এগুচ্ছে।'

'খুব লক্ষ রাখবে, তোমাদের দেশের লোক কিন্তু সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে।'

শফিক কিছু বলল না। সাহেব গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার কমেন্ট শুনে আবার মন খারাপ কর নি তো?'

'না।'

'গুড। শোন শফিক, আজ আমি একটু সকাল-সকাল ঘরে ফিরব। কাজেই আমাকে দিয়ে কোনো সই-টই করাবার থাকলে করিয়ে নিও।'

'ঠিক আছে। আমি তাহলে যাই এখন?'

'যাও।'

শফিক তার নিজের ঘরে ঢুকল। তার পদ হচ্ছে ম্যানেজারের। ম্যানেজার, এডমিনিস্ট্রেশন। তবে সে গত ছ' মাস ধরে জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছে। আগের জেনারেল ম্যানেজার ইংল্যাণ্ডের মিঃ রেভার্স টনির সঙ্গে বড়োকর্তার খিটিমিটি চলছিল বহু দিন থেকে। গত খ্রিসমাসে সেই খিটিমিটি চরমে উঠেছে এবং রেভার্স সাহেব এক দিন অফিসে এসে বড়ো সাহেবকে যে কথাগুলি বলল, তার বাংলা অর্থ হচ্ছে—তোমার অফিস এবং কারখানা তুমি তোমার পশ্চাৎদেশে প্রবেশ করিয়ে বসে থাক, আমি চললাম। সাহেবরাও নোংরা কথা আমাদের মতোই গুছিয়ে বলতে পারে।

বড়োসাহেব এক সপ্তাহ গম্ভীর হয়ে রইল। প্রতি সন্ধ্যায় সাত-আট পেগ হুইস্কি খেয়ে পুরোপুরি আউট হবার চেষ্টা করতে লাগল। সেটা সম্ভব হল না। এ্যালকোহল তাঁকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না। এক সপ্তাহ পর জেনারেল ম্যানেজার হারানোর দুঃখ তার অনেকটা কমে এল। সে শফিককে ডেকে বলল, 'তুমি জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে নাও। আমি দশ দিনের মধ্যে হেড অফিস থেকে অর্ডার আনিয়ে দিচ্ছি। ব্রিটিশগুলি হচ্ছে মহা হারামজাদা। টনি কোম্পানিটার বারটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে সব ঠিকঠাক করা।'

দশ দিনের মধ্যে অর্ডার আসার কথা। ছ' মাস হয়ে গেল অর্ডারের কোনো খোঁজ নেই। যখনই কোনো রকম ঝামেলা উপস্থিত হয়, বড়োসাহেব শফিককে ডেকে বলে, 'ব্যাপারটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ট্যাকল কর শফিক, আমি হেড অফিসে টেলেক্স করছি—কেন তারা তোমাকে এখনো কনফার্ম করছে না। এরা পেয়েছেটা কী? এভাবে কোনো আন্তর্জাতিক কোম্পানি চলে, না চলা উচিত?'

অফিসে শফিকের অবস্থা একটু অস্বস্তিকর। সিদ্দিক সাহেব হচ্ছেন তার দু' বছরের সিনিয়ার। আগে ছিলেন প্রডাকশন ম্যানেজার বছরখানেক আগে তাকে ঢাকা হেড অফিসে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তাঁকে ডিঙিয়ে জেনারেল ম্যানেজার হওয়াটা তিনি সুনজরে দেখছেন না। শফিকের বিরুদ্ধে বেশ জোরালো একটি দলও তাঁর আছে। তাঁর আচার-আচরণে সেটা কখনো বোঝা যায় না। সিদ্দিক সাহেব অত্যন্ত মিষ্টভাষী ভদ্রলোক। সবার সঙ্গেই প্রচুর রসিকতা করেন।

শফিক তার ঘরে বসামাত্রই সিদ্দিক সাহেব ঢুকলেন, এবং তাঁর স্বভাবমতো বললেন, 'তারপর জি. এম. সাহেব, হোয়াট ইজ নিউ? সাহেবকে ঠাণ্ডা করেছেন?'

'হুঁ। এখন ঠাণ্ডা।'

'আসলে এই কোম্পানিতে একটা পোস্ট ক্রিয়েট করা দরকার, যে পোস্টের কাজই হবে সাহেবকে ঠাণ্ডা রাখা।'

শফিক কিছু বলল না। সিদ্দিক সাহেব বললেন, 'আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে। দুঃসংবাদটা দিতে এলাম।'

'কী দুঃসংবাদ?'

'হিস্টোলিনের একটা নতুন ব্যাচের কাজ শুরু হয়েছে। প্রডাকশন ম্যানেজার জানিয়েছেন, এই ব্যাচটা নষ্ট হয়েছে। প্রায় এক লাখ টাকা নর্দমায় ফেলা হল।'

সিদ্দিক সাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন। যেন তাঁর কিছুই যায়-আসে না। শফিক উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'ব্যাচ বাতিল করা-হয়ে গেছে?'

'না, এখনো হয় নি। তবে বাতিল করা ছাড়া উপায় নেই। ইমালসিফায়ার

নেই। কাজ যখন শুরু করা হল, তখন জানা গেল ইমালসিফায়ার নেই।'

'সেকি! আগে জানা যায় নি?'

'স্টোর বলেছিল আছে। সেই ভরসাতেই শুরু করা হয়েছিল। মাঝপথে বলা হল নেই।'

শফিক উঠে দাঁড়াল। সিদ্দিক সাহেব বললেন, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'তেজগাঁয়ে যাই।'

'সেখানে গিয়ে করবেন কী?'

'খোঁজ নিই কী হচ্ছে। অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

'কোথায় পাবেন? আর পেলেও সেটা ব্যবহার করা যাবে না। কোম্পানির দেওয়া নিজস্ব জিনিস ব্যবহার করতে হবে। রেগুলেশন নাম্বার সিক্সটিন। কাজেই শান্ত হয়ে বসুন। চায়ের অর্ডার দিন। প্রডাকশন ম্যানেজার, স্টোর ইনচার্জ এবং চিফ কেমিস্টকে ডেকে পাঠান। লিখিত রিপোর্ট দিতে বলুন। হেড অফিসে টেলেক্স পাঠান।'

শফিক কপালের ঘাম মুছল। হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে। সিদ্দিক সাহেব বললেন, 'আপনার টেলিফোন করবার দরকার নেই, আমি ইতিমধ্যেই টেলিফোন করেছি। এবং ওরা খুব সম্ভব রওনাও হয়ে গেছে।'

'বড়োসাহেবকে খবর দেওয়া দরকার।'

সিদ্দিক সাহেব অলস ভঙ্গিতে বললেন, 'তা দরকার। তবে এখন খবর না দেওয়াই ভালো। বড়োসাহেব ব্যস্ত আছেন। ডিকটেশন দেবার জন্যে মিস রীতাকে ডেকেছেন।'

সিদ্দিক সাহেব মুচকি হাসলেন। বড়ো সাহেব মাঝেমধ্যেই ডিকটেশন দেবার জন্যে মিস রীতাকে ডেকে নেন নিজের কামরায়। তখন দরজা বন্ধ থাকে। এবং কিছুক্ষণ পরপর মিস রীতার খিলখিল হাসি শোনা যায়।

মিস রীতা গোমেজ এখানকার রিসিপশনিস্ট। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হলেও এখনো চমৎকার শরীরের বাঁধুনি। চেহারায় স্নিগ্ধ ভাব আছে। খুবই আমুদে মেয়ে। বড়োসাহেবের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাবে এ-রকম একটা গুজব অনেক দিন থেকে শোনা যাচ্ছে।

শফিকের দিন শুরু হল খুবই খারাপভাবে। বড়োসাহেবের সঙ্গে কোনো কথা হল না। তিনি জানিয়ে দিলেন, আজ অত্যন্ত ব্যস্ত। অফিসের কোনো ব্যাপারে নাক গলাতে চান না।

দুপুরবেলা শফিক রাজশাহী থেকে শাশুড়ির একটি চিঠি পেল। তাকেই লেখা।

> *"বিলুর একটি ছেলে হইয়াছে গত বুধবারে রাত আটটায়। ছেলে ভালো আছে। কিন্তু বিলুর অবস্থা খুবই খারাপ। তাহাকে রাজশাহী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। বেশ কয়েক বার রক্ত দেওয়া হইয়াছে। আমি কী করিব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। জামাই ফরিদপুরে।*

তাহারও কোনো খোঁজ নাই। বাবা, তুমি কি নীলুকে সঙ্গে নিয়া একবার আসিবে? আমার মন বলিতেছে, বিলুর দিন ফুরাইয়াছে---,"

বিরাট চিঠি। শফিক চিঠি হাতে দীর্ঘ সময় চেয়ারে বসে রইল। নীলুকে আজ রাতের কোচেই পাঠানো দরকার। সঙ্গে কিছু টাকাপয়সাও দিয়ে দেওয়া দরকার। টাকার জোগাড় করা যায় কীভাবে?

বন্যার বাসা খুঁজে বের করতে বেশি ঝামেলা হল না। সুন্দর ছিমছাম ওয়ান বেডরুম এ্যাপার্টমেন্ট। বসার ঘরে বেতের সোফা। দেয়ালে জলরঙ ছবি। মুগ্ধ হবার মতো সাজসজ্জা। নীলু মুগ্ধ হয়ে গেল।

'সুন্দর সাজিয়েছিস বন্যা!'

'আমি সাজাই নি। ও সাজিয়েছে। এসব দিকে আমার ঝোঁক নেই।'

'আর সব গেস্ট কোথায়?'

'তোকে এবং তোর বরকে ছাড়া আর কাউকে বলি নি। তাও তুই এলি একলা। এটা ভালোই হল। আমার বরের সঙ্গেও আমার ঝগড়া হয়েছে। ও সকালবেলা ঘর ছেড়ে চলে গেছে। এখন আমরা দু' জনে মিলে গল্প করব। রাতে ভাত খেয়ে তারপর যাবি।'

'ঝগড়াটা হয়েছে কী নিয়ে?'

'রেগুলার ফিচার। পার্সোনালিটি ক্ল্যাশ। ও চায় আমার বাচ্চাকাচ্চা হোক। চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি ঘরসংসার করি।'

'তুই বাচ্চাকাচ্চা চাস না?'

'এখন চাই না। ও চাইলেই আমাকে বাচ্চা পেটে ধরতে হবে নাকি? পুরুষদের কথামতো সারা জীবন চলব আমরা? আমাদের কোনো ইচ্ছা–অনিচ্ছা নেই? আমরা বানের জলে ভেসে এসেছি?'

'তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন?'

'রাগব না কেন? নিশ্চয়ই রাগব। মেয়ে হয়েছি বলে কি আমরা মানুষ না? বাদ দে এসব, তোর কথা বল। বরকে নিয়ে এলি না কেন?'

'ওর কী যেন কাজ পড়েছে। টঙ্গি যেতে হবে।'

'আর তুই বিশ্বাস করে বসে আছিস? তোকে বুঝ দেয়ার জন্যে বলা। কাজটাজ কিছুই না। স্ত্রীদের কারণে কিছু করবে না এটা হচ্ছে পুরুষদের মটো। ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি।'

'সমগ্র পুরুষ জাতিটার উপর তুই রেগে আছিস।'

'তা আছি। তুই বোস, চা বানিয়ে আনি। রাতে কী খাবি, বল?'

'রাতে কিছু খাব না। একা একা এতদূর যেতে পারব না।'

'একা যেতে হবে না, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'ভয় করবে না তোর?'

'আমার এত ভয়টয় নেই।'

'খুব সাহস তোর?'

'হ্যাঁ, খুব। এক জন পুরুষ যদি রাত দশটায় হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারে, তাহলে এক জন মেয়েও পারে।'

'থাক, এত সাহস দেখানোর দরকার নেই।'

বাসায় ফিরতে ফিরতে নীলুর সন্ধ্যা হয়ে গেল। বন্যা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, নীলু রাজি হয় নি। বন্যার স্বামী জহুর সাহেব চলে এসেছেন ততক্ষণে। বন্যা তাকেই বলল, 'তুমি নীলুকে পৌঁছে দাও না। বেচারি একা একা যেতে ভয় পায়। একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও।' কী সর্বনাশের কথা! অচেনা পুরুষমানুষের সঙ্গে সে বাসায় ফিরবে? নীলু আঁৎকে উঠে বলেছে, 'কিচ্ছু লাগবে না, আমি চলে যেতে পারব।'

'ঠিক তো?'

'হুঁ, ঠিক।'

'ভয় পাবি না তো?'

'না।'

নীলু ভয় পায় নি। তার মতো একা একা অনেক মেয়েই যাচ্ছে। তা ছাড়া মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। বাসার কাছাকাছি এসে মনে হল শফিক খুব রাগ করবে। শুধু শফিক না, তার শাশুড়িও রাগ করবেন। আর শাশুড়ির রাগ মানেই হচ্ছে—ভূমিকম্প। কী যে অবস্থা হবে, কে জানে!

কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কিছু বলল না। সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেরা যেন তেমন কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। শফিক বলল, 'তাড়াতাড়ি একটু গোছগাছ করে নাও নীলু, নাইট কোচে রাজশাহী যাবে। তোমার বোনের শরীর ভালো না।'

নীলু আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'মারা গেছে?'

'না, না। চিঠি পড়ে দেখ। অবস্থা ভালো না, তবে বেঁচে আছেন। তুমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও, রফিক তোমার সঙ্গে যাবে।'

'টুনি, টুনি?'

'টুনি থাকবে এখানেই। অসুবিধা হবে না। তুমি যাও।'

'বিলু আপা বেঁচে আছে তো?'

'বললাম না, ভালোই আছেন। চিঠিটা পড়ে দেখ, চিঠিতেই সব লেখা আছে। তেমন খারাপ হলে টেলিগ্রামই আসত। আসত না?'

শফিকের কথা সত্যি না। বিকাল পাঁচটায় বিলুর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে। নীলুকে মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হবে কি হবে না, এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। শফিক খবরটা দিতেই চেয়েছিল। তার মতে খবর না দিলে সে বোনের সঙ্গে দেখা হবার আশা নিয়ে যাবে এবং যখন দেখবে বোন বেঁচে নেই, তখন অনেক বড়ো শক পাবে। শফিকের যুক্তি অন্যদের ভালো লাগে নি।

নীলু চলে যাবার পর শফিকের মনে হল, কাজটা ঠিক হল না। তার সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল। সে চলে গেলে বিটা ফার্মাসিটিক্যালস-এর সব কাজ আটকে থাকবে, এই ধারণাটা ঠিক না। কারো জন্যেই কিছু আটকে থাকে না। স্ত্রীর দুঃসময়ে স্বামী পাশে এসে না দাঁড়ানটা দুঃখজনক। যে-কোনো স্ত্রী এইটুকু তার স্বামীর কাছ থেকে আশা করতে পারে, এবং আশা করা উচিত।

মনোয়ারা রাতে খাবার সময় অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'বৌটা না থাকায় বাড়ি খালি-খালি লাগছে। বড়ো খারাপ লাগছে বউমার জন্যে।' এটা তাঁর কথার কথা নয়, তিনি ঠিকমতো খেতে পারলেন না। আধখাওয়া প্লেট ঠেলে সরিয়ে উঠে পড়লেন। রাতে শোবার সময় হোসেন সাহেবকে বললেন, 'তোমার ছেলের এমনই রাজকার্য পড়ে গেছে, বৌটার সঙ্গে যেতে পারল না। যত অপদার্থ আমি পেটে ধ...ছি! এই অপদার্থগুলির কপালে দুঃখ আছে।'

হোসেন সাহেব ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'তুমি শফিককে বললে না কেন সঙ্গে যেতে?'

'কেন আমি বলব? এটা সে নিজে কেন বোঝে না! দু'টা পয়সা রোজগার করে সে কী ভেবেছে? সবার মাথা কিনে নিয়েছে? লাটসাহেব হয়ে গেছে?'

৯

এয়ারপোর্টে সাব্বিরকে রিসিভ করবার জন্যে শারমিন একা এসেছে। রহমান সাহেবের সঙ্গে আসার কথা, শেষ মুহূর্তে তিনি মত বদলালেন, 'তুমি একাই যাও মা। ড্রাইভারকে ব'লে দাও একটা ফুলের তোড়া নিয়ে আসতে। সাব্বির পছন্দকরবে।'

ফুলের তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করতে শারমিনের লজ্জা করছিল। ফুলটুল নিয়ে আর কেউ আসে নি, সে একাই এসেছে। অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। কী ভাবছে, তারা মনে মনে, কে জানে!

ন'টার সময় প্লেন আসার কথা, সেটা এল এগারটায়। কাস্টমস সেরে বেরুতে বেরুতে সাব্বিরের দুটোর মতো বেজে গেল। সাব্বিরের স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে। শীতের দেশ থেকে আসছে বলেই বোধহয় লালচে ভাব গালে। মাথাভর্তি চুল এলোমেলো হয়ে আছে। তার আচার-আচরণে একটা ছটফটে ভাব আছে। শারমিনকে স্বীকার করতেই হল, সাব্বির অত্যন্ত সুপুরুষ। এ রকম সুপুরুষদের পাশে দাঁড়াতে ভালো লাগে।

শারমিন হাসিমুখে বলল, 'এই নিন আপনার ফুল।'

'ফুল, ফুল কী জন্যে?'

'এত দিন পর দেশে ফিরছেন, তাই।'

সাব্বির ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল, 'আমার দেশের

বাড়ি থেকে কেউ আসে নি? কাউকে তো দেখছি না। চিঠি দিয়েছি, টেলিগ্রাম করেছি, হোয়াট ইজ দিস?'

শারমিন কিছু বলল না। সাব্বিরের দেশের বাড়ির কারোর সঙ্গে তার পরিচয় নেই। দেশের বাড়িতে সাব্বিরের তেমন কেউ নেইও। এক চাচা আছেন, যিনি তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন। বড়ো এক বোন আছেন, জামালপুরে, তার সঙ্গে শারমিনের কয়েক বার দেখা হয়েছে। সে এয়ারপোর্টে আসে নি। এলে দেখা হত।

সাব্বির বলল, 'মা আসেন নি?'

'না। উনি ঢাকায় নেই।'

'কোথায়?'

'জামালপুরে মেয়ের কাছে আছেন।'

'জামালপুরে কবে গেলেন, আমি তো কিছু জানি না!'

'গতমাসে গিয়েছেন।'

সাব্বির অত্যন্ত বিরক্ত হল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি দাঁড়াও তো এখানে, আমি খুঁজে দেখি। আছে হয়তো কেউ। এত দিন পর আসছি, কেউ আসবে না?'

সাব্বির খুঁজতে গিয়ে আধ ঘন্টার মত দেরি করল। ফিরে এল মুখ কাল করে। কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না। শারমিন বলল, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

'কোথায় যাব?'

'আমাদের বাসায়, আর কোথায়?'

'না, প্রথম যাব ঝিকাতলা। মা কোথায় আছেন খোঁজ নিয়ে আসি।'

সাব্বিরের মাকে পাওয়া গেল না। তার ছোট মামার কাছে জানা গেল, তিনি জামালপুরে। ছোট মামা সাব্বিরের প্রসঙ্গে কোনো রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। সাব্বির বলল, 'আমি আসব, আপনি জানতেন না?'

'জানতাম।'

'আমি তো আশা করেছিলাম এয়ারপোর্টে আপনাকে দেখব।'

ছোট মামা মুখ কালো করে বললেন, 'নিজের যন্ত্রণায় অস্থির। ছোট মেয়ের ডায়রিয়া। মহাখালি নিয়ে গিয়েছিলাম। তুই হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খা।'

সাব্বির সেসব কিছুই করল না। বিরক্ত মুখে বের হয়ে এল। শারমিন বলল, 'এবার কি যাবেন আমার সঙ্গে?'

'হুঁ, যাব। তোমাদের ওখানে চা খেয়ে রওনা হব জামালপুর। জামালপুর যাবার সবচে ভালো বুদ্ধি কী?'

'ট্রেনে করে যেতে পারেন। বাই-রোডে যেতে চাইলে আমাদের একটা গাড়ি নিয়ে রওনা হতে পারেন। আজই যেতে হবে?'

'হুঁ, আজই।'

'আপনি এমন ছটফট করছেন কেন?'

'কিচ্ছু ভালো লাগছে না।'

'কেন?'

'জানি না, কেন।'

শারমিন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'বাংলাদেশ কেমন লাগছে?'

'বাংলাদেশ দেখলাম কোথায়?'

'রাস্তাঘাট তো দেখছেন। কত বড়ো বড়ো রাস্তা হয়েছে, দেখেছেন?'

সাব্বির তার জবাব না দিয়ে মুখ গোমড়া করে বসে রইল। শারমিন বলল, 'আপনার শরীর ভালো তো?'

'হ্যাঁ, ভালোই।'

'কত দিন থাকবেন?'

'বেশি দিন না। এক সপ্তাহ।'

'হঠাৎ এমন হুট করে চলে এলেন যে ! আপনার তো কথা ছিল আগস্ট মাসে আসার।'

'এখানে কী যেন একটা ঝামেলা হচ্ছে, সেটা জানার জন্যে এসেছি।'

'কী ঝামেলা?'

সাব্বির বিরক্ত স্বরে বলল, 'দু' শ' ডলার করে মাকে প্রতি মাসে পাঠাই। তাঁর একার জন্যে যথেষ্ট টাকা, কিন্তু তার পরেও গতমাসে একটা চিঠি পেলাম, যার থেকে ধারণা হয় যে, তাঁর টাকাপয়সার খুব টানাটানি। এর মানে কী? টাকাগুলি যাচ্ছে কোথায়?'

'এটা জানার জন্যে একেবারে আমেরিকা থেকে চলে এলেন?'

'শুধু এটা না। মা'র শরীর খারাপ। মনে হয়, ঠিকমতো চিকিৎসাও হচ্ছে না। সেটাও দেখব।'

রহমান সাহেব সাব্বিরকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। প্রথম যেদিন দেখেছিলেন, সেদিনই তাঁর তাকে ভাল লেগেছিল।

সেই ভালোলাগা পরবর্তী সাত বছরে ক্রমেই বেড়েছে। তাদের প্রথম পরিচয়পর্বটি বেশ নাটকীয়।

রহমান সাহেব সবে অফিসে এসে বসেছেন। তাঁর সেক্রেটারি বলল, একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঘন্টাখানেক ধরে বসে আছে।

'কী চায়?'

'আমাকে বলছে না।'

রহমান সাহেব ছেলেটিকে আসতে বললেন। নিশ্চয়ই চাকরিপ্রার্থী। প্রতিদিনই বেশ কিছু এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়।

অত্যন্ত সুদর্শন একটি ছেলে ঢুকল। এবং সে কোনো রকম ভণিতা না করে বলল, 'আমার নাম সাব্বির আহমেদ। আমি এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ট্যাটিসটিক্স-এ এম. এস. সি পাশ করেছি। আপনি কি দয়া করে আমার মার্কশিটটা দেখবেন?'

'কোনো চাকরির ব্যাপার?'
'জ্বি–না, কোনো চাকরির ব্যাপার নয়।'
'ব্যাপারটা কী?'
'আপনি আগে দেখুন, তারপর বলব।'
রহমান সাহেব দেখলেন। অনার্স এবং এম. এস. সি দু'টিতেই প্রথম শ্রেণী।
'আপনার তো চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।'
'না, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি অন্য ব্যাপারে এসেছি।'
'বলুন, শুনি।'
'আমি আমেরিকান একটি ইউনিভার্সিটি—স্টেট ইউনিভার্সিটি অব আইওয়াতে টিচিং এ্যাসিসটেন্টশিপ পেয়েছি। সেখানে আণ্ডার–গ্রাজুয়েট ক্লাসে পড়াব, সেই টাকায় পি–এইচ. ডি. করব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে আমি অত্যন্ত দরিদ্র। আমার আত্মীয়স্বজনরাও দরিদ্র। আমেরিকায় যাবার জন্যে আমার ত্রিশ হাজার টাকার মতো দরকার।'
'আপনি চাচ্ছেন এই টাকাটা আমি আপনাকে দিয়ে সাহায্য করি?'
'ধার হিসেবে চাচ্ছি।'
'এত লোক থাকতে আমার কাছে এসেছেন কেন?'
'শুধু আপনার কাছে নয়, আরো অনেকের কাছেই গিয়েছি। আমি একুশ জন ইণ্ডাস্ট্রিয়েলিস্টের একটি লিস্ট করেছি। ঠিক করেছি, এদের সবার কাছেই যাব।'
'লিস্টটা দেখতে পারি?'
'নিশ্চয়ই পারেন।'
সাব্বির লিস্টি বের করে দিল।
'আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির চিঠিটি সঙ্গে আছে?'
'হ্যাঁ, আছে। রেজিস্ট্রারের চিঠি।'
রহমান সাহেব চিঠিটা মন দিয়ে পড়লেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'ওরা আই টুয়েন্টি পাঠিয়েছে?'
'জ্বি, পাঠিয়েছে।'
'ভিসা হয়েছে?'
'হ্যাঁ, হয়েছে।'
'পাসপোর্টটা দেখাতে পারেন?'
'পারি।'
সাব্বির পাসপোর্ট বের করল। মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা। রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'টিকেটের টাকা জোগাড় না–করেই ভিসা করেছেন?'
'হ্যাঁ, করেছি। কারণ টাকার ব্যবস্থা হবেই।'
রহমান সাহেব শান্তস্বরে বললেন, 'ক্যাশ দেব না চেক কেটে দেব?'

'ক্যাশ হলে ভালো হয়।'

তিনি ক্যাশিয়ারকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে বললেন। সাব্বির বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখাল না—যেন এটা তার প্রাপ্য। রহমান সাহেব তাকে বাড়তি কোনো ফেভার করছেন না।

আমেরিকা যাবার আগে সে দেখা করতে পর্যন্ত এল না। ছ' মাস পর ইউ এস ডলারে সাব্বির টাকাটা শোধ করল। সেই সঙ্গে চমৎকার একটি চিঠিও লিখল:

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বড়লোকদের প্রতি আমার এক ধরনের ঘৃণা আছে। সারা জীবন অত্যন্ত দরিদ্র ছিলাম বলেই হয়তো। এখন বুঝতে পারছি, ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভালোমানুষ আছেন। আপনার অনুগ্রহের কথা আমি মনে রাখব। টাকাটা পাঠানোর আগে আমি আপনাকে লিখি নি, কারণ আমি এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগছিলাম। আশা করি, আপনি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন।

বিনীত
সাব্বির

দু' বছরের মাথায় সাব্বির দেশে এল। রহমান সাহেবের জন্যে প্রচুর উপহার নিয়ে এল। সাব্বিরের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ হল তখন। পি-এইচ.ডি শেষ করে আবার সে দেশে এল। শারমিনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হল সেই সময়। শারমিন তখন মাত্র কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে।

দুপুরের খাওয়া সারতে-সারতে দু'টা বেজে গেল। খাবার টেবিলে সাব্বির খুব গম্ভীর হয়ে রইল। রহমান সাহেব বললেন, 'তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?'

'কোন পরিকল্পনার কথা বলছেন?'

'আমেরিকাতেই থাকবে, না দেশে আসবে?'

'দেশে আসব। আমেরিকায় থাকব কেন? পোস্ট ডক শেষ করে ফিরব। এখানকার ইউনিভার্সিটিতে সহজেই আমার চাকরি হবার কথা।'

'অনেকেই তো ফিরতে চায় না।'

'আমি চাই। বিদেশের জন্যে আমার কোনো মোহ নেই।'

শারমিন বলল, 'আপনি এত তাড়াহুড়া করছেন কেন, আস্তে আস্তে খান।'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে। জামালপুর যেতে হবে তো।'

'আজ না গেলে হয় না?'

'আমার হাতে সময় বেশি নেই। আজই যাব। বাসে করে চলে যাব।'

রহমান সাহেব বললেন, 'বাসে যেতে হবে না। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, ও তোমাকে নিয়ে যাবে। তিনটা সাড়ে-তিনটার দিকে রওনা হলেই হবে, তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর।'

সাব্বিরকে বিশ্রামের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হল না। যেন এই মুহূর্তে তার রওনা হওয়া দরকার। শারমিন বলল, 'আপনি কি সব সময়ই এমন ছটফট করেন?'

'তা করি।'

'এ রকম ভাব করছেন, যেন দু' মিনিটের মধ্যে আপনার গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। আপনি আরাম করে বসুন তো, আমি চা এনে দিচ্ছি। শান্ত হয়ে চা খান।'

'চা আন। আমি বসছি শান্ত হয়ে।'

'আর শোনেন সাব্বির ভাই, আপনি তো গাড়ি চালাতে জানেন?'

'জানি। কেন?'

'আপনি আবার বাহাদুরি করে গাড়ি চালাতে যাবেন না। যা ছটফটে স্বভাব আপনার, এ্যাকসিডেন্ট করবেন।'

সাব্বির হেসে ফেলল এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বলল, 'শারমিন, তুমিও চল না আমার সঙ্গে, মা খুব খুশি হবে।'

শারমিন হকচকিয়ে গেল।

'গাড়ি যখন যাচ্ছে, তখন তো অসুবিধা হবার কথা নয়।'

'না–না, আমি এখন যাব না।'

'কেন, অসুবিধাটা কী?'

শারমিন কী বলবে ভেবে পেল না। সাব্বির বলল, 'গল্প করতে-করতে যাব, তোমার ভালোই লাগবে।'

'চট করে রেডি হওয়া যাবে না। তৈরি হতেও সময় লাগবে।'

'বেশ তো, না হয় কাল সকালে যাই। তৈরি হবার সময় পাবে। পাবে না?'

শারমিন বিব্রত স্বরে বলল, 'আমি এখন যাব না, সাব্বির ভাই।'

'কেন?'

'আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।'

সাব্বিরকে দেখে মনে হল, তার আশাভঙ্গ হয়েছে। যেন সে ধরেই নিয়েছিল শারমিন যাবে।

বিকেলে শারমিনের নিজেরও কেমন যেন নিঃসঙ্গ লাগতে লাগল। মনে হল—গেলেই হত। যার সঙ্গে সারা জীবন কাটানো হবে, তার সঙ্গে বিয়ের আগে কিছু সময় কাটানোয় এমন কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হত না। নাকি হত?

শারমিন বাগানে বেড়াতে গেল।

মার্টি বরই গাছের নিচে গা এলিয়ে শুয়ে আছে। সারা গা কাদায় মাখামাখি।

'এই মার্টি, তোমার এ কি অবস্থা!'

মার্টি শুয়েই রইল, ছুটে এল না। ওর শরীর ভালো নেই। শরীর ভালো থাকলে এভাবে শুয়ে থাকতে পারত না। ডাকামাত্র ছুটে আসত। শারমিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকল, 'জয়নাল, জয়নাল।'

জয়নাল অল্প কিছু দিন হল চাকরিতে যোগ দিয়েছে। তার আসল কাজ হচ্ছে মার্টির দেখাশোনা। একটি কুকুরকে দেখাশোনার কাজ তার কাছে খুব অপমানজনক মনে হয়েছে বলেই বোধহয় সে কখনো মার্টির ধারেকাছে থাকে না। আজও ছিল না। শারমিনের গলা শুনে ছুটে এল।

'মার্টিকে গোসল করিয়েছিলে?'

'জ্বি, আফা।'

'ওর গা এত ময়লা কেন?'

'কাদার মইধ্যে খালি গড়াগড়ি করে। কি করমু আফা।'

'যাও, আবার ওকে পরিষ্কার কর। মার্টি উঠে আয়।'

মার্টি উঠে এল না। ঝিমুতে লাগল। জয়নাল বলল, 'এ আর বাঁচত না, আফা।'

'বুঝলে কী করে?'

'লেজ নাইম্যা গেছে দেখেন না? লেজ নামলে কুত্তা বাঁচে না।'

জয়নালকে খুব উল্লসিত মনে হল। যেন সে একটা সুসংবাদ দিচ্ছে।

'জয়নাল।'

'জ্বি আফা।'

'কাল ভোরেই ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।'

'জ্বি, আইচ্ছা।'

'খাওয়াদাওয়া করছে ঠিকমতো?'

'জ্বি, করতাছে।'

'রাতের খাবার কখন দেওয়া হবে?'

'সইন্ধ্যাবেলা।'

'আমাকে খবর দেবে তখন। আমি দেখব ঠিকমত খায় কিনা।'

শারমিনের অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে গেল। মার্টি কি সত্যি সত্যি মারা যাবে? মৃত্যুর পর পশুরা কোথায় যায়? ওদেরও কি কোনো স্বর্গ-নরক আছে?

শারমিন দোতলায় উঠে গেল। বাড়ি এখন একেবারে খালি। বাবা গিয়েছেন মতিঝিল। কখন আসবেন কোনো ঠিক নেই। কী একটা মিটিং নাকি আছে। এসব মিটিং শেষ হতে অনেক দেরি হয়। কোনো কোনো দিন ফিরতে রাত একটা-দেড়টা বেজে যায়। আজও হয়তো হবে। শারমিন

কিছুক্ষণ একা একা বারান্দায় বসে রইল। কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। সবচে বড়ো কথা কিছুই করার নেই।

লাইব্রেরি থেকে একগাদা বই আনা হয়েছে। কোনোটাই পড়া হয় নি। মাঝে মাঝে এমন খারাপ সময় আসে, কোনো কিছুতেই মন বসে না। বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মার্টিকে খাওয়াবার সময় হয়েছে বোধহয়। শারমিন নিচে নেমে এল, এবং অবাক হয়ে দেখল রফিক বসে আছে।

'আরে, তুমি কখন এসেছ?'

'প্রায় মিনিট পাঁচেক। দেখলাম দরজা খোলা, আশেপাশে কেউ নেই। চুপচাপ বসে আছি।'

'ভালো করেছ। এস আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'মার্টি সাহেবকে ডিনার দেয়া হবে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।'

'কুকুর খাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, এত শখ আমার নেই। তুমি খাইয়ে আস। আমি বসছি এখানে।'

'অসময়ে হঠাৎ কোত্থেকে এলে?'

রফিক গম্ভীর হয়ে বলল, 'এখানে এক বন্ধুর বাসায় এসেছিলাম, তারপর ভাবলাম এসেছি যখন, তখন দেখা করে যাই।'

'বাজে কথা বলবে না। এখানে তোমার কোনো বন্ধুর বাসা নেই। তুমি আমার কাছেই এসেছিলে। ঠিক কিনা বল।'

রফিক কিছু বলল না। শারমিন বলল, 'চা খাবে?'

'খাব।'

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু?'

'খাব, তবে মিষ্টি না। আমি মিষ্টি খাই না। ঘরে তৈরি সন্দেশও না।'

'তোমাকে রোগা লাগছে কেন রফিক?'

'ভাবীকে নিয়ে রাজশাহী গিয়েছিলাম। এক সপ্তাহ খুব ছোটাছুটি করেছি। ভাবীর এক বোন মারা গেছে। একটা ছোট্ট ছেলে আছে তার। ছেলেটিকে নিয়ে এমন মুশকিলে পড়েছে সবাই!'

'মুশকিল কেন?'

'কোথায় রাখবে, কার কাছ রাখবে—এত ছোট বাচ্চার দায়িত্ব কেউ নিতে চাচ্ছে না।'

'বল কি!'

'দ্যাট্স ফ্যাক্ট। তোমাদের মার্টির জন্যে নিশ্চয়ই তিন-চার জন লোক আছে। কিন্তু এই বাচ্চাটির জন্যে কেউ নেই।'

শারমিন কিছু বলল না। রফিক বলল, 'রাগ করলে নাকি?'

'না, রাগ করি নি। তুমি বস, চা নিয়ে আসছি। দুধ-চা না লেবু-চা?'

'আদা–চা। গলা খুশখুশ করছে।'

রফিক ভেবেছিল মিনিট দশেক গল্পসল্প করে চলে যাবে, কিন্তু সে রাত আটটা পর্যন্ত থাকল। এর মধ্যে যে ক'বারই সে উঠতে চেয়েছে, শারমিন বলেছে, 'আহ্, বস না। এত ব্যস্ত কেন?'

'রাত হয়ে যাচ্ছে, অনেক দূর যাব।'

'যাবার ব্যবস্থা আমি করব। আজ আমার সঙ্গে ভাত খাবে।'

'সে কি, কেন?'

'কেন আবার কি? খেতে বলেছি তাই খাবে।'

'তোমাদের রান্না কী?'

'জানি না কি।'

'তোমাদের কখন কী রান্না হয় তা তোমরা জান না?'

শারমিন কিছু বলল না।

'খাও কিসে? রুপোর থালাবাটিতে?'

'বকবক করবে না। খেতে বসলেই টের পাবে কিসে খাই।'

'খাওয়াটা হবে কখন?'

'একটু দেরি হবে। বাবুর্চিকে নতুন একটা আইটেম রান্না করতে বলেছি।'

'আইটেমটা কী?'

'খেতে বসলেই টের পাবে। এখন আমার সঙ্গে এস, মার্টিকে খাওয়ান হবে।'

'আসতেই হবে?'

'হ্যাঁ, আসতেই হবে।'

রহমান সাহেব ফিরলেন রাত দশটায়। শারমিন একটি ছেলের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে, এবং কিছুক্ষণ পরপর শব্দ করে হেসে উঠছে। এই দৃশ্যটি তিনি অবাক হয়ে দেখলেন। শারমিন বাবাকে দেখতে পায় নি।

রহমান সাহেব নিঃশব্দে দোতলায় উঠে গেলেন। তাঁর কপালে সূক্ষ্ম কিছু ভাঁজ পড়ল।

১০

মনোয়ারার গাল ফুলে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়েছে।

সারা দিন কিছুই মুখে দেন নি। ব্যথায় ছটফট করেছেন। ব্যথা কমানোর কোনো ওষুধ কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না।

সবচে মুশকিল হয়েছে হোসেন সাহেবের। তাঁকে দেখামাত্র মনোয়ারার রাগ চড়ে যাচ্ছে। যা মনে আসছে, তাই বলছেন। হোসেন সাহেব অনেকক্ষণ

সহ্য করলেন। কিন্তু এক সময় স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি থমথমে মুখে বললেন, 'আমার উপর রাগ করছ কেন? তোমার দাঁতব্যথা তো আমি তৈরি করি নি। সে-রকম কোনো ইচ্ছা আমার নেই।'

মনোয়ারা চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, 'আমার সামনে থেকে যাও তো। শুধু শুধু ভ্যাজভ্যাজ করবে না।'

'যাবটা কোথায়?'

'যেখানে ইচ্ছা যাও। শুধু চোখের সামনে থাকবে না।'

'আই সি।'

'কী, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'যাচ্ছি, শেষে আফসোস করবে কিন্তু।'

হোসেন সাহেব কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। নীলু কাপড় ইস্ত্রি করছিল, তাকে গিয়ে বললেন, 'চললাম মা।' নীলু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কোথায় চললেন?' তিনি তার জবাব দিলেন না। অনেক সময় নিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগ গোছালেন এবং এক সময় সত্যি সত্যি বেরিয়ে গেলেন।

নীলু খুব একটা বিচলিত হল না। হোসেন সাহেব প্রায়ই এ রকম গৃহত্যাগ করেন, ঘন্টা দু'-এক রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেন এবং এক সময় বাড়ি ফিরে আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, হোসেন সাহেবের গৃহত্যাগের কিছুক্ষণের ভেতরই মনোয়ারার দাঁতের ব্যথার আরাম হল। তিনি এক কাপ লেবু-চা এবং দু' স্লাইস রুটি খেলেন। রাতের বেলা কী রান্না হচ্ছে খোঁজ নিলেন, তারপর শাহানার সঙ্গে ছোটখাটো একটা ঝগড়া বাধিয়ে বসলেন। ঝগড়া বাধানোর ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তিনি বেশ স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোদের রেজাল্ট বেরুতে এত দেরি হচ্ছে কেন?'

শাহানা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি কী করে বলব এত দেরি হচ্ছে কেন। আমি কি বোর্ডের চেয়ারম্যান?'

মনোয়ারা অবাক হয়ে বললেন, 'তুই এমন ক্যাটক্যাট করে কথা বলছিস কেন? একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম, আর ছ্যাঁৎ করে উঠলি? তোর সঙ্গে কি কথাও বলা যাবে না?'

শাহানা থমথমে মুখে তাকাল। তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তোর তেল বেশি হয়েছে। কাজকর্ম নেই তো, শুধু বসে বসে খাওয়া। বসে-বসে খেলে এমন তেল হয়ে যায়।'

'এ-রকম বাজে করে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না, মা।'

'বাজে করে কথা বলব না?'

'না।'

'কেন? তুই কি রানী ভিক্টোরিয়া?'

'হ্যাঁ, আমি রানী ভিক্টোরিয়া।'

'চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। মুখে-মুখে কথা।'

শাহানা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল, এবং দরজা বন্ধ করে দিল। শাহানার দরজা বন্ধ করা একটা ভয়াবহ ব্যাপার, সহজে এ দরজা সে খুলবে না। ক্রমাগত দু দিন দু' রাত দরজা বন্ধ রাখার রেকর্ড তার আছে। এ দরজা কবে খুলবে কে জানে।

মনোয়ারা কিছুক্ষণ কাঁদলেন, তারপর নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লেন।

নীলু বড়ো অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। এ বাড়ির সবার এখন মেজাজ খারাপ যাচ্ছে। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে রাগারাগি। নীলুর নিজের মন-মেজাজও ভালো না। এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে তার ভালো লাগে না। কিন্তু মাথা ঘামাতে হয়, এক-এক করে সবার রাগ ভাঙাতে হয়। ভালো লাগে না।

সংসারে অভাব-অনটন বাড়ছে। অনেক চেষ্টা করেও কিছু করা যাচ্ছে না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের লোনের টাকা কাটতে শুরু করেছে। বাড়িভাড়া বেড়েছে এক শ' টাকা। নীলুর ধারণা ছিল, খুব সহজেই রফিকের চাকরি হয়ে যাবে। ধারণা ঠিক হয় নি। রফিকের কিছুই হচ্ছে না। সপ্তাহে দু'-তিনটা করে ইন্টারভ্যু দিয়ে হাসিমুখে ঘরে ফিরছে, 'ভাবী, একেবারে মেরেকেটে দিয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'ইয়েস। স্মার্টলি সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। যেখানে হাসার দরকার সেখানে মৃদু হাসলাম। যেখানে গম্ভীর হওয়ার দরকার সেখানে গম্ভীর হলাম।'

'পেরেছ সবকিছু?'

'এইট্টি পারসেন্ট পেরেছি। যেগুলি পারি নি, সেগুলি পারার কথা নয়।'

'চাকরি হবে বলছ?'

'এক জনের হলেও আমার হবে।'

'বল কি!'

'দ্যাটস্ রাইট। এখন চট করে চা-সিগ্রেট খাওয়াও। আমাকে খুশি রাখার চেষ্টা কর। ভবিষ্যতে লাভ হবে। বেতনের দিন ভালোমন্দ কিছু পেয়েও যেতে পার।'

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি কিছুই হয় না। রফিক নতুন কোনো ইন্টারভ্যুর জন্যে তৈরি হয়। নীলুর বড়ো মায়া লাগে। মনোয়ারা রাগারাগি করেন, 'দুনিয়াসুদ্ধ লোকের চাকরি হয়, তোর হয় না কেন?'

'হবে। আমারো হবে।'

'কবে সেটা?'

'ভেরি সুন। কোনো এক সুপ্রভাতে দেখবে রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি এসে হাজির।'

'আমি আর দেখে যেতে পারব না।'

'এখনো তো পাঁচ মাস হয় নি পাশ করেছি, এর মধ্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?

'যার হয় না পাঁচ মাসে, তার হয় না পাঁচ বছরে।'

চিঠি অবশ্যি একটা আসে রফিকের। রেজিস্ট্রি ডাকে নয়—সাধারণ ডাকে। 'মনসুর আলি কলেজে'র প্রিন্সিপ্যালের চিঠি। ইতিহাসের প্রভাষক পদে নিয়োগপত্র। যেতে হবে বরিশালের কোনো এক গ্রামে।

নীলু জিজ্ঞেস করল, 'যাবে নাকি?'

'যাব না মানে? অফকোর্স যাব।'

'থাকতে পারবে গ্রামে?'

'খুব পারব। গ্রামের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বিসিএস-এর জন্য সিরিয়াস একটা প্রিপারেশন নিয়ে নেব। দেখবে ফার্স্ট-সেকেন্ড কিছু একটা হয়ে বসে আছি।'

রফিক মহা উৎসাহে বরিশাল চলে গেল। এবং এক সপ্তাহের মধ্যে মুখ অন্ধকার করে ফিরে এল। শফিক অবাক হয়ে বলল, 'চলে এলি কেন?' রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'আরে দূর, যত ফালতু ব্যাপার! অলরেডি সেখানে একটা ভালো কলেজ আছে। রেষারেষি করে আরেকটা কলেজ দিয়েছে। না আছে মাস্টার, না আছে ছাত্র। এগার জন টীচার আছে, এরা গত পাঁচ মাস ধরে বেতন পাচ্ছে না।'

'বলিস কি!'

'আমি যাওয়ামাত্র প্রিন্সিপ্যাল আমার জন্যে একটা জায়গীরের ব্যবস্থা করে ফেলল। নাইনে পড়ে এক মেয়ে, তাকে পড়াতে হবে। তার বিনিময়ে থাকা-খাওয়া। চিন্তা কর অবস্থা।'

শফিক কিছু বলল না। রফিক শুকনো মুখে বলল, 'ঝুলে থাকতাম সেখানেই, কিন্তু মেয়ের বাবার কথাবার্তা যেন কেমন-কেমন।'

'কেমন-কেমন মানে?'

'ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় মেয়ে বিয়ে দিতে চায় আমার কাছে।'

'বলিস কি!'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম আমাকে ভাই বলত, তারপর বলা শুরু করল—আপনি আমার ছেলের মতো।'

নীলু বলল, 'মেয়েটি দেখতে কেমন?'

'দেখতে ভালোই। বরিশালের মেয়েরা খুব সুন্দর হয়। হাসছ কেন তুমি ভাবী? এর মধ্যে হাসির কিছু নেই। এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার।'

'বিয়ের ভয়েই পালিয়ে এসেছ?'

'সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা ভালো লাগে না।'

'তুমি ওদের বলে এসেছ তো, নাকি না-বলে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছ?'

রফিক কোনো উত্তর দিল না। পরবর্তী বেশ কিছুদিন কাটাল গম্ভীর হয়ে। নীলু ঠাট্টা-টাট্টা করবার চেষ্টা করল, 'কী রফিক, বরিশাল-কন্যার

জন্যে মন খারাপ নাকি?'

'একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে কী সব ঠাট্টা কর, ভালো লাগে না।'

'মেয়েটির দিকে দরদ একটু বেশি বেশি মনে হচ্ছে।'

'স্টপ ইট ভাবী। প্লীজ।'

বিসিএস পরীক্ষাও রফিকের ভালো হল না। ইংরেজি এবং ইতিহাস দু'টার কোনোটাতেই নাকি পাশ মার্ক থাকবে না। রফিকের ধারণা, এগজামিনররা খাতা দেখে হাসাহাসি করবে। হোসেন সাহেব বললেন, 'এতটা খারাপ হল কেন?'

'বোগাস সব কোশ্চেন করেছে, খারাপ হবে না?'

'বিসিএস-এ বোগাস প্রশ্ন করবে কেন?'

'করলে তুমি কী করবে বল? সব মাথা-খারাপের দল। ইতিহাসের প্রশ্ন পড়লে মনে হয় জিওগ্রাফির কোশ্চেন।'

'বলিস কি?'

'বিশ্বাস না হলে তুমি পড়ে দেখ।'

পরীক্ষা খারাপ দিয়ে রফিক খুবই মুষড়ে পড়ল। সে ধরেই নিয়েছিল, ভালো করবে। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কও কমে গেল। নাশতা খেয়ে বেরিয়ে যায়, রাত দশটা-এগারটায় ফেরে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই রেগে যায়। কথাবার্তা যা হয় নীলুর সঙ্গেই। তাও সব দিন নয়, যেদিন মেজাজ ভালো থাকে সেদিন।

নীলু বুঝতে পারে, রফিক হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করেছে। এটা কাটিয়ে তোলার জন্যে তার কিছু করা উচিত, কিন্তু সে কী করবে বুঝতে পারে না। আগে মাসের মধ্যে বেশ কয়েক বার রফিক টাকা চাইত। এখন আর চাচ্ছে না। চাইতে লজ্জা পাচ্ছে বোধহয়। দিন দশেক আগে হঠাৎ করে চাইল, 'ভাবী, তোমার গোপন সঞ্চয় থেকে কিছু দিতে পারবে?'

'কত?'

'সামান্য কিছু, ধর পঞ্চাশ।'

নীলু এক শ' টাকা এনে দিল।

'গোটাটা দিলে নাকি ভাবী?'

'হুঁ, দিলাম।'

'থ্যাংক্স্। মেনি থ্যাংক্স্।'

'আমাকে থ্যাংক্স্ কেন? তোমার ভাইকে দাও। আমি তো তার ধনেই পোদ্দারি করছি।'

'ভাইয়াকেও থ্যাংক্স্। আমি ভাবী, সব লিখে রাখছি। ভেরি সুন তোমাদের সব পয়সা ফেরত দেব, উইথ ইন্টারেস্ট।'

'ঠিক আছে, দিও।'

'মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই একটা কিছু হবে।'

'তাই নাকি?'

'সেভেন্টি পারসেন্ট পসিবিলিটি। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সে বলেছে--আপনার মত ইয়াং এ্যাকটিভ ম্যানদেরই এখন দরকার। নিউ ব্লাড। নিউ আইডিয়া।'

'বেতন কেমন?'

'ফ্যানটাস্টিক বেতন। বিদেশী কোম্পানি।'

'তোমার ভাইয়েরটাও তো বিদেশী কোম্পানি। বেতন তো এমন কিছু না।'

'কোম্পানিতে কোম্পানিতে বেশকম আছে ভাবী।'

'তোমাদেরটা খুব রমরমা কোম্পানি বুঝি?'

'খুবই রমরমা। গাড়ি এসে দিয়ে যাবে, নিয়ে যাবে।'

'বল কি!'

'কোম্পানির নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। থ্রী বেড রুম। দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।'

'ফ্ল্যাট দেখে এসেছ?'

'না, আমি দেখি নি। ঐ অফিসের অন্য অফিসারদের সঙ্গে আলাপ হল। সবাই বেশ মাইডিয়ার।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। বেশ কয়েক জন মহিলা আছেন। বড়ো বড়ো পোস্টে। বুঝলে ভাবী, মেয়েদের জন্যে আজকাল চাকরির খুব সুবিধা। তুমি যদি চেষ্টা কর, উইদিন টু মানথস্ একটা কিছু জুটিয়ে ফেলতে পারবে।'

'সত্যি?'

'ইউ বেট। বি.এ. পাশ আছ। দেখতে-শুনতেও মোটামুটি খারাপ না। চলে যায়।'

'চলে যায় মানে?'

'ডানাকাটা পরী তুমি নও ভাবী। এ-রকম কোনো মিসকন্সেপসন থাকা উচিত না। তবে দেখতে খারাপও না।'

নীলু হেসে ফেলল। রফিক সিগারেট ধরিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আমার কথা শোন ভাবী, চাকরির চেষ্টা কর। এই যুগে একার রোজগারে কিছু হয় না। দু' জনে মিলে হাল ধর।'

'তোমার ভাই পছন্দ করবে না।'

'এর মধ্যে পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই। কোশ্চেন অব সারভাইভেল।'

চাকরির ব্যাপার নিয়ে অনেক দিন থেকেই নীলু ভাবছে। বন্যা গত মাসে এসেছিল। তাকে এক সময় বলেই ফেলেছে, 'তুই বলেছিলি আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিবি। চাকরি জুটিয়ে দিবি। মনে আছে?'

'মনে থাকবে না কেন? করতে চাস?'

'হুঁ। কী রকম চাকরি?'

'মোটামুটি ধরনের একটা কিছু, তোকে তো আর ফস্ করে ক্লাস ওয়ান অফিসার বানিয়ে ফেলবে না।'

'কেরানির চাকরি?'

'অসুবিধা আছে? দেড়–দু' হাজার টাকা পাবি সব মিলিয়ে। এই বাজারে এটাই–বা মন্দ কী? করবি? তাহলে আগামী সোমবার আয় আমার অফিসে। আমি কথা বলে রাখব।'

'কার সঙ্গে কথা বলবি?'

'লোক আছে। তুই আয় তো।'

নীলু সোমবারে যেতে পারে নি। বুধবারে সত্যি সত্যি গিয়ে উপস্থিত। বন্যা অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নিল। হাসিমুখে বলল, 'তোর এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে হাতে দেবার ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার নাম বন্যা নয়।'

'বলিস কি তুই!'

'মামাকে তোর কথা বলে রেখেছি। সার্টিফিকেটগুলি এনেছিস?'

'না।'

'বললাম না সার্টিফিকেটগুলি সব আনতে?'

'এখন গিয়ে নিয়ে আসব?'

'আচ্ছা থাক, পরে হলেও চলবে।'

মতিঝিলের এমন একটি অফিসে তারা ঢুকল যে, নীলুর বুক কাঁপতে শুরু করল। রিসিপশনে উগ্র ধরনের সাজ–করা ভারি সুন্দরী একটি মেয়ে। ঝকঝক তকতক করছে চারদিক।

'এইটাই নাকি অফিস?'

'হুঁ, কেন, পছন্দ হচ্ছে না?'

নীলু কিছু বলল না। বন্যা বলল, 'চল, মামার সঙ্গে তোকে পরিচয় করিয়ে দিই। মুখ এমন শুকনো করে রেখেছিস কেন?'

নীলু ফিসফিস করে বলল, 'এখানে আমার চাকরি হবে না।'

'বুঝলি কী করে হবে না?'

'আমার মন বলছে হবে না। কিছু কিছু জিনিস আমি টের পাই। সিক্সথ সেন্স।'

'রাখ তোর সিক্সথ সেন্স।'

বন্যার মামা তেমন কোনো উৎসাহ দেখালেন না। দু'একটা ছোটখাট প্রশ্ন করলেন--কবে পাস করেছেন? এর আগে কোথাও চাকরি করেছেন? টাইপিং জানা আছে কিংবা শর্টহ্যাণ্ড? বাসা কোথায়? এমন কিছু জটিল প্রশ্ন নয়, কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে নীলুর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল এবং এক বার মনে হল, না এলেই ভালো ছিল।

ভদ্রলোক তাদের কফি খেতে বললেন। প্রাইভেট ব্যবসার নানা সমস্যার কথা বললেন এবং এক সময় টেলিফোন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দু'টি

মেয়ে বসে আছে তাঁর সামনে, এটা তাঁর মনেই রইল না। নীলু ফিস-ফিস করে বন্যাকে বলল, 'আমরা কি চলে যাব?' বন্যা ইশারায় তাকে বসতে বলল। সবচে যে জিনিসটি নীলুর কাছে আশ্চর্যজনক মনে হল, তা হচ্ছে—বন্যার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। বন্যা নিজেও কেমন যেন মিইয়ে আছে। নীলু লক্ষ করল, তাদের দু' জনের মধ্যে কথাবার্তা প্রায় কিছুই হয় নি। এমন এক জন অল্প পরিচিত মানুষের কাছে বন্যা তাকে এতটা ভরসা দিয়ে কেন নিয়ে এসেছে, কে জানে! নীলুর বেশ মন খারাপ হল।

টেলিফোনে ভদ্রলোক প্রায় এক ঘন্টা কথা বললেন। খুব জরুরি টেলিফোন বোধহয়। কারণ কথা শেষ করেই তিনি বললেন, 'আমি আজ একটু ব্যস্ত।' অর্থাৎ উঠতে বলা হচ্ছে। বন্যা শুকনো মুখে বলল, 'একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেন মামা। চাকরির ওর খুব দরকার।' রাগ হবার মতো কথা। নীলুর চাকরির এমন কিছু দরকার নেই। কিন্তু বন্যা এমনভাবে কথাটা বলল, যেন নীলু ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়ে আছে।

ভদ্রলোক নিরাসক্ত গলায় বললেন, 'আমাদের এখানে কোনো ওপেনিং নেই। ভবিষ্যতে হবে, এ-রকম আশাও নেই। তবে আমার কাছে পার্টিকুলার্স রেখে যান, আমি দু'-এক জনকে বলে দেখব।'

'ও কিন্তু মামা অত্যন্ত ভালো মেয়ে।'

'ভালো মেয়েদের অফিসে দরকার নেই, অফিসে দরকার এফিশিয়েন্ট মেয়ে।'

'ও খুব এফিশিয়েন্ট।'

'বুঝলে কী করে? উনি তো এর আগে অফিসে কোনো কাজ করেন নি।

'মামা, আপনি একটু দেখবেন।'

'নিশ্চয়ই দেখব। নাম-ঠিকানা এবং একটা বায়োডাটা আপনি আমার সেক্রেটারির কাছে দিয়ে যান।'

নীলুর এসব করার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বন্যা এমন আগ্রহ নিয়ে এসেছে, তাকে না বলতে খারাপ লাগল। সে এমন ভাব করছে যেন বায়োডাটা লিখে দিলেই তার চাকরি হয়ে যাবে। এমন ছেলেমানুষও থাকে এই যুগে!

নীলু বাড়ি ফিরল খুব মন খারাপ করে। এতটা মন খারাপ হবে সে নিজে বুঝতে পারে নি। সে বোধহয় ধরেই নিয়েছিল চাকরিটা হবে। নানা রকম পরিকল্পনাও তার ছিল। প্রতি মাসে মাকে কিছু টাকা পাঠাবে। বেতন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মানি অর্ডার করবে। যত দিন মা বেঁচে থাকবেন তত দিনই পাঠানো হবে। এ বাড়ির কারোর কিছু বলার থাকবে না। তার নিজের টাকা। দু' একটা শখের জিনিস কিনবে। একটা টিভি। একটা ফ্রিজ। একটা হারমোনিয়াম। গানের দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল। তার বাবারও ছিল। বাবাই দু' মেয়েকে গান শিখিয়েছিলেন। বাবা মারা যাবার পর কোথায় সব ভেসে

গেল!

কী চমৎকার গানের গলা ছিল বিলু আপার! বাবা সব সময় বলতেন, 'আমার এই মেয়ে গান গেয়ে পাগল করে দেবে সবাইকে।' কোথায় গেল গান, কোথায় কি!

নীলু তার বোনের কথা কখনো ভাবতে চায় না। ওটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন। কোনোকালে তার যেন কোনো বোন ছিল না। বিলু নামের কাউকে সে চেনে না। কিন্তু তবু এককে সময় এমন পরিষ্কারভাবে বিলু আপার মুখ মনে আসে--আদুরে, স্নিগ্ধ একটা মুখ! যেন সে বলছে, 'কিরে নীলু, রোদে ঘুরে তোর মুখটা রাঙা হয়ে আছে। দেখি, বস তো আমার পাশে।' নীলু প্রায়ই ভাবে, এত মায়াবতী একটি মানুষ কী করে হয়! কী দুঃখী মেয়েই না ছিল বিলু আপা, অথচ কী সুখী-সুখী চেহারা! গভীর দুঃখের কিছুমাত্র ছাপ ছিল না বিলু আপার চোখে। আনন্দ উজ্জ্বল হাসি-হাসি দু'টি চোখ।

শফিক সাধারণত রাত আটটার মধ্যে এসে পড়ে। সাড়ে আটটা বাজছে, এখনো তার ফেরার নাম নেই। হোসেন সাহেবও ফেরেন নি। কোথায় ঘুরছেন কে জানে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর রাগ থাকে না। আজ আছে। রাগ পড়ে নি শাহানারও। এখনো তার ঘরের দরজা বন্ধ। মনোয়ারা রাগ ভাঙানোর চেষ্টা করেছেন, লাভ হয় নি।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দিন খারাপ করেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি হলে ভালোই হবে। গুমোট হয়ে আছে। নীলু আকাশের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

টুনী জেগে উঠেছে। তার হাসি শোনা যাচ্ছে। অদ্ভুত স্বভাব হয়েছে মেয়েটার, ঘুম ভেঙে হাসতে শুরু করে। পৃথিবীর সব বাচ্চারাই জেগে উঠে কাঁদে। শুধু টুনীই বোধহয় হাসে। দূর থেকে টুনীর হাসি শুনতে এমন মজা লাগছে।

'বৌমা।'

নীলু চমকে তাকাল। মনোয়ারা টুনীকে কোলে নিয়ে বারান্দায় চলে এসেছেন।

'একটু হলেই তো সর্বনাশ হত! কী যে কাণ্ড কর তুমি!

'কী হয়েছে মা?'

'খাটের কিনারে শুইয়ে রেখেছ। নিজে নিজে উঠে বসেছে, একটু হলেই পড়ত। এত অসাবধান হলে চলে?'

নীলু কিছু বলল না।

'বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'দিন খারাপ করেছে মা।'

'ঘরে আস। দরজা-জানালা বন্ধ কর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার দরকারটা

কী?'

জানালা বন্ধ করবার আগেই হঠাৎ করে প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করল। রীতিমতো ঝড়। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। মনোয়ারা টুনীকে কোলে নিয়ে অকারণেই ছোটাছুটি করতে লাগলেন। মোমবাতি খুঁজে পাওয়া গেল না। হারিকেনে তেল নেই। প্রচণ্ড শব্দে বাথরুমের জানালার একটা কাচ ভাঙল। মনোয়ারা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'বৌমা, তোমার কি কোনো কালেও বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না! ঝড়-বাদলার দিনে হাতের কাছে হারিকেন রাখবে ঠিকঠাক করে--এক ফোঁটা তেল নেই হারিকেনে। এসব কী?'

টুনীও ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। নীলু বলল, 'ওকে আমার কাছে দিন মা।'

মনোয়ারা রেগে গেলেন, 'অন্ধকারে হাত থেকে ফেলবে। ও থাকুক আমার কাছে। তুমি তোমার কাজ কর।'

করার মতো কোনো কাজ নেই। নীলু তার ঘরে চলে গেল। ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। এক-এক বার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আলো হয়ে উঠছে চারদিক। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে। মনে হয় এই কাছেই কোথাও যেন পড়ল। চুপচাপ বসে থাকতে ভালোই লাগছে নীলুর।

'ভাবী।'

নীলু তাকাল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে শাহানা এগিয়ে আসছে। নীলু হাসিমুখে বলল, 'রাগ কমেছে নাকি শাহানা?'

শাহানা জবাব দিল না। নীলু হালকা গলায় বলল, 'ওদের কী অবস্থা, কে জানে!'

'কাদের?'

'বাবা আর রফিক।'

'তোমার বরের কথা তো কিছু বল নি। নাকি ভাইয়াকে নিয়ে তুমি ভাব না?'

'ভাবি।'

শাহানা উঠে এল খাটের উপর। মৃদুস্বরে বলল, 'হঠাৎ করে এমন দিন খারাপ হল কীভাবে? যা ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কী আছে?'

টুনী কাঁদছে। মনোয়ারা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছেন। কোনো লাভ হচ্ছে না। শাহানা বলল, 'ভাবী, তুমি টুনীকে নিয়ে এস তো।'

'তুমি নিয়ে এস, আমার কাছে দেবেন না।'

'আমি যাচ্ছিটাচ্ছি না।'

নীলু হালকা গলায় বলল, 'এত ছোট ব্যাপার নিয়ে এ-রকম রাগ করে

কেউ? জীবনে রাগ করার মতো অনেক বড়ো বড়ো ব্যাপার ঘটবে।'

শাহানা মৃদুস্বরে বলল, 'হঠাৎ করে আমার কেমন যেন রাগ ধরে যায়। আর এ-রকম করব না।'

'মোমবাতি কোথায় আছে জান?'

'জানি। আমার টেবিলের ড্রয়ারে।'

'একটা মোমবাতি মা'র ঘরে দিয়ে আস না। টুনী অন্ধকার দেখে কাঁদছে।'

'আমি পারব না ভাবী। তুমি যাও।'

নীলু মোমবাতি জ্বালিয়ে মনোয়ারার ঘরে রেখে এল। টুনীর কান্না থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হাত-পা ছুঁড়ে খেলা জুড়ে দিল। নীলুর ইচ্ছা হল বলে, 'ওকে আমার কাছে একটু দিন না মা।' কিন্তু সে কিছু বলল না। মনোয়ারা দেবেন না।

-বৌমা, ক'টা বাজল?'

'ন'টা পঁচিশ।'

'এ তো মহাচিন্তায় পড়লাম। কোথায় আটকা পড়ল ওরা কে জানে?'

'এসে পড়বে মা। আপনার দাঁতব্যথা কমেছে?'

'কমেছে।'

'কিছু খাবেন আপনি? দুপুরে তো কিছু খান নি।'

'না, কিছু খাব না। তুমি দেখ, শাহানার রাগ ভাঙাতে পার কিনা। যন্ত্রণা হয়েছে একটা!'

'ওর রাগ ভেঙেছে মা। আমার ঘরে বসে আছে।'

মনোয়ারা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

দরজায় ধাক্কা পড়ছে। নীলু দরজা খুলে দেখল, আনিস দাঁড়িয়ে আছে। কাকভেজা হয়ে গেছে সে।

'ব্যাপার কী আনিস?'

'অবস্থা কাহিল ভাবী। চা খাওয়াতে পারবেন?'

'তা পারব। শুকনো কাপড় কিছু পরে আস।'

'শুকনো কাপড় আমার কিছু নেই ভাবী। ঘর ভেসে গেছে। একটা গামছা-টামছা কিছু দিন।'

'এস ভেতরে। শাহানাকে বলছি, কাপড় দেবে তোমাকে।'

নীলু চা বানিযে বসার ঘরে ঢুকে দেখল, অন্ধকারে আনিস এবং শাহানা পাশাপাশি বসে আছে। ওদের বসার ভঙ্গিটার মধ্যেই কিছু একটা ছিল যা দেখে হঠাৎ নীলু একটু চমকাল। ভালোবাসাবাসির কোনো ব্যাপার নেই তো? শাহানার বয়স খুবই কম। এই সময়ে মন তরল থাকে। সবাইকেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

দরজায় আবার ধাক্কা পড়ছে। হোসেন সাহেবের গলা পাওয়া যাচ্ছে-'ও বৌমা, বৌমা।'

রাত দশটার মধ্যে ভিজতে ভিজতে সবাই এসে উপস্থিত হল। তুমুল বর্ষণ হল সারা রাত। আনিস থেকে গেল এ বাড়িতে। সোফার উপর বিছানা হল তার, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল সে।

জেগে রইল শাহানাও। সমস্ত রাত তার মন কেমন করতে লাগল।

আজ প্রথম বারের মতো সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছে। আনিস ভাই যখন গামছায় তার মাথার ভেজা চুল মুছছে, তখন হঠাৎ তার ইচ্ছা করছিল গামছাটা তার কাছ থেকে নিয়ে নিতে। তার বলতে ইচ্ছা করছিল, 'আনিস ভাই, মাথাটা নিচু করুন, আমি মুছিয়ে দিচ্ছি।' কেন এ-রকম মনে হল? এ-রকম মনে হওয়া নিশ্চয়ই খুব খারাপ। খুব খারাপ মেয়েদেরই নিশ্চয়ই এ-রকম মনে হয়। কিন্তু সে খারাপ মেয়ে হতে চায় না। সে খুব একটা ভালো মেয়ে হতে চায়।

শাহানা চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে কাঁদতে শুরু করল। সে অন্ধকারে একা ঘুমুতে ভয় পাবে বলেই মনোয়ারা আজ তার সঙ্গে ঘুমিয়েছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে শাহানা, কাঁদছিস কেন?' শাহানা ধরা গলায় বলল, 'জানি না কেন।'

অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট হচ্ছে শাহানার। এ ধরনের কষ্ট পৃথিবীতে আছে, তা তার জানা ছিল না। মনোয়ারা শাহানার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন। তিনি কি কিছু বুঝতে পারছেন? মায়েরা অনেক কিছু বুঝে ফেলে।

শাহানা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে মা।'

১১

কবির সাহেব সাধারণত অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে ওঠেন। হাত-মুখ ধুয়ে হারিকেন জ্বালিয়ে তাঁর পড়ার টেবিলে বসেন। জরুরি লেখালেখির কাজগুলি সূর্য ওঠার আগেই সেরে ফেলা হয়। আজ তেমন কোনো জরুরি লেখালেখির ব্যাপার নেই। অভ্যাস-বশে লেখার টেবিলে বসেছেন। শুধু শুধু বসে থাকার কোনো মানে হয় না, তিনি একটি প্রবন্ধ লিখতে বসলেন। প্রবন্ধের নাম—স্বাধীনতা। প্রথমে ইচ্ছা ছিল "মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা" এই বিষয়ে কিছু লিখবেন। প্রতিটি লেখারই নিজস্ব প্রাণ আছে। সে লেখাকে ঘুরিয়ে দেয়। এই লেখাটিও সে-রকম হল। তিন পৃষ্ঠা লেখার পর কবির সাহেব লক্ষ করলেন, দেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে না লিখে তিনি লিখছেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রসঙ্গে। তিনি ভুরু কুঁচকে লেখাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর বয়স হয়ে যাচ্ছে, যা ভাবছেন তা লিখতে পারছেন না। এটা বয়সের লক্ষণ। জরার লক্ষণ। সময় কি তাহলে শেষ হয়ে আসছে? তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেললেন। মানুষের মতো এমন শক্তিধর একটি প্রাণী এত ক্ষীণ আয়ু নিয়ে আসে কেন? একটি কচ্ছপ বাঁচে আড়াই শ' বছর। কচ্ছপের আড়াই শ' বছর বাঁচার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের অপচয়।

শওকত উঠে পড়েছে। সে সাড়াশব্দ করে ডন-বৈঠক করছে। কবির সাহেব বিরক্ত হয়ে তাকালেন শওকতের দিকে। গুনে গুনে সে পঞ্চাশটা ডন দেবে, তারপর কেরোসিন কুকার জ্বালিয়ে চা বানাতে বসবে। বিরাট একটা জামবাটিতে শরবতের মতো মিষ্টি চা এনে টেবিলে রেখে গালভর্তি হাসি দিয়ে বলবে, 'স্যার, চা।' চা তিনি খান না। বহু বার এই কথা শওকতকে বলা হয়েছে। কোনো লাভ হয় নি। সে কাজ করে তার নিজের ইচ্ছায়। অন্য কেউ কী বলছে না-বলছে, তার কোনো তোয়াক্কা করে না। তার ধারণা, সকালবেলা এক বাটি চা দিয়ে সে স্যারের সেবা করছে, এবং স্যারের আপত্তিটা মৌখিক—আসলে তিনি মনে মনে খুশিই হন।

শওকত তাঁর সঙ্গে এসে জুটেছে মাস তিনেক হয়। তবে কবির সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের। নীলগঞ্জ স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়বার সময় সে উধাও হয়ে যায়। কোথায় আছে, কী করছে, কেউ বলতে পারে না। মাসখানেক পর খবর পাওয়া গেল সে এক সার্কাস পার্টিতে ঢুকে সোহাগী চলে গেছে। নিউ অপেরা সার্কাস। খুব বড়ো দল। কবির সাহেব খবর পেয়ে সোহাগী চলে যান এবং কানে ধরে তাকে নীলগঞ্জে নিয়ে আসেন। কানে ধরা কথাটা মুখের কথা নয়, সোহাগী থেকে নীলগঞ্জ আসার সারাটা পথ তিনি সত্যি সত্যি তার কান চেপে ধরে ছিলেন। পরবর্তী এক বৎসর কোনো রকম ঝামেলা হয় না। সে ক্লাস এইটে প্রমোশন পায়। ক্লাস এইটেই সে মহা গুণ্ডা হিসেবে নীলগঞ্জে মোটামুটি একটা ত্রাসের সৃষ্টি করে। নীলগঞ্জের চেয়ারম্যান সাহেবের ছোট মেয়ের জামাইয়ের সঙ্গে কী একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে। এবং লাথি মেরে তার পা ভেঙে ফেলে। কবির সাহেব খবর পেয়ে বেত হাতে তাকে ধরতে যান। তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। তার বাবা গ্রামের দরবার ডেকে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেন। পুত্রের প্রতি বিরাগবশত এটা অবশ্যি করা হয় না, করা হয় চেয়ারম্যান সাহেবের রোষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। চেয়ারম্যান হাজি খবিরউদ্দিন খুব সহজ লোক না।

যাই হোক, পরবর্তী চার বছর শওকতের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। উড়ো খবর আসে, সে চলে গেছে আসাম। এত জায়গা থাকতে আসাম যাবার কারণটি কারোর কাছেই পরিষ্কার হয় না।

চার বছর পর এক সকালবেলা কবির সাহেব দেখলেন তাঁর বাড়ির বারান্দায় শওকত ঘুমাচ্ছে। চেনার উপায় নেই। বিশাল জোয়ান।

'কি রে, তুই কোত্থেকে?'

'স্যারের শরীরটা ভালো?'

'আমি ভালো, তুই এসেছিস কখন?'

'রাইতে।'

'বাড়িতে যাস নি?'

'না, বাড়িত গিয়া কী হইব?'

'এইখানেই থাকবি নাকি?'

'হুঁ।'

কবির সাহেবের ধারণা, কিছুদিন থাকবে, তারপর নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। কিন্তু এ-রকম কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। খাচ্ছে-দাচ্ছে, আছে নিজের মতো। এর মধ্যে খবর পেয়েছেন, সে খবিরউদ্দিনকে শাসিয়ে এসেছে। বলে এসেছে, 'বেশি তেড়িবেড়ি করলে বিলের মইধ্যে পুইত্তা থুইয়াম।' ভয়াবহ ব্যাপার!

কবির সাহেব সরবতের মতো মিষ্টি চায়ের খানিকটা খেলেন। সূর্য উঠি-উঠি করছে। বেরিয়ে পড়বার সময় হয়েছে। সূর্য ওঠার আগেই তিনি সমস্ত গ্রামে একটা চক্কর দিয়ে আসেন।

কয়েক দিনের বৃষ্টিতে রাস্তা প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে আছে। পা রাখামাত্রই দেবে যাচ্ছে। কবির সাহেব চটি খুলে ফেললেন। পাজামা হাঁটু পর্যন্ত টেনে তুললেন। এক হাতে একটি ছাতা নিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগলেন। আকাশ মেঘলা হয়ে আছে। বৃষ্টি শুরু হবার সম্ভাবনা। এ-রকম দিনে না বের হলেও চলত। কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে--সকালে না ঘুরলে মনে হয় দিনটা ঠিকমতো শুরু হল না। কিছু একটা যেন বাকি রয়ে গেল।

সূর্য এখনো ওঠে নি, কিন্তু গ্রাম জেগে উঠেছে। শহরের সাথে গ্রামের সবচে বড়ো পার্থক্য হচ্ছে, শহরের মানুষরা কখনো সূর্যোদয় দেখে না। কবির সাহেবের মনে হল, সূর্যোদয় দেখাটা অত্যন্ত জরুরি। এই দৃশ্যটি মানুষকে ভাবতে শেখায়। মন বড়ো করে। কবির সাহেবের পরক্ষণেই মনে হল, মন বড়ো করে, ধারণাটা ঠিক না। গ্রামে অত্যন্ত ছোট মনের মানুষদের তিনি দেখেছেন। মন বড়ো-ছোট ব্যাপারটির সঙ্গে প্রকৃতির কোনো সম্পর্ক বোধহয় নেই।

'মাস্টার সাব, স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছ কুদ্দুস?'

'জ্বি মাস্টার সাব, আপনের দোয়া।'

'যাও কোথায় এত সকালে?'

'ইস্টিশনে যাই। ঢাকা যাওন দরকার।'

'ট্রেন তো সকাল দশটায়, এখনই কোথায় যাও!'

কুদ্দুস কিছু বলল না। কবির সাহেবকে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে সে প্রায় রাস্তায় নেমে গেল। কবির সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, "স্টেশনে এতক্ষণ বসে থেকে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে,এটা ঠিক না।" অশিক্ষার জন্যে এটা হচ্ছে। দশটায় ট্রেন, গিয়ে বসে থাকবে ছ' টার সময়।

'মাস্টার সাবের শইলডা বালা?'

'হ্যাঁ, ভালোই।'

কুদ্দুস তার পেছন পেছন আসতে লাগল। দু' জনে হাঁটছে নিঃশব্দে। রাজারামের পুকুর ঘাট পর্যন্ত এসে কবির সাহেব বললেন--

'তুমি তো উল্টোদিকে আসছ কুদ্দুস, ইস্টিশানে যাবে ইস্টিশনে যাও।'

'জ্বি আচ্ছা।'

কুদ্দুস উত্তরের সড়কের পথ ধরল। কবির সাহেব দিঘিতে পা ধোয়ার জন্যে নামলেন। পা ধোয়া অর্থহীন। আবার কাদা লাগবে। কিন্তু রাজারামের এই দিঘির কাছে এলেই পানিতে হাত-পা ডোবাতে ইচ্ছে করে। বিশাল দিঘি। আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি। এই ঘোর বর্ষায়ও এর জল কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ।

হাত পা ধুতে ধুতেই কবির সাহেব লক্ষ করলেন, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দু'জন ভিখিরি যাচ্ছে। এই দৃশ্যটি নতুন। গ্রামের মানুষজন সহজে ভিক্ষা করে না। এরা কি এই গ্রামেরই নাকি? তিনি হাত ইশারা করে ডাকলেন' না, এরা এ গ্রামের না। কবির সাহেব কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'বাড়ি কোন গ্রামে? কত দিন ধরে ভিক্ষা করছ? বসতবাড়ি আছে? ছেলেমেয়ে নেই? ভিক্ষা করতে করতে কত দূর যাও? রাতে নিজ গ্রামে ফিরে যাও, না থেকে যাও?'

ওরা বেশ আগ্রহ নিয়েই প্রশ্নের জবাব দিল। গ্রামের ভিক্ষুকরা শহরের ভিক্ষুকদের মতো নয়, এরা কথা বলতে পছন্দ করে। জীবন সম্পর্কে আগ্রহ এখনো আছে। কবির সাহেব হাত-মুখ ধুয়ে উঠে দাঁড়াতেই ওদের এক জন চিকন সুরে বলল, 'চাচামিয়া, আট আনা পয়সা দেন।' কবির সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি ভিক্ষা দিই না।'

ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তিনি উত্তরের সড়ক ধরলেন। সূর্য উঠে গেছে, এখন আর হাঁটতে ভালো লাগবে না। গ্রামে ভিক্ষুক বাড়ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। এটা হতে দেওয়া যায় না। গ্রাম হচ্ছে উৎপাদনের জায়গা, এখানে ভিক্ষুক তৈরি হলে চলবে কীভাবে?

'স্যার, স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। রকিব ভালো আছ?'

'জ্বি স্যার। একটু বসবেন না?'

'না, আরেক দিন।'

রকিব সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। সে গ্রামে থাকে না। রাজশাহীতে ফুড সাপ্লাইয়ে কাজ করে। অল্প দিনের মধ্যেই পয়সাকড়ি করে ফেলেছে। বাড়ি এসেছে ঘর পাকা করবার জন্যে।

'স্যার, একটা দোনলা বন্দুক কিনলাম।'

'তাই নাকি? বন্দুক কেন?'

'একটা বন্দুক থাকলে স্যার ডাকাতি হয় না। জানেন তো আশেপাশে খুব ডাকাতি হচ্ছে।'

'তাই নাকি? জানি না তো।'

'খুব হচ্ছে স্যার। এই গ্রামেও হবে। বন্দুকটা কিনলাম এই জন্যেই। আসেন না স্যার, একটু দেখে যান।'

'বন্দুক-টন্দুকের ব্যাপারে আমার উৎসাহ নেই রকিব। বন্দুক দিয়ে কিছু হয় না।'

বলেই তাঁর মনে হল কথাটা ঠিক না। মুক্তিযুদ্ধ বন্দুক দিয়েই করতে হয়েছে। বন্দুক একটা অত্যন্ত দরকারি জিনিস।

'রকিব!'

'জ্বি, স্যার।'

'বন্দুক দিয়ে কিছু হয় না, তোমাকে যে বললাম—এটা ঠিক না। বন্দুকের দরকার আছে।'

'জ্বি, স্যার, তা তো আছেই। গ্রামের এক বাড়িতে বন্দুক আছে শুনলে সেই গ্রামে আর ডাকাত আসে না।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার।'

'তোমার বন্দুক বাড়িতেই থাকবে?'

'জ্বি।'

'তুমি কত দিন আছ?'

'এক সপ্তাহ থাকব স্যার। কাল এক বার আসব আপনার কাছে?'

'কোনো কাজে? না, এমনি দেখা-সাক্ষাৎ?'

'একটা কাজ স্যার আছে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'কখন আসলে পাওয়া যাবে আপনাকে?'

'সব সময়। যাব আর কোথায়? ঘরেই থাকি সারা দিন।'

রকিব বিদায় নিতে গিয়ে পা ছুঁয়ে সালাম করল। এটা একটা নতুন ব্যাপার। কোনো উদ্দেশ্য আছে কি? উদ্দেশ্য ছাড়া আজকাল কেউ কিছু করে না। তিনি ভুরু কোঁচকালেন। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়। খবর পেয়েছিলেন, শিয়ালজানি খালে পানি বাড়ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। বন্যা এ বছরও কি হবে? একটু ঘুরে শিয়ালজানি খালটা দেখে গেলে হয়। একটা বাঁধ-টাধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রতি বছর বন্যা হলে তো সবাই ভিখিরি হয়ে যাবে। চিন্তিত মুখে তিনি শিয়ালজানি খালের দিকে রওনা হলেন। ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। সঙ্গে ছাতা আছে, কিন্তু ছাতা মেলতে ইচ্ছা করছে না। পথে যেতে যেতে তাঁর মনে হল, আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। কাজে হাত দেওয়া দরকার। মানুষ কচ্ছপ নয়, সে আড়াই শ' বছর বাঁচে

না। অল্প কিছুদিন বাঁচে। যা করবার, এই অল্প সময়ের মধ্যেই করতে হবে। শুরু করতে হবে একা, তারপর অনেকে এসে দাঁড়াবে পাশে। কোনো সৎকাজে মানুষের অভাব হয় না। মানুষ এক সময় না এক সময় পাশে এসে দাঁড়ায়। তাঁর পাশেও লোকজন এসে দাঁড়াবে।

ছাত্রদের কাছে চিঠি লিখতে হবে। দেখা করতে হবে সবার সাথে। অনেক কাজ। শিয়ালজানি খালের পাড়ে কবির সাহেব দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। ছাতা মেলতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। পানি সত্যি সত্যি অনেকখানি বেড়েছে। ছোট একটা খাল। কিন্তু কত অল্প সময়ের নোটিশে বিশাল হয়ে যেতে পারে। এ–রকম নজির আছে।

'স্লামালিকুম মাস্টার সাব।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'খালের পানি বাড়তাছে।'

'হুঁ।'

'এই বছর কিন্তুক পানি অইত না।'

'বুঝলে কীভাবে?'

'পরপর দুই সন বান হয় না। তারপর পানিটা দেখেন, ভারি পানি, বানের পানি অয় পাতলা।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'ভারি–পাতলা বোঝ কীভাবে?'

'হাতে নিলেই বুঝন যায়।'

কবির সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, 'খালের তীর বরাবর বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করব, বুঝলে মজনু মিয়া?'

'এইটা সম্ভব না মাষ্টার সাব।'

কবির সাহেব রাগী গলায় বললেন, 'অসম্ভব বলে কোনো জিনিস নেই, মজনু মিয়া, সবই সম্ভব। মানুষের ক্ষমতা খুব বেশি। অবশ্যি বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না। এস, ছাতার নিচে এস, ভিজছ কেন?'

মজনু মিয়া হাসতে হাসতে বলল, 'ভিজতে ভালো লাগে মাষ্টার সাব।'

মজনু মিয়ার দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে। ভালো লাগছে দেখতে।

তিনিও ছাতা নামিয়ে ফেললেন। মজনু অবাক হয়ে বলল 'ও মাষ্টার সাব, ভিজতাছেন তো!'

'বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোই লাগছে।'

মজনু মনে–মনে ভাবল, আমাদের মাষ্টার খুব পাগলা কিসিমের আছে।

সন্ধ্যার দিকে খবর এল, শিয়ালজানি খালের পানি অনেকখানি বেড়েছে। এই

হারে বাড়তে থাকলে রাতের মধ্যে গ্রামে পানি ঢুকবে। নীলগঞ্জের সমস্ত মানুষ শঙ্কিত। খালের পাশে লোকজন আছে। অবস্থা তেমন দেখলে হাঁক-ডাক দেবে।

কবির সাহেব সন্ধ্যা থেকেই চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। সকালবেলা বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক হয় নি। জ্বর এসে গেছে। গলা ব্যথা করছে। ঢোক গিলতে পারছেন না। বয়সের লক্ষণ। শরীর বলছে—এখন আর আমাকে দিয়ে যা-ইচ্ছা-তা করিয়ে নিতে পারবে না। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে।

শওকত ঘুরছে শুকনো মুখে। তার খুব ইচ্ছা, এক জন ডাক্তার নিয়ে আসে। কবির সাহেব রাজি নন। সামান্য জ্বরজারিতে ডাক্তার কী? তাছাড়া এ গ্রামে ডাক্তার নেই। বৃষ্টির মধ্যে যেতে হবে ফটিকখালি। কোনো অর্থ হয় না। শওকত কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'স্যার, একটু চিড়া ভিজাইয়া দেই, খান।'

'না।'

'রুটি বানাইয়া দেই? দুধ দিয়া চিনি দিয়া খান।'

'কিছু খাব না রে শওকত। তুই যা, পানির অবস্থাটা কি খোঁজ নিয়ে আয়।'

'না খাইয়া থাকবেন সারা রাইত?'

'হুঁ। একটা কথা মন দিয়ে শোন শওকত। এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ পেটে খিদে নিয়ে ঘুমুতে গেছে। সুস্থ মানুষ। আর আমি অসুস্থ। খেতে ইচ্ছা করছে না। আমি এক বেলা না খেলে কিছু যাবে-আসবে না।'

কবির সাহেবের মন অন্য একটি কারণেও বেশ খারাপ। ঢাকা থেকে নীলু হঠাৎ করে তাঁকে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখেছে। সে চিঠিতে শাহানার সেকেণ্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশের খবরের সঙ্গে তার বোন বিলুর মৃত্যুসংবাদ আছে। শেষ লাইনটিতে সে লিখেছে, 'মামা, আপনি তো অনেক জ্ঞানী মানুষ, আপনি আমাকে বলুন, এত কষ্ট কেন মানুষের?' চিঠি পড়ে তিনি চোখ মুছেছেন। এটাও বয়সের লক্ষণ। মন দুর্বল হয়ে গেছে। সামান্যতেই চোখ ভিজে ওঠে।

দুপুর-রাতে শওকত খবর নিয়ে এল, পানি কমতে শুরু করেছে। এই খবরের আনন্দেই সম্ভবত কবির সাহেবের জ্বর কমে গেল। তিনি হাসিমুখে বললেন, 'একটু যেন খিদে-খিদে লাগছে রে শওকত।'

'ভাত খাইবেন?'

'দে, চারটা ভাতই খাই। তরকারি কী?'

'খইলসা মাছ ডেঙ্গা দিয়া রাঁধছি। মাষের ডাইল আছে।'

'খেয়েই ফেলি চারটা।'

খেতে খেতেই তিনি মনস্থির করলেন, আগামী কাল ভোরে ঢাকা যাবেন। সুখী নীলগঞ্জের কাজে হাত দেওয়া দরকার। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'শওকত।'

'জ্বি স্যার।'

'ঢাকা যাব কাল। তুইও চল আমার সাথে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বড়ো একটা কাজে হাত দেব। সুখী নীলগঞ্জ! নীলগঞ্জের মানুষের আর কোনো দুঃখ থাকবে না।'

শওকত তাকিয়ে থাকল। এই অদ্ভুত মানুষটিকে সে খুবই পছন্দ করে। সেও মজনু মিয়ার মতো মনে-মনে ভাবল, আমাদের স্যার খুব পাগলা।

কবির সাহেব যাবেন ঢাকা। ভৈরব রেল স্টেশনে আটকা পড়ে গেলেন। এক গ্লাস পানি খাবার জন্যে স্টেশনের পাশের এক হোটেলে ঢুকেছেন। ক্যাশবাক্স নিয়ে বসা মোটাসোটা লোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল—যেন ভূত দেখছে। কবির সাহেব বললেন, 'স্লামালিকুম।' লোকটি জবাব দিল না।

'পানি খাব। এক গ্লাস পানি দেওয়া যাবে?'

লোকটি লাফিয়ে উঠল। কবির সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না।

'স্যার, আমি আপনার ছাত্র।'

'ভালো আছ বাবা?'

'আমাব নাম স্যার, ফজল।'

ফজল পা ছুঁয়ে সালাম করল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। পানির গ্লাসের জন্যে নিজেই ছুটে গেল। কিন্তু ফিরে এল পানি ছাড়াই।

'স্যার, বাড়িতে চলেন। বাড়িতে পানি খাবেন। কাছেই বাড়ি, দুই মিনিট লাগবে।'

'ঢাকার গাড়ি ধরব ফজল।'

'আমি স্যার গাড়িতে তুলে দেব।'

'পানিটা এখানেই খেয়ে গেলে হত না?'

'বাড়িতে খাবেন স্যার।'

ফজল, কবির সাহেবের হাত থেকে ব্যাগ প্রায় ছিনিয়ে নিল। কবির সাহেব হাঁটতে শুরু করলেন। এ জাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়। অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় তাঁর ছাত্র বের হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তাকে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হয়। এক বার সান্তাহার যাচ্ছিলেন—ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। টিকেট চেকার উঠেছে। টিকিট-নেই যাত্রীর সংখ্যাই বেশি। টিকিট চেকার দিব্যি বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে এক টাকা দু টাকা করে নিয়ে নিচ্ছে। তার ভাব দেখে মনেই হচ্ছে না যে কাজটা অন্যায় এবং এ-রকম প্রকাশ্যে করাটা ঠিক হচ্ছে না। এক পর্যায়ে কবির সাহেব বললেন, 'আপনি কী করছেন এসব?' টিকিট চেকার রাগী মুখে তাঁর দিকে তাকাল, পরমুহূর্তেই তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে থেমে থেমে বলল, 'স্যার, আপনি!' সে এগিয়ে এসে সালাম করল।

'তুমি কি বাবা আমার ছাত্র?'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি তো আমাকেও লজ্জা দিলে। তোমার মতো ছাত্র তৈরি করল যে মাষ্টার, সে কেমন মাষ্টার?'

টিকিট চেকার গাড়ির দরজার কাছে মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি দেখে কবির সাহেবের নিজেরই একটু খারাপ লাগতে লাগল। কিছু না বললেই হত। মুখের কথায় কি আর অন্যায় বন্ধ হয়? দোষ তো তার একার নয়। লোকগুলি বিনা টিকিটে উঠল কেন? প্রথম অন্যায় তো করেছে যাত্রীরা। দেশের সব মানুষই কি অসৎ হয়ে যাচ্ছে? নীতিবোধ নেই? ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই?

সান্তাহার স্টেশনে ট্রেন বদলের জন্যে কবির সাহেব নামলেন। টিকিট চেকার ছাত্র এসে উপস্থিত। কথা নেই বার্তা নেই, স্যুটকেস উঠিয়ে নিল হাতে।

'ব্যাপার কি!'

'বাসায় যেতে হবে স্যার।'

'আমি তো রংপুর যাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি।'

'রাতের বেলা যাবেন স্যার। রাতে একটা ট্রেন আছে।'

'আজ বাবা বাদ দেওয়া যায় না?'

'না স্যার। আমার অনেক দিনের শখ, আপনাকে সাথে নিয়ে এক বেলা চারটা ভাত খাই। স্যার, আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেন নি।'

'না!'

'আপনি স্যার পুরো এক বছর আমার কলেজের পড়ার খরচ দিয়েছেন। প্রতি মাসের তিন তারিখে আপনার কাছ থেকে নিয়ে আসতাম।'

যেতে হল তাঁকে। গিয়ে মনে হল, ছেলেটি তাঁকে ইচ্ছা করেই বোধহয় এনেছে। বিশাল পরিবার। নিজের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে ছাড়াও তিনটি বড়ো বড়ো বোন, দু'টি ভাই, বাবা এবং মা। সবাই মিলে দু' কামরার রেলের কোয়ার্টারে আছে। কবির সাহেবের বেশ মন খারাপ হয়ে গেল।

ছেলেটি রাতে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিল। মৃদুস্বরে বলল, 'স্যার, বড়ো কষ্টে আছি। আপনি স্যার আমাকে বলেন, আমি কী করব।'

তিনি কিছু বলতে পারলেন না। মাঝে মাঝে দারুণ সব অস্বস্তিতে পড়তে হয়।

ভৈরবেও এই জাতীয় অবস্থা হল। পানি খেতে গিয়ে তিনি আটকা পড়ে গেলেন। কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ নয়। ফজল সেই জিনিসটিই করতে লাগল। তাঁকে বসিয়ে রেখে—একটু আসি স্যার বলেই উধাও হয়ে গেল এবং ফিরে এল প্রকাণ্ড একটা রুই মাছ নিয়ে। কবির সাহেবের বিরক্তির সীমা রইল না। তাঁর ঢাকা যাবার দরকার।

১২

দুপুরবেলা পিওন একটি রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেছে।

খামের উপর লেখা—নীলুফার ইয়াসমিন। ইংরেজিতে টাইপ করা ঠিকানা। নীলু খুবই অবাক হল। কে তাকে রেজিস্ট্রি চিঠি দেবে? বিয়ের আগে এরকম চিঠি আসত। আজেবাজে সব কথার চিঠি--তোমাকে আজ দেখলাম কলেজে যাচ্ছ যেন কোনো রাজকন্যা পথ ভুলে এসেছে। জান, তোমার কথা ভেবে ভেবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। রাত জেগে জেগে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ি—চুল তার কবেকার......। এই চিঠিও সে-রকম কিছু নাকি?

নীলু ভয়ে ভয়ে খাম খুলল। ইংরেজিতে টাইপ করা একটা চিঠি। মার্কস এণ্ড ফিশার-এর জেনারেল ম্যানেজার লিখেছেন, 'তোমাকে জানানো যাচ্ছে যে, মার্কস এণ্ড ফিশার-এর পারচেজ ডিভিশনে জুনিয়র এ্যাপ্রেনটিস অফিসার হিসেবে তোমাকে নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে। চাকরির শর্তাবলী নিম্নরূপ। শর্ত পছন্দ হলে অগাস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাকে কাজে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।'

সহজ ইংরেজি, অর্থ না বোঝার কিছু নয়, তবু নীলুর মাথায় কিছু ঢুকছে না। সে পরপর চার বার চিঠিটা পড়ল। মার্কস এণ্ড ফিশারে চাকরির জন্যে সে কোনো দরখাস্ত করে নি। মার্কস এণ্ড ফিশার কেন, কোথাও করে নি। বন্যার চাপাচাপিতে সে তার মামার কাছে গিয়েছিল। চাকরির চেষ্টা বলতে এইটুকুই বন্যা অবশ্যি এক দিন এসে সাদা কাগজে তার দস্তখত নিয়ে গেছে। সার্টিফিকেট মার্কশিট নিয়েছে ফটোকপি করবার জন্যে। কোথায় কোথায় নাকি পাঠাবে। তাই দেখেই চাকরি হয়ে যাবে? ইন্টারভ্যু টিন্টারভ্যু কিছু লাগবে না? বাংলাদেশ এ রকম সোনার দেশ হয়ে গেছে?

নাকি কোনো রহস্য আছে এর মধ্যে। হয়তো এই নীলুফার ইয়াসমিন সে নয়, অন্য কেউ। ভুল ঠিকানায় এসেছে। কিংবা ফাঁদ-টাদ পেতেছে কেউ। সে জয়েন করতে যাবে, অমনি তাকে ধরে নিয়ে পাচার করে দেবে পাকিস্তানে কিংবা সিঙ্গাপুরে। গতকালের পত্রিকাতেই আছে, দশটি মেয়েকে পাচার করেছে পাকিস্তানে। ধরা পড়ে তারা এখন আছে লাহোরের এ জেল-হাজতে। একটি মেয়ের ছবিও ছাপা হয়েছে। কেমন বৌ-বৌ চেহারা দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। রুমা নাম।

সারাটা দুপুর নীলুর কাটল অস্বস্তিতে। চিঠিটা কাউকে দেখানো যাচ্ছে না। বাসায় রফিক অবশ্যি আছে। তাকে এখনি কিছু বলা ঠিক হবে না। হৈ চৈ চেঁচামেচি শুরু করবে। ব্যাপারটা পুরোপুরি না জেনে কাউকে কিছু না বলা ভালো। বন্যাকে টেলিফোন করা যায় অবশ্যি। সে সবচে ভালো বলতে পারবে

রশীদ সাহেবের বাসায় নতুন টেলিফোন এসেছে। বন্যার টেলিফোন নাম্বারও লেখা আছে। কিন্তু দুপুরবেলায় বেরুতে গেলেই মনোয়ারা হাজারটা প্রশ্ন করবেন, কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ? দরকারটা কী?

তবে মনোয়ারা খাওয়াদাওয়া শেষ হলেই ঘুমুতে যাবেন। সেই সময় যাওয়া যায়। নীলু তার শাশুড়ির ঘুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বন্যাকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। মার্কস এণ্ড ফিশারের কথা শুনেই বলল, 'সেই অফিসেই তো তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম। মামার অফিস। নামটাও মনে নেই? গাধা নাকি তুই?''

'জয়েন করব?

'করবি না মানে! এত ঝামেলা শুধু শুধু করলাম? কত বার যে আমি মামার কাছে গিয়েছি, সেটা আমি জানি আর মামা জানে।'

'আমার কেন জানি শুধু ভয়-ভয় লাগছে।'

'ভয়-ভয় লাগার কী আছে এর মধ্যে?'

'অফিসের চাকরি, পারব টারব না, সবার বকা খাব।'

'বাজে কথা বলিস না। চড় খাবি।'

'বাসার সবাই কীভাবে নেবে, কে জানে।'

'যেভাবে ইচ্ছা নিক। কিছুই যায়-আসে না।'

'শাশুড়ি হয়তো রেগে যাবেন।'

'বেতন পেয়ে তাঁকে একটা গরদের শাড়ি কিনে দিস, দেখবি সব রাগ জল হয়ে গেছে। উঠতে-বসতে তখন শুধু বৌমা বৌমা করবে।'

বন্যা খুব হাসতে লাগল। এটা কোনো হাসির ব্যাপার না। হয়তো শেষ পর্যন্ত শফিকই বলে বসবে—এত ছোট বাচ্চাকে রেখে চাকরি করবে কী? ওকে কে দেখবে? তাছাড়া সে রাজি হলেও নীলু কি পারবে টুনীকে রেখে অফিস করতে?

রফিক বাসায় ফিরল ন'টার দিকে। তার মনটন ভালো নেই। চাকরির ব্যাপারে এক জনকে ধরার কথা ছিল। ধরা যায় নি। এক্ষুণি আসবেন এক্ষুণি আসবেন করে ওরা তাকে তিন ঘন্টা বসিয়ে রেখে বলেছে, 'আজ মঙ্গলবার, খেয়ালই ছিল না। মঙ্গলবার তিনি তো আসেন না। আপনি ভাই মঙ্গলবার ছাড়া অন্য যে কোনো দিন আসেন।' রফিক বহু কষ্টে রাগ সামলে বলেছে, 'আমি কাল আসব।' কাল গেলেও লাভ হবে না। তবু যেতে হবে, কারণ এই লোক এক জন মন্ত্রীর ফুপাতো ভাই। তাকে ধরে মন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।

রফিক বাসায় ফিরেই খেতে বসল। তার খুব খিদে পেয়েছে।

'ডাল আর আলু ভাজা? অত্যন্ত উচ্চমানের খাবার দেখছি ভাবী!'

নীলু বলল, 'বাজার হয় নি আজ।'

'একটা ডিম ভেজে নিয়ে এস।'

'ডিম নেই ঘরে। থাকলে ভেজে দিতাম।'

রফিক প্লেট সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'এইসব ফালতু জিনিস আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব না।'

'না খেয়ে থাকবে?'

'হ্যাঁ। খাবার যা দিয়েছ, সেটা খাওয়া আর না-খাওয়া সমান।'

নীলু আর কিছু বলল না। রফিকের মধ্যে এই ছেলেমানুষিটা আছে। এই বয়সে খাবার নিয়ে রাগ করে কেউ?

মনোয়ারা এসে বললেন, 'রফিক কি না-খেয়ে চলে গেল বৌমা?'

'জ্বি।'

'জানোই তো, সে এসব আজেবাজে খাবার খেতে পারে না। একটা ডিম এনে রাখলে না কেন?'

'কাকে দিয়ে আনাব বলেন? বাবার পায়ে ব্যথা, শুয়ে আছেন। ও এখনো অফিস থেকে ফেরে নি।'

মনোয়ারা বিরক্ত হয়ে বললেন,'কী মুখে মুখে তর্ক করছ?' আনিস ছোঁড়াটাকে বললেই তো এনে দেয়। চেষ্টা থাকলে একটা উপায় হয়। সেই চেষ্টাটাই তো নেই।'

নীলু কিছু বলল না। মনোয়ারার মেজাজ চড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল রফিকের উপর, 'সম্রাট জাহাঙ্গীর। মোঘলাই খানা ছাড়া খেতে পারেন না। পরের উপর খাওয়া তো, টের পায় না। নিজের রোজগারে যখন খাবে, তখন বৌমা, তুমি দেখবে আলুভর্তা দিয়ে সোনামুখ করে ভাত খাচ্ছে। শাহানশাহ্‌র জন্যে দুপুর-রাতে গিয়ে ডিম কিনে আনতে হবে। কি আমার ডিম খানেওয়ালা।'

নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'মা, ও শুনবে।'

'শুনলে শুনবে। আমি কি ওর রাগের তোয়াক্কা করি? কান ধরে বের করে দেব না? চাকরি-বাকরি না পেয়ে তেল বেশি হয়ে গেছে। তেল কমানো দরকার।'

রফিক শোবার আয়োজন করছে। নীলু এসে দরজার পাশে দাঁড়াল, 'ঘুমিয়ে পড়েছ রফিক?'

'না।'

'আসব ভেতরে?'

'ইচ্ছে করলে আসতে পার।'

নীলু ভেতরে ঢুকল। রফিকের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। মনোয়ারার কাটা কাটা কথা নিশ্চয়ই কানে গিয়েছে। নীলু বলল, 'খিদে নিয়ে ঘুম আসবে না। ভাত দিয়েছি, খেতে আস।' রফিক জবাব দিল না।

'তোমার বিখ্যাত ডিম ভাজাও আছে। আনিসকে পাঠিয়ে ডিম আনানো হয়েছে। কেন এমন ছেলেমানুষি কর রফিক? এস, প্লীজ।'

রফিক খাবার ঘরে এল কোনো রকম আপত্তি না করেই। নীলু খেতে বসল রফিকের সঙ্গে।

'তুমি খাও নি?'

'না।'

রফিক হালকা গলায় বলল, 'সব সময় এমন ভালো মেয়ে সাজতে চাও কেন ভাবী? আমার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার ছিল না।'

নীলু কিছু বলল না। রফিক গম্ভীর গলায় বলল, 'ধর, আমি যদি রাতে না খেতাম, তুমিও কি না-খেয়ে থাকতে?'

'কি জানি। জানি না।'

'না-না, বলতে হবে তোমাকে।'

'আমার প্রচণ্ড খিদে লেগেছে, আমি খেয়ে নিতাম।'

'দ্যাট্‌স্ গুড। বাঙালি মেয়েদের একটা প্রবণতাই হচ্ছে ভালোমানুষির ভান করা। ভান আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। তোমার মধ্যেও প্রচুর ভান আছে।'

'আছে নাকি?'

'অফকোর্স আছে। থাকতেই হবে।'

নীলু প্রসঙ্গ পাল্টে মৃদুস্বরে বলল, 'একটা খবর আছে রফিক।'

'খারাপ খবর, না ভালো খবর?'

'বুঝতে পারছি না'

'বল শুনি।'

'আমি একটা চাকরি পেয়েছি।'

'কী পেয়েছ?'

'চাকরি। মার্কস এণ্ড ফিশারে জুনিয়র এ্যাপ্রেনটিস অফিসার। বেসিক পে ষোল শ' টাকা। হাউস রেন্ট আছে, মেডিকেল আছে, যাতায়াতের জন্যে এ্যালাউন্স আছে।'

'ঠাট্টা করছ তুমি?'

'না, ঠাট্টা না। খাওয়া শেষ কর, এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখাচ্ছি।' রফিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'সত্যি বলছ তো ভাবী?'

'হ্যাঁ। আজই পেয়েছি। কাউকে বলি নি এখনো।'

'ভাইয়াকেও না?'

'না। তাকে বলব ভেবেছিলাম, সে এসেই শুয়ে পড়েছে। তার শরীর ভালো না। ঘুমুচ্ছে বোধহয়।'

'ভাইয়াকে ডেকে তোল এবং খবরটা দাও, দেখবে সে চাঙ্গা হয়ে

উঠবে।'

নীলু চুপ করে রইল। রফিক বলল, 'ভাইয়ার জন্যে এটা যে কী পরিমাণ রিলিফ হবে, তা তুমি বুঝতে পারছ না। ভয়ে আধমরা হয়ে আছ। ভাইয়াকে খবরটা দাও, দেখবে সে তোমার কোমরে ধরে ওরিয়েন্টাল ড্যান্স দেবে।'

নীলু হেসে ফেলল। রফিক বলল, 'এখন থেকে ভাবী আমার চাকরি না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে দু শ' টাকা করে হাতখরচ দেবে। তোমার নিজের বেতনের টাকা থেকে দেবে। আমার অবস্থা টাইট।'

শফিক জেগেই ছিল। নীলু দেখল টুনীকে সরিয়ে একপাশে দেয়া হয়েছে। শফিক তার পাশে নীলুর জন্যে জায়গা রেখেছে। নীলু একটি দীর্ঘশ্বাস চাপার চেষ্টা করল। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে অপমান এবং অবহেলা আছে। আজ রাতে শফিকের নীলুকে প্রয়োজন, কাজেই টুনীকে একপাশে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আগামীকাল এই প্রয়োজন হয়তো থাকবে না, টুনী ঘুমুবে দু' জনের মাঝখানে।

শফিক বলল, 'ক'টা বাজে?'

'বারটা দশ। ঘুমুও নি এখনো?'

'ঘুমিয়েই ছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।'

শফিক নীলুকে তার কাছে টানল। নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'আমি একটা চাকরি নিলে কেমন হয়?'

'হঠাৎ চাকরির কথা বলছ কেন?'

'বল না কেমন হয়? অনেকগুলি বাড়তি টাকা আসে সংসারে। যা অবস্থা!'

শফিক হালকা গলায় বলল,'চাকরিটা তোমাকে দেবে কে? বাজারের অবস্থা তো জান না। রফিককে দেখছ না। এম. এ. পাশ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।'

নীলু বলল, 'আচ্ছা ধর, যদি পাই তাহলে?'

'তাহলে কী?'

'তাহলে কি চাকরিটা নেব?'

'তোমার শখ হলে নেবে।'

'শখ বলছ কেন, এটা কি প্রয়োজন না?'

শফিক কিছু বলল না। চাকরির প্রসঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে তার ইচ্ছা করছে না।

তারা বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেল একটার দিকে। বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। ঝমঝম শব্দ হচ্ছে বৃষ্টির। এ বৎসর বর্ষা নেমেছে ভালো।

নীলু টুনীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু চাকরি একটা পেয়েছি। মার্কস এণ্ড ফিশারে। আমার এক বন্ধু বন্যা—সে জোগাড় করে

দিয়েছে।'

শফিক কিছু বলল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শুধু।

'আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়েন করবার কথা। জয়েন করব?'

'চাকরি পেয়েছ এই কথাটা আগে বললেই পারতে, এত ভণিতা করছিলে কেন?'

'তোমার কি ইচ্ছা না, আমি চাকরি করি?'

'ইচ্ছা–অনিচ্ছার কোনো ব্যাপার না। চাকরি করতে চাও করবে। ভণিতা করবে না। মেয়েলি ভণিতা আমার ভালো লাগে না।'

'মেয়েমানুষ, মেয়েলি ভণিতাই তো করব।'

আর কোনো কথা হল না। রাত বাড়তে লাগল। ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কাছেই। ছোট্ট টুনী ঘুমের মধ্যেই চমকে উঠল। নীলু তাকে কাছে টেনে নিল। মনে মনে বলল, 'পৃথিবীতে কেউ যদি আমাকে ভালো না বাসে তাতে কোনো ক্ষতি নাই। তুই ভালোবাসবি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভালোবাসার আমার দরকার নেই। এক জনের ভালোবাসা পেলেই হবে।'

নীলুর ঘুম আসছে না। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি, অথচ চোখে ঘুম নেই। নীলু মনে–মনে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগল, 'বুঝলি টুনী, আমি খুব এক জন অসুখী মানুষ। বাইরে থেকে সেটা কেউ বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে—বাহ্, নীলু মেয়েটা তো খুব সুখী হয়েছে। স্বামী কন্যা শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে কী চমৎকার মিলেমিশে আছে। এ–রকম সুখ কিন্তু আমি চাই নি রে পাগলি। আমি অন্য রকম সুখ চেয়েছিলাম। এমন এক জন স্বামী চেয়েছিলাম, যে সব সময় তার পাশে আমার জন্যে জায়গা রাখবে। শুধু বিশেষ বিশেষ রাতে রাখবে না।'

আজ নীলুর একটি বিশেষ দিন। চাকরিতে যোগ দেবার তারিখ। সাড়ে ন'টায় শফিক বলল, 'এস খেয়ে নিই।' নীলুর লজ্জা করতে লাগল। সে বলল, 'তুমি খেয়েনাও।'

'খাবে না?'

'ইচ্ছা করছে না। ক্যান্টিনে কিছু খেয়ে নেব।'

খেতে বসল শফিক একাই। নীলু বসল তার সামনের চেয়ারে। মনোয়ারা খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর মুখ গম্ভীর। তিনি নীলুর দিকে এক বারও তাকাচ্ছেন না। শফিক বলল, 'এখানে বসে আছ কেন? তৈরী হও।'

নীলু তৈরী হয়েই ছিল। তবু উঠে পড়ল। হোসেন সাহেব শোবার ঘরে বসে পত্রিকা দেখছিলেন। নীলুকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাসিমুখে তাকালেন, 'তৈরি নাকি মা?'

'হ্যাঁ।'

নীলু পা ছুঁয়ে সালাম করল। হোসেন সাহেব দরাজ গলায় বললেন, 'ফি

আমানুল্লাহ মা। ফি আমানুল্লাহ্।'

নীলু একটু ইতস্তত করে বলল, 'বাবা, আমার এই চাকরি করতে যাওয়া নিয়ে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?'

হোসেন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'আপত্তি থাকবে কেন?'

'মা বোধহয় খুব একটা পছন্দ করছেন না।'

'এখন না করলেও পরে করবে।'

'ওনার উপর অনেক ঝামেলা পড়বে।'

'সহ্য হয়ে যাবে। তাছাড়া টুনী তো বিরক্ত করে না। আমি দেখব টুনীকে।'

'যাই তাহলে বাবা।'

'যাও মা। দশ বার ইয়ামুকাদ্দেমু পড়ে, ডান পা আগে ফেলে ঘর থেকে বেরুবে।'

মনোয়ারা শেষ পর্যন্ত গম্ভীর হয়েই রইলেন। বৌয়ের চাকরির ব্যাপারটি তিনি গোড়া থেকেই অপছন্দ করে এসেছেন। শফিককে বেশ কয়েক বার বলেছেনও। কিন্তু শফিক কোনো উত্তর দেয় নি। যেন এ ব্যাপারে তার কোনো বক্তব্য নেই। কিছু জিজ্ঞেস করলে শফিক এমন ভাব করে, যেন এর উত্তর দেয়াটা জরুরি নয়। গতকাল রাতেই তিনি শফিককে ডেকে বললেন, 'আমি এই বয়সে সংসার সামলাব কী করে?' শফিক হাই তুলে বলেছে, 'অসুবিধা হবে না। কাজের একটা লোক তো আছে।'

'ঐ লোককে আমি এক্ষুণি বিদায় করব।'

'কেন?'

'এত বড় একটা জোয়ান কেউ রাখে বাসায়? কোন দিন সবাইকে খুন করে জিনিসপত্র নিয়ে ভাগবে।'

'ওকে তাড়ালে তোমারই অসুবিধা হবে মা?'

'হোক অসুবিধা।'

মনোয়ারা কাজের লোকটিকে সত্যি সত্যি বিদায় করে দিলেন। এতেও শফিক কিছু বলল না। ছেলেদের সংসারে থাকার কাল কি তাঁর শেষ হয়েছে? বোধহয় হয়েছে।

রফিক নীলুকে অফিস পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। সে তার স্বভাবমতো বকবক করছে। নীলুর কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না, তবু বলতে হচ্ছে। রফিক সঙ্গে থাকলে কথা না-বলে থাকা মুশকিল।

'কি ভাবী, গুমি হয়ে আছ কেন? আজকে তোমার খুশির দিন। আনন্দ-ফূর্তি কর।'

'কী আনন্দ-ফূর্তি করব?'

'গান-টান গাও।'

'কী যে পাগলের মতো কথা বল।'

'আমি হলে তাই করতাম। রিক্সায় যেতে যেতে গান ধরতাম, কী আনন্দ চারিধারে! কী আনন্দ চারিধারে!'

'টুনীকে ছাড়া এতক্ষণ থাকতেই পারব না।'

'খুব পারবে। আর এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমরা সবাই দেখব। চোখে-চোখেরাখব।'

'সারা দিন তো তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। তুমি আবার চোখে-চোখে কি রাখবে?'

'আমি না রাখলেও অন্যরা রাখবে।'

রফিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নেমে গেল। মতিঝিল পর্যন্ত তার যাবার কথা, কিন্তু সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে এমনভাবে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল, যেন খুব জরুরি কোনো কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়েছে। অথচ তেমন কোনো কাজই নেই। রাস্তায় হাঁটা। এই হাঁটার মধ্যেই পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হওয়া।

'এ্যাই, রফিক না?'

'হুঁ।'

'চিনতে পারছিস?'

'না।'

'বলিস কি, আমি ইয়াসিন। কলেজে তোর সঙ্গে পড়তাম।'

'ও ইয়াসিন। আছিস কেমন?'

'ভালো। এখন বিটিসিতে আছি।'

'গুড।'

'বেতনপত্র মন্দ না। তিনটা বোনাস আছে। আসিস একদিন আমার এখানে, ফ্রি সিগারেট দেব। খাস তো সিগারেট?'

'খাই।'

'আসিস তাহলে অফিসে।'

'আচ্ছা আসব।'

অফিস কোথায়, কি, কিছুই না বলে চলে গেল ইয়াসিন। অনেক দিনের পুরোনো পরিচিতদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু অবশ্যি আশা করা যায় না। ইউনিভার্সিটির বন্ধুরাই যেখানে দায়সারা গোছের কথা বলা শুরু করেছে! সেদিন করিমের সঙ্গে দেখা। সুন্দর একটি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে নিউ মার্কেটে ঘুরছে। হাঁটার ভঙ্গি দেখেই বলে দেয়া যায়, নতুন বিয়ে। সঙ্গের মেয়েটি তাঁরই স্ত্রী, অন্য কারোর নয়, এটা বোঝানোর প্রবল চেষ্টা। গর্বিত দৃষ্টি। রফিক দূর থেকে ডাকল—'করিম নাকি?'

করিম অনুৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এল। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারত,

তা এল না। সুন্দরী মেয়েটি ঘাড় কাত করে বইয়ের দোকানে বই দেখতে লাগল।

'কি রে, বিয়ে করেছিস নাকি?'

'হুঁ, হুট করে হয়ে গেল। কাউকে খবর দিতে পারি নি। তুই আছিস কেমন?'

'ভালোই।'

'দাড়ি–টাড়ি যেভাবে বড়ো করছিস—দরবেশ হয়ে যাচ্ছিস মনে হয়?'

'চেষ্টা করছি।'

'চাকরি–বাকরি?'

'হবে হবে করছে। যা তুই, তোর বৌ বিরক্ত হচ্ছে।'

করিম প্রায় ছুটে গেল তার পুতুল–পুতুল স্ত্রীর কাছে। সময় বদলে যাচ্ছে। পুরানো বন্ধুত্বের গাঁথুনি আলগা হয়ে যাচ্ছে। আর পাঁচ বছর পর এক জন অন্য জনের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বলবে, 'কেমন, ভালো?' ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

দুপুরে রফিক নীলুর খোঁজ নিতে গেল। হাসিমুখে বলল, 'দেখতে এলাম কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে।'

নীলুর জন্যে ছোটখাট ছিমছাম একটা ঘর। টেবিলের উপর একটা টেলিফোন। রফিক চোখ কপালে তুলে বলল, 'টেলিফোনও আছে নাকি?'

'সবার টেবিলেই আছে। পিবিএক্স। ডিরেক্ট লাইন না।'

'খুব মালদার পার্টি মনে হচ্ছে।'

নীলুর লজ্জা করতে লাগল।

'কাজকর্ম শুরু করেছ নাকি?'

'না। প্রথম দিন কাজকর্ম কিছু নেই। এটা–ওটা শিখছি। দুপুরবেলা ঘুরঘুর করছ কেন, বাসায় গিয়ে খাওয়াদাওয়া কর।'

'তোমাদের এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই? ক্যান্টিন–ফ্যান্টিন কি আছে?'

'আছে। চল যাই।'

ক্যান্টিন দেখে রফিক মুগ্ধ হয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, 'কাজ করলে এইসব বিদেশী ফার্মেই কাজ করতে হয়। তুমি ভাবী আমার জন্যে একটু ট্রাই করবে। বস–টসদের ভজিয়ে ভাজিয়ে বলবে আমার কথা।'

'ওরা কি আমার কথা শুনবে?'

'এখন না শুনুক, বৎসরখানেকের মধ্যেই শুনবে। তোমার কাজকর্মে খুশি হয়েই ওরা শুনবে। শুনতেই হবে।'

'তোমার ধারণা, আগামী এক বৎসরের মধ্যে তোমার চাকরি হচ্ছে না?'

'অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে সে–রকমই মনে হচ্ছে। অবস্থা সুবিধার না ভাবী।'

'হাল ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?'

'এখনো ছাড়ি নি, ধরেই আছি। তবে ধরে থাকতে থাকতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে।'

রফিক উঠে দাঁড়াল। নীলু বলল, 'যাচ্ছ কোথায় এখন?'

'এক বন্ধুর বাসায়।'

'এখন কি আর কারো বাসায় যাবার সময়?'

'আনএমপ্লয়েডদের সময়–অসময় বলে কিছু নেই।'

'তোমার বন্ধুও কি আনএমপ্লয়েড?'

রফিক কোনো জবাব দিল না। সে হেঁটে হেঁটে চলে এল পুরানো ঢাকায়। শারমিনদের বাসায় যাবার তার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। তবু সে কেন জানি দুপুরবেলায় উপস্থিত হল সেখানে। কাজের মেয়েটি বলল, 'আপা ঘুমাইতেছে। ডাকমু?'

'না, কোনো দরকার নেই। আমি অপেক্ষা করব। ঘুম ভাঙলে খবর দিও। পত্রিকা বা ম্যাগাজিন কিছু থাকলে দিয়ে যাও, বসে বসে পড়ি।'

বড়লোকদের বাড়ির কাণ্ডকারখানাই অন্য রকম। কাজের মেয়েটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফির লেটেস্ট সংখ্যাটি দিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে চা এবং কেকও এসে গেল। চা খেতে খেতে পত্রিকা ওল্টাতে ভালোই লাগছে। চম ৎকার সব ছবি। বিদেশী পত্রিকাগুলি ছবি দেখার জন্যেই বের হয় সম্ভবত। একটি এস্কিমো পরিবারের ছবি দেখে রফিক মুগ্ধ হল। স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। দেখেই মনে হয় চমৎকার একটি জীবন এদের। পাস করে চাকরি খুঁজতে হয় না। বাড়ি বানানোর জন্যে জমি কিনতে হয় না। যেখানে পছন্দ সেখানেই বরফের একটা ঘর বানিয়ে নিলেই হল। রাতে তিমি মাছের তেলের বাতি জ্বালিয়ে সবাইকে নিয়ে গল্পগুজব চলবে। বাইরে হু–হু করে বইবে তুষারঝড়। চমৎকার একটা জীবন। রফিক একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল।

'আরে, তুমি কখন এসেছ?'

'এই তো কিছুক্ষণ।'

'আমাকে ডাক নি কেন?'

সারা দুপুর ঘুমিয়ে শারমিনের চোখ ভারি হয়ে আছে। এলোমেলো করে পরা শাড়ি, চুল বাঁধা নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে দৃশ্যটি এত সুন্দর।

'চা দিয়েছে?'

'হুঁ।'

'কোনো কাজে এসেছ, না এমনি এসেছ?'

'এমনি এসেছি।'

'এস আমার সাথে।'

'কোথায়?'

'আসতে বলছি, আস।'

শারমিন তাকে নিয়ে এল দারোয়ানের ঘরের পাশের ছোট্ট ঘরটিতে। মার্টি শুয়ে আছে সেখানে। শারমিনকে ঢুকতে দেখে এক ধরনের ঘড়ঘড় শব্দ করল। শারমিন মৃদুস্বরে ডাকল, 'মার্টি সাহেব।' মার্টি মাথা তুলে এক বার মাত্র তাকাল, তারপরই মাথা নামিয়ে নিল।

'ও বাঁচবে না। এই ঘরেই তার শেষশয্যা।'

বলতে বলতে শারমিনের গলা ভারি হয়ে এল। কেঁদে ফেলবে নাকি?

'বেচারার এত কষ্ট হচ্ছে! সারা রাত ঘুমায় না। কাঁদে শুধু।'

রফিক কিছু বলল না। শারমিন নিচু হয়ে মার্টির মাথায় হাত রাখল। চাপা স্বরে বলল, 'পশুদের সবচে বড়ো কষ্ট হচ্ছে এরা নিজেদের কষ্টের কথা অন্যদের বলতে পারে না।'

'অনেক মানুষও সেটা পারে না।'

'বাজে কথা বলবে না। মানুষ ঠিকই পারে। আজ তোমার মনে কোনো কষ্ট হলে সেটা তুমি কাউকে বলবে না?'

'সব কষ্টের কথা কি বলা যায়? কিছু কিছু কষ্টের কথা কখনো বলা যায় না।'

শারমিন বলল, 'মার্টি মারা গেলে আমার খুব কষ্ট হবে। আমার বন্ধু কেউ নেই। মার্টিই আমার বন্ধু।'

শারমিন উঠে দাঁড়াল। হালকা গলায় বলল, 'আজ কিন্তু তুমি রাতে খাবে এখানে।'

'কেন?'

'একা একা খেতে আমার খুব খারাপ লাগে। বাবা চিটাগাং গেছেন, কাল আসবেন। তুমি না এলে সাব্বির ভাইকে আসতে বলতাম।'

'উনি আমেরিকায় যান নি?'

'সামনের সপ্তায় যাবেন। মামার বাসায় আছেন। সাত দিনের জন্যে এসে বেচারাকে দু' মাস থাকতে হল। মায়ের অসুখ।'

'তুমি কি তাকে আপনি–আপনি করে বল?'

'হুঁ।'

'কেন, আপনি বল কেন?'

'তুমি বলতে কেমন জানি লজ্জা লাগে।'

'উনি কিছু বলেন না এ নিয়ে?'

'খুব একটা বলেন না। হঠাৎ এক–আধ দিন বলেন।'

বাগানে বসে চা খাওয়া গেল না। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। শারমিন বলল, 'এস, দোতলায় বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখি।'

'বৃষ্টির মধ্যে দেখার কী আছে?'

'দেখার কিছু নেই? কী বল তুমি!'

'আমার মধ্যে এত কাব্য ভাব নেই।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত রফিক বারান্দায় বসে রইল। তেমন কোনো কথাবার্তা ওদের মধ্যে হল না। শারমিন কেমন অন্যমনস্ক। কথাবার্তা কিছুই বলছে না। রফিকের হঠাৎ খুব মন খারাপ হল। কেন সে বারবার ঘুরে ঘুরে এখানে আসে? এটা ঠিক না। কেন সে আসবে?

'শারমিন, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, উঠি।'

'খেয়ে যেতে বললাম না?'

'না, আজ থাক, অন্য এক দিন।'

'আজ অসুবিধা কী?'

রফিক হালকা স্বরে বলল, 'আজকের রাতটা খুব চমৎকার। তুমি সাব্বির সাহেবকে আসতে বল। দু' জনে মিলে খাওয়াদাওয়ার পর বারান্দায় বসে গল্পটল্প কর।'

শারমিন কিছু বলল না। রফিক উঠে দাঁড়াল। অন্য সময় শারমিন আসত তার সঙ্গে সঙ্গে। ড্রাইভারকে বলত পৌঁছে দিতে। আজ সে কিছুই করছে না।

রফিক ভিজতে ভিজতেই রওনা হল। তার বারবার ইচ্ছা করছিল পেছনে ফিরে শারমিনকে এক বার দেখতে। কিন্তু সে তাকাল না। মার্টি সাহেব কাঁদছে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে সে কান্না মিশে কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। গেটের দারোয়ান বলল, 'চলে যাচ্ছেন নাকি স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'গাড়ি নিয়ে যান। গাড়ি আছে তো। ড্রাইভার চা খেতে গেছে, ডেকে নিয়ে আসছি।'

'ডাকতে হবে না।'

রফিক লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল। দারোয়ান শ্রেণীর কারোর গলায় এমন শুদ্ধ ভাষা শুনতে ভালো লাগে না। কেন লাগে না? এটা কি অত্যন্ত বাজে ধরনের একটা মানসিকতা নয়? দারোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এর মধ্যে অবাক হবার কী আছে? এরা কি রফিকের এখানে আসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে?

১৩

মনোয়ারা গম্ভীর মুখে বললেন, 'বৌমা, আজ অফিসে যাবে না?'

নীলু হাসিমুখে বলল, 'আজ টুনীর জন্মদিন, অফিসে যাব না।'

মনোয়ারা কিছু বললেন না। আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। নীলুর খুব ইচ্ছা, টুনীর দ্বিতীয় জন্মদিনটি খুব ভালো মতো করে। প্রথমটি করা হয় নি।

শফিক কোনো রকম উৎসাহ দেখায় নি। বিরক্ত মুখে বলেছে, 'জন্মদিন আবার কী?'

নীলু বলেছে, 'আমাদের জন্যে তো না, টুনীর জন্যে।'

'এক বছরের বাচ্চা, ও জন্মদিনের কি বোঝে? বাদ দাও।'

এ বছর সে-রকম কিছু বলতে পারবে না। টুনীর বয়স এখন দুই। জন্মদিনটি সে কিছু কিছু বুঝতে পারবে। আর না পারলেও জানবে তাকে ঘিরে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। শফিক বলতে পারবে না, টাকাপয়সা নেই। এর জন্যে সে টাকা আলাদা করে রেখেছে। তেমন কোনো বড়ো উৎসব হবে না। একটা কেক কাটা হবে। কিছু ভালোমন্দ রান্না হবে। টুনীকে সঙ্গে নিয়ে সে এবং শফিক একটা ছবি তুলবে স্টুডিওতে। প্রতি বছর এ-রকম একটি করে ছবি তোলা হবে। সেই ছবির এ্যালবামটি টুনীর বিয়ের সময় টুনীকে উপহার দেওয়া হবে। প্রথম জন্মদিনের ছবিটি অবশ্যি তোলা হয় নি।

শফিক অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। নীলু এসে বলল, 'তুমি কি আজ একটু সকাল সকাল আসতে পারবে?'

'না।'

'একটু চেষ্টা করে দেখ না।'

'কেন?'

'টুনীর আজ জন্মদিন না? তুমি এলে তোমাকে নিয়ে স্টুডিওতে একটা ছবি তুলব।'

শফিক জবাব দিল না। নীলু নরম স্বরে বলল, 'প্লীজ।'

'আচ্ছা দেখি।'

'দেখাদেখি না, আসতেই হবে। সন্ধ্যাবেলা কেক কাটা হবে। রাতে একটু খাওয়াদাওয়া হবে।'

'অনেককে বলেছ নাকি?'

'না, বন্যাকে বলেছি। ও তার হাসবেণ্ডকে নিয়ে আসবে। আনিসকে বলেছি। আনিস ম্যাজিক দেখাবে।'

'ও ম্যাজিক জানে নাকি?'

'শিখছে। জানে নিশ্চয়ই। তুমি যদি তোমার কোনো বন্ধুবান্ধবকে বলতে চাও, বল।'

'আমার আবার বন্ধুবান্ধব কোথায়?'

'কেউই নেই?'

শফিক জবাব দিল না।

নীলুর ধারণা ছিল রফিককে বাজারে পাঠানো সমস্যা হবে। সে যেতে চাইবে না। ইদানীং সে অল্পতেই রেগে ওঠে। বাজারের কথা বললেই নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'বাজার করাই শেষ পর্যন্ত আমার ক্যারিয়ার হবে। বাজার সরকারের কাজই পাব। অন্য কিছু পাব না।'

আজ সে খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজি হল। শার্ট পরতে পরতে বলল, 'সিরিয়াস একটা হৈচৈ হবে মনে হয়। বিরাট খাওয়াদাওয়া নাকি?'

'বিরাট কিছু না। তোমার কোনো বন্ধুবান্ধবকে বললে বলতে পার।'

'বেকারের কোনো বন্ধুবান্ধব থাকে না। লিস্টি দাও। কী কী নিয়ে আসতে হবে বল। ঘর সাজানো হবে নাকি?'

'দাও না সাজিয়ে। বেলুন–টেলুন দিয়ে সাজালে ভালোই লাগবে।'

'সাজিয়ে দিতে পারি, তবে এক শ' টাকা ফিজ লাগবে।'

'দেব, ফিজ দেব।'

সবচে আগ্রহ দেখা গেল শাহানার মধ্যে। তার উৎসাহের সীমা রইল না। সে কলেজে গেল না। নিজেই নিউমার্কেট থেকে রঙিন কাগজ কিনে আনল। হোসেন সাহেবও তার সঙ্গে জুটে গেলেন। শিশুদের উৎসাহ নিয়ে রঙিন কাগজের শিকল বানাতে বসলেন। মনোয়ারা বিরক্ত মুখে বললেন, 'তুমি বুড়ো মানুষ, রঙিন কাগজ দিয়ে মালা বানাতে বসছ?'

'বুড়ো মানুষেরা মালা বানাতে পারবে না এ রকম কোনো আইন আছে নাকি?'

'বাজে তর্ক করবে না।'

'এত দিন পরে একটা উৎসব হচ্ছে বাড়িতে, আর তুমি ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছ, এটা ঠিক না।'

'কি ঝগড়া বাধালাম?'

'এই তো বাধাচ্ছ। আমি এখন একটা কথা বলব, তুমি তার উত্তরে দশটা কথা বলবে। তারপর আমি আবার আরেকটা কথা বলব, তুমি তার উত্তরে বলবে বিশটা, তারপর...।'

মনোয়ারা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মাথা ধরেছে এই অজুহাতে বিছানায় শুয়ে রইলেন। কোনো ব্যাপারেই কোনো রকম আগ্রহ দেখালেন না। নীলু যখন এসে বলল, 'পোলাওটা একটু বসিয়ে দিন না মা।' তখন তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন, তুমি কি পোলাও রান্না ভুলে গেছ নাকি?' নীলুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

শফিকের জন্যে সে সেজেগুজে বিকাল থেকেই বসে ছিল। শফিক আসামাত্র ছবি তুলতে যাবে। টুনীও খুব আগ্রহ নিয়ে নতুন জামা পরে বসে আছে। সে বারবার বলছে, 'বাব্বা কখন আসবে?' বাব্বা হচ্ছে আব্বা। টুনী কিছু কিছু শব্দ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে। আব্বা হল বাব্বা। পাচ্ছি হচ্ছে পাখি। সে 'আ' বা 'পা' উচ্চারণ করতে পারে না, তা নয়। ঠিকই পারে। তবু নতুন শব্দগুলি কেন বলে, কে জানে। শিশুদের মধ্যে অনেক দুর্বোধ্য ব্যাপার আছে।

সাড়ে ছ'টা বেজে গেল, শফিক এল না। শাহানা বলল, 'তুমি একাই টুনীকে নিয়ে ছবি তুলে আস ভাবী, ভাইয়া আসবে না।'

'বলেছিল তো আসবে।'

'আসার হলে এসে যেত। চল, আমরা তিন জনে একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাই। শ্যামলীতে একটা ভালো স্টুডিও আছে।'

'আরেকটু দেখি।'

শুধু শফিক নয়, বন্যাও আসে নি। নীলুর মন খারাপ হয়ে গেল। এত চমৎকার করে ঘর সাজানো হয়েছে, অথচ লোকজন কেউ নেই। কেউ আসুক না-আসুক, শফিক তো আসবে। হোসেন সাহেব বললেন, 'টুনী ঘুমিয়ে পড়বে বৌমা, কেকটা কাটাও। আনিস ম্যাজিক শুরু করুক, আমরা দেখি বসে বসে। উৎসবটা জমছে না মোটেই।' নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'আরেকটু অপেক্ষা করি, ও এসে পড়বে।'

আনিস চূড়ান্ত রকমের নার্ভাস। আজই তার জীবনের প্রথম ম্যাজিক শো। কে জানে কী হবে। পাঁচটা আইটেম সে তৈরি করে রেখেছে। আইটেম হিসেবে পাঁচটাই চমৎকার। আজ সারা দিনে সে প্রতিটি আইটেমই প্রায় এক হাজার বার করে প্রাকটিস করেছে। তবু তার মনে হচ্ছে, আসল সময়ে একটা কিছু গণ্ডগোল হয়ে যাবে। সবচে বড়ো সমস্যা হচ্ছে তার কোনো কন-ফিডারেট নেই, যে দর্শকদের মধ্যে বসে থাকবে। প্রয়োজনের সময় বিশেষ সাহায্যটি করবে। এরকম এক জন কাউকে পাওয়া গেলে চমৎকার একটা ম্যাজিক দেখানো যেত। আনিস চিন্তিত মুখে বীণার সঙ্গে কথা বলতে গেল। বীণাকে বলে দেখা যেতে পারে। সে রাজি হবে কি হবে না কে জানে।

বীণা সঙ্গে সঙ্গেই রাজি। সে উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'কী করতে হবে বলে দেন, নো প্রবলেম।'

'বিশেষ কিছুই না, টেবিলের উপর একটা রুমালে আংটি লুকানো থাকবে। তুমি আংটি আছে কিনা পরীক্ষা করতে গিয়ে আংটিটি তুলে নিয়ে আসবে।'

'তুলে আনবার সময় কেউ দেখবে না?'

'না। সবার নজর থাকবে ম্যাজিসিয়ানের দিকে। সেই সময় একটা বক্তৃতা শুরু করব আমি। পারবে না?'

'পারব না কেন?' নিশ্চয়ই পারব।'

আনিস চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লতিফা বললেন, 'তোর ও বাড়িতে যাবার কোনো দরকার নেই।'

'দাওয়াত দিয়েছে, যাব না?'

'না।'

'এসব বলে তো মা লাভ নেই। আমি যাব।'

লতিফা গম্ভীর হয়ে রইলেন। মেয়েকে আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। কেন জানি তিনি বীণাকে কিছুটা ভয় পেতে শুরু করেছেন। বীণা দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছে। আনিসের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে, এই নিয়ে তিনি খুব ভাবেন। তাঁর ধারণা বীণা আনিসকে মাঝেমধ্যে এটা-ওটা

কিনে দেয়। এই ধারণাটা হয়েছে গত পরশু। বীণা একা একা নিউ মার্কেটে গিয়েছিল। নিউ মার্কেট থেকে ফিরেই সে বেড়াতে গেল ছাদে। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি দেখলেন, আনিস লাল রঙের একটি নতুন চেক শার্ট গায়ে দিয়ে হাসিমুখে নামছে। এর মানেটা কী? সারাটা দিন লতিফার খুব খারাপ কাটল। সন্ধ্যার পর বীণাকে খুব সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আনিসের গায়ে একটা নুতন শার্ট দেখলাম।' বীণা হাই তুলে বলল, 'আমিও দেখলাম। খুব মানিয়েছে।'

'লাল রঙ ব্যাটাছেলেদের মানাবে কি?'

'লাল হচ্ছে এমন একটা রঙ, যা সবাইকেই মানায়।'

'নিউ মার্কেট থেকে তুই কী কী কিনলি?'

'তেমন কিছু না। দু' দিস্তা কাগজ। একটা বল পয়েন্ট পেন।'

'এসব কেনার জন্যে নিউমার্কেটে যেতে হল? সুরমা স্টোরেই তো পাওয়া যায়।'

'তা যায়। তবু গেলাম।'

লতিফা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, 'নিউ মার্কেট থেকে ফিরেই ছাদে গেলি কেন?'

'এমনি গেলাম। ছাদে যাওয়া নিষেধ নাকি?'

লতিফা এক বার ভাবলেন সরাসরি জিজ্ঞেস করেন শার্টটা বীণা কিনে দিয়েছে কিনা। সাহস হল না। ঘরে একটা বড়ো মেয়ে থাকার কত যে সমস্যা। চোখের আড়াল হলেই বুক ধড়ফড় করে। বীণা গিয়েছে শাহানাদের ওখানে। ঘন্টাখানেকের ব্যাপার, তবু ভালো লাগছে না। আনিসটাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দিতে পারলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেত। লতিফা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন।

টুনী বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। রফিক বলল, 'ভাবী, আমি টেলিফোন করে দেখি ভাইয়া অফিসে আছে কিনা।' টেলিফোনের কথাটা নীলুর মনে আসে নি। আগেই টেলিফোন করা যেত। 'কোত্থেকে করবে? রশীদ সাহেবের বাসা থেকে?'

'না, গ্রিন ফার্মেসি থেকে, চেনা লোক আছে। ভাইয়ার টঙ্গি অফিসের নাম্বার তোমার কাছে আছে?'

'না।'

'ঠিক আছে, আমি বের করে নেব।'

টুনীকে শুইয়ে দিতে গিয়ে নীলুর চোখে পানি এসে গেল। মানুষ এমন হয়, আশ্চর্য। নীলুর ইচ্ছা করতে লাগল বাতিটাতি নিভিয়ে শুয়ে থাকে টুনীর পাশে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তাকে হাসিমুখে সবার সামনে ঘুরে বেড়াতে হবে। আনিসের ম্যাজিক দেখতে হবে।

'ভাবী।'

'কী শাহানা?'

'তাড়াতাড়ি এস, কে এক জন মেয়ে এসেছে আমাদের বাসায়। পরীর মতো সুন্দর। না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না। উপহারের প্যাকেট আছে হাতে।'

'বন্যা নাকি?'

'আরে না। ওনাকে বুঝি আমি চিনি না? তুমি তাড়াতাড়ি আস।'

নীলুও তাকে চিনতে পারল না। মেয়েটি বিব্রত মুখে বলল, 'আমার নাম শারমিন। রফিকের সঙ্গে পড়ি। ও আমাকে দাওয়াত দিয়েছে ভাতিজির নাকি জন্মদিন।'

'হ্যাঁ। তুমি বস।'

'আপনি ওর ভাবী?'

'হ্যাঁ।'

'আমি সবাইকে চিনি। ও হচ্ছে শাহানা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের জন্মদিনের মানুষটি কোথায়?'

'টুনী ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'ওর উপহারটা হাতের কাছে রেখে আসি।'

নীলু ভেবে পেল না, এই মেয়েটির কথাই কি রফিক মাঝেমধ্যে তাকে বলে? এমন চমৎকার একটি মেয়ে! শারমিন হোসেন সাহেব ও মনোয়ারা দু' জনকেই বিনীতভাবে সালাম করল। হোসেন সাহেব তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে নিতান্ত পরিচিত জনের মতো গল্প শুরু করে দিলেন। এমনকি মনোয়ারা পর্যন্ত মিশুক স্বরে গল্পে যোগ দিলেন।

'বাসা কোথায় তোমার?'

'পুরানো ঢাকায়।'

'এত দূর একা একা এসেছ?'

'গাড়ি নিয়ে এসেছি। আর রাত বেশি হয় নি। সাতটা মাত্র বাজে।'

শাহানা শারমিনকে নিয়ে ছাদ দেখাতে গেল। সে তাড়াতাড়ি কারো সঙ্গে সহজ হতে পারে না। সেও চট করে সহজ হয়ে গেল। শাহানার খুব ইচ্ছা করতে লাগল এই চমৎকার মেয়েটিকে ম্যাজিশিয়ান আনিসের কথা বলে। কাউকে তার কথা বলতে ইচ্ছা করে।

'এখানে কেউ থাকে নাকি শাহানা?'

'আনিস ভাই থাকেন।'

'আনিস ভাই কে?'

'এক জন ম্যাজিশিয়ান। যা সুন্দর ম্যাজিক দেখান!'

'তুমি দেখেছ?'

'না।'

'তাহলে বুঝলে কী করে, সুন্দর?'

শাহানা চুপ করে গেল। শারমিন হাসিমুখে বলল, 'আমি ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে এক বার গিয়েছিলাম ইংল্যাণ্ড, সেখানে মিঃ স্মিথের ম্যাজিক দেখেছি।অপূর্ব!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ভদ্রলোক একটা ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর। অথচ প্রফেশন্যাল ম্যাজিশিয়ানদের হার মানাতে পারেন।'

শারমিন জন্মদিনের উৎসবে এসেছে, এটা শুনে রফিকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। টেলিফোনে জন্মদিনের দাওয়াত অবশ্যি সে দিয়েছে। সেটাও তেমন কোনো জোরালো দাওয়াত নয়। শারমিনও আসবে এমন কোনো ইঙ্গিত দেয় নি। ঠিকানা অবশ্য জিজ্ঞেস করেছিল।

নীলু বলল, 'শাহানা ওকে ছাদে নিয়ে গেছে।'

'শীতের মধ্যে ছাদে কেন?'

নীলু হেসে ফেলল, 'মমতা খুব বেশি মনে হচ্ছে।'

'তুমি যা ভাবছ তা না ভাবী, শারমিনের শিগগিরই বিয়ে হচ্ছে। আগস্টে হবার কথা ছিল, পিছিয়ে গেছে।'

'আমি অবশ্যি মনে মনে আশা করছিলাম, এ মেয়ে এই বাড়িতেই আসবে।'

'পাগল হয়েছ! এরা যে কী সিরিয়াস বড়োলোক এটা তুমি ধারণাও করতে পারবে না।'

'সিরিয়াস বড়োলোকদের মেয়েরা বুঝি বিয়ে করে না?'

'করে, তবে আমার মতো কাউকে করে না।'

শফিক আধ ঘন্টার মধ্যে চলে আসবে বলেছিল। এক ঘন্টা পার হয়ে গেল, তার দেখা নেই। হোসেন সাহেব বললেন, 'আনিসের ম্যাজিকটা শুরু হয়ে যাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি বরং টুনীকে ঘুম থেকে তোল।'

টুনীর ঘুম ভাঙানো গেল না। আজ দুপুরে ঘুমায় নি। সহজে সে আর জাগবে না। নীলু বলল, 'থাক ও ঘুমাক, আসুন, আমরা ম্যাজিক দেখি।'

আনিস এই শীতেও রীতিমতো ঘামছে। হাত-পা কাঁপছে, কী অবস্থা হবে কে জানে! প্রতিটি আইটেমই অনেক বার করে করা। চোখ বন্ধ করেও এসব করা যাবে, কিন্তু তবু তার মনে হচ্ছে এক্ষুণি একটা হাসির কাণ্ড হবে। শাহানা বলল, 'শুরু করুন আনিস ভাই।'

বীণা বসে আছে শাহানার পাশে। বীণার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। কারো সঙ্গেই সে কোনো কথাবার্তা বলছে না। যে কোনো কারণেই হোক সে অস্বস্তি বোধ করছে। আনিস প্রায় এক শ' ভাগ নিশ্চিত, সে আঙটি সরিয়ে দিতে পারবে না। আনিস ঘরের কোণের দিকে সরে গেল। তার হাতে কিছু নেই।

'আমি তাহলে শুরু করছি। দেখুন আমার হাত। হাতে কিছু নেই।'

হোসেন সাহেব চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছেন। ম্যাজিকের ব্যাপারে তিনি দারুণ উৎসাহ বোধ করছেন। আনিস তার খালি হাত দেখিয়ে মুহূর্তেই দুটি টকটকে লাল রুমাল তৈরি করল। হোসেন সাহেব মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

শাহানা বলল, 'দেখি, রুমাল দু'টি আমার হাতে দিন তো আনিস ভাই। পরীক্ষা করে দেখি।'

'ম্যাজিকের রুমাল তো দেওয়া যাবে না।'

বলতে বলতেই আনিস রুমাল দু'টি নিশানের মতো কিছুক্ষণ বাতাসে ওড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল একটি টকটকে লাল গোলাপ। আনিস গোলাপটি এগিয়ে দিল শাহানার দিকে। শাহানা কেন জানি খুব লজ্জা পেল। হোসেন সাহেব মুগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'অদ্ভুত ম্যাজিক! এত সুন্দর ম্যাজিক আমার জীবনে আমি দেখি নি।' বীণা শুধু কঠিন দৃষ্টি নিয়ে বসে রইল। সে আশা করেছিল এই গোলাপটি সে পাবে।

আনিস আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে কাজেই তার তৃতীয় ম্যাজিক লিংকিং রিং হল চমৎকার। রফিক বলল, 'এ তো দেখি সিরিয়াস ম্যাজিশিয়ান।। ঠিক না শারমিন?'

'হ্যাঁ, আমার নিজেরই এখন ম্যাজিক শিখতে ইচ্ছা হচ্ছে।'

শাহানা বলল, 'মিঃ স্মিথের ম্যাজিকের মতো লাগছে আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ, সেরকমই লাগছে।'

শেষ ম্যাজিকে গণ্ডগোল হয়ে গেল। আঙটি হাওয়া করে দেওয়ার ম্যাজিক। আনিস শারমিনের আঙটি নিয়ে রুমালে ভরে রাখল টেবিলে। হাসিমুখে বলল, 'এখানে একটি আঙটি আছে, এ বিষয়ে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে? সন্দেহ থাকলে হাত রুমালে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে যান।' বীণার দায়িত্ব হচ্ছে পরীক্ষা করতে এসে আঙটি উঠিয়ে নেওয়া। সে উঠে দাঁড়াল এবং সরু গলায় বলল, 'আমার মাথা ধরেছে, আমি বাসায় যাব।' শাহানা বলল, 'আরে, এখন যাবে কি! দেখে যাও কী হয়।'

'যা ইচ্ছা হোক, আমার ভালো লাগছে না।'

আনিস বীণার এই হঠাৎ রাগের কোনো কারণ খুঁজে পেল না। সে বলল, 'বীণা এসে দেখে যাও, আঙটি আছে কিনা।'

'অন্যরা দেখুক।'

বীণা গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। শেষ ম্যাজিকটি আনিসের দেখানো হল না। হোসেন সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'আনিস, আঙটিটার কী হল দেখাও।'

'ম্যাজিকের মাঝখানে কেউ উঠে গেলে সে ম্যাজিক আর দেখানো যায় না।'

'তাই নাকি, জানতাম না তো!'

'এইটি অন্য কোনো দিন দেখাব।'

শাহানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার মন বলছে—বীণার মধ্যে কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে, সে সম্পর্কে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তবে সে একেবারেই যে বুঝতে পারছে না, তাও নয়।

মনোয়ারা ম্যাজিক শেষ হওয়ামাত্র নীলুকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'শারমিন মেয়েটি কেন এসেছে এ বাড়িতে?'

'রফিক দাওয়াত করেছে, তাই এসেছে।'

'দাওয়াত করবে আর হুট করে চলে আসবে? তাও একা একা এসেছে। আমার কিন্তু ভালো লাগছে না।'

'ঐসব কিছু না মা।'

'তুমি বুঝলে কী করে ঐসব কিছু না? বড়োলোকের মেয়ে, নাকে দড়ি দিয়েঘোরাচ্ছে।'

নীলু কিছু বলল না।

'রফিক চাকরি-বাকরি কিছু খুঁজছে না। ঐ মেয়ের পেছনে ঘুরঘুর করে সময় কাটাচ্ছে।'

'না মা, চাকরির চেষ্টা ও ঠিকই করছে।'

'বাজে কথা বলবে না। চেষ্টা করলে এই অবস্থা হয়? হয় না। আর, কিছু যে হচ্ছে না, সেই নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাও নেই। দিব্যি মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছে। আজ আমি তাকে কিছু কথা শোনাব।'

'থাক মা, আজ আর কিছু না বললেন।'

'কেন? তাকে কথা শোনাতে হলে আগে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে? পঞ্জিকা দেখতে হবে?'

'আস্তে কথা বলুন মা, ওরা শুনবে।'

'শুনলে শুনুক, আমি কাউকে ভয় পাই নাকি? ওর রোজগারে আমি খাই?'

'ওদের খাবার দিয়ে আসি মা। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

শফিক ফিরল এগারটায়।

নীলু না-খেয়ে অপেক্ষা করছিল। সে কিছুই বলল না। শফিক বলল, 'জন্মদিন কেমন হল?'

'ভালোই।'

'লোকজন এসেছিল?'

'এসেছে কেউ কেউ। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আস, খাবার গরম করছি। নাকি খেয়ে এসেছ?'

'না, খাব কোথায়? অফিসে একটা ঝামেলা হল।'

নীলু কোনো আগ্রহ দেখাল না।

'স্যারেনসেন মনে হয় চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। অবশ্যি গুজবও হতে পারে।'

নীলু নিঃশব্দে ভাত বেড়ে দিতে লাগল। শফিকের কথাবার্তা তার শুনতে ইচ্ছা করছে না। সারা দিনে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। শফিক ভাত মাখতে মাখতে বলল, 'হুইস্কি খেয়ে ব্যাটা খুব হৈচৈ করছিল আজ, কেলেঙ্কারি অবস্থা!'

শফিক অনেক রাত পর্যন্ত বসার ঘরে বসে বসে সিগারেট টানল। নীলু যখন বলল, 'ঘুমুবে না?' তখন সে নিয়ম ভঙ্গ করে চা খেতে চাইল।

'কষ্ট না হলে একটু চা কর তো নীলু। কাজের ছেলেটা কোথায়? ওকে দেখছি না কেন?'

'মা বিদায় করে দিয়েছেন।'

'কবে করলেন?'

'গত সপ্তাহেই করেছেন। তোমার চোখে পড়ে নি বোধহয়।'

শফিক আর কিছু বলল না। চা খেতে খেতে এলোমেলোভাবে কিছু কথাবার্তা হল। যেমন, রফিকের কিছু হয়েছে? চেষ্টা করছে না বোধহয় সে-রকম। চাকরির বাজার এতটা খারাপ নিশ্চয়ই না। প্রশ্ন করার জন্যেই করা। নীলু বলল, 'আমি ঘুমুতে যাচ্ছি।'

শফিক কিছু বলল না।

নীলু শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল, তারা দু' জনে কি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে? বোধহয় যাচ্ছে। কিন্তু কেন? দোষটা কার? শফিকের একার নিশ্চয়ই নয়। তারও নিশ্চয়ই কোনো ভূমিকা আছে। সংসারের পেছনে শফিককে একা খাটতে হচ্ছিল। এখন সে কিছু সাহায্য করছে। শফিকের সেটা পছন্দ নয়। শুধু শফিক নয়, তার শাশুড়িরও।

প্রথম বেতনের টাকা থেকে এক হাজার টাকা সে মনোয়ারাকে দিতে গেছে, তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'ঐ টাকা তোমার কাছেই রাখ বৌমা। আগে যদি শফিকের টাকায় চলে থাকে, এখনো চলবে।' শফিকও বলেছে একই কথা, তবে একটু ঘুরিয়ে, 'রেখে দাও, দরকার হলে নেব।'

প্রথম দিকের সেই অবস্থা এখন নেই। মনোয়ারা এখন টাকা নেন। গত মাসে বললেন, 'সামনের মাস থেকে আরো কিছু বেশি দিতে পার কিনা দেখ তো বৌমা।'

নীলু তার নিজের মা'কে প্রতি মাসেই দু' শ' টাকা করে দিচ্ছে। তিনি বারবার লিখছেন, 'কোনো দরকার নেই। যখন দরকার হবে আমি চাইব।' তিনি চাইবেন না কোনোদিন। তাঁর ধারণা, মেয়ের টাকায় তাঁর কোনো অধিকার নেই। এটা একটা মিথ্যা ধারণা। ছেলের টাকায় মা'র অধিকার

থাকলে মেয়ের টাকায়ও থাকবে। কেন থাকবে না?

নীলুর চাকরি কেউ পছন্দ করছে না, কিন্তু তার টাকায় বাড়তি কিছু সুখ কি আসছে না? সে টাকা জমাচ্ছে। মাস তিনেকের ভেতরই একটি টিভি কেনার মতো টাকা জমে যাবে। এটা কম কী—নিশ্চয়ই কম নয়।

মশারির ভেতর কয়েকটা মশা ঢুকে গেছে। গুনগুন করছে কানের কাছে। নীলুর উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, কিন্তু পুরোপুরি ঘুম আসছে না। বিয়ের আগে এরকম হত। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হত। তখন সময়টাও খুব খারাপ ছিল। বিয়ে দেবার জন্যে মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বিয়ের কোনো প্রস্তাবই আসে না। বড়ো ভাবী খুব কায়দা করে কাটা-কাটা কথা শোনান। তাঁর প্রতিটি কথার তিন চার রকম মানে হয়। একেক বার প্রচণ্ড রাগ হত। কিন্তু কার উপর রাগ করবে? মা'র উপর? যার কেউ নেই, তার উপর রাগ করা যায় না।

টুনী কাঁদতে শুরু করেছে। কোনো ভয়ের স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে বোধহয়।

'কী হয়েছে মা। ভয় লাগছে?'

'না।'

'বাথরুম?'

'না।'

'পানি খাবে?'

'না।'

'তাহলে কাঁদছ কেন?'

'বাথরুম করব।'

নীলু টুনীকে কোলে নিয়ে নামল। টুনী বলল, 'বাথরুম করব না। দাদুর সঙ্গে ঘুমাব।'

'কাল ঘুমিও।'

'না, আজ।'

নীলু রাত-দুপুরে হোসেন সাহেবের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। প্রায় রাতেই এখন এ-রকম হচ্ছে। টুনী ঘুমুতে যাচ্ছে দাদুর সঙ্গে। দাদুকে এখন গল্প বলে বলে ঘুম পাড়াতে হবে। মনোয়ারা বিরক্ত হবেন। খিটিমিটি বাধবে দু' জনের মধ্যে।

১৪

রাত ন'টা।

রহমান সাহেব খেতে এসে দেখেন শারমিন দোতলা থেকে নিচে নামে নি। জমিলার মা বলল, 'আফা ভাত খাইবেন না।'

'কেন?'

'কিছু কন নাই? শরীর খারাপ মনে হয়।'

রহমান সাহেব বিস্মিত হলেন। শরীর ভালো থাকুক না-থাকুক, খাবার সময় শারমিন উপস্থিত থাকে। কিছুদিন থেকে তিনি তার ব্যতিক্রম লক্ষ করছেন। রহমান সাহেব নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলেন। রাতের খাবার সময়টা তিনি বেশ আনন্দে কাটান। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে হালকা আলাপ করেন শারমিনের সঙ্গে। অফিসের ব্যাপার নিয়েও কথাবার্তা হয়। আজ তিনি একটি জরুরি ব্যাপার নিয়ে শারমিনের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

নাইক্ষ্যংছড়িতে তিনি একটা রাবার চাষের পরিকল্পনা নিতে চাচ্ছেন। এই বিষয়ে মতামত জানা।

রহমান সাহেব খাওয়া শেষ করে শারমিনের দরজায় টোকা দিলেন।

'মা জেগে আছ?'

'আছি।'

'শরীর খারাপ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'জ্বর?'

জবাব না দিয়ে শারমিন দরজা খুলল। রহমান সাহেব চমকে উঠলেন। ফ্যাকাসে মুখ শারমিনের। চোখ লাল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এইমাত্র কেঁদে উঠেছে।

'এস আমার ঘরে। গল্প করি।'

শারমিন চাদর গায়ে দিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে এল। রহমান সাহেবের মনে হল, মেয়েটি খুব একলা হয়ে পড়েছে। নিঃসঙ্গতার চেয়ে বড়ো কষ্ট তো আর কিছু নেই। এই কষ্টটার ধরন তাঁর মতো আর কেউ জানে না। তারা দু' জন নিঃশব্দে রহমান সাহেবের প্রকাণ্ড শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

'খাটে পা তুলে আরাম করে বস তো মা।'

শারমিন বসল খাটে। রহমান সাহেব আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'সাব্বিরের সঙ্গে তোমার ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি?'

'না, ঝগড়া হবে কেন?'

'ফিরে যাবার সময় এয়ারপোর্টে তাকে খুব গম্ভীর দেখলাম।'

'পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। অনেক রকম ঝামেলা যাচ্ছে ওনাদের। তাঁর মারও অসুখ ছিল।'

'তুমি কি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলে?'

'ঢাকায় নেই তো উনি। জামালপুরে তাঁর মেয়ের কাছে থাকেন।'

রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সিগারেট প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিছু দিন হল আবার শুরু করেছেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, শারমিন সিগারেটের প্রসঙ্গে কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না।

'সাব্বির তোমাকে চিঠিপত্র লিখেছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'জবাব দাও তো তুমি?'

'হ্যাঁ, দিই। দেব না কেন?'

'আমি আজ তার একটা লম্বা চিঠি পেয়েছি। সে দেশে চলে আসছে। এপ্রিলের মাঝামাঝি এসে পড়বে। তোমাকেও নিশ্চয়ই লিখেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি ঠিক করেছি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমাদের বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলব। কী বল তুমি?'

শারমিন কিছু বলল না। রহমান সাহেব বললেন, 'খুব জমকাল একটা উৎসব করতে চাই। তোমার মা'র শখ ছিল জমকাল উৎসবের।'

শারমিন এমনভাবে তাকাচ্ছে, যেন সে কিছু শুনছে না। অন্য কিছু ভাবছে। রহমান সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি আশা করেছিলেন বেশ অনেকক্ষণ গল্প গুজব করবেন। মেয়েটি ক্রমেই কি দূরে সরে যাচ্ছে? বিয়ের পর নিশ্চয়ই আরো দূরে যাবে।

শারমিন মৃদুস্বরে বলল, 'বাবা, তুমি তোমার কোনো কারখানায় একটি চাকরির ব্যবস্থা করতে পারবে?'

রহমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কার চাকরি?'

'আমাদের সঙ্গে পড়ত একটা ছেলে। অনেক দিন ধরে চাকরির চেষ্টা করছে। পাশ করবার পর প্রায় দু' বছর হয়ে গেল।'

রহমান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'যে ছেলে দু' বছর চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না, সে মোটামুটিভাবে এক জন অপদার্থ।'

'অপদার্থ হবে কেন? দেশের অবস্থা খারাপ।'

'খারাপ ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলেরা এই খারাপ অবস্থার মধ্যেও গুছিয়ে নিতে পারে।'

শারমিন কিছু বলল না। রহমান সাহেব বললেন, 'ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিও আমার কাছে, আমি দেখব। ও কি প্রায়ই আসে নাকি এখানে?'

'না, প্রায়ই আসবে কেন?'

'ঠিকানা জান?'

'না, জানি না।'

বলেই শারমিন চমকে উঠল। এই মিথ্যাটা সে কেন বলল? কোনো দরকার ছিল না তো!

ঠিকানা না জানলে খবর দেবে কি করে?

শারমিন লজ্জিত মুখে বলল, 'আমি ঠিকানা জানি।' রহমান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'বাবা, আমার মাথা ধরেছে, ঘুমুতে যাই।'

শারমিন উঠে দাঁড়াল। তার সত্যি সত্যি মাথা ধরেছে। জ্বর আসছে বোধহয়। রহমান সাহেব বললেন, 'একটু বস। আদা চা করে দিক, মাথা ব্যথা কমবে।' তিনি নিজেই চায়ের কথা বলবার জন্যে উঠে গেলেন। এবং তখনই জানতে পারলেন, আজ বিকেলে মার্টি মারা গেছে। খবরটি দিতে গিয়ে জয়নালের মুখের ভাব এ-রকম হল, যেন সে নিজেই মার্টিকে মেরেছে।

'আমাকে খবরটা তখন দাও নি কেন?'

'আপা নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন ভাত খাওয়ার পরে দিতে।'

রহমান সাহেব মার্টিকে দেখতে গেলেন। ঠাণ্ডা মেঝেতে মার্টি এলিয়ে পড়ে আছে। তার গায়ে মোটা একটা কম্বল।

'মারা গেল কীভাবে?'

'জানি না। খাওন দিতে গিয়া দেখি এই অবস্থা।'

'শারমিন কি খুব কান্নাকাটি করছিল?'

'জ্বি-না।'

'কিছুই বলে নি?'

'বলেছেন সকাল হইলে মাটি দিতে। বরই গাছের নিচে।'

'মার্টির গায়ে কম্বল দিয়ে রেখেছে কেন?'

'আমি দেই নাই, আফা দিছেন।'

চা-পর্ব সমাধা হল নিঃশব্দে। মার্টি প্রসঙ্গে কোনো কথাই হল না। শারমিন বলল, 'বাবা, আমি যাই?'

'যাও মা, ঘুমাও। আর শোন, ঐ ছেলেটিকে বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'দরকার নেই।'

'দরকার থাকবে না কেন?'

'যারটা সে-ই করুক। আমার এত মাথাব্যাথা নেই।'

এসব কি শারমিনের রাগের কথা? কেন সে রাগ করছে? কার উপর রাগ করছে? শারমিন নিজেই তা বুঝতে পারছে না। সে কি অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে? সব মেয়েই কি এ-রকম বদলে যায়, না এটা শুধু তার বেলায় হচ্ছে। জানার কোনো উপায় নেই, কাকে সে জিজ্ঞেস করবে?

শারমিনের কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। আত্মীয়স্বজন যারা ঢাকায় আছেন, তাদের সঙ্গেও কোনো রকম যোগাযোগ নেই। কেউ কেউ ঈদের দিনে বেড়াতে আসেন। গেটের ভেতর ঢোকার পর থেকেই তাঁরা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। সেই অস্বস্তি বাড়ি থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত কমে না। এদের অনেককেই শারমিন চেনে না। রহমান সাহেব চেনেন, কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র উচ্ছ্বাস দেখান না। মেয়েকেও কারো বাসায় বেড়াতে যাবার জন্যে বলেন না। যে-কোনো কারণেই হোক, মেয়েকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান।

তবু মাঝে মাঝে নিতান্ত অপরিচিত এক জন কেউ আসে। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে—যেন দীর্ঘদিনের চেনা। এদের কথার ধরন থেকেই বোঝা যায়—সাহায্যপ্রার্থী।

এক বার দুপুরবেলায় ঘোমটা-পরা এক জন মহিলা এলেন। সঙ্গে চারটা আনারস, দু' বোতল আচার। শারমিনকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ কাঁদলেন, 'আহ্ গো মা, কত দিন পরে দেখলাম। গায়ের রঙটা একটু ময়লা হয়ে গেছে, আগে সোনার পুতলার মত ছিল। আমাকে চিনছ তুমি?'

'না।'

'আমি আটপাড়ার। তোমার আব্বার মামাতো বোন।'

সেই মহিলা খুব আগ্রহ নিয়ে সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখলেন, এবং ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। এবং এক সময় জানা গেল তিনি এসেছেন ছ' হাজার টাকার জন্যে। মেয়ের বিয়ে আটকে গেছে। জামাই একটা সাইকেল এবং একটা টু-ব্যাণ্ড রেডিও চায়। বিয়ের কথাবার্তা সব পাকা। এখন এই অল্প কিছু টাকার জন্যে বিয়ে আটকে আছে। শারমিন লজ্জিত স্বরে বলল, 'আমার কাছে তো এত টাকা থাকে না। আপনি অপেক্ষা করুন, বাবা আসুক। তিনি বিকেলে আসেন।'

'তোমার কাছে কত টাকা আছে?'

'আমার কাছে খুব অল্পই আছে, এতে আপনার কাজ হবে না। আপনি বিশ্রাম করুন, বাবা চলে আসবেন।'

ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করতে লাগলেন। শারমিন সাধ্যমত তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে চেষ্টা করল। ভালো ব্যবহারের চেষ্টা করাও মুশকিল। তারা দু' জন দুই জগতের মানুষ। এই দু' জগতের ভেতরে কানো বন্ধন নেই। অল্প সময়ের মধ্যেই শারমিন বিরক্ত হয়ে পড়ল। ভদ্রমহিলা একটির পর একটি আব্দার করেই যাচ্ছেন, 'ও মা, তোমার তো বাক্সভর্তি শাড়ি। দুই-একটা আমাকে দিও গো মা। পুরানা চাদর আছে? খুব শীত পড়ে আটপাড়ায়। না গেলে বুঝবা না।'

সন্ধ্যাবেলা রহমান সাহেব এলেন। টাকার কথা শুনে বললেন, 'তোমাকে তো মেয়ে বিয়ের জন্যে তিন মাস আগেই চার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, বক্কর সাহেব এসে নিয়ে গেছেন।'

'সেই বিয়াটা হয় নাই ভাইজান।'

'আক্‌দ্ হওয়া বিয়ে ভেঙে গেছে! বক্কর সাহেব তো বললেন, আক্‌দ্ হয়ে গেছে। রোসমত আটকে আছে। তিন হাজার টাকা চেয়েছিলেন। আমি দিয়েছিলাম চার হাজার টাকা।'

ভদ্রমহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। বিশ্রী অবস্থা! শারমিন সরে গেল সামনে থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনল বাবা বলছেন, 'আমার সঙ্গে চাল চালতে যাবে না। তোমাদের চাল বোঝার ক্ষমতা আমার আছে।'

সময় কাটানোই হয়েছে শারমিনের সবচে বড়ো সমস্যা। সময় পাহাড়ের মতো বুকের উপর চেপে বসে থাকে। বই পড়া, গান শোনা, এর কোনোটাই এখন আর ভালো লাগে না। ছবি আঁকা শেখার কথা এক বার মনে হয়েছিল। রং-তুলি কিনে কয়েক দিন খুব রঙ মাখামাখি করা হল, তাও মনে ধরল না। প্রতিটি কাজ এত বিরক্তিকর।

কোনো কোনো দিন একা একা ঘুরতে ইচ্ছা করে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে খারাপ লাগে না। সব দিন তো আর তা করা যায় না। পুরানো বান্ধবীদের কারোর ঠিকানা নেই, নয়তো তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত। অদিতির ঠিকানা ছিল। তাকে পরপর দু'টি চিঠি দিয়েছে, জবাব পাওয়া যায় নি। হয়তো এই ঠিকানায় সে এখন থাকে না কিংবা থাকলেও তার জবাব দেবার ইচ্ছা নেই। শারমিন বন্ধুর জন্যে অতীতে কখনো হাত বাড়ায় নি, তার মূল্য দিতে হচ্ছে এখন। হাত বাড়িয়ে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

শারমিন জেগে উঠল খুব ভোরে। চোখ বন্ধ করে মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল আজকের দিনটি কেমন করে কাটান যায়। ইউনিভার্সিটিতে গেলে কেমন হয়? পরিচিত কাউকে কি পাওয়া যাবে ইউনিভার্সিটিতে? সম্ভাবনা খুব কম। এই পরিকল্পনাটা বাদ দিতে হল। রফিকদের বাসায় গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হলে কেমন হয়? শাহানা মেয়েটিকে ঐ দিন চমৎকার লেগেছিল। ওর সঙ্গে গল্পগুজব করা যেত। কিন্তু সে নিশ্চয়ই কলেজে। কোন কলেজে পড়ে জিগ্যেস করা হয় নি। জানা থাকলে ঐ কলেজে হাজির হলে মন্দ হত না। শাহানাকে বের করে সিনেমা দেখা যেত, কিংবা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে বসে সময় কাটান যেত।

কিংবা ঐ ম্যাজিশিয়ান আনিসকে এক বার খবর দিয়ে এ বাড়িতে নিয়ে এলে হয়। ছোটখাট একটা উৎসবের মতো করা হবে। ম্যাজিশিয়ান আনিস ম্যাজিক দেখাবে। পরিচিত কিছু মানুষ থাকবে।

চায়ের টেবিলে শারমিন হাসিমুখে বলল, 'ম্যাজিক তোমার কেমন লাগে বাবা?'

'কী ম্যাজিক?'

'ট্রিক্স্। রুমাল ভ্যানিশ হয়ে যাবে। শূন্য থেকে তৈরি হবে রক্তগোলাপ।'

'ভালোই লাগে। হঠাৎ ম্যাজিক প্রসঙ্গ কেন?'

'আমি এক জন ম্যাজিশিয়ানকে চিনি। তাঁকে আমি বাসায় শো করতে বলব।'

'বেশ তো, বলবে।'

'কবে করলে তোমার সুবিধা হয়?'

'যে-কোনো দিন করতে পার। রবিবারে করা যেতে পারে।'

'ঠিক আছে বাবা, রবিবার সন্ধ্যায়।'

রহমান সাহেব মেয়ের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। ম্যাজিশিয়ান শ্রেণীর কাউকে তাঁর মেয়ে চেনে, এটা বিশ্বাস করতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

'বাবা, তাহলে ঐদিন খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'হ্যাঁ, ব্যবস্থা কর।'

'ঐদিন সব রান্না আমি করব, কী বল?'

'ভেরি গুড আইডিয়া।'

'দেশী রান্না, না চাইনিজ? কোনটা চাও তুমি?'

'মিক্সড্ হলে কেমন হয়?'

'ভালোই হয়।'

শারমিনের চোখ–মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রহমান সাহেবের মনে হল, মার্টির শোক শারমিনকে স্পর্শ করে নি। তার জীবনে কি এর চেয়েও কোনো বড়ো শোক আছে?

শারমিন হাসিমুখে বলল, 'নাশতা খাওয়ার পর আজ সারা দিন আমি ঘুরব।'

'ভেরি গুড। কোথায় ঘুরবে?'

'ঠিক নেই কোনো।'

'গাড়ি নিয়ে যাচ্ছ তো?'

'হুঁ।'

'তুমি নিজে গাড়ি চালানোটা শিখে নাও না কেন?'

'আমার ইচ্ছে করে না।'

প্রেসক্লাবের সামনে রফিক দাঁড়িয়ে আছে। ছোটখাট একটা ভিড় সেখানে। শারমিন বলল, 'ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি থামান।'

ড্রাইভার গাড়ি থামাল।

'ঐ কোণায় পার্ক করে রাখুন। তারপর রফিককে ডেকে নিয়ে আসুন। ঐ যে হলুদ পাঞ্জাবি, দড়ির ব্যাগ কাঁধে।'

রফিক হাসিমুখে এগিয়ে এল, 'আরে, কী ব্যাপার?'

'তুমি এই ঠাণ্ডায় শুধু একটা পাঞ্জাবি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?'

'ইয়েস ম্যাডাম। বেকারদের শীত লাগে না।'

'করছ কি এখানে? ভিড় কিসের?'

'চাকরির দাবিতে অনশন হচ্ছে। তাই দেখছিলাম। নিজেও ঢুকে পড়ব কিনা ভাবছি।'

'উঠে আস।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ঠিক নেই।'

রফিক উঠে এল। শারমিন বলল, 'তোমার ঝুলির ভেতর কী আছে?'

'কিছুই নেই। যাচ্ছি কোথায় আমরা?'

'কোথাও না। শুধু ঘুরব ঢাকা শহরে। তোমার কোনো কাজ নেই তো?'

'না। দুপুরবেলা ভাবীর অফিসে যাবার একটা প্ল্যান ছিল, সেটা বাতিল করলাম।'

'বাতিল করবার দরকার কী? যাবে দুপুরে। আমি বাইরে অপেক্ষা করব। কিংবা আমিও যেতে পারি, তোমার ভাবী যদি রাগ না করেন।'

'রাগ করবে কেন? রাগ, হিংসা, দ্বেষ এইসব ভাবীর মধ্যে নাই। শী ইজ এন একসেপশনাল লেডি। তারপর তোমার কী খবর বল।'

'কোন খবর জানতে চাও?'

'ভদ্রলোক কবে আসছেন?'

'এপ্রিল।'

'বিয়েটা হচ্ছে কবে?'

'মে মাসে।'

'মহানন্দে আছ।'

'হুঁ। তোমার কি হিংসা হচ্ছে নাকি?'

'একটু যে হচ্ছে না তা না। ভালো কথা, তোমার কাছে টাকাপয়সা আছে?'

'কেন?'

'যদি থাকে, তাহলে এক প্যাকেট দামী সিগারেট কিনে দাও। ফতুর হয়ে গেছি।'

শারমিন হেসে বলল, 'ভিক্ষা?'

'হ্যাঁ, ভিক্ষা।'

'ভিক্ষাই যখন চাইছ, তখন ছোট জিনিস চাইছ কেন? বড়ো কিছু চাও।'

'পাওয়া যাবে না, এমন কিছু আমি চাই না।'

দুপুরবেলা তারা দু' জন সত্যি সত্যি নীলুর অফিসে উপস্থিত হল। নীলু বেশ অবাক হল। যে মেয়েটির কিছু দিনের মধ্যেই বিয়ে হচ্ছে, সে একটি ছেলের সঙ্গে এমন সহজভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কীভাবে?

'ভাবী কেমন আছেন?'

'ভালো। তুমি কেমন আছ? তুমি বললাম, রাগ কর নি তো?'

'হ্যাঁ, খুব রাগ করেছি।'

শারমিন হেসে ফেলল। নীলুর মনে হল, এই মেয়েটি বড়ো ভালো। কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের সব সময় কাছের মানুষ মনে হয়। এই মেয়েটি সেই দলের।

শারমিন বলল, 'আসুন ভাবী, আজ দুপুরে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে

খাব। নতুন একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট হয়েছে, খুব ভালো খাবার।'

'আজ তো যেতে পারব না। আমাদের বোর্ড মিটিং আছে। সবাইকে থাকতে হবে। বৎসর শেষ হচ্ছে তো।'

'আজ তাহলে আপনি খুব ব্যস্ত?'

'হ্যাঁ। অন্য কোনো দিন সবাই মিলে একসঙ্গে খাব।'

'তার মানে আপনি এখন আমাদের বিদায় হতে বলছেন?'

নীলু হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ। আজ আমাদের খুব ঝামেলা।'

'কিন্তু আপনাকে এত খুশি-খুশি লাগছে কেন?'

'আমার একটা সুখবর আছে।'

রফিক অবাক হয়ে বলল, 'কী সুখবর, প্রমোশন হয়ে গেছে নাকি তোমার? চাকরি তো এক বছরও হয় নি!'

নীলু কিছু না বলে অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। সে নিজেও তার সুখবর সম্পর্কে কিছু জানে না। সকালবেলা অফিসে আসতেই সালাম সাহেব বলেছেন, 'আপনার জন্যে সুখবর আছে। বোর্ড মিটিংয়ের পর জানতে পারবেন।' নীলু ভয়ে-ভয়ে বলেছে, 'সুখবরটা কী?'

'জানবেন, জানবেন। এত ব্যস্ত কেন? দুঃসংবাদ তাড়াতাড়ি শোনা ভালো, কিন্তু সুসংবাদের জন্যে অপেক্ষা করাতেও আনন্দ।'

কথাটা ঠিক, নীলুর আনন্দই লাগছে। কী হতে পারে খবরটা? প্রমোশন হবে না। সেটা সম্ভব না। চাকরি এক বছরও হয় নি। কিন্তু এছাড়া আর কী হতে পারে?

শারমিন বাসায় ফিরল সন্ধ্যাবেলা। সমস্তটা দিন বাইরে কেটেছে, কিন্তু এতটুকুও ক্লান্তি লাগছে না। বরং বেশ ঝরঝরে লাগছে।

রহমান সাহেব বাসায় ছিলেন। তিনি অনেক দিন পর শারমিনের উৎফুল্ল চোখ-মুখ দেখলেন। তিনি বললেন, 'চল মা, বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাই।'

'এই শীতের মধ্যে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে চা খাবে কি!'

'খুব শীত না! চল যাই। চাদর-টাদর কিছু গায়ে দিয়ে নাও।'

রহমান সাহেব গোলাপঝাড়ের দিকে এগুলেন। এই বাগানের পেছনে অনেক শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু বাগান প্রাণহীন। প্রচুর গোলাপ গাছ আছে, কিন্তু বেশির ভাগ গাছই ফুল ফোটাতে পারে না। হয়তো মাটি ভালো না। কিংবা মালী ফুলগাছের কিছু জানে না। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে রহমান সাহেবের একটু মন খারাপ হল।

'কী করলে আজ সারা দিন?'

'তেমন কিছু না। ঘুরলাম, কিছু কেনাকাটা করলাম।'

'কী কিনলে?'

'সুতির শাড়ি কিনেছি দু'টি। ঘরে পরার, ফ্যান্সি কিছু না।'

'ফ্যান্সি কিছু কিনলেই পারতে।'

'কিনব এক সময়।'

রহমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'তাড়াতাড়িই কেনা উচিত। উৎসবের দিন তো এগিয়ে আসছে।'

শারমিন কিছু বলল না।

'শুনেছি, অনেকেই বিয়ের শাড়ি–টাড়ি কোলকাতা থেকে কেনে, তুমি যেতে চাও কোলকাতায়?'

'না।'

'আমি আগামী সপ্তাহে যাচ্ছি কোলকাতায়, ইচ্ছা করলে তুমি যেতে পার।'

'না, অত শখ নেই আমার।'

'এটা তো শখেরই বয়স। তোমার শখ নেই কেন?'

'ভেতরে চল বাবা। ঠাণ্ডা লাগছে।'

রহমান সাহেব হালকা স্বরে বললেন, 'একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বল শারমিন, সাব্বিরকে বিয়ের ব্যাপারে তোমার মনে কি কোনো দ্বিধা দেখা দিয়েছে?'

'না, শুধু শুধু দ্বিধা দেখা দেবে কেন?'

'আজ তার একটি চিঠি পেলাম। তোমার কাছে চিঠি লিখে লিখে নাকি জবাব পাচ্ছে না।'

'মাঝে মাঝে আমার চিঠি লিখতে ভালো লাগে না। আলসে লাগে।'

'আজ তাকে চিঠি লিখে দিও।'

'হ্যাঁ, দেব।'

'আর ঐ ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল?'

'না।'

'রোববারের প্রোগামটা ঠিক আছে?'

'না।'

'না, কেন?'

'এখন আর ইচ্ছা করছে না।'

রহমান সাহেব মেয়ের দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। শারমিনকে তিনি বুঝতে পারছেন না। বাবারা হয়তো সব সময় তা পারে না। মা'রা পারে। শারমিনের মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই শারমিনকে বুঝতে পারত। রহমান সাহেব অনেক দিন পর নিজের স্ত্রীর কথা মনে করলেন।

১৫

সন্ধ্যা মিলিয়ে গেল, তবু নীলু জানতে পারল না, ভালো খবরটি কি? ম্যারাথন বোর্ড মীটিং হচ্ছে। চারটার পর তিন বার চা দেওয়া হয়েছে ভেতরে। ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শেষ বারের চা আনতে হল বাইরে থেকে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে মীটিং চলবে রাত ন'টা–দশটা পর্যন্ত।

নীলু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বাসায় বলে আসা হয় নি। সবাই নিশ্চয়ই চিন্তা করবে। কিন্তু মীটিংয়ের মাঝখানে চলে যাওয়া যায় না। কেউই যায় নি। আজ বোনাস ঘোষণা হবার কথা। এ বছর কোম্পানি দু' কোটি টাকার কাছাকাছি লাভ করেছে। বড়ো রকমের বোনাস হবার কথা। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, চার মাসের বেসিক পে বোনাস হিসেবে দেওয়া হবে। গুজবটা এসেছে খুব উঁচু লেভেল থেকে, সত্যি হলেও হতে পারে।

সত্যি হলেও অবশ্যি নীলুর কোনো লাভ নেই। যাদের চাকরি এক বছরের কম, তারা বোনাস পাবে না—নিয়ম নেই। নীলুর চাকরির এক বছর হতে এখনো তিন মাস বাকি। সবাই বোনাস পাবে, নীলু পাবে না। ভাবতে একটু খারাপ লাগে। টাকাটা পেলে সে টিভি কিনে ফেলত। বাসার সবাইকে দারুণ একটা চমক দেওয়া যেত।

রাত আটটায় নীলুর টেলিফোন এল। রফিক টেলিফোন করেছে।

'হ্যালো ভাবী? ব্যাপার কী, এত দেরি!'

'বোর্ড মীটিং হচ্ছে।'

'বোর্ড মীটিং করবে ডিরেক্‌টররা। তুমি চুনোপুঁটি, তুমি বসে আছ কেন?'

'আমি একা না। সবাই অপেক্ষা করছে।'

'এত রাতে বাসায় ফিরবে কীভাবে?'

এটা নীলু ভাবে নি। বাসায় ফেরা একটা সমস্যা হবে। দশটা পর্যন্ত অবশ্যি বাস চলাচল করে। বাসে করে ফিরে যেতেও ঘন্টাখানিক লাগবে।

'হ্যালো ভাবী।'

'বল।'

'তুমি অপেক্ষা কর আমার জন্যে। আমি নিতে আসছি, এক্ষুণি রওনা দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। তোমার ভাই এসেছে?'

'হ্যাঁ, এসেছে। তুমি এখনো ফের নি শুনে ভাম হয়ে আছে। আজ মনে হয় গরম বক্তৃতা দেবে। ভাবী, আমি রাখলাম।'

নীলু টেলিফোন নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল মীটিং শেষ হয়েছে। বড়ো সাহেব মঞ্জুর হোসেন ডেকেছেন সবাইকে।

মঞ্জুর হোসেন সাহেবের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। এই মুখ দেখে ভরসা

হয় না, কোনো ভালো খবর আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি ভালো খবর ছিল। বড়ো সাহেব নীরস ভঙ্গিতে খবরগুলি দিলেন।

'কোম্পানি এ বছর খুব ভালো বিজনেস করেছে। কোম্পানির পলিসি মতো লাভের একটি ভালো অংশ কর্মচারীদের জন্যে ব্যয় করা হবে। সবাই এবার স্পেশাল বোনাস পাবে। সেটা হচ্ছে চার মাসের বেসিক পে। আমাদের এখানে দু' জন আছেন, যাদের চাকরির মেয়াদ এক বছর হয় নি। আইন অনুযায়ী তাঁরা বোনাস পেতে পারেন না, তবে এ বছর তাঁদেরকেও বোনাস দেবার সুপারিশ করা হয়েছে।

'কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এবং মেডিক্যাল এ্যালাউন্স বাড়ানোর সুপারিশও করা হয়েছে। মেডিক্যাল এ্যালাউন্সের ব্যাপারটি যাবে ফাইন্যান্স কমিটিতে।'

তুমুল হাততালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ হল। মঞ্জুর সাহেব নীলুকে হাত ইশারা করে ডাকলেন, 'আপনি একটু আমার কাছে আসুন।'

নিশ্চয়ই সুখবরটা বলা হবে। নীলুর বুক টিপটিপ করতে লাগল।

'বসুন।'

নীলু বসল।

'আপনার জন্যে একটা ভালো খবর আছে। কোম্পানি এ বছর আপনাকে সুইডেনে ট্রেনিংয়ের জন্যে সিলেক্ট করেছে। ছ' মাসের ট্রেনিং। বিজনেস ম্যানেজমেন্টের উপর ট্রেনিংটা হবে। কাল সকালে আপনাকে কাগজপত্র দেব। ট্রেনিং পিরিয়ডে থাকা-খাওয়ার খরচ ছাড়াও প্রতি মাসে দু' শ পঞ্চাশ ইউ এস ডলার পাবেন হাতখরচ।'

নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'থ্যাংক ইউ স্যার।'

'থ্যাংকস্ দেবার কিছু নেই। সুযোগটা আপনি পেয়েছেন আপনার নিজের যোগ্যতায়। খুব অল্প সময়ে আপনি কাজের নেচার পিক আপ করেছেন এবং চমৎকারভাবে করেছেন। এ্যানুয়েল রিপোর্টটাও আপনি ভালো তৈরি করেছেন।'

আনন্দে নীলুর চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। নীলু নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। ভদ্রলোকের সামনে কেঁদে ফেললে লজ্জার ব্যাপার হবে।

'রাত হয়ে গেছে তো, আপনি যাবেন কীভাবে?'

'আমাকে নিতে আসবে স্যার।'

'বাসা কোথায় আপনার?'

'কল্যাণপুর।'

'সে তো অনেক দূর। যাতায়াত করেন কীভাবে?'

'বাসে আসি স্যার।'

'কোম্পানি শিগগিরই একটা মাইক্রোবাস কিনবে। যাতায়াতের প্রবলেম তখন অনেকটা দূর হবে।'

বড়োসাহেব উঠে দাঁড়ালেন।
'আপনাকে কখন নিতে আসবে?'
'কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে স্যার।'
'দরকার হলে আমি একটা লিফ্‌ট্‌ দিতে পারি।'
'থ্যাংক ইউ স্যার। আমার দরকার নেই।'
রফিক এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'বাড়িতে পৌছানো মাত্র আজ একটা 'ফাইটিং চিত্র' হবে। ভাইয়া আগুন খেয়েলাফাচ্ছে।'
'দেরি হয়েছে বলে?'
'হুঁ।'
'তার দেরি হয় না? সেও তো প্রায়ই রাত এগারটার দিকে বাড়ি ফেরে।'
'পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে না? মহিলাদের বাড়ি ফিরতে হবে সূর্য ডোবার আগে।'
'কেন?'
'আমি জানি না কেন। এটাই নিয়ম। চল ভাবী, রওনা হওয়া যাক।'
নীলু বলল, 'কিছু মিষ্টি কিনতে চাই রফিক। দেরি যখন হয়েই গেছে, আরেকটু হোক।'
'মিষ্টি কেন?'
'তোমার ভাইয়ার রাগ কমানোর জন্যে।'
বলতে বলতে নীলু হেসে ফেলল।
'মাই গড, তোমার প্রমোশন হয়েছে নাকি! বিগ বস?'
'না, সেসব কিছু না। বলব তোমাকে, চল রিকশা নিই। নিউ মার্কেট পর্যন্ত রিকশায় যাব। নিউমার্কেট থেকে বেবিট্যাক্সি নেব।'
দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছে। হু-হু করে শীতের হাওয়া বইছে। সাড়ে আটটা বাজে, কিন্তু রাস্তাঘাট জনশূন্য। রফিক বলল, 'এত বড়ো শহর ঢাকা, কিন্তু এখনো কেমন গ্রামের ছাপ দেখছ? আটটা না বাজতেই লোকজন বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'
নীলু কিছু বলল না। তার কেন জানি বড়ো ভালো লাগছে।
প্রেসক্লাবের সামনে এসেই রফিক বলল, 'এক মিনিট ভাবী, একটু দেখে যাই।'
'কী দেখবে?'
'কয়েকটি ছেলে চাকরির জন্যে আমরণ অনশন শুরু করেছে। এদের একটু দেখে যাই। তুমিও আস, এক মিনিট লাগবে।'
ছ'-সাত জন ছিল দিনে, এখন দেখা গেল তিন জনকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। এক জনের এর মধ্যে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। ঘন ঘন নাক ঝাড়ছে। আশেপাশে কোনো লোকজন নেই। একটি নীল শাড়ি পরা অসম্ভব রোগা

মেয়ে টুলের উপর বসে আছে শুকনো মুখে। অনশনকারীদের কারোর স্ত্রী হবে। এই মেয়েটিও নিশ্চয়ই না-খেয়ে আছে।

রফিক বলল, 'কী ভাইসব, কেমন আছেন?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

'আপনি তো দেখি একেবারে সর্দি লাগিয়ে বসে আছেন। দেখেন, শেষে নিউমোনিয়া-টিউমোনিয়া বাধিয়ে বসবেন।'

রোগা মেয়েটি বিড়বিড় করে কী যেন বলল। সে তাকিয়ে আছে নীলুর দিকে। তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি। নীলুর অস্বস্তি লাগছে। রফিক বলল, 'আপনারা কেউ সিগারেট খাবেন? সিগারেটে অনশন ভঙ্গ হয় না। খাবেন কেউ? আমার কাছে ভালো সিগারেট আছে।' তিন জনের মধ্যে শুধুমাত্র সর্দিতে কাতর লোকটিই হাত বাড়াল।

তারা বাসায় পৌঁছল রাত ন'টা কুড়িতে। নীলু যেমন ভেবেছিল, তেমন কিছুই হল না। শফিক বসার ঘরে বসে পত্রিকা পড়ছিল। সে চোখ তুলে এক বার তাকাল, তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল পত্রিকা নিয়ে।

মনোয়ারা কোনো কথাই বললেন না। হোসেন সাহেব শুধু বললেন, 'এ-রকম দেরি হলে আগে থেকে বলে যেও মা। যা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল! ঢাকা শহর দুষ্ট লোকে ভরে গেছে। রাজধানীগুলিতে যা হয়! সমস্ত দেশ থেকে আজেবাজে লোকেরা ভিড় করে রাজধানীতে।'

টুনী ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় ঘুমিয়েছে। শাহানা মশারি খাটাচ্ছে। নীলু নিচু হয়ে টুনীর গালে চুমু খেল। ঘুমের ঘোরেই টুনী হাত দিয়ে ধাক্কা দিল মাকে। দেরিতে ফিরে আসা মা'কে সে যেন গ্রহণ করতে পারছে না।

শাহানা বলল, 'টুনী আজ খুব বিরক্ত করেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বিকেল থেকেই খুব কান্নাকাটি শুরু করেছে, মা'র কাছে যাব, মা'র কাছে যাব। তারপর ভাইয়া এল। তুমি তখনো ফের নি দেখে সেও রেগে গেল।'

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। শাহানা বলল, 'ভাইয়া বিকেলে চা-টা কিছুই খায় নি। তখন থেকে পত্রিকা নিয়ে বসার ঘরে বসে আছে। আমাকে শুধু শুধু একটা ধমক দিল।'

'কেন?'

'গ্লাসে পানি ঢালতে গিয়ে পানি ফেলে দিয়েছিলাম।'

নীলু বেশ অবাক হল। শফিক কখনো ছোটখাট কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্য কোনো কারণে কি তার মেজাজ খারাপ হয়েছে? অফিসে কোনো ঝামেলা হয়েছে নাকি?

শাহানা বলল, 'তোমাকে ভাইয়া কিছু বলেছে?'
'না।'
'নির্ঘাত বলত। কবির মামা এসেছেন তো, তাই নিজেকে চেক করেছে।'
'কবির মামা এসেছেন নাকি?'
'হুঁ। আটটার সময় এসেছেন। শুয়ে আছেন, শরীর ভালো না।'
'এবারও কি হেঁটে এসেছেন?'
'না, হেঁটে আসেন নি। রিকশা করেই এসেছেন। তবে কাহিল। কবির মামা বেশি দিন আর বাঁচবে না।'

নীলু কাপড় বদলে কবির মামার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তিনি বাতি নিভিয়ে শুয়ে ছিলেন। নীলুকে ঢুকতে দেখেই উঠে বসলেন।

'কেমন আছেন মামা?'
'ভালোই আছিরে বেটি। থাক থাক, সালাম লাগবে না। শরীরটা ভালো তো মা?'
'জ্বি, ভালো। আমার চিঠি পেয়েছিলেন?'
'হ্যাঁ, পেয়েছি। চিঠিতে তুমি মা দু'টা সাধারণ বানান ভুল করেছ। এটা ঠিক না। বিশদ বানান লিখেছ 'স' দিয়ে। তারপর মুহূর্ত বানানও ভুল।'

নীলু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল।

'চিঠিপত্র লেখার সময় হাতের কাছে ডিকশনারি রাখবে। ডিকশনারি আছে না ঘরে?'
'আছে মামা।'
'গুড। কোনটা আছে, আধুনিক না সংসদ অভিধান?'

নীলু না জেনেই মাথা নাড়ল। কবির মামা বললেন, 'রাতে শোবার সময় ডিকশনারিতে বানান দু'টা দেখে নিও মা।'

'জ্বি আচ্ছা, দেখব। আপনি খাওয়াদাওয়া করেছেন?'
'না, রাতে আর কিছু খাব না। শরীরটা আগের মতো নেই। পরিশ্রম করতে পারি না।'
'না খেলে তো শরীর আরো খারাপ করবে।'
'এটা ঠিক না। মাঝেমধ্যে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করলে শরীরের বিশ্রাম হয়। সবাই তো বিশ্রাম চায়।'

নীলু ঘুমুতে গেল অনেক রাতে। শফিক তখনো জেগে। নীলুর জন্যেই অপেক্ষা করছে বোধহয়। শোবার ঘরের প্রাইভেসিতে কিছু কড়া কড়া কথা শোনাবে। নীলু একটা পিরিচে দু'টি সন্দেশ এবং এক গ্লাস পানি নিয়ে ঘরে ঢুকল। মৃদুস্বরে বলল, 'মিষ্টি খাও।'

'না।'
'খাও না। একটা অন্তত খাও।'

শফিক একটি মিষ্টির খানিকটা ভেঙে মুখে দিল। নীলুকে অবাক করে

দিয়ে সহজ স্বরে বলল, 'বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়। রাত হয়েছে।'

নীলু বাতি নিভিয়ে দিল। শফিককে কি আজ রাতেই তার সুইডেনের ব্যাপারটা বলা উচিত? দু' জন শুয়ে আছে পাশাপাশি। হাত বাড়ালেই একে অন্যকে ছুঁতে পারে। তবু দু' জন কী দু' প্রান্তেই না বাস করে! নীলু মৃদুস্বরে ডাকল, 'এ্যাই, ঘুমাচ্ছ?'

'না।'

'আজ আমাদের বোর্ড মীটিং হল। আমাদের সবাইকে চারটা বোনাস দিয়েছে।'

'ভালোই তো।'

নীলুর মন খারাপ হয়ে গেল। বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই শফিকের গলায়। ভদ্রতা করেও অন্তত দু'একটা কথা বলতে পারত। নীলু খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আমার আর একটা ভালো খবর আছে।'

'কি?'

'আমাকে ওরা ট্রেনিং-এ সুইডেনে পাঠাচ্ছে। ছ' মাসের ট্রেনিং।'

'কবে সেটা?'

'মার্চে কিংবা এপ্রিলে। আমি ঠিক জানি না।'

শফিক আর কোনো কথা বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এল। এক জন সুখী মানুষের নিশ্চিন্ত ঘুম। ঘুমের মধ্যেই সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্ন দেখবে সে।

আজ রাতে নীলুরও স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করছে। কোনো এক দূর দেশের স্বপ্ন। যে দেশে দুঃখ নেই, অভাব নেই, ক্ষুধা নেই। যেখানে চাকরির জন্যে কেউ আমরণ অনশন করে না। স্ত্রীরা বাড়ি ফিরতে দেরি করলেই স্বামীদের মুখ অন্ধকার হয় না।

সেই দেশের আকাশ এদেশের আকাশের চেয়েও অনেক বেশি নীল। গাছপালা অনেক বেশি সবুজ।

কবির মামা রফিককে নিয়ে বের হয়েছেন।

তাঁর হাতে প্রকাণ্ড জাবদা খাতা। ছাত্রদের নাম-ঠিকানা সেখানে লেখা, প্রথমে যাবেন নীলক্ষেতে—ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার। মুকসেদ আলি থাকেন সেখানে। বোটানির এসোসিয়েট প্রফেসর। রফিকের সঙ্গে যাবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে চাঁদা তোলার কোনো অর্থ হয় না। তাছাড়া কেউ দেবেও না কিছু। নিজেদেরই চলে না, চাঁদা দেবে কী!

কিন্তু তবু সঙ্গে যেতে হল। কবির মামা নিউ মার্কেটে বাস থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলেন। রফিক গম্ভীর গলায় বলল, 'চাঁদা তোলার ব্যাপারটা কি মামা হেঁটে হেঁটে করা হবে?'

'হ্যাঁ। আপত্তি আছে?'

'আছে।'

'তোর জন্যে মোটরগাড়ি লাগবে?'

'পেলে ভালো হত, আপাতত একটা রিকশা হলেই চলবে।'

'টাকা যেটা উঠবে, সেটা তো রিক্সা ভাড়াতেই চলে যাবে।'

'রিক্সা ভাড়া আমি দেব।'

'তুই দিবি কোত্থেকে? তুই তো এখনো সিন্দাবাদের ভূতের মতো ভাইয়ের ঘাড়ে বসে আছিস।'

'সেটা নিয়ে এখন কোনো আর্গুমেন্টে যেতে চাই না। শুধু এইটুকু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, হাঁটাহাঁটি সম্ভব না।'

'যা, তুই চলে যা। আমি একাই পারব।'

রফিক গেল না। মুখ অামশি করে আসতে লাগল পাশাপাশি। মুকসেদ আলি সাহেবকে বাসায় পাওয়া গেল। ভদ্রলোক স্যারকে দেখে যে-পরিমাণে উৎসাহিত হলেন, স্যারের নীলগঞ্জ প্রজেক্টের কথা শুনে ঠিক সে-পরিমাণ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন।

'আপনি একা কতটুকু করবেন স্যার?'

'একা কোথায়? তোমরা সবাই আছ আমার সঙ্গে। আছ না? তাছাড়া পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো কাজ একা একাই করা হয়েছে।'

'বহু টাকাপয়সার ব্যাপার স্যার।'

'টাকাপয়সার ব্যাপার তো আছেই। তুমি কত দেবে বল?' কবির মামা খাতা খুলে ফেললেন।

'তোমাকে দিয়েই শুরু।'

ভদ্রলোক শুকনো গলায় বললেন, 'মাসের প্রথম দিক ছাড়া তো স্যার আমার পক্ষে সম্ভব না। ইউনিভার্সিটির মাষ্টারদের মাসের প্রথম দিকে কিছু টাকাপয়সা থাকে, তারপর নুন নাই পান্তাও নাই অবস্থা।'

'মাসের প্রথম দিকে আসব?'

'আপনার আসার স্যার দরকার নেই। ঠিকানা রেখে যান। আমি কিছু পাঠিয়ে দেব।'

'তোমার কথাবার্তা শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে না তুমি পাঠাবে। মনে হচ্ছে তুমি চেষ্টা করছ আমাকে বিদায় করতে।'

মুকসুদ আলি সাহেবের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। রফিক দারুণ অস্বস্তিবোধ করল। কবির মামার কথাবার্তার কোনো মাত্রা নেই। যা মনে আসছে বলে ফেলছেন। এই যুগে মনের কথা সব সময় বলা যায় না। চেপে রাখতে হয়।

'মুকসুদ, আমি উঠলাম। মাসের প্রথম দিকে আবার আসব। আমি হচ্ছি কচ্ছপ, যেটা কামড়ে ধরি, সেটা ছাড়ি না। ইউনিভার্সিটির মাষ্টারদের মধ্যে আমার আর কোনো ছাত্র আছে?'

'ঠিক বলতে পারলাম না।'

'একটু খোঁজ করবে। আর শোন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমার প্রজেকটের কথা বলবে। সবাই তো আর তোমার মতো না। কেউ কেউ উৎসাহিত হবে।'

'আমি বলব।'

নীলক্ষেত থেকে কবির মামা গেলেন মতিঝিলে। তিন-চার জন ছাত্রের নাম-ঠিকানা আছে। তাদের মধ্যে এক জনকে শুধু পাওয়া গেল। সেই ছাত্র স্যারকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। স্যারের কথাবার্তা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, 'এত বড়ো কাজ কি স্যার প্রাইভেট সেকটরে হয়? সরকারি সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব না।'

'প্রথমেই যদি তুমি ধরে নাও সম্ভব না, তাহলে আর সম্ভব হবে কীভাবে?'

'আবেগতাড়িত হয়ে স্যার অনেকে অনেক প্রোগ্রাম নেয়। সোনার বাংলা করতে চায়। তা কি আর হয়?'

'হবে না কেন?'

ছাত্রটি মৃদুস্বরে বলল, 'চা খান স্যার। আপনি রেগে যাচ্ছেন।'

'তুমি বেকুবের মতো কথা বলবে, আমি রাগতেও পারব না!'

'আমি স্যার প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমগুলির দিকে আপনার দৃষ্টি ফেরাতে চাচ্ছি।'

'কাজে নামার আগেই তুমি প্রবলেমের কথা ভাবতে শুরু করেছ? আমার ছাত্র থাকাকালীন তো তুমি এতটা বোকা ছিলে না! সেই সময় তো তোমার কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল।'

রফিক, কবির মামার কথাবার্তায় স্তম্ভিত। বলে কী এ লোক! ছাত্রটি অবশ্যি মোটামুটি ভদ্র ব্যবহারই করল। চা কেক-টেক আনিয়ে খাওয়াল এবং ফিরে আসার সময় পাঁচ শ' টাকার দু'টি চকচকে নোট দিল। এটা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। রফিক ধরেই নিয়েছিল, এই লোকের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। মুখ শুকনো করে বলবে, পরে এক দিন আসুন, দেখি কিছু করা যায় কিনা।

সে-সব না বলে বলল, 'সামনের মাসে আসেন এক বার, দেখি আর কিছু করা যায় কিনা।'

'করা যায় কিনা বললে তো হবে না। করতেই হবে।'

রাস্তায় নেমেই রফিক বলল, 'চল মামা, বাড়ি যাওয়া যাক। এক দিনে তো রোজগার ভালোই হল।'

কবির মামা চোখ কপালে তুলে বললেন, 'এখনই বাড়ি যাবি কী!'

'আরো ঘুরবে?'

'ঘুরব না মানে? কাজটা সহজ ভাবছিস তুই?'

'আগামীকাল থেকে নতুন উদ্যমে শুরু করলে কেমন হয়?'

'তোর কাজ থাকলে তুই চলে যা।'

'দুপুর হয়ে গেছে, খাওয়াদাওয়া করবে না? তাছাড়া এখন লাঞ্চ টাইম, কাউকে পাবে না। তারচে চল খানাপিনা করা যাক।'

'কোথায় খাবি?'

'সস্তার একটা হোটেল আছে সেগুনবাগানে, সেখানে যেতে পারি। কিংবা তুমি চাইলে ভাবীর অফিসে গিয়েও খেতে পারি। ভাল ক্যান্টিন আছে।'

'চল যাই সেখানে।'

'তবে মামা সেখানে না যাওয়াই ভালো।'

'কেন?'

'আমি তো বলতে গেলে রোজ দুপুরে খাচ্ছি সেখানে। এখন তোমাকে নিয়ে গেলে অফিসের লোকজন ভাববে পুরো ফ্যামিলি এনে পার করে দিচ্ছে।'

'চল তাহলে, সেগুনবাগানের দিকেই যাই।'

'একটা রিকশা নেয়া যাক, কী বল?'

'নে একটা।'

সেক্রেটারিয়েটের কাছে এসে রিকশা থেকে নেমে যেতে হল। মিছিল বের হয়েছে একটা। আকাশ ফাটানো গর্জন উঠছে, 'গণতন্ত্র চাই, গণতন্ত্র চাই!!' কবির মামা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের জন্যে মিছিল বের করতে হচ্ছে, এরচে লজ্জার ব্যাপার আর কী হতে পারে?'

রফিক কিছু বলল না। কবির মামা বললেন, 'মিছিলটা কাদের?'

রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'মানুষদের মিছিল, আবার কাদের? তুমি কি মামা মিছিলে ভিড়ে যাবে নাকি? খাবে না?'

'হুঁ, খাব।'

'তাহলে দাঁড়াও, মিছিল চলে যাক।'

'চল খানিকটা যাই। প্রেসক্লাবের সামনে বেরিয়ে পড়লেই হবে।'

রফিকের বিরক্তির সীমা রইল না। সে ইচ্ছা করেই পিছিয়ে পড়ল। সিগারেট খাওয়া দরকার। দীর্ঘ সময় বিনা সিগারেটে চলেছে। বুক ব্যথা করছে এখন। মিছিল এগোচ্ছে খুব শ্লথ গতিতে। লক্ষণ ভালো নয়। নিরীহ ধরনের এইসব মিছিল মাঝে মাঝে ভয়াবহ চরিত্র নেয়। এটিও হয়তো নেবে। রফিক সিগারেটে টান দিয়ে শ্লোগানে গলা মেলাল, "বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই। বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।"

কবির মামা ক্লান্ত মুখে প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। অনশন করা ছেলে তিনটি এখনো আছে। নীল শাড়ি পরা মেয়েটিও আছে। আশেপাশে আর কেউ নেই। যেন এই ব্যাপারটিতে কারো কোনো উৎসাহ নেই।

রফিক কাছে আসতেই কবির মামা বললেন, 'দেশের কী অবস্থা দেখেছিস? চাকরির দাবিতে অনশন করতে হচ্ছে। কী সর্বনাশের কথা!'

রফিক কিছু বলল না।

কবির মামা বললেন, 'বাথরুমে যাওয়া দরকার।'

'বাথরুম কোথায় পাবে এখানে? বসে যাও রাস্তার পাশে।'

'কী যে কথাবার্তা তোর!'

'তাহলে যাও প্রেসক্লাবে, গিয়ে বল, আমি নীলগঞ্জের প্রভাতী পত্রিকার সম্পাদক। আমাকে একটু পেচ্ছাব করার সুযোগ দিন।'

কবির মামা বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন প্রেসক্লাবের দিকে। রফিক গেল নীল শাড়ি পরা মেয়েটির কাছে।

'অনশনের আজ কত দিন?'

'ছয় দিন।'

'বলেন কী?'

বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষ তিন জন চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাচ্ছে। মেয়েটি বলল, 'আপনি কি কাগজের লোক?'

'না। আমিও এক জন বেকার। শোনেন ভাই, আপনারা কেউ সিগারেট খাবেন? ভালো সিগারেট আছে আমার কাছে, খেতে পারেন।'

মেয়েটি বলল, 'আপনি বেকার, ভালো সিগারেট পেলেন কোথায়?'

'আমার ভাবী প্রেজেন্ট করেছে। আপনি কে?'

'আমার নাম রীতা।'

'এদের মধ্যে আপনার কেউ আছে?'

'আমার ছোট ভাই আছে।'

'কোন জন?'

মেয়েটি আঙুল দিয়ে দেখাল। এই লোকটিই বোধহয় কাল রাতে সিগারেট নিয়েছিল। রফিক বলল, 'কী নাম ভাই আপনার?'

'ফরহাদ।'

'কষ্ট হচ্ছে খুব?'

লোকটি জবাব দিল না।

'সিগারেট নেবেন?'

'না।'

কবির মামা আসতে দেরি করছেন। তাঁর বড়ো বাথরুমে পেয়েছে কিনা কে জানে। রফিক আরেকটি সিগারেট ধরাল। নীল শাড়ি পরা রোগা মেয়েটি কি কিছু খেয়েছে? রফিক মনে-মনে ভাবল, মেয়েটিকে যদি বলা হয়, আসুন আপনি আমাদের সঙ্গে চারটা ভাত খান, তাহলে সে কি আসবে? মনে হয় না। মেয়েদের আত্মসম্মান খুব বেশি।

১৬

শফিক অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। নীলু এসে বলল, 'এখানে তোমার একটা সই লাগবে।'

'কিসের সই?'

'আমার পাসপোর্টের দরখাস্তের ফরম। স্ত্রীর দরখাস্তে স্বামীর সিগনেচার লাগে, কিন্তু স্বামীর দরখাস্তে স্ত্রীর কোনো সিগনেচার লাগে না—অদ্ভুত নিয়ম-কানুন!'

শফিক গম্ভীর স্বরে বলল, 'তোমার সুইডেনের ব্যাপার?'

'হ্যাঁ। আমাদের অফিসের এক জন কলিগ দশ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট আনিয়েদেবে।'

'খুব কাজের লোক মনে হয়।'

'খুবই কাজের। আমাকে একটা টিভি কিনে দিয়েছেন এক হাজার টাকা কম দামে।'

বলেই নীলু জিবে কামড় দিল। টিভির কথাটা এখন সে বলতে চায় নি। এটা ছিল সবার জন্যে একটা সারপ্রাইজ। আজ সন্ধ্যায় ইসমাইল সাহেবের টিভি নিয়ে আসার কথা।

শফিক বলল, 'টিভি কিনছ নাকি?'

'হুঁ।'

'কই, আগে তো কিছু বল নি।'

'তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।'

'ঘরে আসবে কবে?'

'আজই আসবে। সন্ধ্যাবেলা নিয়েআসার কথা।'

নীলু উজ্জ্বল চোখে হাসল। মনোয়ারা বাইরে থেকে ডাকলেন, 'শুনে যাও তো বৌমা।'

কয়েক দিন ধরেই তিনি বেশ গম্ভীর হয়ে আছেন। কথাবার্তা বলছেন না। কিন্তু আজ যে-কোনো কারণেই হোক মেজাজ ভালো।

'কী ব্যাপার মা?'

'আজ অফিসে না গেলে হয় না?'

'কেন মা?'

'আছে একটা ব্যাপার।'

মনোয়ারা মুখ টিপে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন। নীলু কিছু বুঝতে পারল না।

'কী মা, না গেলে চলে?'

'হ্যাঁ, চলবে না কেন? বীণাদের বাসা থেকে টেলিফোন করে দেব। ব্যাপারটা কী?'

'শাহানাকে দেখতে আসবে।'

'দেখতে আসবে মানে?'

'সাড়ে তিনটার সময় আসবে, ছেলের এক চাচী আর ছেলের মা।'

নীলু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার শাশুড়ি বিয়ের আলাপ আলোচনা অনেক দিন থেকেই করছেন, এটাকে সে কখনোই গুরুত্ব দেয় নি। মায়েরা মেয়ে একটু বড়ো হলেই বিয়ে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে। এটাও সে-রকমই ভেবেছিল। এখন মনে হচ্ছে সে-রকম নয়। নীলু বলল, 'কই মা, আমি তো কিছু জানি না!'

'জানার মতো কিছু হলে তবেই না জানবে। তোমার খিলগাঁয়ের মামাশ্বশুর সম্বন্ধ আনলেন। ওরা এক জন অল্পবয়েসী মেয়ে চায়, তবে সুন্দর চায়।' আর কিছু না।

'এখন বিয়ে দিলে তো পড়াশোনা হবে না।'

'বিয়ে না দিয়েই যেন কত পড়াশোনা হচ্ছে! কোনো মতে ম্যাট্রিক হয়েছে।আই.এ. আর পাশ হবে না। তুমি যাও তো, শাহানাকে বলে আস আজ কলেজে যেতে হবে না।'

'ছেলে কী করে?'

'ছেলে রাজপুত্রের মতো। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা রিটায়ার্ড ডিসট্রিক জজ। বিরাট বড়োলোক। ছেলের ছবি আছে আমার কাছে, দেখবে?'

নীলু মন থেকে কোনো আগ্রহ দেখাতে পারছিল না, কিন্তু আগ্রহ না দেখলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। নীলু দেখতে গেল। ছবি দেখে স্বীকার করতেই হল, ছেলেটি অত্যন্ত সুপুরুষ—যাদের দেখলেই মনে হয়, আহ্, না জানি কোন মেয়ের সঙ্গে এর বিয়ে হবে!

মনোয়ারা বললেন, 'ছবি কেমন দেখলে মা?'

'ভালো।'

'শুধু ভালো?'

'ছেলে তো খুবই সুন্দর, করে কী?'

মনোয়ারা গালভর্তি করে হাসলেন। নীলু আবার বলল, 'ছেলে কী করে?'

'তোমার ধারণা, ছেলে যখন এত সুন্দর, তখন নিশ্চয়ই মাকাল ফল। আমারও সে-রকম ধারণা ছিল। ছেলে কিন্তু খুব ভালো। ওকালতি করছে। ভালো প্রাকটিস।'

'বয়স তো তাহলে অনেক বেশি।'

'না, বয়স বেশি না। এ বছরই বারে জয়েন করেছে। তুমি যাও তো বৌমা, শাহানাকে কলেজে যেতে নিষেধ কর। ওকে কিছু বলবে না। জানতে পারলে কান্নাকাটি চেঁচামেচি শুরু করবে।'

শাহানা কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। নীলুকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'তুমি আজ অফিসে যাও নি ভাবী?'

'না।'

'কেন?'

'ভালো লাগছে না।'

'তাহলে আমিও আজ কলেজে যাব না।'

'ঠিক আছে, না গেলে।'

'মা বকাবকি করবে।'

'তা হয়তো করবেন।'

'করলে করুক। আমি কলেজে যাব না আজ। তুমি মাকে একটু বলে আস আমার মাথা ধরেছে কিংবা কিছু একটা হয়েছে।'

শাহানা হৃষ্টচিত্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কলেজে যেতে হচ্ছে না—এতে সে দারুণ খুশি। তার ধারণা ছিল মা কিছু বলবেন, কিন্তু তিনি কিছু বলছেন না। এ-রকম সৌভাগ্য তার খুব বেশি হয় না। সে টুনীকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে বেড়াতে গেল।

আনিসের ঘরের দরজা খোলা। শাহানা উঁকি দিল।

'কি করছেন আনিস ভাই?'

'তেমন কিছু না। এস ভেতরে।'

শাহানা ভেতরে ঢুকল না। আনিস হাসিমুখে বলল, 'নতুন একটা চাইনীজ ট্রিক, শিখেছি দেখবে?'

'না।'

শাহানা দরজার সামনে থেকে সরে এল। আনিস বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

'এই যে শাহানা, তাকাও এদিকে? কি আছে হাতে? আহ্, চুপ করে আছ কেন, বল।'

'কিছু নেই।'

'গুড। এই দেখ হাত বন্ধ করলাম।'

আনিস মুঠি খুলল। চমৎকার একটি গোলাপ তার হাতে। শাহানা রাগী গলায় বলল, 'আবার আপনি আমাদের টবের গোলাপ ছিঁড়েছেন?'

'গোলাপ ছিঁড়েছি কি না-ছিঁড়েছি সেটা পরে, আগে বল ম্যাজিকটা কেমন?'

'এই ম্যাজিকটা শেখার পর আপনি আমাদের টবের সবগুলি গোলাপ নষ্ট করেছেন। এটা ছিঁড়েছেন আজ সকালে কেমন মানুষ আপনি, বলেন তো!'

'আচ্ছা যাও, আর ছিঁড়ব না। কথা দিচ্ছি।'

'গোলাপ কি আর আছে যে ছিঁড়বেন? সবই তো শেষ করে ফেলেছেন। আপনার একটু মায়াও লাগে না, না?'

আনিস লজ্জা পেয়ে গেল। গোলাপ গাছগুলি শাহানার খুব প্রিয়। সব তুলে ফেলা ঠিক হয় নি। শাহানার যা রাগ! পড়তে সময় লাগবে। আনিস মৃদুস্বরে বলল, 'গোলাপটা নাও শাহানা।'

'আমার দরকার নেই।'

টুনী হাত বাড়াল। শাহানা তাকে একটা ধমক দিল। কড়া গলায় বলল, 'এদিকে আয়, নিতে হবে না।' সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে মনোয়ারা ডাকছেন শাহানাকে। শাহানা আষাঢ়ের আকাশের মতো মুখ করে নিচে নেমে গেল।

আনিস গোলাপ নিয়ে প্রাকটিস চালাল খানিকক্ষণ। ফুলটা প্রকাণ্ড। একে ঠিকমতো 'পাম' করা মুশকিল। কিন্তু প্রাকটিসের একটা মূল্য আছে। হাত অভ্যস্ত হয়ে আসছে। এখন সে অনায়াসে ফুলটি লুকিয়ে রাখতে পারে। গোলাপ তৈরির ম্যাজিকে সে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হতে চায়। যেখানেই সে হাত দেবে, সেখানেই তৈরি হবে একটি রক্তগোলাপ।

দশটার মতো বাজে। আনিসের তেমন কিছু করার নেই। শরাফ আলির কাছে গেলে কেমন হয়? ফুলের এই ম্যাজিকটি শরাফ আলির কাছ থেকে শেখা। তাকে অবশ্যি কখনোই পাওয়া যায় না। তাকে ধরার একমাত্র কৌশল হচ্ছে বারবার যাওয়া। কিন্তু শরাফ আলি যে জায়গায় থাকে, সেখানে বারবার যাওয়া সম্ভব নয়, এবং যাওয়া ঠিকও নয়।

প্রথম বার গিয়েছিল বদরুলের সঙ্গে। নওয়াবপুর রোডের এক গলিতে বদরুল ঢুকে পড়ল। নর্দমার পাশ দিয়ে যাবার রাস্তা। পচা গন্ধে গা গোলাতে শুরু করল। গলির ভেতর তস্য গলি। নবাবী আমলের বাড়িঘর সেদিকে। যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়ার কথা, কিন্তু ভেঙে পড়ছে না। অধিকাংশ বাড়িরই দরজা-জানালা নেই। মোটা চট ঝুলছে। দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার অন্ধকার ভাব।

আনিস ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কোথায় নিয়ে এলেন বদরুল ভাই?'

'আসল জায়গা।'

'আসল জায়গা মানে?'

'সন্ধ্যা না হলে বুঝবে না। ঢাকা শহরের এটা খুব-একটা খান্দানী অঞ্চল।'

তারা একটি দোতলা জরাজীর্ণ লাল ইটের দালানের সামনে দাঁড়াল। বদরুল গলা উঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'শরাফ আলি ভাই আছেন? শরাফ আলি ভাই।' কেউ কোনো সাড়া দিল না। বদরুল নিচু গলায় বলল, 'পামিংয়ের আসল লোক। ওস্তাদ আদমি। তবে শালা মারাত্মক খচ্চর।'

বহু ডাকাডাকির পর নীল লুঙ্গি পরা বড়োমতো এক জন লোক বেরিয়ে এল। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তাকাচ্ছে চোখ লাল করে। বদরুল দাঁত বের করে বলল, 'শরাফ ভাই, ভালো আছেন?'

'হুঁ।'

'ঘুমাচ্ছিলেন নাকি?'

'হুঁ।'

'আনিসকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে। বলেছিলাম তো তার কথা

আপনাকে। খুব বড়ো ঘরের ছেলে। আপনার কাছ থেকে দু'–একটা কৌশল শিখতে চায়। সাধ্যমতো টাকাপয়সা খরচ করবে। কয়েকটা পামিং যদি....'

'আরেক দিন আসেন।'

'আপনাকে তো শরাফ ভাই পাওয়া যায় না। এসেছি যখন একটু বসি, আলাপ–পরিচয় হোক।'

'আরেক দিন আসেন। সইল ভালো না।'

শরাফ আলি দ্বিতীয় কোনো কথার সুযোগ না দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বদরুল আরো খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করল, কিন্তু লাভ হল না। শরাফ আলির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়।

ফেরবার পথে বদরুল বলল, 'এই লোক অনেক কিছু জানে। ম্যাজিক শিখতে হলে এর সঙ্গে লেগে থাকতে হবে। জায়গাটা খারাপ। তোমাকে ঘন ঘন এখানে আনা ঠিক না, তবে গরজটা যখন তোমার।'

'লোকটা কেমন?'

'শরাফ মিয়ার কথা বলছ? এই শ্রেণীর লোক যতটা ভালো হতে পারে ততটাই। বেশিও না, কমও না।'

শরাফ মিয়াকে আনিসের মনে ধরল। অসাধারণ পামিং জানে লোকটা। চোখের পলকে সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেলল। হাত উল্টে পাল্টে দেখাল, হাতে সিগারেটের প্যাকেট নেই। কিন্তু হাতেই আছে—দর্শকের চোখে পড়ছে না। অপূর্ব কৌশল! আনিসের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার পক্ষে কি শেখা সম্ভব?'

শরাফ মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, 'সম্ভব না।'

'কেন, সম্ভব না কেন?'

'এসব ভদ্রলোকের কাজ না। ছোটলোকের কাজ। ভদ্রলোকের হাতের তালু ইচ্ছামতো নরম হয় না।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'হুঁ, তা পারেন।'

প্রথম দিনেই গোলাপ লুকিয়ে রাখার কৌশল শিখিয়ে দিল। ভারি গলায় বলল, 'ফুলের বোঁটাটা ধরতে হয় আঙুলের ফাঁকে। ফুলটা এক বার থাকবে হাতের তালুর দিকে, এক বার থাকবে পিঠের দিকে। এইটা করতে হয় চোখের পাতি ফেলতে যত সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে।'

'কত দিন লাগবে শিখতে?'

'তিন–চাইর বছর। এর বেশিও লাগতে পারে।'

'বলেন কি!'

'ম্যাজিক ভদ্রলোকের কাজ না। ছোটলোকের কাজ।'

আনিস অবশ্যি চার মাসের মাথাতেই ব্যাপারটা মোটামুটি ধরে ফেলল। শরাফ মিয়া নির্লিপ্ত স্বরে বলল, 'আপনার হইব। কিন্তু কী করবেন এইসব

শিইখ্যা? লাভ কী?'

'কোনো লাভ নেই?'

'না, কোনো লাভ নাই। এক সময় রাজা–বাদশারা ছিল, এরা এইসব জিনিসের কদর করত। এখন রাজাও নাই, বাদশাও নাই। সব ফকির। ফকিরের দেশে ম্যাজিক চলে না।'

এই গলির ভেতর ঢুকতে আনিসের সব সময় একটু গা ছমছম করে। সব সময় মনে হয় সবাই বোধহয় বিশেষ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। এক বার ঢুকে পড়লে এই অস্বস্তিটা কেটে যায়, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে অস্বস্তি লাগে। অনেক দিন ধরে সে আসা–যাওয়া করছে এদিকে, তবু অস্বস্তির ভাবটা কাটছে না।

পানের দোকানের বেঁটে বুড়োটি আনিসকে দেখে পরিচিত ভঙ্গিতে হাসল, 'ভালো আছেন ভাইস্যাব?'

'ভালো।'

'শরাফ ভাইয়ের কাছে যান?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা যান। নিশ্চিন্তে যান। কেউ আপনেরে কিছু কইব না। বলা আছে সবেরে।'

শরাফ মিয়াকে পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর রেশমা জানালা খুলে বলল, 'বাসায় নাই।'

'কখনআসবেন?'

'জানি না।'

মেয়েটা দরজা বন্ধ করে দিল। আনিস দাঁড়িয়ে রইল। শরাফ মিয়া অনেক সময় ঘরে থেকেও বলে দেয় বাসায় নেই। ঘন্টাখানিক বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করলে এক সময় নিজেই বের হয়ে আসে। চক্ষুলজ্জায় পড়েই আসে সম্ভবত।

আনিস সিগারেট ধরাল।

জানালা খুলল আবার। রেশমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'এক বার তো কইলাম নাই। বাড়িত যান। কেন খালি ঝামেলা করেন?'

আর দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হয় না। আনিস হাঁটতে শুরু করল। রেশমা খুব সম্ভব শরাফ মিয়ার মেয়ে। অবশ্যি এই অঞ্চলে সম্পর্কের ব্যাপারটা খুব জোরালো নয়। মেয়ে নাও হতে পারে। রেশমার চেহারার সাথে কোথায় যেন শাহানার ছাপ আছে। তবে শাহানার মুখ গোল, এই মেয়েটির মুখ লম্বাটে। আনিস লক্ষ করেছে, এ মেয়েটি তাকে সহ্য করতে পারে না। কিংবা কে জানে এ অঞ্চলের কোনো মেয়েই হয়তো পুরুষ সহ্য করতে পারে না। সহ্য করতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

পানের দোকানের সামনে আসতেই বুড়ো লোকটি বলল, 'শরাফ ভাইরে পাইছেন?'

'না। বাসায় নেই।'

'বাসাতেই আছে। আবার যান।'

আবার যেতে ইচ্ছা করছে না। আর গেলেও কোনো লাভ হবে না। রেশমা বিরক্ত স্বরে চেঁচাবে, 'বাসাত নাই।'

শীতের দিনের রোদে এক ধরনের তীক্ষ্ণতা আছে। দুপরের দিকে এই রোদ গায়ে সুঁচের মতো বিঁধতে থাকে। আনিসের রোদে হাঁটতে ইচ্ছা করছিল না। রিকশা নিয়ে গুলিস্তান চলে যেতে ইচ্ছা করছে। সেখান থেকে কল্যাণপুরের বাস ধরা যাবে। কিন্তু পকেটের অবস্থা ভালো না। এই অবস্থায় বিলাসিতা প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাছাড়া হেঁটে যাবার অন্য একটা মজা আছে। হঠাৎ দু'এক জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিশিয়ানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন এক দিন কুদ্দুসকে পাওয়া গেল।

কুদ্দুস পুরানো ঢাকা অঞ্চলে খুঁজলি বিখাউজ এবং কান পাকার ওষুধ বিক্রি করে। সবক'টি ওষুধ স্বপ্নে পাওয়া এবং ওষুধগুলি দেয়া হয় বিনা মূল্যে। কারণ যিনি এই ওষুধ স্বপ্নে পেয়েছেন, তিনি বিক্রি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

তবে নামমাত্র হাদিয়া নেয়া হয়। ওষুধ তৈরির খরচ জোগাড় করার জন্যেই। অন্য কোনো কারণে নয়। কুদ্দুস ওষুধ বিক্রির আগে লোক জড়ো করবার জন্যে ম্যাজিক দেখায়। অসাধারণ সেসব ম্যাজিক। প্রথম শ্রেণীর 'পামিংয়ে'র কৌশল। একটি লোককে চারদিক থেকে সবাই ঘিরে আছে এবং সে এর মধ্যেই একের পর এক দেখিয়ে যাচ্ছে—দড়ি কাটার খেলা, পিংপংয়ের খেলা, চমৎকার সব তাসের খেলা। একটি খেলা তো বারবার দেখার মতো। কুদ্দুস একটি হরতনের বিবি নেয় হাতের মুঠোয়। কুদ্দুসের সহকারী ন' বছরের ফজল ঘন ঘন ডুগডুগি বাজায়। কুদ্দুস তার ভাঙা গলায় বলে, 'দেখেন ভাই দেখেন, বিবি সাবরে দেখেন। রাজার ছিল চাইর বিবি। এই বিবির কদর নাই। খাওন পায় না। মনে দুঃখু। দিন যায় আর বিবি দুবলা পাতলা হয়।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে হরতনের বিবির তাসটা ছোট হতে শুরু করে। ফজল ডুগডুগি বাজায় প্রচণ্ড শব্দে। তাস ছোট হতে হতে এক সময় মিলিয়ে যায়। অপূর্ব একটি খেলা কত সহজেই–না দেখাচ্ছে লোকটি।

আনিস অনেক দিন ধরেই খুঁজছে কুদ্দুসকে। আগে তাকে প্রায়ই পুরানো ঢাকায় দেখা যেত, এখন দেখা যাচ্ছে না। জায়গা বদল করেছে বোধহয়। এই শ্রেণীর লোকরা যাযাবর শ্রেণীর হয়। এক জায়গায় থাকতে পারে না বেশি দিন।

আনিস নিজেও কি এক দিন তাদের মতো হবে? রাস্তার পাশে তাকে

ঘিরে থাকবে লোকজন। ছোট্ট একটি অপুষ্ট শিশু চোখে পিঁচুটি নিয়ে প্রাণপণে ডুগডুগি বাজাবে। এবং সে দেখাবে তার বিখ্যাত গোলাপ তৈরির খেলা। খেলা শেষ হবার পর বিক্রি করবে--কালিগঞ্জের বিখ্যাত দাঁতের মাজন—যা নিয়মিত ব্যবহার করলে মুখে দুর্গন্ধ, মাড়ি ফোলা, দাঁতের পোকা, কিছুই থাকবে না। আসেন ভাইসব, ব্যবহার করে দেখেন—কালিগঞ্জের বিখ্যাত দন্ত-বান্ধব নিম টুথ পাউডার।

মনোয়ারা দুপুরের পর থেকেই অস্থির হয়ে পড়লেন। নীলু মনে-মনে বেশ বিরক্ত হল। শাহানাকে বিয়ে দিতে কোনো রকম সমস্যা হবার কথা নয়। তার মতো রূপবতী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ভালো ভালো সম্বন্ধ আসবে' কিন্তু মনোয়ারা এমন করছেন, যেন মেয়ে গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। আজ সাড়ে তিনটায় সেই কাঁটা সরানোর প্রথম ধাপটি শুরু হবে।

'বৌমা, শাহানাকে দেখলাম কামিজ পরে ঘুরঘুর করছে। ওকে একটা শাড়ি পরতে বল।'

'শাড়ি পরার দরকার কী মা? ওরা তো আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে আসছে না।'

মনোয়ারা রেগে গেলেন, 'যা করতে বলছি, কর। ওকে ভালো দেখে একটা শাড়ি পরাও। চুলে তেল দিয়ে চুল বেঁধে দাও।'

'এসব করতে গেলেই শাহানা সন্দেহ করবে।'

'সন্দেহ করলে করবে।'

'তারপর ধরুন মা, কোনো কারণে ওদের পছন্দ হল না, তখন তো শাহানা খুব শক পাবে।'

মনোয়ারা বিরক্ত স্বরে বললেন, 'চাকরি নেবার পর থেকে তুমি বৌমা বড়ো বেশি কথা বলছ। তুমি গিয়ে ওকে শাড়ি পরতে বল। তুমি না বললে আমি বলব।'

নীলু শাহানার খোঁজে গেল। শাহানা নিজের ঘরে গল্পের বই নিয়ে বসেছে এবং ঘন ঘন চোখ মুছছে। ভাবীকে দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল।

'টুনী কোথায় শাহানা?'

'বাবার সঙ্গে ঘুমুচ্ছে। কত বললাম আমার সঙ্গে এসে ঘুমাতে। তা ঘুমাবে না।'

'তুমি একটু ওঠ তো শাহানা। আমার সঙ্গে যাবে এক জায়গায়।'

'কোথায়?'

'ছবি তুলব।'

'তোমার সেই পাসপোর্টটির ছবি?'

'না, পাসপোর্টের ছবি তোলা হয়েছে। তুমি আর আমি দু' জনে মিলে তুলব। কালার ছবি।'

'কেন?'

'স্মৃতি রাখবার জন্যে। দু' দিন পর বিয়ে হয়ে কোথায় কোথায় চলে যাবে!'

'সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগে না।'

'ওঠ শাহানা। ভালো দেখে একটা শাড়ি পর।

'জামদানিটা পরব?'

'না, জামদানি ফুলে থাকবে। সিল্কের শাড়িটা পর।'

শাহানা খুশি মনে উঠে এল। শাড়ি পরল। চুল বাঁধল। সবুজ রঙের ছোট্ট একটা টিপ পরল কপালে। আয়নায় নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

'ভাবী, চোখে কাজল দেব?'

'কাজলের তোমার দরকার নেই।'

'কেমন লাগছে আমাকে?'

'তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সেরা রূপসীদের এক জন। কোনো ছেলে তোমাকে এক বার দেখলে সারা রাত বিছানায় ছটফট করবে।'

'তুমি ভাবী খুব অসভ্যের মতো কথা বল। ভালো লাগে না।'

সাজগোজ সারতে সারতেই মেহমানরা এসে পড়লেন। দু' জন বয়স্কা মহিলা। তাঁরা থাকলেন খুব অল্প সময়। চা-টা কিছুই খেলেন না। কথাবার্তাও কিছু বললেন না। কালোমতো মহিলাটি নীলুকে বললেন, 'তোমাকে মা আমি আগে দেখেছি। গুলশান মার্কেটে বিছানার চাদর কিনছিলে।'

কথাটা ঠিক নয়। নীলু কখনো গুলশান মার্কেটে যায় নি। কিন্তু সে কোনো প্রতিবাদ করল না। শাহানার সঙ্গে তাদের তেমন কোনো কথাবার্তা হল না। ফর্সা এবং অসম্ভব ধরনের মোটা মহিলাটি বললেন, 'খুব সাজগোজ করেছ দেখি।'

'আমরা ছবি তুলতে যাচ্ছি।'

'কোন স্টুডিওতে যাচ্ছ? এলিফেন্ট রোডের দিকে গেলে চল, আমি নামিয়ে দেব।'

'জ্বি-না। আমরা এই কাছেই যাব। হেঁটে যাওয়া যায়।'

ভদ্রমহিলার আচার-আচরণ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। সাড়ে চারটায় তাদের এক জায়গায় দাওয়াত আছে. তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন। মনোয়ারার মন খারাপ হয়ে গেল। মেয়ে ওদের পছন্দ হয় নি। পছন্দ হলে চলে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠত না। চা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কাপে চুমুক পর্যন্ত দিল না। ভদ্রতা করে হলেও কাপে একটা চুমুক দেবার দরকার ছিল। কালো মহিলাটি সারাক্ষণই নাক উঁচু করে ছিল। কপাল কুঁচকে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিল।

নীলু শাহানাকে নিয়ে ছবি তুলতে গেল সন্ধ্যার আগে আগে। দু'টি ছবি

তোলা হল। একটিতে নীলু এবং শাহানা। অন্যটিতে শুধু শাহানা। অনেকগুলি টাকা খরচ হল শুধু শুধু। ছবি ভালো আসবে কিনা কে জানে। স্টুডিওর মালিক এক জন বুড়ো লোক। সে চোখেই দেখে না' ছবি তুলবে কী?"

ফেরবার পথে শাহানা বলল, 'চল ভাবী, ফুচকা খাই। এখানে একটা ফুচকার গাড়ি আছে।'

'কোথায়?'

'আরেকটু সামনে যেতে হবে। চল যাই। ফুচকা খাবার পর আমরা একটু হাঁটব, কী বল?'

'সন্ধ্যাবেলা শুধু শুধু হাঁটব কেন? আর এখানে হাঁটার জায়গা কোথায়?'

'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে ভাবী। হাঁটতে হাঁটতে কথাটা বলব।'

'এখনই বল।'

শাহানা শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি ভাবী খুব কায়দা করে শাড়ি পরিয়েছ। সাজগোজ করিয়েছ। ঐ মহিলা দু'টি আমাকে দেখতে এসেছিলেন। ঠিক কিনা বল।'

'ঠিক।'

'আমি তো ভাবী তোমার মতো বুদ্ধিমান নই, সহজে কিছু বুঝতে পারি না। ওরা যে আমাকে দেখতে এসেছিলেন, সেটা বুঝলাম এই অল্প কিছুক্ষণ আগে।'

নীলু হাসল। কিছু বলল না। শাহানা বলল, 'তোমরা আমাকে বিয়ে দেবার যত চেষ্টাই কর না কেন লাভ হবে না।'

'তুমি বিয়ে করবে না?'

'যদি করি, করব আমার পছন্দমতো ছেলেকে।'

'এমন কেউ কি পছন্দের আছে?'

শাহানা জবাব দিল না। তার ফর্সা গাল লাল হয়ে উঠেছে। শেষ সূর্যের আভায় বড়ো সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। নীলু বলল, 'ছেলেটা কে শাহানা?'

শাহানা মাথা নিচু করে বলল, 'আমি যাকে বিয়ে করব সে খুবই সাধারণ এক জন মানুষ। তোমরা কেউ তাকে পছন্দ করবে না।'

'আমরা পছন্দ করব না, এমন কাউকে তুমি কেন বিয়ে করবে?'

'কারণ আমি তাকে পছন্দ করি।'

'ছেলেটি কে—আনিস?'

শাহানা জবাব দিল না। তার ভাসা ভাসা ঘন কালো চোখে জল চিক-চিক করতে লাগল। নীলু হালকা গলায় বলল, 'নিয়ে চল তোমার ফুচকার গাড়িতে। বেশি দূর নাকি?'

পরবর্তী এক সপ্তাহে খুব দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটল।

সোমবার

বাসায় টিভি এল। বার ইঞ্চি চমৎকার একটা টিভি। হোসেন সাহেব শিশুদের মত হৈচৈ শুরু করলেন। সন্ধ্যা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত টিভির সামনে থেকে নড়লেন না। মনোয়ারা কয়েক বার বললেন, 'এ রকম করছ, যেন টিভি কোন দিন চোখে দেখ নি।'

প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল টিভি আনার ব্যাপারটা মনোয়ারা ঠিক পছন্দ করছেন না। কিন্তু ফিরোজা বেগমের গানের সময় তিনিও খুব আগ্রহ করে সামনে বসলেন। শুধু শফিক এল না। হোসেন সাহেব রাত দশটার খবরের সময় উঁচু গলায় ডাকলেন, 'আস সবাই, খবর হচ্ছে—খবর।' যেন খবরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এটা শুনতেই হবে। শফিক তখনই শুধু বসল খানিকক্ষণ। হোসেন সাহেব সারাক্ষণই বলতে লাগলেন, 'এত সুন্দর রিসিপশন আমি কোনো টিভিতে দেখি নি। আর কী সুন্দর সাউণ্ড!'

মঙ্গলবার

মনোয়ারাকে অবাক করে দিয়ে ফর্সা ও মোটা মহিলাটি বুড়ো এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সকালবেলা উপস্থিত হলেন। তাঁরা দীর্ঘ সময় কথা বললেন হোসেন সাহেবের সঙ্গে। শফিকের অফিসে যাওয়া হল না। তাদের কথাবার্তায় নীলুর ডাক পড়ল না। মনোয়ারা শুধু অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে গেলেন, 'ওদের শাহানাকে পছন্দ হয়েছে।' সেদিনই বিকেলে একটি বিশেষ সময়ে নীলুকে যেতে হল নিউমার্কেটে। নীলুর সঙ্গে শাহানা। নীলুর ভান করতে হল যে সে বই কিনছে। শাহানা সারাক্ষণই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে রইল এবং এক সময় বলল, 'যার আমাকে দেখার কথা, সে কি দেখেছে?'

নীলু অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখাদেখির কোনো ব্যাপার এর মধ্যে নেই। বই কিনতে এসেছি, বই কিনে চলে যাব।'

'কেন আমাকে মিথ্যা কথা বলছ ভাবী? কালো স্যুট পরা লোকটি এসেছিল আমাকে দেখতে।'

'খুব সুন্দর না ছেলেটা?'

শাহানা জবাব দিল না। নীলু বলল, 'এমন চমৎকার ছেলের কথা শুধু গল্প উপন্যাসেই পড়া যায়।' শাহানা গম্ভীর হয়ে রইল। সে রাতে ভাত খেল না। তার নাকি মাথা ধরেছে।

নীলুর মনে হল বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আর এগোন ঠিক না। কিন্তু ঘটনাগুলি ঘটছে খুব দ্রুত। এক সময় আর ফেরা যাবে না। রাতের বেলা সে শফিককে বলল, 'শাহানার এই বিয়েতে মত নেই।'

শফিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওর মতামতটা চাচ্ছে কে?'
'যে বিয়ে করবে, তার কোনো মতামত থাকবে না?'
'শাহানার মতামত দেয়ার বয়স হয় নি।'
'ধর যদি অন্য কোনো ছেলের প্রতি তার কোনো দুর্বলতা থাকে, তখন?'
'কী যে বাজে কথা বল!'
'ও যে–রকম মেয়ে, কোনো একটা কাণ্ডটাণ্ড করে বসতে পারে।'
'কিছুই করবে না। আমি কথা বলব ওর সাথে।'
'কখন?'
'এখনই ডাক। কথা বলছি।'
'থাক, আজ আর না বললেও হবে।'
'আজ অসুবিধাটা কী?'
'মাথা ধরেছে, শুয়ে আছে।'
'তুমি বল, আমি ডাকছি।'
'প্লীজ, আজ না। যা বলার অন্য এক দিন বলো।'

বৃহস্পতিবার

সন্ধ্যাবেলা ফর্সা মোটা মহিলাটি অনেককে নিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে প্রচুর মিষ্টি। তারা শাহানার হাতে হীরে বসান একটি আংটি পরিয়ে দিলেন। মনোয়ারা বললেন, 'মা, ইনাকে সালাম কর।' শাহানা বাধ্য মেয়ের মতো সালাম করল।

সেই রাতেই শফিক শাহানার সঙ্গে অনেক সময় ধরে কথা বলল। নীলু সেই আলোচনায় থাকল না। কিন্তু লক্ষ করল, শাহানার মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অন্ধকার ভাবটা আর নেই।

সহজভাবে টিভির সামনে এসে বসল। গানের ভুবন অনুষ্ঠানটি খুব আগ্রহ নিয়ে দেখল। সেখানে এক জন শিল্পীকে একটি মাছি বড়ো বিরক্ত করছে। বারবার মাছিটি গিয়ে বসছে তার নাকে। শিল্পী নির্বিকার থাকতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না। দৃশ্যটি দেখে শাহানা অন্য সবার মতোই হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল। নীলুর মনে হল, শাহানাকে নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। এই বিয়েতে সে সুখীই হবে।

অনেক রাতে শাহানা নীলুকে বলল, 'ভাবী , আংটিটা কি পরে থাকব, না খুলে বাক্সে তুলে রাখব?'

'বাক্সে তুলে রাখার দরকার কী?'

'এত দামী আংটি হাত থেকে খুলে পড়ে যায় যদি!'

'না, পড়বে না। আংটিটা তোমার পছন্দ হয়েছে শাহানা?'

শাহানা কিছু বলল না। নীলু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ' যাক, তোমার

কল্যাণে হীরা দেখা হল। আমি হীরা আগে দেখি নি।'

১৭

শফিক অফিসে এসে শুনল, বড়োসাহেব সকাল আটটায় এসেছেন, কয়েক বার শফিকের খোঁজ করেছেন। তাঁর মেজাজ অবশ্যি ভালো। অন্য দিনের মতো চেঁচামেচি করছেন না। শফিক ঘড়ি দেখল, দশটা চল্লিশ। আজ তার অফিসে আসতে দেরি হল। এটা সে কখনো করে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যে দিন সে দেরি করে আসে, বেছে বেছে স্যারেনসেন ঠিক সেদিনগুলিতেই আসে।

'স্যার, মে আই কাম ইন?'

'কাম ইন। কেমন আছ শফিক?'

'ভালো।'

'আজকের ওয়েদার কেমন চমৎকার, লক্ষ করেছ? ব্রাইট সানশাইন। কুল ব্রিজ।'

শফিক ব্যাপার কিছু বুঝতে পারল না। বাতাসে কোনো মিষ্টি গন্ধ নেই, কাজেই বড়ো সাহেব প্রকৃতিস্থই আছেন। সকালবেলার চমৎকার ওয়েদার নিয়ে তাঁর কাব্যভাবের কোনো কারণ নেই। আজকের সকাল অন্য দিনের সকালের মতোই। আলাদা কিছু নয়।

'শফিক।'

'বলুন স্যার।'

'তুমি কি আমার প্রসঙ্গে কোনো গুজব শুনেছ? আমাকে নিয়ে দু'টি গুজব প্রচলিত। একটি হচ্ছে, তোমাদের অফিসের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ফেলছি। আমি এই গুজবটির কথা বলছি না। আমি বলছি অন্য গুজবটির কথা।'

'না স্যার, আমি কিছু শুনি নি।'

'ঠিকই শুনেছ। এখন প্রিটেণ্ড করছ। তাতে অবশ্যি কিছুই যায় আসে না।'

শফিক চুপ করে রইল। বড়োসাহেবের কথাবার্তা হেঁয়ালির মতো লাগছে।

'আমাকে হেড অফিস জানিয়েছে যে তারা মনে করছে আমি এখানকার কাজকর্ম ঠিকমতো চালাতে পারছি না। কাজেই তারা আমার এক জন রিপ্লেসমেন্ট পাঠাচ্ছে।'

'কবে?'

'এই সপ্তাহেই। তোমার জন্যে যে সুপারিশ আমি করেছিলাম, সেটিও বাতিল হয়েছে। কাজেই তুমি ফিরে যাবে তোমার আগের জায়গায়।'

শফিক সিগারেট ধরাল। স্যারেনসেন শান্ত স্বরে বলল, 'আমার ব্যাপারে

ওদের ডিসিশন ঠিকই আছে। আমি মোটামুটি একটি অপদার্থ। কিন্তু তোমার ব্যাপারে ওরা ভুল করল। আমি খুবই দুঃখিত। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। আমি চার্জ হ্যাণ্ডওভার করব, তার জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করতে সাহায্য কর।'

শফিক দীর্ঘ সময় তার ঘরে চুপচাপ বসে রইল। স্যারেনসেনের বদলে অন্য কেউ এলে ভালো হবারই কথা। এখানকার এ্যাডমিনিসট্রেশন অত্যন্ত দুর্বল। প্রায় এগারটার মতো বাজে, এখনো অফিসের সব কর্মচারী এসে উপস্থিত হয় নি। কর্মচারীদের আনা-নেয়ার জন্যে কোনোগাড়ি নেই। অথচ গাড়ির স্যাংশন হয়ে আছে দু' বছর আগে। অত্যন্ত জরুরি ছাপ মারা ফাইলগুলিও সে ফেলে রাখবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তার মুড আসছে না, কিংবা মাথা ধরেছে। কিংবা এই ব্যাপারটি নিয়ে সে আরো চিন্তা-ভাবনা করতে চায়।

কিন্তু তবুও স্যারেনসেন এক জন ভালো মানুষ। জগতের বেশির ভাগ অপটু মানুষরা সাধারণত ভালো মানুষ হয়ে থাকে, এর কারণ কি? নিজের অক্ষমতাকে ভালোমানুষী দিয়ে আড়াল করে রাখার একটা চেষ্টা কি?

সিদ্দিক সাহেব এসে ঢুকলেন। হাসি-হাসি মুখ। যেন এইমাত্র মজার কিছু ঘটে গেছে।

'কী শফিক সাহেব, সকালবেলাতেই মুখ এমন গম্ভীর কেন? বড়ো সাহেবের খবরে আপসেট নাকি?'

'কিছুটা তো আপসেট বটেই।'

'যাকে নিয়ে আপসেট, সে কিন্তু সুখেই আছে। সকালে এসে গুনগুন করে গান গাইছে। আসলে বাংলাদেশ থেকে বেরুতে পেরে ব্যাটা খুশি।'

'তাই কি?'

'তাই। নয়তো এতটা ফুর্তি হবার কথা না। বেল টিপুন, চা দিতে বলুন। আপনি কি অফিশিয়াল অর্ডার পড়ে দেখেছেন?'

'না।'

'আছে আমার সঙ্গে। চা খাবার পর পড়ে দেখবেন।'

শফিক ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। অফিস অর্ডার সিদ্দিক সাহেবের কাছে যাবে কেন?

'বুঝলেন শফিক সাহেব, এবার আমরা অফিস এ্যাডমিনিসট্রেসন টাইট করব। আপনার ফুল কো-অপারেশন দরকার। আমাদের নিজেদের সারভাইভেলের জন্যেই এটা দরকার। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, এতে কোম্পানি বিজনেস গুটিয়ে ফেলবে। বিদেশী কোম্পানিগুলি এদেশে আসে কাঁচা পয়সা নিতে। ভ্যাকেশন কাটাতে তো আসে না। এদের পয়সা তৈরির সুযোগ করে দিতে না পারলে তো আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কী বলেন?'

শফিকের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। হেড অফিস সিদ্দিক সাহেবের প্রমোশন দিয়েছে। অফিস অর্ডার তাঁর কাছে যাবার রহস্য হচ্ছে এই।

'শফিক সাহেব।'

'বলেন।'

'বড়োসাহেবের একটা জমকাল ফেয়ারওয়েল দেবার ব্যবস্থা করা যাক। এই দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। ছোটখাট একটি ফাংশান, তারপর ডিনার। ফাংশান সবাই এ্যাটেণ্ড করবে, ডিনার শুধুমাত্র অফিসারদের জন্যে। এবং সবার তরফ থেকে তাঁকে আমরা একটা গিফ্‌ট্‌ও দিতে চাই। কী দিলে ভাল হয় সেটা নিয়েও একটু চিন্তা করবেন। বাংলাদেশের ল্যাণ্ডস্কেপের উপর একটা অয়েলপেইন্টিং পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। আপনার চেনা-জানা কেউ আছে আর্টিস্ট?'

'না।'

'আমি অবশ্যি দু'-এক জনকে চিনি। দেখব কি করা যায়।'

সিদ্দিক সাহেব প্রায় এক ঘন্টার মতো বসলেন। তিনি সম্ভবত এই হঠাৎ আসা প্রমোশনের খবরে শফিকের কাছে লজ্জিত বোধ করছিলেন। লজ্জা ঢাকার জন্যেই বসা।

শাহানাদের কলেজ আজ দুপুরবেলা ছুটি হয়ে গেল। ফার্স্ট ইয়ারের একটি মেয়ে কুমিল্লা যাচ্ছিল বাবা-মা'র সঙ্গে। এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মারা গেছে তিন দিন আগে। খবর পাওয়া গেছে আজ। সেজন্যেই ছুটি এবং শোকসভা।

শোকসভায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হল। ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বক্তৃতা দিলেন। যার ভাবার্থ হচ্ছে, সংসার অনিত্য, জন্মিলে মরিতে হবে। ভাইস প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের লম্বা বক্তৃতা দেয়ার বদঅভ্যাস আছে। সুযোগ পেয়ে তিনি প্রায় পঞ্চাশ মিনিট কথা বললেন। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

শাহানার সবচে প্রিয় বান্ধবী মিলি, ফিসফিস করে বলল, 'আগে আগে ছুটি হয়ে লাভটা কি হল? সেই তো সাড়ে বারটা বাজিয়ে ফেলেছে।'

শাহানা বলল, 'এখন দেখবি লীনা আপা বক্তৃতা দেবে।'

'সর্বনাশ হবে তাহলে। লীনা আপা ঝাড়া দু' ঘন্টা বলবে।'

ওদের আজ নিউ মার্কেটে যাবার কথা। লীনা আপা ডায়াসে গেলে সেটা সম্ভব হবে না। শাহানা অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সম্ভবত আজ আপা কিছু বলবে না। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। তাঁরও নিশ্চয়ই কোথাও যাবার কথা। হলভর্তি ছাত্রী মুখ শুকনো করে বসে আছে। শোকসভা না হয়ে অন্য কিছু হলে এতক্ষণে স্যাণ্ডেল ঘষাঘষি শুরু হত। আজ তা করা যাচ্ছে না। দুঃখী-দুঃখী মুখ করে সবাই বসে আছে।

শাহানার মন খারাপ করিয়ে লীনা আপা বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কাঁপা কাপা গলায় বললেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতার নাম……'

শাহানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। সূচনা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা একটা লম্বা ব্যাপার হবে। অথচ যে মেয়েটি মারা গেছে তাকে এই আপা হয়তো চেনেনও না। কিন্তু কত ভালো ভালো কথা বলা হবে। এমনভাবে সবাই বলবে, যেন ঐ মেয়েটির মতো ভালো মেয়ে পৃথিবীতে জন্মায় নি। এবং তার মৃত্যুতে সবার একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। কোনো মানে হয়? শাহানার ঐ মেয়েটির উপর রাগ লাগতে লাগল। কী দরকার ছিল তার কুমিল্লা যাবার?

শাহানা সময় কাটানোর জন্যে অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করল। এই কাজটা সে খুব ভালো পারে। ক্লাসে কোনো লেকচার যখন তার পছন্দ হয় না, তখন স্যারের দিকে তাকিয়ে থেকে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। বেশ লাগে তার।

শাহানা ভাবতে লাগল বাসায় ফিরে গিয়ে কী করবে। করার কিছুই নেই। এমন নিরানন্দ জীবন। কিছুক্ষণ পড়াশোনা, টিভি দেখা, রাতের পর ঘুমানো, ব্যস। দিনের পর দিন একই রুটিন। এতটুকুও ভালো লাগে না, প্রায়ই ইচ্ছা করে কোথাও পালিয়ে যেতে। ছেলে হয়ে জন্মালে সে নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত। মেয়ে হয়ে পালিয়ে যাওয়াও সম্ভব না। পত্রিকা খুললেই মেয়েদের নিয়ে এমন সব আজেবাজে খবর দেখা যায়। এসব খবর শাহানার পড়তে ভালো লাগে না। কিন্তু মা আবার বেছে বেছে সেই খবরগুলিই ভাবীকে পড়ে শোনাবেন।

'বৌমা, শুনে যাও, কী লিখেছে। মানুষ আর মানুষ নেই। জানোয়ার হয়ে গেছে। ফরিদপুরের নবগ্রামে তিন জন যুবক কর্তৃক এগারো বৎসর বয়েসী কুলসুমকে……'

এসব খবর কি জোরে জোরে পড়ে শোনানোর জিনিস? কিন্তু মাকে বলবে কে? যতই দিন যাচ্ছে, মা ততই অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কী বাজে স্বভাব যে তাঁর হচ্ছে। অবশ্যি এখন তার সঙ্গে মা খুব ভালো ব্যবহার করছে, যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, তার সঙ্গে হয়তো খারাপ ব্যবহার করার নিয়ম নেই। আগে টুনীকে নিয়ে ছাদে গেলে এক শ' বার জবাবদিহি করতে হত।

'ছাদে গিয়েছিলি কেন?'

'দিনের মধ্যে দশ বার ছাদে যাওয়া লাগে কেন?'

'খবরদার, আর যেন না দেখি। এত বড়ো মেয়ে ছাদে ঘুরঘুর করবে কেন? ছাদ কি হাওয়া খাবার জায়গা?'

এখন মা কিছুই বলে না। কয়েক দিন আগে কলেজ থেকে ফেরবার সময় গলির মাথায় আনিস ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। দু' জন কথা বলতে বলতে আসছে। মা ব্যাপারটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল। এই নিয়ে কিছুই বলল না। অন্য সময় হলে এক লক্ষ প্রশ্ন করত।

'কী কথা হল আনিসের সাথে? হাত নেড়ে নেড়ে এমন কী কথা?'

'তোকে কত বার বলব, আগ বাড়িয়ে আলাপ জমাতে যাবি না?'

'হাসতে হাসতে দেখি ভেঙে পড়ে যাচ্ছিলি। রাস্তার মধ্যে কেন এমন হাসাহাসি? ভদ্রলোকের মেয়ে না তুই?'

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার কিছু ভালো দিকও আছে। স্বাধীনতা আসে। কত দিন থাকবে এই স্বাধীনতা কে জানে। বিয়ের পর কী হবে, এসব নিয়ে শাহানা কখনো ভাবে না। ভাবতে ভালো লাগে না। যা হবার হোক, তখন দেখা যাবে। তবে শাহানা নিশ্চিত যে লোকটির সঙ্গে তার বিয়ে হবে, সে ভালোই হবে। ছ্যাবলা ধরনের হবে না। সে-রকম হলে শাহানার সঙ্গে বারবার দেখা করত। চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে চাইত। চাইনীজে নিয়ে যেত। প্রেম প্রেম একটা খেলা চলত। সবকিছু ঠিকঠাক করবার পর প্রেমের অভিনয়। এই ছেলে এসব কিছুই করে নি। এই একটি কারণে শাহানা তার উপর কৃতজ্ঞ। শাহানা ঠিক করে রেখেছে, বিয়ের প্রথম রাতেই এজন্যে সে তার স্বামীকে ধন্যবাদদেবে।

ওদের বাড়ি থেকে এক বার বিরাট এক গাড়ি এসে উপস্থিত। বাচ্চারা সবাই চিড়িয়াখানায় যাবে। তাদের ইচ্ছা শাহানাকে নিয়ে যাবার। শাহানা কি পারবে যেতে? তার যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। মা'র জন্যে যেতে হল। সাজসজ্জা করতে হল। চুল বাঁধতে হল। শাহানা ধরেই নিয়েছিল, চিড়িয়াখানাটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে ও তার সঙ্গে ঘুরতে-টুরতে চায়। কিন্তু ও ছিল না। বাচ্চারাই গিয়েছে দল বেঁধে।

মাঝে মাঝে শাহানার মনে হয়, ওর মধ্যে শাহানার প্রতি একটা অবহেলার ভাব আছে। নয়তো বিয়ে ছ' মাস পিছিয়ে দেবার প্রস্তাবে ছেলের আত্মীয়স্বজনরা কেউ রাজি হল না। কিন্তু ছেলে রাজি হয়ে সবাইকে রাজি করাল। এসব খবর অবশ্যি খিলগাঁর মামার কাছ থেকে পাওয়া। তাঁর সব খবর বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি বানিয়ে বানিয়ে প্রচুর কথা বলেন।

লীনা আপার বক্তৃতা প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিনি আধ ঘন্টা বক্তৃতা দিলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। দুই মিনিট পর পর রবীন্দ্রনাথ এই বলেছেন—মহামতি বালজাক এই বলেছেন। আগে জানলে কে আসত শোক সভায়?

শাহানার বাসায় ফিরতে ফিরতে তিনটা বেজে গেল। বাসায় কেউ নেই, শুধু শফিক বসে আছে বসার ঘরে।

'ওরা কোথায় ভাইয়া?'

'খিলগাঁয়।'

'তুমি আজ এত সকাল-সকাল যে?'

'এসে পড়লাম একটু আগে আগে।'

'শরীর খারাপ নাকি?'

'না, শরীর ভালোই আছে।'

'আজ আমাদেরও সকাল সকাল ছুটি হয়েছে। ফার্স্ট ইয়ারের একটা মেয়ে মারা গেছে—এজন্যে ছুটি।

'কীভাবে মারা গেল?'

'জানি না। এ্যাকসিডেন্ট না কি যেন হয়েছিল।'

শাহানা কাপড় বদলাতে গেল। বাড়িটা ফাঁকা বলেই কেমন অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে অন্য কোনো মানুষের বাড়ি। আর খিলগাঁয় যখন গিয়েছে, তখন রাত দশটা–এগারটার আগে ফিরবে না। শাহানার দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল।

'শাহানা, শাহানা।'

'কী ভাইয়া?'

'চা বানাতে পারিস?'

'পারব না কেন, তুমি আমাকে কী ভাব?'

'বানা এক কাপ চা।'

শাহানা অত্যন্ত উৎসাহে চা বানাতে গেল। রান্নাঘরে যাবার সে কোনো সুযোগ পায় না। মনোয়ারার কঠিন নিষেধ আছে। বিয়ের আগে রান্নাঘরে যাওয়া যাবে না। আগুনের আঁচে গায়ের রঙ নষ্ট হয়। রান্নাবান্না যা শেখার বিয়ের পর শিখলেই হবে।

শফিক চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। শাহানা এল তার পিছু পিছু।

'তোর গোলাপ গাছে অনেক ফুল ফুটেছে রে শাহানা।'

শাহানা হাসল। গাছের প্রসঙ্গে কেউ কোনো কথা বললেই শাহানার বড়ো ভালো লাগে।

'তোর গাছগুলি তুই শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবি, না রেখে যাবি আমাদের জন্যে?'

'কী যে তুমি বল ভাইয়া!'

শাহানার লজ্জা করতে লাগল। ভাইয়া গম্ভীর ধরনের মানুষ, ঠাট্টা–তামাশা কখনো করে না। কিন্তু শাহানা লক্ষ করেছে, বিয়ের প্রসঙ্গে সে মাঝে মাঝে হালকা কথাবার্তা বলে।

কয়েক দিন আগে তারা খেতে বসেছে। খাবার তেমন কিছু নেই। ভাইয়া হঠাৎ বলল, 'এত বড়ো লোকের স্ত্রী এক জন খেতে বসেছে, আর এই খাওয়া!' শাহানার লজ্জায় মরে যাবার মতো অবস্থা। সবাই খুব হাসাহাসি করল। বাবার হাসি তো আর থামেই না। শেষটায় বিষম খেয়ে ফেললেন।

আজ শফিকের মুখ অন্ধকার হয়ে আছে। একটু আগে সে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। শফিক বলল, 'তোর ভাবী কখন আসে?'

'পাঁচটার মধ্যে এসে পড়ে। চারটা পর্যন্ত অফিস। ওদের গাড়ি এসে দিয়ে

যায়।'

'গাড়ি এসে দিয়ে যায়? জানতাম না তো। আমাকে তো কিছু বলে নি!'

'এই মাস থেকেই নিয়ে যাচ্ছে, দিয়ে যাচ্ছে।'

শাহানার মনে হল, শফিক আরো গম্ভীর হয়ে গেছে। এতে তো খুশি হবার কথা, গম্ভীর হবে কেন? শাহানা বলল, 'ভাইয়া, আমি একটু ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাবি?'

'ছাদে।'

ছাদ ফাঁকা। শাহানার মনে হচ্ছিল, আনিস ভাইকে তার ঘরে পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘর তালাবন্ধ। কাপড় শুকোবার দড়িতে ধবধবে সাদা রঙের কয়েকটা কবুতর। এদের পোষ মানানো হচ্ছে। ম্যাজিকে লাগবে। শাহানা কবুতরের খাঁচায় হাত রাখতেই একটি কবুতর ঘাড় বাঁকিয়ে তার হাতে ঠোকর দিল। এই বুঝি পোষমানা কবুতরের নমুনা!

শাহানা একা একা ছাদে হাঁটতে লাগল। শীত লাগছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। কেমন মন খারাপ করিয়ে দেবার মতো একটা সন্ধ্যা নামছে। কোনো রকম কারণ ছাড়াই শাহানার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। খাঁচার কবুতরগুলি আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে।

ছাদ থেকেই দেখা গেল রফিক আসছে। সে চার দিনের জন্যে যশোর গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল, কী, কাউকে বলে যায় নি। চাকরির কোনো ব্যাপার হবে বোধহয়। আজকাল চাকরির ব্যাপারে সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। শাহানা নিচে নেমে এল। রফিক তার দিকে তাকিয়ে হাসল। কেমন রোগা লাগছে রফিককে।

'কেমন আছেন শাহানা বেগম?'

'ভালো আছি। তুমি কেমন?'

'ভালোই।'

'কেমন খুশি-খুশি লাগছে তোমাকে। চাকরি-টাকরি কিছু হয়েছে?'

'না। আমার ঐসব হবে না। বিজনেস করব ঠিক করেছি। বাসায় কেউ নেই নাকি?'

'না। খিলগাঁয়ে গিয়েছে। ভাবী এখনো ফেরে নি।'

'চট করে চা বানা। খুব কড়া করে। হাই পাওয়ারড্ টী দরকার। কেউ কি আমার খোঁজ করেছিল?'

'না কারোর খোঁজ করার কথা?'

'উঁহু।'

নীলু আজও ফিরতে দেরি করছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে—সাড়ে ছ'টা বাজে। এতটা দেরি করার কথা না। শফিক শাহানাকে বলল, 'তোর ভাবী কি দেরি হবার কথা কিছু বলে গেছে?'

'না।'

'প্রায়ই কি সন্ধ্যা পার করিয়ে আসে?'

'না। বীণাদের বাসা থেকে অফিসে টেলিফোন করে দেখব?'

'দরকার নেই।'

শাহানা বলল, 'আরেক কাপ চা বানিয়ে দেব ভাইয়া?'

'না।'

শফিকের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে। কোনো কাজের মানুষ নেই বাড়িতে। রফিককে বললে সে এনে দেবে। বলতে ইচ্ছা করল না। শফিক নিজেই চাদর গায়ে দিয়ে বেরুল। শাহানা বলল, 'যাচ্ছ কোথায় ভাইয়া?'

'সিগারেট কিনব।'

'আমিও আসি তোমার সাথে?'

'আয়।'

সারাটা পথ শাহানা কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। শফিক হাঁটছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। শাহানা কী বলছে, তার কানে যাচ্ছে কিনা সন্দেহ। সে অবশ্যি হ্যাঁ হুঁ দিয়ে যাচ্ছে।

'ভাবীর সঙ্গে তুমিও চলে যাও না কেন সুইডেনে। সে যা এ্যালাউন্স পাবে তাতে তোমরা দু' জন দিব্যি থাকতে পারবে। আমরা রাখব টুনীকে। কোনোই অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া টুনী তো রাতে থাকে বাবার সাথে। তোমাদের জন্যে সে খুব কাঁদবে-টাঁদবে বলে মনে হয় না। আসবার সময় তার জন্যে একগাদা খেলনা নিয়ে আসবে। শোন ভাইয়া, বিদেশে ডল হাউস বলে একটা খেলনা পাওয়া যায়। যা সুন্দর! চমৎকার একটা বাড়ি। সব রকম আসবাবপত্র আছে। এমনকি বাথরুমে বেসিন, কমোড সব আছে। ঐ একটা নিয়ে আসবে।'

শফিকের মনে হল, শাহানা মানসিক দিক দিয়ে এখনো বড় হয় নি। ছোটই রয়ে গেছে। হুট করে তার বিয়ে ঠিক করাটা বোধহয় ভালো হয় নি। মানসিক প্রস্তুতির জন্যে সময় দেয়া দরকার ছিল।

'ভাইয়া, সিগারেট কিনেই কি তুমি বাসায় চলে আসবে?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'চল না ঐ বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যাই।'

'সেখানে কী?'

'ভাবীর মাইক্রোবাস সেখানে থামে। ভাবী বাস থেকে নেমেই আমাদের দেখবে। খুব অবাক হবে। যাবে ভাইয়া?'

'চল যাই।'

দু' জনে হাঁটতে শুরু করল। শাহানা মৃদুস্বরে বলল, 'তোমাকে একটা গোপন খবর দিতে পারি ভাইয়া।'

'কী খবর?'

'খুবই গোপন। কাউকে কিন্তু বলতে পারবে না।'

'গোপন খবর হলে না–বলাই তো ভালো। গোপন খবর তো বলে দেয়ার জন্যে না।'

শাহানা চুপ করে গেল। ভাইয়ার সঙ্গে অন্য কোনো মানুষের কোনো মিল নেই। অন্য কেউ হলে বলত, 'কাউকে বলব না, খবরটা কী বল।' ভাইয়া সেটা বলবে না। শাহানার খুব ইচ্ছা করছে খবরটা বলে। ভাবী সতের শ' টাকা দিয়ে একটা ঘড়ি কিনেছে শফিকের জন্যে। ম্যারেজ এ্যানিভারসারি উপলক্ষে সেটা শফিককে দেওয়া হবে। এই হচ্ছে খবর।

ঘড়ি কেনার সময় নীলু শাহানাকে নিয়ে গিয়েছিল। শাহানা অবাক হয়ে বলেছিল, 'এত দাম দিয়ে ঘড়ি কিনবে!' নীলু লাজুক হেসে বলেছে, 'ওকে ভালো কিছু দিতে চাই।'

'কিন্তু ভাইয়া তো তোমাকে কখনো কিছু দেয় নি।'

'কোত্থেকে দেবে? ওর কি টাকা আছে?'

'টাকা থাকলেও দিত না। এসব দিকে তার কোনো নজরই নেই।'

কথাটা খুবই সত্যি। গত ম্যারেজ এ্যানিভারসারিতে নীলু দুপুরবেলা শফিকের অফিসে উপস্থিত হল। শফিক অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, তুমি!' নীলু হেসে বলেছে, 'এমনি দেখতে এলাম কী করছ।'

'শুধু শুধু আসবে কেন? নিশ্চয়ই কোনো কাজ আছে। টুনীকে কার কাছে রেখে এসেছ?'

'কার কাছে আর রাখব, মা'র কাছে। তুমি কি আজ ছুটি নিতে পার?'

'কেন?'

'খিদে লেগেছে খুব। কোনো একটি রেস্টুরেন্টে বসে লাঞ্চ খাওয়া যেত। আজকের তারিখটা তোমার মনে নেই, তাই না?'

তারা প্রায় আধ ঘন্টার মতো দাঁড়িয়ে রইল। নীলুর বাস এল না। শফিক বলল, 'চল্ যাই, ঠাণ্ডা লাগছে।'

'একটু দাঁড়াও ভাইয়া, এসে পড়বে।'

শফিক কোনো জবাব না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। শাহানা বলল, 'আর একটুখানি থাকি না ভাইয়া। আমার মনে হচ্ছে পাঁচ–দশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।'

'আসুক। দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না।'

নীলু এল ন'টার একটু আগে। তাদের এক কলিগ অফিস ছুটির আগে আগে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। অফিসের মিনিবাসে করে তাকে শেরে বাংলা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। অন্য সবাইও গিয়েছে সেখানে। ডাক্তাররা বললেন, হার্ট এ্যাটাক। ভদ্রলোকের এখনো জ্ঞান ফেরে নি। তার স্ত্রী এবং দু'টি ছেলে হাসপাতালে এসে খুব কান্নাকাটি করছে।

শফিক কোনো রকম উৎসাহ দেখাল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'খবর তো দেবে।'

'কীভাবে দেব খবরটা? সারাক্ষণ তো হাসপাতালে ছিলাম।'

'তুমি তো হাসপাতালে থেকে কিছু করতে পারছিলে না। শুধু শুধু আমাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেললে।'

'এক জন কলিগের এত বড়ো দুঃসময়ে আমি যাব না?'

শফিক গম্ভীর গলায় বলল, 'তর্ক পরে করবে, এখন দেখ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। রান্নাবান্না কিছুই তো হয় নি।'

নীলুর প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। সে মাথাধরা নিয়েই রান্নাঘরে ঢুকল। শাশুড়ি খাওয়াদাওয়া শেষ করে ফিরবেন কিনা কে জানে।

দুপুরের তরকারি কিছুই নেই। রাতের বেলার জন্যে কী রাঁধবে, নীলু ভেবে পেল না। রফিককে ডিম কিনে আনার জন্যে পাঠাতে হবে।

রফিক ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। নীলু ডাকতেই সে ক্লান্তস্বরে বলল, 'ভাবী, আমার জ্বর। হঠাৎ করে জ্বর এসে গেছে। বিশ্বাস না হলে কপালে হাত দিয়ে দেখ।'

নীলু আনিসের খোঁজে ছাদে গেল। আনিস ছিল না। নীলু ফিরে এল মন খারাপ করে। ডাল-ভাতই খেতে হবে। রান্নাঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না, খুব ক্লান্তি লাগছে। নীলু শাহানাকে ডেকে বলল, 'তুমি রফিকের পাশে বস, মাথায় হাত-টাত বুলিয়ে দাও। ওর জ্বর।'

শাহানার ইচ্ছা করছিল নীলুর সঙ্গে গল্প-টল্প করে। কিন্তু সে গেল রফিকের ঘরে। জ্বরে সত্যি সত্যি রফিকের গা পুড়ে যাচ্ছে। শাহানা বলল, 'চুল টেনে দেব?' রফিক বলল, 'চুল ধরে টানাটানি করার কোনো দরকার নেই। তুই নিজের কাজে যা।'

জ্বরের সময় কোনো একটা কথা কানে গেলে সেটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। চুল টানার ব্যাপারটা রফিকের মাথায় ঘুরতে লাগল। তার মনে হতে লাগল তিন-চার জন অল্পবয়েসী মেয়ে একঘেয়ে গলায় তার কানের কাছে চেঁচাচ্ছে—

চুল টানা, বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা।
সাহেব বলেছে যেতে
পান সুপারি খেতে
পানের ভেতর মৌরি বাটা।
ইস্কুপের চাবি আঁটা।।
চুল টানা বিবিয়ানা
চুল টানা বিবিয়ানা।

হোসেন সাহেবরা এলেন রাত এগারটায়। সে–সময় রফিকের মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। গ্রিন ফার্মেসির ডাক্তার অজয় বাবু চিন্তিত মুখে বসার ঘরে বসে আছেন। আনিস আছে, রশিদ সাহেব আছেন। জ্বর উঠেছে এক শ' পাঁচ পর্যন্ত। রফিক বিড়বিড় করে ছড়াজাতীয় কী যেন বলছে। শাহানার বুক ধড়ফড় করছে। একি কাণ্ড! সুস্থ মানুষ। এসে চা খেল, গোসল করল আর ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আকাশ–পাতাল জ্বর! মনোয়ারা কাঁদতে শুরু করলেন। হোসেন সাহেবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। অজয় বাবু বললেন, 'ভয়ের কিছু নাই, জ্বর রেমিশন হবে। অস্থির হবার কিছু নাই।'

রাত তিনটার দিকে রফিকের জ্বর অনেকখানি কমল। সে উঠে বসে সহজ স্বরে বলল, 'কিছু খেতে–টেতে দাও ভাবী। মুড়ি ভেজে আন ঝাল দিয়ে।'

নীলু ঘুমুতে গেল রাত চারটার দিকে। শফিক তখনো জেগে আছে। নীলু ক্লান্ত স্বরে বলল, 'ঘুমুবে না?'

'রাত তো বেশি বাকি নেই, ঘুমিয়ে কী হবে?'

'আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'

'শুয়ে পড়।'

নীলু শুয়ে পড়ল। টুনী আজ তাদের সঙ্গে ঘুমিয়েছে। অনেক বড়ো হয়ে গেছে মেয়েটা। দেখতে দেখতে কেমন বড়ো হয়ে যাচ্ছে। নীলু টুনীকে বুকের কাছে টেনে আনল। টুনী ঘুমের মধ্যেই মাকে জড়িয়ে ধরল। আহা, সারা দিন দেখা হয় নি মেয়েটিকে। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করেছে কিনা কে জানে। কেমন রোগা–রোগা লাগছে হাত–পা। কপালের কাছে লাল একটা দাগ, ফুলে উঠেছে। পড়ে গিয়ে ব্যথাট্যাথা পেয়েছে নিশ্চয়ই। নীলু চুমু খেল কপালের কাটা দাগে।

শফিক বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে এল। নীলু বলল, 'টুনী কেমন ব্যথা পেয়েছে দেখেছ? কপাল ফুলে উঠেছে।'

শফিক কিছু বলল না। নীলু বলল, 'আরেকটু হলে চোখে লাগত।'

'যাদের বাবা–মা দু' জনেই ব্যস্ত তাদের ছেলেমেয়েরা অবহেলার মধ্যেই বড়ো হবে। এটা নিয়ে দুঃখ করা ঠিক না। তুমি ঘুমাও।'

নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'আমার চাকরিটা তোমার পছন্দ না, তাই না?'

শফিক চুপ করে রইল।

'বল, তোমার কি ইচ্ছা না আমি চাকরি করি?'

শফিক শান্ত স্বরে বলল, 'আমার কাছে মনে হয়, পরিবারের প্রতি মেয়েদের দায়িত্ব অনেক বেশি।'

'সেই দায়িত্ব আমি পালন করছি না?'

'রাত–দুপুরে এ নিয়ে তর্ক করতে ভালো লাগছে না।'

'তর্ক না। তোমার মতামতটা শুনি।'

'মতামত তো দিলাম। টুনী বড়ো হচ্ছে অযত্ন অবহেলায়। যার ফল হিসেবে তার মানসিক বিকাশ অন্যসব শিশুদের মতো হবে না।'

'টুনীর মানসিক বিকাশ হচ্ছে না?'

'আমি ইন জেনারেল বলছি। চাকরিজীবী মহিলার কাছে ঘর–সংসারের চেয়ে তাদের ক্যারিয়ারই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। অফিসের এক জন কলিগের অসুস্থতা তার কাছে বিরাট ব্যাপার মনে হয়। যেমন তোমার উদাহরণটাই ধরা যাক।'

'আমার কী উদাহরণ?'

'সুইডেনের ব্যাপারটায় তুমি কী রকম উল্লসিত হয়ে উঠলে। এক বারও ভাবলে না, এই ছয় মাস টুনী কীভাবে থাকবে।'

'ভাবি নি তোমাকে কে বলল?'

'ভাবলেও সেটাকে তেমন গুরুত্ব দাও নি। পাসপোর্ট করা, এই করা সেই করাতেই ব্যস্ত।'

'তুমি চাও না আমি যাই?'

শফিক জবাব দিল না।

'বল তুমি চাও না?'

'না।'

'চাকরি করি, তাও চাও না?'

'আমি না–চাইলেই তুমি ছেড়ে দেবে? তা পারবে না। এক বার যখন ঢুকেছ, সেখান থেকে কিছুতেই বেরুতে পারবে না। সংসার যদি ভেসে যায়, তাতেও না।'

'এতটা নিশ্চিত হয়ে কথা বলছ কীভাবে?'

'নিশ্চিত হয়ে বলছি, কারণ আমি জানি। যে মেয়ে চাকরি করে, সে কিছু পরিমাণে স্বাধীন। সেই স্বাধীনতা কোনো মেয়েই ছাড়বে না। সে সংসার ছেড়ে দেবে, কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়বে না।'

'মেয়েরা স্বাধীন হোক, সেটা তুমি চাও না?'

শফিক বলল, 'যথেষ্ট তর্ক হয়েছে, এখন ঘুমুতে যাও।'

নীলু ঘুমতে পারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান শোনা গেল। ভোর হচ্ছে। শুরু হচ্ছে আরেকটি দিন। এই দিন অন্যসব দিনের মতো নয়। এটি একটি বিশেষ দিন। এই দিনে সাত বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল।

১৮

বৈশাখ মাস।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। ধরন দেখে মনে হয় কালবৈশাখী

হবে। পাখিরা অস্থির হয়ে ওড়াউড়ি করছে। ওরা টের পায়। কবির মাষ্টার দ্রুত পা চালাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আছে শওকত। শওকতের মাথায় বিছানার চাদর দিয়ে বাঁধা গাদাখানেক বই। বইগুলি যোগাড় হয়েছে নীলগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরির জন্যে। পাবলিক লাইব্রেরি আপাতত তাঁর শোবার ঘরে। খুব শিগগিরই ঘর তোলা হবে। জমি খানিকটা পেলেই হয়। জমি পাওয়া যাচ্ছে না।

কবির মাষ্টার আকাশের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললেন, 'তাড়াতাড়ি পা চালা শওকত। তুই দেখি বইগুলি ভেজানোর মতলব করছিস!'

'আর কত তাড়াতাড়ি যাইতাম কন? আমি তো আর ঘোড়া না। মাথার উপরে আছে তিনমুণি বোঝা।'

'লম্বা লম্বা পা ফেল রে বাবা। বই ভিজলে সর্বনাশ!'

লম্বা লম্বা পা ফেলেও রক্ষা হল না। কালী মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই চেপে বৃষ্টি এল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। তারা ছুটতে ছুটতে কালী মন্দিরে উঠল। মন্দিরটি জরাজীর্ণ। পূজা-টূজা হয় না দীর্ঘ দিন। কালীমূর্তির মাথা নেই। মন্দিরের চাতাল গোবরে ভর্তি। কবির মাষ্টারের এক পা গোবরে ডুবে গেল।

'এহ্, কী কাণ্ড রে শওকত!'

পাকা দালানের বাড়ি। ছাদ ফেটে গেছে। পানি আসছে ভাঙা ছাদ থেকে। শওকত বলল, 'হাত তালি দেন স্যার।'

'কেন?'

'জায়গাটা সাপে ভর্তি।'

'বলিস কী!'

'দুইটা ছাগল মরল সাপের কামড়ে।'

'আরে ব্যাটা, আগে বলবি তো!'

কবির মাষ্টার এই একটি প্রাণীকে ভয় করেন। এই প্রাণীটির সঙ্গে কেন যেন তাঁর বারবার দেখা হয়।

'শওকত!'

'জ্বি স্যার।'

'চল্, রওনা দিই।'

'এই তুফানের মইধ্যে কই যাইবেন? জবর তুফান হইতাছে।'

বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়ছে। মন্দিরের দরজা-জানালা কিছু নেই। বৃষ্টির ঝাপটায় দু' জনেই কাকভেজা হয়ে গেল। কবির মাষ্টার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এক কালে কত জাঁকজমক ছিল মন্দিরের। প্রতি অমাবস্যায় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজা হত। এখন কিছুই হয় না। গরু-ছাগল চরে বেড়ায়। বিত্তশালী হিন্দুদের কেউই নেই। সবার ধারণা হয়েছে, সীমান্ত পার হতে পারলেই মহা সুখ।

পালবাবুরা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর একটি ছেলে মারা গেল। পালিয়ে যাবার সময় তাঁর বড়ো ছেলের বৌ বরুণা রহস্যময়ভাবে মিলিটারিদের হাতে পড়ল। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। মেয়েটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

পালবাবু প্রায় জলের দরে বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করলেন। সবাই বলল, 'এখন আর ভয় কী? এখন কেন যাবেন?' পালবাবু থাকলেন না। দেশ ছাড়ার আগে কবির মাষ্টারকে বলে গেলেন, 'মাস্টার, বসতবাড়ি আর দশ বিঘা ধানী জমি বিক্রি করি নাই, এইগুলি আমি তোমারে দিয়া যাইতাছি।'

কবির মাষ্টার অবাক হয়ে বললেন, 'কেন?'

'আমার বৌমা যদি কোনো দিন আসে এগুলি তুমি তারে দিবা। আমার কেন জানি মনে হয় বৌমা বাঁইচা আছে। সে একদিন-না-একদিন আসব নীলগঞ্জে।'

'সে বেঁচে আছে, এটা মনে করার কারণ কী?'

'আমি স্বপ্নে দেখছি মাষ্টার।'

'সে যদি আসে, আমি নিজে পৌঁছে দেব আপনার কাছে।'

'না মাষ্টার, তার দরকার নাই।'

'কেন? দরকার নেই কেন?'

পালবাবু জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বরুণা ফিরে আসে নি। দশ বিঘা জমি এবং বসতবাড়ি আছে আগের মতোই। এক বার ফজল মিয়া দলিল বের করল একটা, বসতবাড়ি এবং জমি তাকে দলিল করে দিয়ে গেছে পালরা। সেই দলিল আদালতে টিকল না। কিছু দিন হল ফজল আলির ভাগ্নে মিম্বর মিয়া একটি হ্যাণ্ডনোট বের করেছে, যার মর্মার্থ হচ্ছে, উনিশ শ সত্তুর সনে পালবাবু তার কাছে এগার হাজার বত্রিশ টাকা কর্জ নিয়েছে। সে টাকা শোধ হয় নি। টাকা শোধ কিংবা অনাদায়ে বাড়িঘর নিলামে তোলার জন্যে সে চেষ্টা-তদবির করছে।

কবির মাষ্টার মিম্বর মিয়ার সঙ্গে দেখা করে ঠাণ্ডা গলায় বলে এসেছেন, 'দেখ মিম্বর, উনিশ শ সত্তুর সনে তুমি হাফপ্যান্ট পরতে। দাড়িগোঁফও জ্বালায় নি। তোমার কাছ থেকে এগার হাজার টাকা কর্জ নিল পালরা! জালিয়াতি করতে হলে বুদ্ধি লাগে, তোমার মতো বেকুবের কাজ না।'

মিম্বর মিয়া কোনো উত্তর দেয় নি, কিন্তু এমনভাবে তাকিয়েছে—যার মানে সে সহজে ছাড়বে না।

কিছু দিন হল, কবির মাষ্টার ভাবছেন, গার্লস স্কুলটা পালদের বসতবাড়িতে শুরু করলে কেমন হয়? নাম দেবেন—বরুণাবালিকাবিদ্যালয়। বরুণা যদি সত্যি সত্যি ফিরে আসে, সে খুশিই হবে। আর, এক বার স্কুল চালু হয়ে গেলে সহজে কেউ হাত বাড়াবে না।

ঝড় ভালোই হয়েছে। গাছপালা পড়ে চারদিক লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

অধিকাংশ কাঁচা বাড়ি ঝড়ে উড়ে গেছে। মানুষজন মারা যায় নি। তবে বদিউজ্জামানের মা'র পা ভেঙেছে দু' জায়গায়। সে চিৎকার করছে গরুর মতো। বদিউজ্জামানের সেদিকে লক্ষ নেই। সে তার ঝড়ে উড়িয়ে নেওয়া ঘরের শোকে কাতর। সে উঠোনে বসে আছে মাথা নিচু করে। মায়ের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে এক বার ধমকে উঠেছে, 'আরে, খালি চিল্লায়। চুপ করেন।'

'ডাক্তারের কাছে আমারে লইয়া যা রে বদিউজ্জামান।'

'সকাল হউক।'

'সকালতক বাঁচতাম না।'

'না বাঁচলে নাই।'

বদিউজ্জামানের স্ত্রী হাঁস-মুরগির খবর নিতে ছোটাছুটি করছে।

আকাশের অবস্থা ভালো নয়। সাধারণত কালবৈশাখীর পরেপরেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। এবার সে-রকম হচ্ছে না। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়িঘর-ভাঙা মানুষগুলির জন্যে রাতের একটা আশ্রয় দরকার। এতগুলি মানুষকে আশ্রয় দেবার মতো ব্যবস্থা হঠাৎ করা মুশকিল।

কবির মাষ্টার ছাতা মাথায় দিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। এত বড়ো একটা ঝড় হয়ে গেল, কিন্তু এক জন মানুষও মারা গেল না—এই ব্যাপারটি তাঁকে অভিভূত করল। ঝড়ের মধ্যে বেঁচে এদের অভ্যাস আছে।

বদিউজ্জামানের মাকে সদরে পাঠানো দরকার। বদিউজ্জামানের সেদিকে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। ঘরের শোকেই সে কাতর।

কবির মাষ্টার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মাথায় হাত দিয়ে বসে আছিস কেন? মাকে হাসপাতালে নিয়ে যা।'

'সকাল হউক, সকালে নিমু।'

'সকালে নিবি কিরে ব্যাটা? অবস্থা তো খুবই খারাপ।'

'এখন রওনা দিলে শেষ রাইতে পৌছমু সদরে। কেউ পুছত না আমারে।'

'রুয়াইল বাজারে নিয়ে যা। ডাক্তার দেখা।'

'পয়সা নাই মাষ্টার সাব। হাঁস মারা গেছে দুইটা। তুফানে ফতুর হইছি।'

বদিউজ্জামান থুক করে এক দলা থুথু ফেলল। তার মা প্রাণপণে চিৎকার শুরু করল। কবির সাহেব বললেন, 'ডাক্তারের খরচ আমার কাছ থেকে নে।'

তিনি তাঁকে পঞ্চাশটা টাকা দিলেন। এদের এত খারাপ অবস্থা! দুঃসময়ের জন্যে কোনো সঞ্চয় নেই। একটা নীলগঞ্জ তহবিল করা দরকার। যেখান থেকে দুঃসময়ে টাকাপয়সা নেওয়া যাবে। তবে যথাসময়ে সে টাকা ফেরত দিতে হবে। তাতে সবার মনে একটা সাহস হবে।

'বদিউজ্জামান।'

'জ্বি।'

'টাকাটা ফেরত দিবি মনে করে। আমার নিজের টাকা না। সুখী

নীলগঞ্জের টাকা।'

'জ্বি আইচ্ছা।'

কবির সাহেব রাতে আর ঘুমুতে গেলেন না। সমস্ত গ্রাম ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। অল্প কিছু সময়ের জন্যে ঘুমুতে যাবার মানে হয় না। তিনি তাঁর চিঠিপত্র নিয়ে বসলেন। চিঠিপত্র আসতে শুরু করেছে। ছাত্রদের কাছ থেকে যে-রকম সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয়েছিল, সে-রকম সাড়া পাওয়া যায় নি। চিঠির উত্তর সবাই দিচ্ছে, কিন্তু আসল জায়গায় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। যেসব চিঠি পাচ্ছেন তার একটির নমুনা এরকম—

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও যে আপনি একটা কিছু করতে যাচ্ছেন, তা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আশা করি আপনার স্বপ্ন সফল হবে। সুখী নীলগঞ্জ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। আমি কতটুকু সাহায্য করতে পারব তা জানি না। কারণ বর্তমানে কিছু আর্থিক সমস্যা যাচ্ছে। সমস্যাটা মিটলেই আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ইতি

আপনার স্নেহধন্য

আমীরুল ইসলাম

এই জাতীয় চিঠিগুলির উপর তিনি লাল কালি দিয়ে লেখেন—সাক্ষাৎ। যার মানে হচ্ছে, চিঠিতে এর কাছে কোনো কাজ হবে না, দেখা করতে হবে। অবশ্যি মাঝে মাঝে দু'-একটা এমন চিঠি পান যে আনন্দে চোখ ভিজে ওঠে। রংপুর থেকে ওহীদুল আলম বলে একটি ছেলে লিখল—"স্যার, আমি ভাবতেও পারি নি আমার কথা আপনার মনে আছে। কী যে খুশি হয়েছি চিঠি পড়ে! অতি নিকৃষ্ট ছাত্র হয়েও আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হই নি, এই আনন্দ আমার রাখার জায়গা নেই। স্যার, আমি জীবনে তেমন কোনো সাফল্য লাভ করতে পারি নি। মোটামুটি একটি টানাটানির সংসার বলতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি আপনাকে সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। পাঁচ শ' টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠালাম। আমি আমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে আপনাকে পাঠাব। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমার মহা সৌভাগ্য যে আপনার জন্যে কিছু করতে পারছি। স্কুলে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে এক দিন একটা বড়ো অপরাধ করেছিলাম। আপনি আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে এক লাইনের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমার তা এখনো মনে আছে। যত দিন বেঁচে থাকব তত দিন তা মনে থাকবে।........"

এই জাতীয় চিঠিগুলি তিনি আলাদা করে রাখেন। কোনো কারণে মন খারাপ হলে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই মন ভালো হয়ে যায়। মনে হয় সুখী

নীলগঞ্জ প্রকল্প নিশ্চয়ই এক দিন শুরু হবে।

তিনি ফজরের আজান পড়ার আগ পর্যন্ত চিঠিপত্র নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। তারপর রুটিনমতো বেড়াতে বেরুলেন। দক্ষিণপাড়া থেকে কান্নার শব্দ আসছে। ব্যাপার কী? তিনি দ্রুত দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

কাঁদছে বদিউজ্জামান এবং তার স্ত্রী। বদিউজ্জামান তার মাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় নি। তার মা কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছে।

১৯

তিনি অবাক হয়ে নীলুর দিকে তাকালেন।

যেন নীলুর কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না। নীলু বলল, 'স্যার, আমি খুব লজ্জিত। শেষ মুহূর্তে জানালাম।'

বড়ো সাহেব বললেন, 'লজ্জিত হওয়াই উচিত। অন্তত এক মাস আগে জানলেও আমরা অন্য কাউকে পাঠাতে পারতাম।'

নীলু মাথা নিচু করে বসে রইল। বড়োসাহেব বললেন, 'আপনার সুইডেনে যেতে না পারার পেছনে কারণগুলি কী?'

'আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে। ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না।'

'কত ছোট?'

'সাড়ে তিন বছর বয়স।'

'এই প্রবলেমটা আগে লক্ষ করলেন না কেন?'

'আগে ভেবেছিলাম সম্ভব হবে। দেখতে দেখতে ছ' মাস কেটে যাবে।'

বড়ো সাহেব যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন। নীলু তার মুখ দেখেই সেটা বুঝতে পারছে। কিন্তু তার করার কিছুই নেই।

'ট্রেনিং হবে দুই পর্যায়ে। তিন মাস অফিস ম্যানেজমেন্ট এবং পরের তিন মাস সেল্‌স্ অ্যাণ্ড প্রমোশন। আপনি না--হয় প্রথম তিন মাসের ট্রেনিংটা শেষ করে চলে আসুন। নাকি সেখানেও অসুবিধা?'

'মেয়েদের স্যার অনেক অসুবিধা।'

'তিন মাস আপনার বাচ্চাকে দেখবার কেউ নেই? তার দাদী, কিংবা খালা, ফুপু?'

নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'আমি একা একা এত দূর যাই এটা আমার স্বামীর পছন্দ নয়।'

'আই সি।'

'আপনি যদি মনে করেন আমি কথা বললে তিনি কনভিন্সড্ হবেন, তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

'দরকার নেই স্যার।'

নীলু উঠে দাঁড়াল। এখন সাড়ে বারটা বাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চ ব্রেক হবে। তার আজ আর কাজ করতে ইচ্ছা করছে না। সে ছুটি নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

কেন জানি বাসায় যেতেও ইচ্ছা করছে না। আবার একা একা ঘুরে বেড়াতেও ইচ্ছা করছে না। বন্যা তার অফিসে, নয়তো তার বাসায় গিয়ে আড্ডা দেওয়া যেত। অনেক দিন বন্যার সঙ্গে দেখা হয় না। তার অফিসে চলে গেলে কেমন হয়? আগে কোনো দিন যায় নি। ঠিকানা আছে, খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে কেন?

বন্যা খুবই অবাক হল। দু' বার বলল, 'একা একা খুঁজে বের করলি? তুই তো দারুণ স্মার্ট হয়ে গেছিস? অল্প কিছু দিন চাকরি করেই তোর তো ভালো উন্নতি হয়েছে! তবে ভালোমতো বুদ্ধি খেলাতে পারিস নি। তোর প্রথমে উচিত ছিল টেলিফোন করে দেখা আমি আছি কিনা।'

'তোর এখানে আসব, এমন কোনো প্ল্যান ছিল না। হঠাৎ ঠিক করা।'

'আর মিনিট দশেক দেরি হলেই আমার সঙ্গে দেখা হত না।'

'এই সময় ছুটি হয়ে যায় নাকি তোদের?'

'না, ছুটি হয় চারটায়। আজ একটু সকাল-সকাল ফিরছি, বাড়ি দেখতে যাব।'

'বাড়ি বদলাচ্ছিস?'

'না। বরের সঙ্গে বনিবনা একেবারেই হচ্ছে না। আমি আলাদা বাসা নিচ্ছি। তোকে সব বলব। দাঁড়া একটু, বসকে বলে আসি। তুই কিছু খাবি?'

'না।'

নীলু অবাক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কী সব পাগলামি যে করছে বন্যা! বনিবনা না হলেই আলাদা বাসা ভাড়া নিতে হবে? তাছাড়া এই শহরে একটি মেয়েকে কেউ বাসা ভাড়া দেবে না। এই শহরে কেন, কোনো শহরেই দেবে না।

বন্যা নীলুকে নিয়ে রিকশায় উঠল। হালকা গলায় বলল, 'তোর হাতে সময় আছে তো?'

'আছে।'

'তাহলে চল্ আমার সঙ্গে। এক জন কেউ সঙ্গে থাকলে সাহস হয়। নিউ এ্যালিফেন্ট রোডে একটা মহিলা হোস্টেলের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলাম, কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকেই কেমন গা ছমছম করতে লাগল। সুন্দর সুন্দর সব মেয়েরা ঘুরঘুর করছে। ববকাট চুল, ঠোঁটে লিপস্টিক। বেশ ভদ্রঘরের মেয়ে বলে মনে হয়, কিন্তু কেমন একটু খটকা লাগল। হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে কথা বললাম। বিশাল মৈনাক পর্বতের মতো এক মহিলা। প্রথমে বলল সীট আছে। তারপর যখন শুনল আমি একটা এ্যাম্বেসিতে চাকরি করি, তখন বলল সীট নেই।'

'তুই কী বললি?'

'কিছু বলি নি, চলে এসেছি। জায়গাটা ভালো না।'

নীলু ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি আবার ঐখানেই যাচ্ছিস নাকি?'

'না, আরেকটা মহিলা হোস্টেল আছে। শুনেছি, সেটা ভালো। অনেক চাকরিজীবী মহিলা থাকে। তবে সীট পাওয়া মুশকিল।'

'হাসবেণ্ডের সঙ্গে কী হয়েছে, সেটা শুনি।'

'রিকশায় বসে বলার মতো কোনো স্টোরি না। নিরিবিলিতে বলব। আর ঐসব শুনে কী করবি?'

'হোস্টেল-টোস্টেল খোঁজার চেয়ে ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলা ভালো না?'

'আমি কিছু মেটাব না। ও যদি মেটাতে চায়, মেটাবে। দোষটা ওর, আমার না।'

রিকশাতেই বন্যা নিচু গলায় তার সমস্যার কথা বলতে শুরু করল।

'তোকে তো আগেই বলেছি, আমার চাকরি করাটা ও পছন্দ করে না। মাসখানেক আগে আমাদের এক জন অফিসার বেড়াতে এসেছেন আমার বাসায়। কার্টিসি ভিজিট। এতেই তার মুখ গম্ভীর—কেন এসেছে? মহিলা কলিগদের বাসায় ঘুরঘুর করার দরকারটা কী? এইসব। তারপর কী হল শোন। সেই ছেলেটা আরেক দিন এল। আর ওর মাথায় একদম রক্ত উঠে গেল—কেন বারবার আসবে?'

নীলু ক্ষীণস্বরে বলল, 'সত্যি তো, কেন আসবে বারবার?'

'বারবার কোথায় দেখলি? দু' বার এসেছে মাত্র। আর আমি কি তাকে বলতে পারি, আপনি আসবেন না আমার এখানে?'

নীলু চুপ করে রইল। বন্যা গম্ভীর গলায় বলল, 'তারপর কী হল শোন, ও বলল, তুমি চাকরি ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে যদি থাকতে চাও, তাহলে চাকরি ছাড়তে হবে।'

'তুই কী বললি?'

'আমার রাগ উঠে গেল। আমি বললাম, তুমি এমন কি রসোগোল্লা যে, তোমার সঙ্গে থাকতেই হবে।'

'কী সর্বনাশ!'

'সর্বনাশের কী আছে? সত্যি কথা বললাম। মেয়ে হয়েছি বলে সত্যি কথা বলতে পারব না?'

'সত্যি-মিথ্যা এখানে কিছু নেই। তুই তোর বরকে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলি।'

'তা করেছিলাম। ও আমাকে রাগিয়ে দিতে পারবে, আমি পারব না? খুব পারব।'

'কত দিন থাকবি আলাদা?'

'যত দিন দরকার হয়, তত দিন থাকব। নিজ থেকে ফিরে যাবার মেয়ে আমি না।'

হোস্টেলে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। সুপার আসেন পাঁচটায়। সুপার ছাড়া অন্য কেউ কিছু বলতে পারবে না।

মহিলা হোস্টেলটি বেশ সুন্দর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভেতরের দিকে ফুলের বাগান আছে। কমনরুমটি বিশাল। মেয়েরা হৈহৈ করে পিংপং খেলছে। নীলু অবাক হয়ে দেখল, একটা টেবিল ঘিরে কয়েক জন মেয়ে তাস খেলছে। মেয়েরাও তাস খেলে নাকি? রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে মেয়েদের তাস খেলার ব্যাপারটা আছে। বাস্তবেও যে খেলা হয়, নীলু প্রথম দেখল।

'দেখ বন্যা, তাস খেলছে!'

'খেলবে না কেন? এক শ' বার খেলবে। জুয়া খেলবে। মদ খেয়ে রাতে বাড়ি ফিরে স্বামীকে ঠ্যাঙাবে। কোনো ছাড়াছাড়ি নেই।'

নীলু হেসে ফেলল। বন্যার স্বভাব-চরিত্রে অনেকখানি পাগলামি এসে ঢুকে যাচ্ছে।

সুপার এল সাড়ে পাঁচটায়। সুপার মহিলা নয়, পুরুষ। অভদ্র ধরনের লোক। কেউ কিছু বললে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে, যার থেকে ধারণা হয়, লোকটি কারো কোনো কথা শোনে না।

'এখানে কোন সীট নেই,দরখাস্ত করলে ওয়েটিং লিস্টে নাম তুলব। ফর্‌ম্‌ নিয়ে দরখাস্ত করুন। কেন মহিলা হোস্টেলে থাকতে চান, তার কারণ আলাদা একটা কাগজে লিখে সঙ্গে দিন। সীট খালি হলে আপনাকে জানানো হবে।'

'কবে নাগাদ খালি হবে?'

'তা আমি কী করে বলব?' আর খালি হলেই আপনি পাবেন কেন? ওয়েটিং লিস্টে যে প্রথমে আছে, সে পাবে।'

'আপনি এত অভদ্রভাবে কথা বলছেন কেন?'

'কোন কথাটা অভদ্রভাবে বললাম?'

'সারাক্ষণই তো ক্যাটক্যাট করে কথা বলছেন।'

হোস্টেল সুপার থমথমে মুখে বেশ কিছু সময় তাকিয়ে থেকে বলল, 'এ্যাপ্লাই করতে চাইলে ফর্‌ম্‌ নিয়ে এ্যাপ্লাই করুন। পাশের কামরায় ফর্‌ম্‌ আছে।'

নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'করবি এ্যাপ্লাই?'

'করব। করব না কেন?'

'এখন যাবি কোথায়?'

'কোথায় আবার যাব? বাসায় যাব। রোজ একবার খোঁজ নেব সীট খালি হল কিনা।'

নীলু লক্ষ করল, বন্যাকে কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। চোখের নিচে কালি।

দেখেই মনে হয় শরীর বিশ্রামের জন্যে কাতর। বাচ্চা-টাচ্চা হবে না তো? রাস্তায় নেমেই নীলু বলল, 'তোর কি আর কোনো খবর আছে?'

'আর কি খবর থাকবে?'

'এই ধর, জনসংখ্যা বৃদ্ধি-বিষয়ক কোনো খবর।'

বন্যা জবাব দিল না। অন্যমনস্কভাবে নিঃশ্বাস ফেলল। নীলু বলল, 'কী, আছে নাকি?'

'জানি না। তুই এখন বাসায় চলে যা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যেতে পারবি তো একা একা?'

'পারব।'

'আয়, তোকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।'

'বাসে তুলে দিতে হবে না। তুই বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর। তোর বিশ্রাম দরকার।'

বলতে বলতে নীলু রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসল। বন্যা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী যে বাজে কথা বলিস!'

'তাহলে তোর কোনো খবর নেই?'

বন্যা এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তার মুখ বিষণ্ন। এমন একটি সুখের সময়ে কেউ এত বিষণ্ন থাকে কেন? এমন ছেলেমানুষ কেন বন্যা?

নীলু বাসায় ফিরল সন্ধ্যার পর।

তার জন্যে বড় ধরনের একটা চমক অপেক্ষা করছিল। নীলুর মা রোকেয়া দুপুরে ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সঙ্গে বাবলু, বিলুর ছেলে। নীলু আনন্দের উচ্ছ্বাসে কেঁদেকেটে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলল। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর মা'র সঙ্গে নীলুর দেখা।

রোকেয়া নিজেও কাঁদছিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে চেষ্টা করছিলেন মেয়েকে সামলাবার। টুনী এবং বাবলু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছে। টুনী কখনো তার মাকে কাঁদতে দেখে নি। তার বিস্ময়ের কোনো সীমা ছিল না। বড়ো মানুষরাও তাহলে এমন করে কাঁদে?

নীলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'রাজশাহী থেকে ঢাকা কত আর দূর মা? তোমার আসতে সাড়ে তিন বছর লাগল?'

রোকেয়া মেয়েকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। কিছুই বললেন না।

'তোমার নাতনীকে দেখেছ মা?'

'হুঁ। বড়ো সুন্দর মেয়ে হয়েছে। তোর ননদের মতো রূপসী হবে।'

শাহানা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে খুব লজ্জা পেল। লাজুক স্বরে বলল, তোমার কান্না থামাও তো ভাবী। তোমার কান্না দেখে আমার নিজেরও চোখে পানি এসে যাচ্ছে।'

নীলু বাবলুকে কোলে নিয়ে আবার খানিকক্ষণ কাঁদল।

'এই বুঝি বাবলু?'

রোকেয়া বললেন, 'কোল থেকে নামিয়ে দে। কেউ কোলে নিলেই কাঁদে।'

নীলু নামাল না। শাহানা বলল, 'এই ছেলেটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত। কোনো কথা বলে না। দুপুরবেলা এসেছে, এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলে নি। মাঐমা, ও কি রাজশাহীতেও এ-রকম?'

'হ্যাঁ গো মা। কথাবার্তা যা বলে, আমার সঙ্গেই বলে। তাও কানে কানে।'

নীলু হাত-মুখ ধুতে গেল। তার এত আনন্দ লাগছে আজ! মনে হচ্ছে পৃথিবীর মতো সুখের জায়গা আর কিছুই নেই। অসংখ্য দুঃখের মধ্যেও এখানে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব সুখের ব্যাপার ঘটে যায় যে সব দুঃখ চাপা পড়ে যায়। বাথরুমে দরজা বন্ধ করে নীলু আবার খানিকক্ষণ কাঁদল।

রোকেয়াকে এ বাড়ির সবাই বেশ পছন্দ করেন। মনোয়ারা নিজেও করেন। অন্য যে কেউ এ বাড়িতে কিছু দিনের জন্যে থাকতে এলেও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন, শুধু এই একটি ক্ষেত্রে করেন না। এর মূল কারণ হচ্ছে রোকেয়ার স্বভাব। তিনি কথা বলেন কম। গভীর আগ্রহে অন্যের কথা শোনেন। নিজের কোনো মতামত কখনোই জাহির করেন না। যখন কিছু বলেন, এত আন্তরিকতার সঙ্গে বলেন যে, শুনতে বড়ো ভালো লাগে।

মনোয়ারা দুপুর থেকে তাঁর সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনেক কথা বলেছেন। তার মধ্যে একটা বড়ো অংশ ছিল নীলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

'এই দেখেন না বেয়ান সাহেব, আমার ঘাড়ে মেয়ে দিয়ে সেই সকালে চলে যায় অফিসে, ফেরে সন্ধ্যা পার করে। ঘরে একটা কাজের মানুষ নেই। আমি একা মানুষ। বয়স তো হয়েছে আমার, না কি বলেন?'

'কাজের লোক রাখেন না কেন?'

'হাগারের পাগারের এক জন কাউকে ধরে আনলেই রাখব নাকি? একটাকে রেখেছিলাম—বেশ কাজের। তারপর এক দিন দেখি নাক ঝেড়ে সেই হাত তার শার্টে মুছে যেন কিছুই হয় নি এ-রকমভাবে টেবিলে ভাত বাড়তে গেল। এক চড় দিয়ে হারামজাদাকে বিদেয় করেছি।'

'বিদেয় করলেন কেন? ভালোমতো বুঝিয়ে দিলেই হত।'

'আমার এত সময় নেই বেয়ান সাহেব যে, বসে বসে তাকে শেখাব। যে শেখে না নয় বছরে, সে শেখে না নব্বুই বছরে। আর ঝামেলা কি একটা? শাহানার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, জানেন তো?'

'জ্বি জানি।'

'হুটহাট করে ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোকজন আসছে। ওদের তো আর টোস্ট বিসকিট দিয়ে চা দেওয়া যায় না, কি বলেন?'

'না, তা দেবেন কীভাবে?'

'কিন্তু দিতে হয়। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। সেই দিন শাহানার এক খালাশাশুড়ি এসেছিলেন। একটা মানুষ নেই ঘরে! চা দিতে গিয়ে দেখি চায়ের

পাতা নেই। চিন্তা করেন অবস্থা!'

'শাহানার বিয়েটা কবে?'

'জুলাই মাসের দশ তারিখে মোটামুটিভাবে ঠিক করা হয়েছে। ছেলের ছোট চাচা থাকেন হাওয়াই। উনি জুলাই মাস ছাড়া আসতে পারবেন না। আর এটা হচ্ছে ওদের বংশের প্রথম কাজ। ওরা সবাইকে নিয়ে করতে চায়।'

'তা তো চাইবেই।'

'বিরাট খরচের ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন। এদিকে হাত একেবারে খালি। কীভাবে কি হবে, কে জানে? মনে হলেই বুক শুকিয়ে-আসে। ভেবেছিলাম এর মধ্যে রফিকের একটা কিছু হবে, কিছুই হচ্ছে না।'

'ইনশাআল্লাহ হবে শিগগির।'

'আর হয়েছে। মহা অপদার্থ। ওর কিছুই হবে না।'

বাবলু তার অদ্ভুত স্বভাবের জন্যে খুব অল্প সময়েই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হোসেন সাহেবের মতে বাবলুর মতো গম্ভীর ছেলে তিনি এর আগে দেখেন নি। কোনো কথা নেই, কান্নাকাটি নেই, ঝামেলা নেই। গভীর আগ্রহে সব কিছু দেখছে। সবই অবশ্যি দূর দূর থেকে। মনোয়ারার ধারণা—ছেলেটা হাবা টাইপ। বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। কিন্তু কথাটা সম্ভবত ঠিক নয়। ছেলেটির বুদ্ধি ভালো। শুধু ভালো নয়, বেশ ভালো।

টুনী তার সঙ্গে ভাব করার খুব চেষ্টা করছে। বাবলু আছে তার সঙ্গে, কিন্তু খুব একটা ভাব হয়েছে বলে মনে হয় না। টুনী রান্নাবাটি খেলার সময় বাবলু একটু দূরে বসে থাকে। তাকিয়ে থাকে গভীর মনযোগে। খেলাতে তার অংশগ্রহণ বলতে এইটুকুই। টুনীর সঙ্গে তার কথাবার্তার নমুনা এ রকম—

টুনী: রান্নাবাটি খেলবে?

বাবলু: (নিশ্চুপ)

টুনী: আমি হচ্ছি মা। তুমি কী হবে?

বাবলু: (মৃদু হাসি)

টুনী: বাবা হবে?

বাবলু মাথা নাড়ল। তার অর্থ কি ঠিক বোঝা গেল না। হ্যাঁ হতে পারে। আবার নাও হতে পারে।

টুনী: আচ্ছা, তুমি বাবা। এখন অফিসে যাও। সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে আসবে।

বাবলু: নড়ল না।

টুনী: কি, অফিসে যাবে না?

বাবলু: মাথা নাড়ল। কিন্তু এবারও বোঝা গেল না সে হ্যাঁ বলছে কি না বলছে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এ বাড়িতে যে একটিমাত্র লোকের সঙ্গে

তার কিছু কথাবার্তা হয়, সে শফিক। সে ঘুরেফিরে শফিকের কাছে আসে এবং অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে শফিকের পাশে কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যায়। এই অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই দু'–একটা কথাবার্তা হয়।

যেমন, গত রবিবারের কথা ধরা যাক। শফিক শুয়ে ছিল বিছানায়, বাবলু পর্দার আড়াল থেকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করল। তারপর গটগট করে ঘরে ঢুকে পা ঝুলিয়ে খাটে বসে রইল। শফিক বলল, 'কী খবর তোমার বাবলু সাহেব? ভালো আছ?'

বাবলু হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ল। সে ভালোই আছে। শফিক বলল, 'হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা দাও তো।' বাবলু দিল। শফিক সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তুমি একটা খাবে নাকি বাবলু?' বাবলু মাথা নাড়ল—সে খাবে না। শফিক বলল, 'তুমি সিগারেট খাও না?'

'না।'

'কেন।'

'ভালো লাগে না।'

এমনভাবে বলা, যেন আগে অভ্যাস ছিল। ভালো না–লাগায় বর্তমানে ছেড়ে দিয়েছে, তবে খুব পীড়াপীড়ি করলে সে একটা সিগারেট টেনে দেখতে পারে।

'বাবলু সাহেব, তুমি ছড়া বা কবিতা, এসব কিছু জান?'

'হুঁ।'

'শোনাও একটা ছড়া। ছড়া শুনতে ইচ্ছা করছে।'

বাবলু উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত ছড়া শোনাবার তার তেমন আগ্রহ নেই। ঘর থেকে বের হয়ে গেল নিঃশব্দে। পর মুহূর্তেই পর্দার ওপাশ থেকে বাবলুর ছড়া শোনা গেল—

হইয়ার বাড়ি গেছিলাম
দুধ ভাত দিছিল
দুই ভাত খাইছিলাম

অদ্ভুত ছড়া! স্বরচিত হবারই সম্ভাবনা। শফিক হাসিমুখে বলল, 'খুব চমৎকার ছড়া। এস, ভেতরে এস।' বাবলু ভেতরে ঢুকল না। শফিককে অবাক করে দিয়ে একই ছড়া দ্বিতীয় বার পর্দার আড়াল থেকে বলল। শফিক হেসে ফেলল। বড়ো মজার ছেলে তো!

রোকেয়া রাতে ঘুমান শাহানার সঙ্গে। তিনি, বাবলু ও শাহানা। শাহানার খাটটি ছোট। তিন জনে চাপাচাপি হয়। রোজ রাতেই রোকেয়া বলেন, 'তোমাকে তো মা বড়ো কষ্ট দিচ্ছি।' শাহানা লজ্জিত স্বরে বলে, 'কী যে আপনি বলেন মাঐমা, আপনাকে আমরা উল্টো কষ্ট দিচ্ছি। আমার কোনোই কষ্ট হচ্ছে না। আপনি থাকায় কত রকম গল্পটল্প করতে পাচ্ছি।'

এই কথাটা খুবই সত্যি। শাহানা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে গল্প

করে। রোকেয়ার চোখ একেক সময় ঘুমে বন্ধ হয়ে আসে, কিন্তু ঘুমুতে পারেন না। শাহানা ডেকে তোলে, 'মাঐমা ঘুমাচ্ছেন নাকি?'

'না গো মা, জেগেই আছি।'

'বীণার কথা কি আপনাকে বলেছি?'

'বীণা কে?'

'আমাদের বাড়িওয়ালা রশিদ সাহেবের মেয়ে। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ঘরের মেয়ে। প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন বিয়ের এক মাসের মধ্যে। খুব রূপসী ছিলেন। আমরা অবশ্যি দেখি নি, শুধু শুনেছি। মাঐমা ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'না।'

'তাহলে বীণার কাণ্ডটা শোনেন। কাউকে বলবেন না আবার।'

'না, বলব না।'

'আমার কি মনে হয় জানেন মাঐমা? আমার মনে হয়, আনিস ভাইয়ের সঙ্গে ওর কিছু একটা সম্পর্ক আছে।'

'আনিস ভাই কে?'

'আহা, ঐদিন না বললাম আপনাকে—আমাদের চিলেকোঠায় থাকেন! ম্যাজিশিয়ান।'

'ও হ্যাঁ, বলেছ।'

'আপনার সঙ্গে দেখাও তো হয়েছে। ঐ যে হলুদ রঙের স্যুয়েটার পরা একটি ছেলে এসে আপনাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'বুঝলেন মাঐমা, আমার মনে হয় আনিস ভাইয়ের প্রতি বীণার একটা ইয়ে আছে। কীভাবে বুঝলাম জানেন?'

'না, কীভাবে বুঝলে?'

'ব্যাপারটা খুবই গোপন। আমি হঠাৎ টের পেয়ে ফেলেছি। আপনি কাউকে বলবেন না।'

'না মা, আমি আর কাকে বলব?'

শাহানা খাটে উঠে বসল। আশেপাশে কেউ নেই, তবু সে গল্প করতে লাগল ফিসফিস করে। রোকেয়া লক্ষ করেছেন, মেয়েটা প্রায়ই আনিস ছেলেটির প্রসঙ্গ নিয়ে আসছে। তার গল্পের এক পর্যায়ে ম্যাজিশিয়ান আনিসের কথা থাকবেই। প্রতি রাতেই ভাবেন, সকালবেলা নীলুকে জিজ্ঞেস করবেন। একটি মেয়ে—যার কয়েক দিনের মধ্যেই বিয়ে হচ্ছে, সে রোজ রাতে অন্য একটি ছেলের গল্প এত আগ্রহ করে করবে কেন?

'মাঐমা ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'না।'

'বীণা মেয়েটার ঘটনাটা কেমন লাগল?'

তিনি কিছু বললেন না। হাই তুললেন।

'মাঐমা, কাল আমি আনিস ভাইয়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা। এখন ঘুমাও মা। রাত অনেক হয়েছে।'

শাহানা এক ছুটির দিনের দুপুরবেলা তাঁকে আনিসের ঘরে নিয়ে গেল। হাসতে হাসতে বলল, 'আনিস ভাই, মাঐমাকে একটা ম্যাজিক দেখান তো। গোলাপেরটা না। ওটা দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে।'

আনিস খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্লেডের একটা খেলা দেখাল। এই খেলাটা শাহানাও এর আগে দেখে নি। হাত দিয়ে সে শূন্য থেকে একটার পর একটা চকচকে ব্লেড বের করতে লাগল। সেসব ব্লেড সে টপাটপ গিলে ফেলতে লাগল। রোকেয়া আঁৎকে উঠলেন। এ কি কাণ্ড! শাহানা তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'সত্যি সত্যি খাচ্ছে না মাঐমা। ব্লেড কেউ খেতে পারে?'

রোকেয়া ভেবে পেলেন না, যে-ব্লেডগুলি মুখে পুরেছে, সেগুলি গেল কোথায়? সেই রহস্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেদ হল। আনিস গিলে ফেলা ব্লেডগুলি একটার পর একটা মুখ থেকে বের করে সামনের টেবিল প্রায় ভর্তি করে ফেলল। রোকেয়ার বিস্ময়ের সীমা রইল না। করে কী-করে এসব! চোখের ধান্ধা নাকি? এই বাচ্চা ছেলে তাঁর মতো বুড়ো মানুষের চোখে ধান্ধা লাগাবে কীভাবে?

শাহানা রোকেয়ার বিস্মিত মুখভঙ্গি খুব উপভোগ করছে। যেন এই চমৎকার ম্যাজিকের কিছু কৃতিত্ব তার। এসব তো ভালো লক্ষণ নয়। নীলুর সঙ্গে কথা বলা দরকার। এত চমৎকার একটি মেয়ের জীবনে সামান্যতম সমস্যাও আসা উচিত নয়। তবে নীলু খুব চালাক মেয়ে। কিছু একটা হলে নিশ্চয়ই তার চোখে পড়বে। কিছু নয় হয়তো। কিন্তু এমন মুগ্ধ চোখে মেয়েটি তাকিয়ে ছিল আনিসের দিকে! এই দৃষ্টি ভুল হবার কথা নয়।

আনিস ছেলেটিকে তাঁর বেশ লাগল। ভদ্র এবং লাজুক। এ-রকম একটা লাজুক ছেলে ম্যাজিশিয়ান হবে কিভাবে? ম্যাজিক দেখানো কি লাজুক ছেলের কাজ? পড়াশোনা ছেড়ে তার ম্যাজিশিয়ান হবার এমন অদ্ভুত শখই-বা কেন হল? মাথার উপর বুদ্ধি দেওয়ার কেউ নেই। বুদ্ধি দেওয়ার কেউ থাকলে কি এ-রকম হয়? মা-বাবা বেঁচে থাকলে এই ছেলে নিশ্চয়ই এসব নিয়ে মেতে উঠতে পারত না। রোকেয়ার বড়ো মায়া লাগল।

তিনি এক সপ্তাহ থাকবেন বলে এসেছিলেন। প্রায় দু' সপ্তাহ কেটে গেল। যেতে ইচ্ছা করছে না। জামাইয়ের বাড়িতে এত দীর্ঘ দিন থাকাও যায় না। কিন্তু থাকতে তাঁর খারাপ লাগছে না। ভালোই লাগছে। যার জন্যে আসা, সেই নীলুর সঙ্গে কথা বলার তেমন কোনো সুযোগ পাচ্ছেন না। অথচ নীলুর সঙ্গে তাঁর কিছু জরুরি কথা বলা দরকার। নীলু অফিস থেকে ফেরে ক্লান্ত হয়ে। ফিরেই সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাকে একা পাওয়াই মুশকিল,

কারণ শাহানা তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকে। কথাগুলি শাহানার সামনেও নিশ্চয়ই বলা যায়, কিন্তু তাঁর বড়ো লজ্জা লাগে। কিন্তু না বলেই-বা উপায় কী?

রাজশাহী ফিরে যাবার দু' দিন আগে তিনি নীলুকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে হাঁটতে গেলেন। নীলু বলল, 'কিছু বলতে চাও নাকি মা?'

'হ্যাঁ।'

'টাকাপয়সা দরকার?'

'না, সেসব কিছু না।'

নিজের মেয়ের কাছেও তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েরা বোধহয় পুরোপুরি নিজের মেয়ে থাকে না। এদের কাছে সহজ হওয়া যায় না।

'চুপ করে আছ কেন মা, বল।'

'বাবলুকে তোর কাছে রাখবি? ওকে নিয়ে বড়ো কষ্টে পড়েছি।'

নীলু চুপ করে রইল।

'তারা ছেলেটাকে সহ্যই করতে পারে না। এইটুকু বাচ্চা, অথচ.....'

'দুলাভাই কোনো রকম খোঁজ খবর করে না?'

'না।'

'দেখতেও আসে না?'

'গত মাসের আগের মাসে এক বার ঘন্টাখানিকের জন্যে এসেছিল।'

'ছেলেকে নিয়ে কী করবে না-করবে, কিছুই বলে নি?'

'না।'

'কেমন মানুষ বল তো মা?'

দু' জন বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ছাদে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আনিসের ঘর থেকে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে, কোনো ম্যাজিকের প্র্যাকটিস বোধহয়। রোকেয়া মৃদুস্বরে বললেন, 'বাবলু একটা কাঁচের জগ ভেঙে ফেলেছিল, সেই অপরাধের শাস্তি কি হয়েছিল শোন....।'

'এসব শুনতে চাই না, মা।'

'তুই জামাইকে বলে দেখ, যদি রাখতে রাজি হয়। শান্তিতে মরতে পারি।'

'এখনই মরার কথা আসছে কেন?'

'বাঁচব না বেশি দিন।'

'বুঝলে কী করে?'

'এসব বোঝা যায়। তোর বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন।'

নীলু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবলু কি পারবে তোমাকে ছেড়ে থাকতে?'

'পারবে। ও শক্ত ছেলে। তুই একটু বলে দেখ জামাইকে। নাকি আমি বলব?'

'তোমার বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব।'

'রাজি হতে চাইবে না হয়তো। কে চায় একটা বাড়তি ঝামেলা কাঁধে নিতে!'

নীলু জবাব দিল না। রোকেয়া বললেন, 'তুই চাকরি করিস, এটা বোধহয় তোর শাশুড়ি পছন্দ করে না।'

নীলু সে কথারও কোনো জবাব দিল না। সে বাবলুর ব্যাপারটি কী করে বলবে, তাই ভাবছিল। রোকেয়া বললেন, 'চল্ নিচে যাই। তোর শাশুড়ি বোধহয় খুঁজছেন।'

'তুমি যাও মা। আমি থাকি এখানে কিছুক্ষণ। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

রোকেয়া নিচে নেমে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরই চায়ের কাপ হাতে শাহানা তাকে খুঁজতে এল। সে অবাক হয়ে দেখল, 'নীলু কাঁদছে।

'কী হয়েছে ভাবী?'

'কিছু হয় নি।'

'তোমার জন্যে চা এনেছি।'

'চা খাব না, শাহানা।'

'একটু খাও ভাবী, আমি নিজে বানিয়েছি।'

বলতে বলতে সেও কেঁদে ফেলল। কাউকে কাঁদতে দেখলেই তার কান্না পেয়ে যায়। নীলু অবাক হয়ে বলল, 'তোমার আবার কী হল?'

শাহানা ফোঁপাতে লাগল। কিছু বলল না।

বাবলুকে রেখে রোকেয়া রাজশাহী চলে গেলেন। মনে করা হয়েছিল বাবলু খুব কান্নাকাটি করবে, সে তেমন কিছুই করল না। রোকেয়া যখন বললেন, 'যাই বাবলু?'

বাবলু ঘাড় কাত করল। যেন যাবার অনুমতি দিচ্ছে।

'কাঁদবে না তো?'

বাবলু মাথা নাড়ল। সে কাঁদবে না।

২০

রহমান সাহেব দীর্ঘ দিন পর উত্তেজনা অনুভব করছেন।

মেয়ের বিয়েতে তিনি বড়ো রকমের একটা হৈচৈ করতে চান। সব ধরনের সামাজিকতা, উৎসব অনুষ্ঠান তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করতেন। এখনো করেন, কিন্তু শারমিনের বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা মনে হলেই মনে হয় ঢাকা শহরের সবাইকে আনন্দ অনুষ্ঠানে ডাকা যায় না?

রাত জেগে আত্মীয়স্বজনদের লিস্টি তৈরি করেছেন। কেউ বাদ থাকবে

না, সবাই আসবে। দাওয়াতের চিঠি নিয়ে লোক যাচ্ছে। প্রতিটি দাওয়াতের চিঠির সঙ্গে ঢাকায় আসা-যাওয়ার খরচ দেওয়া হচ্ছে।

তাঁর নিজের বাড়িটি প্রকাণ্ড, তবু তিনি আরেকটি দোতলা বাড়ি ভাড়া করেছেন। বিয়ের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা একটা বড়ো হোটেলে সারবার জন্যে সবাই বলছিল। এতে খরচ বেশি হলেও ঝামেলা কম হবে। তিনি রাজি হন নি। তাঁর ঝামেলা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। বাবুর্চিরা বিশাল ডেগচিতে পাক বসাবে। সকাল থেকেই ঘিয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। হৈচৈ ছোটাছুটি হবে। তবেই না আনন্দ!

এইটিই তো জীবনের শেষ ঝামেলা। আবার এক দিন শারমিনের বাচ্চার বিয়ের সময় ঝামেলা হবে। সেই ঝামেলায় তিনি অংশ নিতে পারবেন, এমন মনে হয় না। মানুষ নিজের মৃত্যুর ব্যাপারটি আগে আগে টের পায়।

রাত ন'টা বাজে। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। রহমান সাহেব শারমিনের ঘরের দিকে রওনা হলেন। শারমিনকে নিয়ে বারান্দায় বসবেন। বারান্দায় বেশ হাওয়া।

শারমিনকে কেমন যেন রোগা-রোগা লাগছে। চোখের নিচে কালি। ওর কি ভালো ঘুম হচ্ছে না? অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিয়ের আগে আগে নানান ধরনের দুশ্চিন্তা মানুষকে কাবু করে ফেলে। শারমিনকেও নিশ্চয়ই করছে। এবং ওকে সাহস ও আশ্বাস দেবার কেউ নেই।

'শরীরটা ভালো আছে তো মা?'

'ভালো আছে।'

'ঘুম হচ্ছে না ভালো? মুখটা কেমন শুকনো লাগছে।'

শারমিন মৃদুস্বরে বলল, 'যা গরম!'

'দোতলার ঘরটার এয়ারকুলার চালু করে ঘুমালেই পার।'

'না, ঐখানে আমার কেমন দম বন্ধ লাগে।'

'চা খাওয়া যাক, কি বল শারমিন?'

'গরমের মধ্যে আমি চা খাব না।'

'গরমের মধ্যেই চা ভালো। বিষে বিষক্ষয় হয়। যাও, চায়ের কথা বলে আস। তুমি চা না চাইলে ঠাণ্ডা কিছু নাও। এস কিছুক্ষণ গল্প করি। নাকি আমার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগবে না?'

'ভালো লাগবে না কেন?'

'কেমন গম্ভীর মুখে বসে আছ, তাই বলছি।'

শারমিন হাসল।

'তোমার ক'টা কার্ড লাগবে, তা তো বললে না।'

'আমার কোনো কার্ড লাগবে না, বাবা।'

'কেন, লাগবে না কেন?'

'আমার কাউকে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করছে না।'

রহমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'কেন করছে না?'

'জানি না, কেন করছে না।'

'আমার মনে হয় তুমি সাময়িকভাবে একটা ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছ। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবে?'

'না–না, আমার কি কোনো অসুখ করেছে নাকি যে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব?'

'তাও ঠিক।'

রহমান সাহেব হাসলেন। শারমিনও হাসল।

'শারমিন, সাব্বির কি ছ' তারিখে আসছে?'

'ছ' তারিখ কিংবা আট তারিখ?'

'তুমি কিন্তু এয়ারপোর্টে যাবে।'

'ঠিক আছে, যাব।'

'তুমি কিন্তু মা এখনো আমার চায়ের কথা বল নি। তুমি কি কোনো ব্যাপারে আপসেট?'

'না। আপসেট না।'

সে আপসেট না, এই কথাটা ঠিক নয়। শারমিন এক অদ্ভুত সংশয়ে ভুগছে, যার উৎস সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। উৎসবের ছোঁয়া চারদিকে, কিন্তু এই উৎসব তাকে স্পর্শ করছে না। বাবা প্রতি রাতে বিয়ের নানান ব্যাপারে কত আগ্রহ নিয়ে গল্প করছেন, তাতেও মন লাগছে না। কেন লাগছে না? সাব্বিরকে কি সে পছন্দ করছে না? তাও তো সত্যি নয়।

মানুষ হিসেবে তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় নি। যতটুকু দেখেছে, তার ভালোই লেগেছে। সাব্বিরের ভেতর এক ধরনের দৃঢ়তা আছে, যা ভালো লাগে। সব মেয়েই বোধহয় তার পাশে একজন শক্ত সবল মানুষ চায়, যার উপর নির্ভর করা চলে।

সে রাতদিন বইপত্র নিয়ে থাকে, এখানে কি শারমিনের আপত্তি? তাও তো নয়, পড়াশোনা সে নিজেও পছন্দ করে। জীবনের বেশির ভাগ সময় তো সে বই পড়েই কাটিয়েছে। তাহলে আপত্তিটা কোথায়?

শারমিন নিজেই চা বানাল। বাবার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করে ইদানীং, করা হচ্ছে না। বিয়ের পর আরো হবে না। এই মানুষটি পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবেন। সারা দিন নিজের কাজ দেখে ফিরে আসবেন জনমানবহীন বিশাল একটি বাড়িতে। হয়তো আবার কুকুর পুষবেন। দিন কয়েক আগেই সরাইলের দু'টি কুকুর আনা হয়েছে। কিন্তু পছন্দ না–হওয়ায় ফেরত পাঠিয়েছেন। এ–রকম হতেই থাকবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে কুকুর আসবে, এদের পছন্দ হবে না। আবার সেগুলি ফেরত যাবে।

বাবার জীবনের শেষ অংশ কেমন হবে? এদেশের অসম্ভব বিত্তশালী এক জন মানুষ মারা যাবেন একা একা? আসলেই কি বিপুল বৈভবের তেমন

কোনো দরকার আছে?

'আফা!'

শারমিন চমকে তাকাল। জয়নাল,—কখন যে নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে!

'কি ব্যাপার জয়নাল?'

'আপনের কাছে যে আসে এক জন দাড়িওয়ালা মানুষ—রফিকসাব।'

'হ্যাঁ, কেন?'

'হেইন আইজ সইন্ধ্যায় আসছিলেন।'

'আমাকে আগে বল নি কেন?'

'মনে আছিল না আফা।'

'ডাকলে না কেন আমাকে?'

'ডাকতে গেছিলাম, জামিলার মা কইল আপনার মাথা ধরছে। দরজা বন্ধ কইরা ঘুমাইতাছেন।'

'ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যাও।'

জয়নাল গেল না। মাথা নিচু করে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

'কিছু বলবে জয়নাল?'

'জ্বি।'

'বল।'

জয়নাল একটা অদ্ভুত কথা বলল। সে নাকি তার ঘরে ঘুমুতে পারে না। জেগে কাটাতে হয়। কারণ সে প্রায়ই দেখে তার ঘরে মার্টি সাহেব হাঁটছে কিংবা পা ছড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। ঘর অন্ধকার থাকলেই দেখা যায়। বাতি জ্বাললে দেখা যায় না। শারমিনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বলে কী এ!

'রোজ দেখ?'

'রোজ দেখতাম আগে। এখন সারা রাত ঘরে বাতি জ্বলে। আমারে অন্য একটা ঘরে থাকতে দেন আফা।'

'বেশ তো থাক অন্য ঘরে। ঘরের তো অভাব নেই।'

জয়নাল বেরিয়ে যেতেই শারমিনের মনে হল, সে মিথ্যা কথা বলেছে। উদ্দেশ্যও পরিষ্কার, একটা ভালো ঘর সে দখল করবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে একটি চমৎকার গল্প সে ব্যবহার করছে। আমরা সবাই কি সে রকম করি না?

চা নিয়ে বারান্দায় যাওয়ামাত্রই রহমান সাহেব বললেন, 'তোমাকে একটা বড়ো খবর দেয়া হয় নি।'

'কী খবর?'

'এখন না, সে খবরটা বিয়ের পরপরই দেব।'

'শুধু শুধু তাহলে আমার মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে দিলে কেন?'

'ইচ্ছা করেই দিলাম।'

রহমান সাহেব ছেলেমানুষের মতো হাসতে লাগলেন। যেন বুদ্ধি করে শারমিনের ভেতর কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরে তিনি খুব খুশি। কিন্তু শারমিন তেমন কোনো কৌতূহল অনুভব করল না। তার ঘুম পেতে লাগল।

'আমি যাই বাবা, ঘুম পাচ্ছে।'

'আর একটু বস মা। রাত বেশি হয় নি।'

শারমিন বসল। রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, 'আমার সব কর্মচারী তোমার বিয়ে উপলক্ষে একটা বোনাস পাচ্ছে, তুমি জান?'

'জানি। ম্যানেজার সাহেব আমাকে বলেছেন।'

'আইডিয়াটা তোমার কেমন লাগল মা?'

'ভালোই। প্রাচীন কালের রাজা–মহারাজাদের মতো মনে হচ্ছে। তাঁরাও তো নিজের পুত্র–কন্যাদের বিয়ে উপলক্ষে সবাইকে খেলাত–টেলাত দিতেন।

রহমান সাহেব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। শারমিনের কথাগুলি তাঁর বড়ো ভালো লাগল। অনেক রাত পর্যন্ত কন্যা ও পিতা বসে রইল মুখোমুখি।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। অনেক দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। বৃষ্টি হবে বোধহয়। রহমান সাহেব বললেন, 'যাও মা, শুয়ে পড়।' শারমিন নড়ল না। যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে রইল।

সাব্বির এল আট তারিখে। আগের বার এয়ারপোর্টে তাকে রিসিভ করবার জন্যে কেউ ছিল না। এবার অনেকেই এসেছে। সাব্বিরের মা অসুস্থ, তিনিও এসেছেন। এত লোকজনের মাঝখানে বিশাল একটা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে শারমিনের অস্বস্তি লাগছিল। ফুলের তোড়া, ফুলের মালা, এসব পলিটিশিয়ানদের মানায়—অন্য কাউকে মানায় না। তাছাড়া তোড়া জিনিসটাই বাজে। একগাদা ফুলকে জরির ফিতায় বেঁধে রাখা। অসহ্য! এরচে একটি দু'টি গোলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক ভালো। কোনো একটি ছবিতে এমন একটি দৃশ্য শারমিন দেখেছিল। রেল স্টেশনে একগাদা গোলাপ নিয়ে একটি মেয়ে তার প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা। যদি সে না আসে? কত মানুষ নামল, কত মানুষ উঠল। কিন্তু ছেলেটির দেখা নেই। মেয়েটি প্লাটফরমের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করছে। হাত থেকে একটি একটি করে ফুল পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটির সেদিকে খেয়াল নেই। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ছেলেটিকে। মেয়েটি সব ফুল ছুঁড়ে ফেলে জড়িয়ে ধরল তাকে। চমৎকার ছবি।

'কেমন আছ শারমিন?'

'ভালো। আপনি কেমন?'

'খুব ভালো।'

'এই নিন আপনার ফুল।'

'থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফর দি ফ্লাওয়ার্স।'

সাব্বিরের গায়ে ধবধবে সাদা একটা শার্ট। গাঢ় নীল রঙের একটা টাই। দীর্ঘ ভ্রমণজনিত ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই তার চেহারায়। কি চমৎকার লাগছে তাকে দেখতে! শারমিন ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করল।

সাব্বির বলল, 'আমার সঙ্গে চল শারমিন। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'উঁহু, এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারব না।'

'কেন?'

'লজ্জা লাগবে।'

সাব্বির এয়ারপোর্টের সকলকে সচকিত করে হেসে উঠল। এবং অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে শারমিনের হাত ধরল। দৃশ্যটি এতটুকুও বেমানান মনে হল না। যেন এটাই স্বাভাবিক। সাব্বিরের মা একটু পেছনের দিকে সরে গেলেন। কলেজ–টলেজে পড়া কয়েকটি মেয়ে আছে তাঁর সঙ্গে। তারা মুখ নিচু করে হাসতে লাগল। শারমিনের লজ্জা লাগতে লাগল।

সাব্বির খুশি–খুশি গলায় বলল, 'তোমার বাবা এটা কী শুরু করেছেন বল তো?'

'কী করেছেন?'

'বিশাল এক বাড়ি ভাড়া করেছেন মা'র জন্যে। তিন মাসের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনরা আসবে। মা'র চিঠিতে জানলাম সে–বাড়ি নাকি রাজপ্রাসাদের মতো। ড্রইংরুমটায় নাকি কোর্ট কেটে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়।'

সাব্বির হৃষ্টচিত্তে হাসতে লাগল। শারমিন কিছু বলল না। সাব্বিরের মা'র জন্যে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, এই তথ্যটা সে জানত না। বাবা এ বিষয়ে তাকে কিছু বলেন নি। শারমিন বলল, 'আমি কিন্তু এখন সত্যি সত্যি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

'পরে না, এখনই হবে। তুমি এখন আমার সঙ্গে যাবে। প্লেনে আজ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে, ওটা শুনবে।'

সাব্বিরের মা বললেন, 'চল মা আমাদের সঙ্গে। লজ্জার কিছু নেই। আর সাব্বির, তুই এমন হাত ধরে টানাটানি করছিস কেন? হাত ছেড়ে দে।'

শারমিনের বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাড়ি রং করার লোকজন এসেছিল। এরা বিদায় নিচ্ছে। কিছু অপরিচিতা মহিলাকেও দেখা যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজনরা আসতে শুরু করেছে বোধহয়। তারা দূর থেকে কৌতূহলী হয়ে শারমিনকে দেখছে। কাছে এগিয়ে আসছে না। শারমিন হাত ইশারা করে জয়নালকে ডাকল।

'জয়নাল, কেউ কি এসেছিল আমার কাছে?'

'জ্বি না, আফা।'

'রফিক সাহেব?'

'জ্বি না, আসেন নাই।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও। ভালো কথা, ঘর বদল করেছ?'

'জ্বি, করছি।'

'এখন আর নিশ্চয়ই মার্টি সাহেবকে দেখ না?'

জয়নাল মৃদুস্বরে বলল, 'জ্বি, দেখি। কাইল রাইতেও দেখছি।'

শারমিন কিছু বলল না। অশরীরী মার্টি শুধু জয়নালকে দেখা দেবে কেন? সে যাবে তার প্রিয়জনদের কাছে। আসবে তার কাছে। কিন্তু আসছে না। কেন আসছে না? শারমিন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। দু'টি বাচ্চা ছেলে নামছিল। এরা শারমিনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'তোমরা কারা?'

ছেলে দুটি জবাব দিল না। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বিয়ে উপলক্ষে এসেছে নিশ্চয়ই। ছেলে দু'টি ভয় পেয়েছে। সম্ভবত তাদের বলা হয়েছিল, দোতলায় ওঠা যাবে না। এত আগে সবাই আসতে শুরু করল কেন?

'কী নাম তোমাদের?'

তারা উত্তর না দিয়ে ছুটে নেমে গেল।

শারমিনের ঘর তালাবদ্ধ। আকবরের মা তালা খুলতে খুলতে বলল, 'বাড়ি ভরতি হইয়া গেছে মাইনসে। এইটা ধরে ওইটা ছোঁয়। কিছু কইলে ফুঁস কইরা উঠে। আমি অমুক আত্মীয়, তমুক আত্মীয়।'

শারমিন বলল, 'আমার ঘরের সামনে কাউকে বসিয়ে রাখ, যাতে কেউ ঢুকতে না পারে।'

'জ্বি আইচ্ছা।'

শারমিন হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই জয়নাল এসে খবর দিল, রফিক সাহেব এসেছেন।

রফিক হাসিমুখে বলল, 'বিয়ের দাওয়াত নিতে এলাম। তুমি তো দাওয়াত দিলে না, বাধ্য হয়েই নিজে থেকে আসা। এর আগেও এক দিন এসেছিলাম।'

'খবর পেয়েছি।'

'এখন বল, বিয়ের দাওয়াত দিচ্ছ, না দিচ্ছ না।'

'দিচ্ছি। বাসার সবাইকে নিয়ে আসবে। কাউকে বাদ দেবে না। তোমার চাকরি-বাকরি এখনো কিছু হয় নি, তাই না?'

'বুঝলে কী করে?'

'থট রিডিং। তুমি কিছু খাবে?'

'ঘরে তৈরী সন্দেশ ছাড়া যে কোনো জিনিস খাব। এ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট, দুপুরে আমার খাওয়া হয় নি।'

'কেন?'

'কেন হয় নি সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। খাওয়া হয় নি সেটাই ইম্পর্টেন্ট।'

শারমিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আচ্ছা রফিক, আমি যদি তোমার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিই, তুমি করবে?'

'কী রকম চাকরি?'

'ভালো চাকরি। বেশ ভালো। মাসে তিন-চার হাজার টাকার মতো পাওয়া যায়, এ-রকম কিছু।'

রফিক পাঞ্জাবির পকেট থেকে তার সিগারেটের প্যাকেট বের করল। অনেকখানি সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'না, করব না।'

'কেন?'

'তোমার কাছ থেকে সুবিধা নেব, এজন্যে আমি কখনো তোমার কাছে আসি নি।'

'কি জন্যে এসেছ?'

'কি জন্যে এসেছি তা তুমি নিশ্চয়ই জান। জান না?'

শারমিন শুকনো মুখে হাসল। রফিক বলল, 'আজ বেশিক্ষণ থাকব না। কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'বেকার মানুষেরই কাজ থাকে বেশি। তোমাদের ধারণা, বেকাররা রাতদিন সিগারেট খায় এবং চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়। এ ধারণা ঠিক না।'

'বেকার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। আমি আগে কখনো বেকার দেখি নি। তোমাকেই শুধু দেখলাম।'

'কেমন লাগল আমাকে?'

শারমিন জবাব দিল না। কিছু প্রশ্ন আছে, যার কোনো জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

২১

খবরের কাগজে তিন লাইনের একটা বিজ্ঞাপন উঠেছে। হোসেন সাহেব খুবই অবাক হলেন যে এটা কারো চোখে পড়ল না। লোকজন কি আজকাল বিজ্ঞাপন পড়ে না নাকি? তাঁর ধারণা ছিল মেয়েরা বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে পড়ে। কিন্তু ধারণাটা সত্যি নয়। নীলু, শাহানা, মনোয়ারা—এরা কেউ এই প্রসঙ্গে কিছু বলল না। মনোয়ারার চোখে না-পড়া ভালো। তিনি চান না মনোয়ারা দেখুক, কিন্তু অন্য দু' জন কেন দেখবে না? বিজ্ঞাপনটা এ রকম—

শেষ চিকিৎসা

দুরারোগ্য পুরানো অসুখের হোমিওপ্যাথি মতে
চিকিৎসা করা হয়। যোগাযোগ করুন।
এম হোসেন।
১৩/৩ কল্যাণপুর
ঢাকা।

এক মাসের টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে দু' বার করে এই বিজ্ঞাপন ছাপা হবে। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে মনে হয় না বিজ্ঞাপনে কোনো লাভ হবে। কেউ তো পড়ছেই না।

হোসেন সাহেব খবরের কাগজ হাতে রান্নাঘরে ঢুকলেন। নীলু রান্না চড়িয়েছে। শ্বশুরকে দেখে সে বলল, 'কিছু বলবেন নাকি বাবা?'

'না, তেমন কিছু না। আজকের খবরের কাগজটা কি পড়েছ?'

নীলু অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ। কেন?'

'একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কাগজে, চোখে পড়ে নি?'

তিনি খবরের কাগজ মেলে ধরলেন।

'ভাবলাম, একটা বিদ্যা যখন শিখলাম, কষ্ট করে তখন কাজে লাগানো যাক। কি বল?'

'তা তো ঠিকই।'

'এটাও এক ধরনের সমাজসেবা, কি বল মা?'

'তা তো নিশ্চয়ই।'

'গরিব-দুঃখীদের কাছ থেকে পয়সা নেব না ঠিক করেছি। তবে অন্যদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। বাসায় এলে দশ টাকা, আর কল দিয়ে নিয়ে গেলে কুড়ি টাকা। বেশি হয়ে গেল নাকি?'

'না, বেশি হয় নি, ঠিকই আছে।'

হোসেন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'বাড়ির সামনে একটা সাইন বোর্ড দিতে হবে। "ডাঃ এম হোসেন হোমিও"—কী বল মা? লোকজন বিজ্ঞাপন দেখে আসবে, বাসা খুঁজে বের করতে হবে তো?'

'সাইন বোর্ড তো দিতেই হবে। আপনি রফিককে বলে দিন, ও সাইন বোর্ড করিয়ে নিয়ে আসবে।'

'হ্যাঁ, বলব। ইয়ে, আরেকটা কথা মা।'

'বলুন।'

তোমার শাশুড়িকে কিছু না—বলাই ভালো। মানে, কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই রেগে যায় তো, সে জন্যেই বলছি।'

'না বাবা, আমি কিছু বলব না।'

নীলুর কথার মাঝখানেই মনোয়ারা ঢুকলেন। হোসেন সাহেবকে দেখেই রেগে উঠলেন।

'রান্নাঘরে ঘুরঘুর করছ কেন? পুরুষমানুষদের রান্নাঘরে ঘুরঘুর করা আমার পছন্দ না। যাও, টুনীদের বই নিয়ে বসাও।'

অন্য দিন হলে তিনি কিছু বলতেন। রান্নাঘরে পুরুষমানুষদের থাকা উচিত, না উচিত নয়—এই নিয়ে মোটামুটিভাবে একটা তর্ক বাঁধিয়ে বসতেন। আজ কিছুই বললেন না। টুনী এবং বাবলুকে নিয়ে পড়াতে বসলেন।

মনোয়ারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমার শ্বশুরের কাণ্ডকারখানায় লজ্জায় মুখ দেখানো দায়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে, দেখেছ? এম. হোসেন দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, ঠিকানা দেখে বুঝলাম। তোমাকে বিজ্ঞাপনের কথাই বলছিল বোধহয়।'

'জ্বি।'

'লোকটা যে বোকা, তাও না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে! সে এক মহা ডাক্তার হয়ে গেছে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে। চিন্তা কর অবস্থা।'

নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'কিছু বলার দরকার নেই মা।'

'না বললে তো আশকারা দেওয়া হবে। এসব জিনিস আশকারা দিতে নেই।'

টুনী এবং বাবলু পড়তে বসেছে। এদের পড়ানোর কাজটা হোসেন সাহেব নিজেই আগ্রহ করে নিয়েছেন। পড়াশোনা চলছে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। প্রতিদিন একটি করে অক্ষর নানানভাবে শেখানো হচ্ছে। হোসেন সাহেব হিসাব করে দেখেছেন, এগারটি স্বরবর্ণ শিখতে লাগবে এগার দিন এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শিখতে লাগবে আটত্রিশ দিন। মোট এক মাস উনিশ দিনে প্রতিটি বর্ণ তারা পড়তে এবং লিখতে শিখবে :

আজ শেখান হচ্ছে 'গ'। হোসেন সাহেব প্রকাণ্ড একটা গ লিখে দেয়ালে ঝুলিয়েছেন। গ দিয়ে দু' লাইনের একটি ছড়া তৈরি করা হয়েছে। টুনী এবং বাবলু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ছড়াটি পড়ছে।

গ তে হয় গরু
তার পা দু'টি সরু।
গরুর শিং বাঁকা
গরু যায় ঢাকা।।

বাবলু এমনিতে কথাবার্তা একেবারেই বলে না, কিন্তু ছড়া বলাতে তার একটা আগ্রহ আছে। সে টুনীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর করে ছড়া পড়ছে।

হোসেন সাহেব বললেন, 'এইবার লেখ। প্রথমে একটা গরুর ছবি আঁক। শিংওয়ালা গরু, যে ঢাকার দিকে যাচ্ছে। এবং গরুর পাশে আঁক একটা গ। তারপর তোমাদের ছুটি।'

টুনী বলল, 'না দাদু ছুটি না, তুমি গল্প বলবে।'
'আজ আর গল্প না।'
'উঁহু, বলতে হবে। শীত–বসন্তের গল্প বলতে হবে।'
'না, আজ আর কোনো গল্পটল্প হবে না।'
'বলতেই হবে, বলতেই হবে।'

গল্প বলায় হোসেন সাহেবের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। গল্প বলতে না চাওয়া হচ্ছে তাঁর দাম বাড়াবার একটা কৌশল। রোজই বেশ খানিকক্ষণ না–না করেন এবং শেষ পর্যন্ত লম্বা–চওড়া একটা গল্প শুরু করেন—যেটা শেষ হতে দীর্ঘ সময় নেয়। এক সময় টুনী এবং বাবলু দু'জনের চোখই ঘুমে জড়িয়ে আসে, তবু তারা জেগে থাকে।

বাবলু এ বাড়িতে মোটামুটিভাবে সুখেই আছে বলা চলে। কোনো এক বিচিত্র কারণে শফিক বাবলুকে খুবই পছন্দ করে। সে যে আগ্রহ বাবলুর ব্যাপারে দেখায়, টুনীর ব্যাপারে তা দেখায় না। এটা নীলুকে বেশ পীড়িত করে। এর মধ্যে রহস্য আছে কিনা কে জানে!

অফিস থেকে ফিরেই শফিক ডাকবে, 'বাবলু সাহেব কোথায়?' বাবলু যেখানেই থাকুক গলার স্বর শুনে ছুটে আসবে উল্কার বেগে।

'তারপর বাবলু সাহেব, কেমন আছেন?'
'ভালো।'
'সারা দিন কী কী করলেন?'
(একগাল হাসি)
'কী, কিছুই করা হয়নি?'
(না–বোধক মাথা নাড়া)

শফিক অফিসের কাপড় ছাড়বে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে পাশে। শফিক বাথরুমে যাবে হাত–মুখ ধুতে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে দরজার পাশে। শফিক অফিস–ফেরত চা বারান্দায় বসে খাবে। সেও থাকবে বারান্দায়।

নীলু অনেক বার ধমক দিয়েছে, 'কী সব সময় বড়োদের সঙ্গে ঘুরঘুর করা? যাও, খেলতে যাও।'

শফিক প্রশ্রয়ের সুরে বলেছে, 'আহ, থাক না। বিরক্ত করছে না তো।'

ছুটির দিনগুলিতে শফিক দুপুরবেলা শুয়ে থাকে। বাবলু ঠিক তখন শফিকের পাশে বসে থাকে। এবং একটা হাত তুলে দেয় শফিকের গায়ে। এতটা বাড়াবাড়ি নীলুর ভালো লাগে না। কোনো কিছুর বাড়াবাড়িই ভালো না।

নীলু প্রায়ই ভাবে এই প্রসঙ্গে শফিককে সরাসরি একদিন কিছু বলবে। বলা হয়ে উঠছে না। শফিক আজকাল আগের চেয়েও গম্ভীর। অফিসের ঝামেলা নিশ্চয়ই অনেক বেড়েছে। অফিস সম্পর্কে শফিক কখনো কিছু বলে না, কাজেই আসলে কী হচ্ছে জানার উপায় নেই। অবশ্যি সে এখন ঘরে

ফিরছে সকাল–সকাল। টঙ্গি যাচ্ছে না। নীলুর ধারণা ছিল, টঙ্গির কাজ শেষ হয়ে গেছে বলেই যেতে হচ্ছে না। সে ধারণাও ঠিক না। টঙ্গির কাজ শেষ হয় নি। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অন্য এক জনকে। কেন, কে জানে?

শফিক অফিসে ঢুকেই জানল, খাস বিলেতি বড়োকর্তা আজ অফিসে আসবেন। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় এসে ঢাকা পৌঁছেছেন। তাঁর নাম মিঃ টলম্যান। এই জাতীয় নাম বিলেতিদের পক্ষেই সম্ভব। বাঙালি মুসলমান কত বৎসর পর তার ছেলের নাম রাখবে লম্বা আহমেদ, বা আদৌ এ–রকম নাম রাখার মতো সাহস কি তাদের হবে?

শফিক অবাক হয়ে লক্ষ করল, নতুন বড়ো সাহেবের আচার–আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক গবেষণা হয়ে গেছে। এবং জানা গেছে ইনি দারুণ কড়া লোক। অসম্ভব রাগী এবং অসম্ভব কাজের। মালয়েশিয়ার কোম্পানি যখন লাটে ওঠার মতো হল, তখন টলম্যানকে পাঠানো হল। এক মাসের মধ্যে সে সব ঠিকঠাক করে ফেলল।

বিলেতি সাহেব একজন আসবেন জানা ছিল। গতকালই তিনি এসে পৌঁছেছেন এটা শফিকের জানা ছিল না। সিদ্দিক সাহেব জানতেন। তিনি খবরটি অন্য কাউকে জানান নি। নিজেই গিয়েছেন এয়ারপোর্টে। সাহেবকে এনে প্রথম রাতে নিজের বাসায় ডিনার খাইয়েছেন। সিদ্দিক সাহেবের এই ধরনের লুকোচুরির কারণ শফিকের কাছে স্পষ্ট হল না। কানভাঙানির কিছু কি আছে তাঁর মনে? সিদ্দিক সাহেব বুদ্ধিমান লোক। একজন বুদ্ধিমান লোক এ ধরনের বোকামি করবে না। সিদ্দিক সাহেব এতটা কাঁচা কাজ করবেন, এটা ভাবা যায় না।

সিদ্দিক সাহেব খবর নিয়ে এলেন, মিঃ টলম্যান সাড়ে এগারটার সময় আসবেন। বারটা থেকে সাড়ে বারটা পর্যন্ত অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করবেন। কারখানা দেখতে যাবেন তিনটায়। সাড়ে চারটায় যাবেন জয়দেবপুর। সিদ্দিক সাহেবকে অত্যন্ত উল্লসিত মনে হল। শফিককে হাসতে হাসতে বললেন, 'জাত ব্রিটিশ তো, একেবারে বাঘের বাচ্চা!'

শফিক ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'হালুম হালুম করছিল নাকি?'

'না, এখনো করে নি। তবে করবে। মালয়েশিয়াতে কি কাণ্ডটা করেছে জানেন তো? চার জনকে স্যাক করেছে জয়েন করবার প্রথম সপ্তাহে। ইউনিয়ন গাঁইগুঁই করছিল। ইউনিয়নের চাঁইদের ডেকে নিয়ে বলেছে—যদি কোনো রকম গোলমাল হয়, কোম্পানি বন্ধ করে দিয়ে সে চলে যাবে। তাকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যে কোম্পানি লস খাচ্ছে তাকে পোষার কোনো মানে হয় না।'

'কোনো রকম ঝামেলা হয় নি?'

'এ্যাবসলিউটলি নাথিং।'

'এখানেও কি এ-রকম কিছু হবে বলে মনে করেন?'

'হতে পারে। আমি জানি না।'

'জানবেন না কেন? তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার কথাবার্তা হয়েছে। এয়ারপোর্ট থেকে আনলেন, ডিনার খাওয়ালেন।'

'আপনি কি অন্য কিছু ইঙ্গিত করছেন?'

'না, আমি অন্য কিছুই ইঙ্গিত করছি না। টলম্যানের আসার খবর আপনি চেপে গেছেন, এটাই আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়েছে।'

'এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই।'

'না থাকলেই ভালো।'

অফিসের সবাই ভেবেছিল নাম যখন টলম্যান, তখন নিশ্চয়ই বেঁটেখাট মানুষ হবে। কিন্তু দেখা গেল মানুষটি তালগাছের মতোই, স্বভাব-চরিত্রেও ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। শান্ত। কথাবার্তা বলে নিচু গলায়। মিনিটে মিনিটে রসিকতা করে। নিজের রসিকতায় নিজেই হাসে প্রাণ খুলে।

অফিসারদের সঙ্গে মিটিংটি চমৎকারভাবে শেষ হল। টলম্যান বললেন, তিনি মনে করেন এখানে চমৎকার স্টাফ আছে, যারা ইচ্ছা করলেই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রথম শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। তিনি এসেছেন এই ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে, এর বেশি কিছু নয়। যারা যারা সিগারেট খায়, তিনি তাদের সবাইকে নিজের প্যাকেট থেকে সিগারেট দিলেন এবং হরতাল ও স্ট্রাইক প্রসঙ্গে বিলেতি একটি গল্প বলে সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। গল্পটি এ-রকম: লেবার পার্টি ক্ষমতায় থাকাকালীন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এক বার ঠিক করলেন কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে এক দিনের জন্যে স্ট্রাইক করবেন। ইতিহাসে এ-রকম ব্যাপার আর হয় নি। সবার ধারণা, শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক হবে না। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে প্রচুর জল্পনা-কল্পনা, চিঠি লেখালেখি। শেষ পর্যন্ত স্ট্রাইক হল। অদ্ভুত ধরনের স্ট্রাইক। প্রফেসররা ঠিকই ক্লাস নিলেন, কাজকর্ম করলেন, শুধু সেই দিনটির বেতন নিলেন না।

গল্প শেষ করে টলম্যান বললেন, 'এ ধরনের স্ট্রাইক তোমাদের দেশে চালু করতে পারলে বেশ হত, তাই না?'

মিটিং শেষ করে নিজের ঘরে ফেরার পনের মিনিটের মধ্যে শফিক টলম্যানের কাছ থেকে যে চিঠিটি পেল, তার সারমর্ম হচ্ছে—"তুমি দায়িত্বে থাকাকালীন এ অফিসে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি হয়েছে। আমি মনে করি এ দায়িত্ব বহুলাংশে তোমার। এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি প্রতিটি অভিযোগ প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য লিখিতভাবে জানাবে।" তিনটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পরের পৃষ্ঠায় আছে। বেশ খুঁটিয়ে লেখা।

দুপুর দুটোর দিকে সিদ্দিক সাহেব এসে বললেন, 'শফিক সাহেব, আপনার চিঠির প্রসঙ্গে আমি কিছুই জানি না, আপনি বিশ্বাস করেন। এত ছোট

মন আমার না। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। এই টলম্যান ব্যাটার সঙ্গে আপনার ব্যাপারে আমার কোনো কথা হয় নি।'

শফিক শান্ত স্বরে বলল, 'আপনার কথা বিশ্বাস করছি। কাগজপত্র সাহেব হেড অফিস থেকেই তৈরি করে এনেছে।'

'আমি টলম্যানকে আপনার কথা গুছিয়ে বলব।'

'না, কিছু বলার দরকার নেই।'

শফিক অসময়ে বাড়ি ফিরে এল।

কবির মামা এসেছেন। টেবিলে পা তুলে সোফায় বসে আছেন গম্ভীর হয়ে। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছে মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। মেজাজ খারাপ হবার মতো কারণ ঘটেছে। ট্রেনে আসার সময় একটা ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা ছিল। পা তুলে আরাম করে সিটে বসে ছিলেন। তেজগাঁ স্টেশনে নামতে গিয়ে দেখেন চটি জুতো জোড়া নেই। পুরানো চটি—এমন কোনো লোভনীয় বস্তু নয়। মানুষ কি দিন দিনই অসৎ হয়ে যাচ্ছে? কোথাও যেতে হলে সারাক্ষণ নিজের জিনিসপত্র কোলের উপর নিয়ে বসে থাকতে হবে? তাঁকে বাসায় আসতে হয়েছে খালি পায়ে।

শফিক কবির মামাকে দেখে সালাম করবার জন্যে এগিয়ে এল।

'কি রে, ভালো আছিস?'

'জ্বি।'

'মুখ এমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন?'

'মাথা ধরেছে।'

'অফিস থেকে চলে এসেছিস?'

'জ্বি।'

'সামান্য মাথা ধরাতেই অফিস ছেড়ে চলে এসেছিস, বলিস কি।'

শফিক কিছু না-বলে ভেতরে চলে গেল। কবির মামা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তিনি অসম্ভব বিরক্ত হয়েছেন। সমগ্র জাতির ভেতরই কাজের প্রতি একটি অনীহা এসে গেছে। টঙ্গীতে এক জন টিকিট চেকার উঠল। পাঁচ-ছ' জন যাত্রীর টিকিট দেখেই সে যেন ক্লান্ত হয়ে গেল দু' বার হাই তুলল। কবির সাহেবের কাছে এসে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল, যেন সে এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে। তিনি পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিতেই সে বলল, 'থাক থাক, লাগবে না।'

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'লাগবে না কেন, দেখেন।'

'আরে না, দেখতে হবে না।'

'দেখতে হবে না কেন? এক শ' বার দেখতে হবে।'

টিকিট চেকার এ-রকম ভাবে তাকাল, যেন সে এমন অদ্ভুত কথা এর আগে শোনে নি। বড়োই আশ্চর্য কাণ্ড।

কবির মামা সোফায় হেলান দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন—কেন দিন দিন

জাতি এমন কর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। কাজে কেউ কোনো আনন্দ পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না? এসব প্রশ্নের উত্তর কারা জানেন? সমাজবিজ্ঞানীরা? জাতি হিসেবে বাঙালি কর্মবিমুখ, এটা তিনি মানতে রাজি নন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি দেখেছেন, কী অসম্ভব খাটতে পারে না-খাওয়া শরীরের রোগা মানুষগুলি। তখন পেরেছে, এখন কেন পারবে না? এখন কেন জোয়ান বয়সের এক জন টিকিট চেকার তিনটা টিকিটে টিক মার্ক দিয়েই বোয়াল মাছের মতো হাই তুলবে।

মনোয়ারা বললেন, 'গোসল করে নিন। ভাত দিয়ে দিই।'

'একটু অপেক্ষা করি। বৃষ্টি আসবে আসবে করছে। বৃষ্টির পানিতে গোসল করব।'

'বৃষ্টির পানিতে করবেন কেন? ঘরে কি পানির অভাব?'

কবির মামা থেমে থেমে বললেন, 'বয়স হয়ে যাচ্ছে, বেশি দিন বৃষ্টির পানি গায়ে লাগানো যাবে না, তাই সুযোগ পেলেই লাগিয়ে নিই। সরিষার তেল আছে ঘরে?'

'জ্বি, আছে।'

'নিয়ে আস। তেল মেখে নিই। ঠাণ্ডা লেগে গেলে মুশকিল।'

মনোয়ারা বসলেন পাশেই। কবির মামা বললেন, 'তারপর বল, তোমার খবরাখবর বল।'

'আমার কোনো খবর নেই।'

'খবর নেই কেন? মনে হচ্ছে সবার উপর তুমি বিরক্ত।'

'বিরক্ত হব না কেন? কে আমার জন্যে কী করল খুশি হবার মতো।'

'কে কী করল সেটা জিজ্ঞেস করবার আগে বল, তুমি অন্যদের জন্যে কী করলে?'

মনোয়ারা অবাক হয়ে বললেন, 'কী করলাম মানে! সংসার চালাচ্ছে কে?'

'তুমি এমন ভাব করছ, যেন তুমি না থাকলে সংসার আটকে যাবে।'

'আটকাবে না?'

'না, আটকাবে না। কারো জন্যেই কিছু আটকে যায় না। মুশকিলটা হচ্ছে—সবাই মনে করে, তাকে ছাড়া জগৎ-সংসার অচল। বৃষ্টি নামল বোধহয়। সাবান দাও, গামছা দাও। হোসেন আসবে কখন?'

'জানি না কখন।'

'কোথায় গিয়েছে বললে?'

'জানি না কোথায়?'

'তুমি কি আমার উপর রেগে গেলে নাকি? রাগ হবার মতো কিছু বলি নি।'

গামছা সাবান নিয়ে তিনি ছাদে চলে গেলেন। ভালো বৃষ্টি নেমেছে। ছাদে পানি জমে গেছে। তিনি খানিকক্ষণ শিশুদের মতো সেই জমে–থাকা পানিতে লাফালেন। যখন আশেপাশে কেউ থাকে না তখন সব বয়স্ক মানুষরাই বোধ হয় খানিকটা শিশুর অভিনয় করতে ভালোবাসে।

কবির মামা গায়ে সাবান মাখতে মাখতে লক্ষ করলেন, খাঁচায় দু'টি কবুতর চুপচাপ ভিজছে। আনিসের ম্যাজিকের কবুতর। তাঁর বিরক্তির সীমা রইল না। প্রথমত খাঁচায় পাখি আটকানোই একটি অপরাধ। তার চেয়ে বড়ো অপরাধ বন্দি পাখিগুলি ঝড়–বৃষ্টির মধ্যে ফেলে রাখা। তিনি আনিসের ঘরে উঁকি দিলেন, 'আনিস আছ?'

আনিস ঘরেই ছিল। সে অবাক হয়ে উঠে এল।

'তোমার কবুতর বৃষ্টিতে ভিজছে। পশুপাখিকে এভাবে কষ্ট দেবার তোমার কোনো রাইট নেই। এটা ঠিক না। অন্যায়।'

'আপনি বৃষ্টির মধ্যে কী করছেন মামা?'

'গোসল করছি। আর কী করব?'

'আপনি কি মামা কবুতর দু'টি ছেড়ে দিতে বলছেন?'

'তোমার ম্যাজিকের যদি কোনো গুরুতর ক্ষতি না হয়, তাহলে ছেড়ে দাও।'

আনিস হাসিমুখে বৃষ্টির মধ্যে নেমে এল। খাঁচা খোলার পর কবুতর দু'টি উড়ে গেল না। ছাদের রেলিংয়ের উপর বসে রইল। আনিস বলল, 'দেখলেন মামা, বৃষ্টিতে ভিজতে ওদের ভালোই লাগছে।'

আনিস হুসহুস করে ওদের তাড়াতে চেষ্টা করল। ওরা গেল না। উড়ে উড়ে বার বার রেলিংয়েই বসতে লাগল।

কবির মামা গম্ভীর গলায় বললেন, 'উড়তে ভুলে গেছে।'

আনিস বলল, 'ভুলে গেলেও শিখে নেবে। ওদের নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না মামা।'

'তুমি ভিজছ কেন?'

আনিস হেসে বলল, 'ভিজতে ভালোই লাগছে।'

'তোমার ম্যাজিক কেমন চলছে?'

'ভালোই।'

'যে শাস্ত্রটা তৈরিই হয়েছে মানুষকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে সেটা লোকজন এত আগ্রহ করে কেন শেখে বল তো আমাকে?'

'আপনি মামা শুধু ফাঁকিটা দেখলেন। ফাঁকির পেছনে বুদ্ধিটা দেখলেন না? আমি যদি এই বৃষ্টির ফোঁটা থেকে একটা গোলাপ ফুল এনে দিই, আপনার কেমন লাগবে?'

বলতে বলতেই আনিস হাত বাড়িয়ে একটি গোলাপ তৈরি করল। কবির মামা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'কেমন লাগল মামা?'

'চমৎকার!'

'শুধু চমৎকার?'

'অপূর্ব! আমি মুগ্ধ হলাম আনিস।'

'আপনার কি মামা মনে হয় না যে, সত্যিকার ফাঁকিগুলি ভুলে থাকার জন্যে এ জাতীয় কিছু ফাঁকির দরকার আছে?'

'তুমি খুব গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছ।'

আনিস হাসতে লাগল। কবির মামা বললেন, 'তোমাকে আমি নীলগঞ্জে নিয়ে যাব। গ্রামের লোকজনদের তুমি তোমার খেলা দেখাবে।'

'নিশ্চয়ই দেখাব। আপনি যখন বলবেন, তখনি যাব। অনেকক্ষণ ধরে ভিজছেন। নিচে যান, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ফুলটা নিয়ে যান মামা।'

তিনি গোলাপ-হাতে নিচে নেমে এলেন।

রাতের বেলা তাঁর জ্বর এসে গেল। রফিককে যেতে হল ডাক্তারের খোঁজে। শাহানা কপাল টিপে দিতে বসল।

শাহানা শাড়ি পরেছে। মনোয়ারা কামিজ পরার উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। দু' দিন পর বিয়ে হচ্ছে যে-মেয়ের সে ফ্রক পরে ধেইধেই করবে কেন?

শাড়িতে শাহানাকে অপূর্ব লাগছে। ঘরে আলো কম। কবির মামার চোখে আলো লাগছে বলেই বাতি নেভানো। খোলা দরজা দিয়ে সামান্য কিছু আলো এসে পড়েছে শাহানার মুখে। কী সুন্দর লাগছে তাকে! যেন এক জন কিশোরী দেবী।

শাহানা বলল, 'এখন কি একটু ভালো লাগছে মামা?'

'লাগছে। তোর বিয়ের ব্যাপারে কত দূর কি হল?'

'জানি না।'

'খামোকা এটা ঝুলিয়ে রেখেছে কেন বুঝলাম না। এসব তো ঝুলিয়ে রাখার জিনিস না।'

শাহানা কিছু বলল না। কবির মামা বললেন, 'ছেলেটিকে পছন্দ হয়েছে তো?'

শাহানা জবাব দিল না। খুব লজ্জা পেয়ে গেল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'লজ্জা পাস কেন? এক জন মানুষকে পছন্দ হয়েছে কি পছন্দ হয় নি, এটা বলার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।'

'পছন্দ হয়েছে।'

'ভালো। যে কথাটা মনে আসে, সে কথাটা মুখেও আসতে পারে। এবং আসাই উচিত। তোর বরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ভালো ছেলে। সব সময় হাসছে।'

'সব সময় হাসলেই বুঝি ভালো ছেলে হয়?'

'হ্যাঁ, হয়। কুটিল মনের মানুষ সব সময় হাসতে পারে না। গম্ভীর হয়ে থাকে।'

'তুমিও তো সব সময় গম্ভীর হয়ে থাক। তুমি কি কুটিল মনের মানুষ?'

'গম্ভীর হয়ে থাকি আমি?'

'হ্যাঁ।'

'কখনো হাসি না?'

'না।'

কবির মামাকে দেখে মনে হল, তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। শাহানা হাসতে শুরু করল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করল হাসির বেগ সামলাবার জন্যে, সেটা সম্ভব হল না। সে ছুটে চলে গেল বারান্দায়। বারান্দায় কিন্নরকণ্ঠের হাসি দীর্ঘ সময় ধরে শোনা গেল। টুনী যোগ দিল সেই হাসিতে, তারপর বাবলু। শিশুরা যাবতীয় সুখের ব্যাপারে অংশ নিতে চায়।

২২

আগামীকাল শারমিনের গায়ে-হলুদ।

শারমিন আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছে। আয়নায় নিজেকে চেনা যাচ্ছে না। কোথায় যেন পড়েছিল, বিয়ের ঠিক আগে আগে সব মেয়েই অচেনা হয়ে যায়। তাদের চোখ হয় আরো কালো। চেহারায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঔজ্জ্বল্য আসে। বিয়ে হবে-হবে মেয়েরা বারবার আয়নায় নিজেদের দেখে। কথাটা আংশিক সত্যি। শারমিন আয়নায় নিজেকে চিনতে পারছে না, তবে আয়নার সামনে বসে থাকতেও ভালো লাগছে না।

জামিলার মা এসে বলল, 'আপনারে ডাকে?'

'কে ডাকে?'

'বড়ো সাহেব।'

'বল, আসছি।'

শারমিন নড়ল না। যেভাবে বসে ছিল ঠিক সেভাবেই বসে রইল। বাড়িভর্তি মানুষ। কিছুক্ষণ আগেই দু'টি মেয়ে বারান্দায় ছোটাছুটি করছিল। শারমিন শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছে, 'তোমরা নিচে যাও কিংবা ছাদে যাও, আমার মাথা ধরেছে।' বাবার উপর রাগ লাগছে খানিকটা। এক মাস আগে থেকে লোকজন দিয়ে বাড়ি ভর্তি করবার কোনো দরকার ছিল না। এবং এদের কাণ্ডজ্ঞানও নেই, এত দিন আগে কেউ আসে অন্যের বাড়ি?

'আফা।'

শারমিন বিরক্ত মুখে তাকাল। জামিলার মা আবার এসেছে। তার মুখ

হাসি-হাসি। ঠোঁট লাল টুকটুক করছে। গায়ের লালপেড়ে সাদা শাড়িটিও নতুন। বিয়ে উপলক্ষে সবাই নতুন শাড়ি পেয়েছে। দু'টি করে শাড়ি। একটি সাধারণ লালপেড়ে সাদা শাড়ি, অন্যটি দামী শাড়ি।

'আফা, আপনেরে ডাকে।'

'বলছি তো যাব।'

'বড়ো সাব চা লইয়া বইস্যা আছে।'

শারমিন উঠে দাঁড়াল। এমন বিরক্তি লাগছে! শুধু বিরক্তি নয়, মাথাও ধরেছে। তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যথা। চারটা প্যারাসিটামল খাওয়া হয়েছে ছ' ঘন্টার মধ্যে। যন্ত্রণা ভোঁতা হয়ে এসেছে, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে চিড়িক দিয়ে উঠছে।

রহমান সাহেব চায়ের পট নিয়ে হাসিমুখে বসে আছেন। শারমিনকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এমন একটা সাধারণ শাড়ি পরে ঘুরছ কেন মা?'

শারমিন জবাব দিল না।

'নাও, চা নাও।'

'চা খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা না করলেও খাও। বাবাকে কম্প্যানি দাও। এখন তো আর আগের মতো তোমাকে পাব না।'

'পাবে, সব সময়ই পাবে। আমি সব সময় তোমার মেয়েই থাকব বাবা।'

বলতে বলতে শারমিনের গলা ভারি হয়ে এল। রহমান সাহেব দেখলেন, শারমিন কাঁদছে। তিনি কী বলবেন ভেবে পেলেন না। বাবার কাছে মেয়ের বিয়ে কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়। বিয়ের দিনটি হচ্ছে বাবা-মা'র জীবনের গভীরতম বিষাদের দিন। এই বিষাদ ভোলবার জন্যেই আনন্দ ও উল্লাসের একটা ভান করা হয়। রহমান সাহেব গাঢ় স্বরে বললেন, 'মা-মনি, চা খাও।'

শারমিন পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতেই টুপ করে এক ফোঁটা চোখের জল পড়ল কাপে। রহমান সাহেব দৃশ্যটি দেখলেন। তাঁর নিজেরও ইচ্ছা করল ছুটে কোথায়ও পালিয়ে যেতে। মানুষের বেশির ভাগ ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে। ছুটে যেতে ইচ্ছা করলেও ছুটে যাওয়া যাবে না। তাঁকে বসে থাকতে হবে এখানেই।

'শারমিন।'

'বল বাবা।'

'তোমাকে না জানিয়ে একটা কাজ করেছি মা।'

শারমিন তাকাল।

'পুলিশের ব্যাণ্ড পার্টি আনিয়েছি। গ্রাম থেকে অনেকেই এসেছে, ওরা খুশি হবে। ব্যাণ্ড পার্টির অনেক কায়দা কানুন আছে তো। এক জন ব্যাণ্ড মাস্টার থাকে, সে রুপো-বাঁধানো লাঠি নাড়াচাড়া করে। আমার নিজেরই দেখতে এমন চমৎকার লাগে!'

রহমান সাহেব হাসলেন। হাসল শারমিনও।

'ওরা কখন আসবে?'

'আজ বিকেলে আসবে। আবার কালও আসবে। কেমন হবে বল তো মা?'

'ভালোই হবে।'

'মোতাব্বের সাহেব বলছিলেন ব্যাণ্ড না এনে সানাইয়ের ব্যবস্থা করতে। একটা স্টেজের মতো থাকবে, সেখানে বসে বসে সানাই বাজাবে। কাউকে সে-রকম পাওয়া গেল না। তা ছাড়া সানাই বড়ো মন খারাপ করিয়ে দেয়। মেয়ে বিয়ে এমনিতেই বাবা-মা'র জন্যে যথেষ্ট মন খারাপ করার মতো ব্যাপার, সেটাকে আর বাড়ানো ঠিক না, কী বল মা?'

শারমিন জবাব দিল না। রহমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। কয়েক দিন ধরেই তিনি খুব সিগারেট খাচ্ছেন। প্রায় চেইন স্মোকার হয়ে গেছেন।

শারমিন বলল, 'আমি এখন উঠি বাবা?'

'এখনই উঠবে কী, বস একটু।'

'ভালো লাগছে না বাবা। জ্বর-জ্বর লাগছে।'

তিনি মেয়ের হাত ধরলেন। জ্বর নেই, গা ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

'শারমিন।'

'কি বাবা?'

তিনি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'একটা কথার ঠিক জবাব দাও তো মা। তাকাও আমার চোখের দিকে। তাকাও, তারপর বল।'

শারমিন তাকাল তার বাবার চোখের দিকে। রহমান সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'সাব্বিরকে কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না?'

'পছন্দ হবে না কেন? তাঁকে পছন্দ না করার মতো কিছু নেই।'

'আমিও তাই বলি। জমিলার মা বলল, তুমি গতকাল সারা রাত ঘুমোও নি। বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছিলে।'

'ঘুম আসতে একটু দেরি হয়েছে। যা গরম!'

'আমাকে ডাকলে না কেন?'

'তোমাকে ডাকলে কী হত?'

'দু'জনে মিলে গল্প করতাম।'

'আজ যদি ঘুম না আসে তোমাকে ডাকব। বাবা, এখন যাই?'

'আচ্ছা, যাও। জমিলার মা বলছিল, ছেলেপুলেরা নাকি তোমাকে খুব বিরক্ত করছে। বারান্দায় ছোটাছুটি করছে।'

'না, তেমন কিছু না।'

শারমিন নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল। এবং এক সময় ঘুমিয়েও পড়ল। জামিলার মা তাকে জাগাল না। দুপুরে খাবার সময় রহমান সাহেব বললেন, 'ওর ঘুম ভাঙানোর দরকার নেই, ঘুমুক।'

পুলিশের ব্যাণ্ড পার্টি চলে এল তিনটায়। শারমিনের ঘুম ভাঙল ব্যাণ্ডের শব্দে।

তারা বাজাচ্ছে আনন্দের গান, উৎসবের গান। কিন্তু তবু কেন বারবার চোখ ভিজে উঠছে? কেন বারবার মনে হচ্ছে চারপাশ অসম্ভব ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। কেন এত কষ্ট হচ্ছে?

দরজায় টুকটুক আওয়াজ হল। শারমিন ক্লান্ত গলায় বলল, 'কে?'

'আফা আমি।'

'কী চাও?'

'আপনার সাথে দেখা করতে আইছে।'

'কে?'

'ঐ দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক, রফিক সাব।'

শারমিন চুপ করে রইল। তার এক বার ইচ্ছা হল বলে—ওকে চলে যেতে বল। কিন্তু সে কিছুই বলল না। জামিলার মা দ্বিতীয় বার ডাকল, 'ও আফা, আফা।' শারমিন তারও জবাব দিল না। কিন্তু জামিলার মা নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেও নিচে নেমে এল।

ব্যাণ্ড পার্টির চারদিকে সবাই ভিড় করে আছে। রহমান সাহেবও এতক্ষণ ছিলেন। একটু আগেই গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন। বলে গেছেন শারমিন ঘুম থেকে উঠেই যেন কাপড় পরে তৈরি থাকে। সন্ধ্যার পর তাকে নিয়ে বেরুবেন।

রফিক ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা শুনছে খুব উৎসাহ নিয়ে। তার মুখ হাসি-হাসি। শারমিনকে আসতে দেখে সে এগিয়ে গেল।

'শারমিন বল তো, কি গান বাজছে?'

'জানি না।'

'কাম সেপ্টেম্বর। আমার খুব প্রিয় গান।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। দারুণ মিউজিক। তোমার ভালো লাগছে না?'

'লাগছে।'

'আজ তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হল। আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম।'

'কী পরিচয় দিলে?'

'নিজের তো কোনো পরিচয় নেই। তোমার পরিচয়েই পরিচয় দিলাম। বললাম, আমি আপনার মেয়ে শারমিনের সঙ্গে পড়তাম।'

শারমিন তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রফিক হাসতে হাসতে বলল, 'একবার ভাবছিলাম বলি, আমি শারমিনের বন্ধু।'

'বললে না কেন?'

'সাহস হল না। যদি রেগে যান। উৎসবের দিনে তোমাকে এমন পেত্নীর মতো লাগছে কেন?'

'পেত্নীর মতো লাগছে?'

'হুঁ। চুলে চিরুণি পড়ে নি। চোখ লাল এবং বেছে বেছে সবচে ময়লা

শাড়িটাই আজ পরেছ। আচ্ছা, তোমার কি একটাও ভালো শাড়ি নেই?'

শারমিন বলল, 'তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শোন। আমি এক্ষুণি আসছি। কাপড় বদলে আসছি। তোমার হাতে কি কোনো কাজ আছে?'

'না। কেন?'

'তোমাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়।'

'কোথায়?'

'বলছি, বস তুমি। চা খাবে?'

'হ্যাঁ, খাব। চায়ের সঙ্গে আর কিছু আছে?'

'দেখি আছে কিনা।'

'ঝাল কিছু। নো সুইটস।'

শারমিন অতি দ্রুত কাপড় বদলাল। পাতলা একটা চেইন পরল গলায়। হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি পরল। একটা হ্যাণ্ডব্যাগ নিল হাতে।

জামিলার মা বলল, 'যান কই আফা?'

'একটা কাজে যাচ্ছি। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল। ইয়াসিন আছে না?'

'জ্বি আছে।'

'কোন সময় আইবেন আফা?'

শারমিন তার জবাব দিল না। নেমে এল নিচে। তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। যেন খুব বড়ো ধরনের কোনো একটা অসুখ থেকে সে উঠেছে। রফিকের মনে হল, শারমিন যেন ঠিকমতো হাঁটতেও পারছে না।

'শারমিন, তুমি কি অসুস্থ?'

'না, আমার শরীর ভালোই আছে। চল তুমি।'

'চা খাই নি তো এখনো, চা আসে নি।'

'চা পরে খাবে।'

রফিক অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ব্যাণ্ড বাজছে। দলটিকে ঘিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করছে। ওদের আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ইলেকট্রিশিয়ানরা ব্যস্ত আলোকসজ্জা নিয়ে। আলোকসজ্জা শুরু হবে আজ সন্ধ্যা থেকে।

গাড়ি পুরানো ঢাকা ছাড়িয়ে আসার পরপরই রফিক লক্ষ করল, শারমিন কাঁদছে। অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা। কোথায় তারা যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কে জানে? ড্রাইভার নিজেও বেশ কয়েক বার তাকাল পেছনের দিকে। রফিকের সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু কেন জানি ধরাতেও সাহস পাচ্ছে না।

'রফিক।'

'বল।'

'ক'টা বাজে দেখ তো?'

'চারটা দশ। কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

শারমিন শান্তস্বরে বলল, 'আমি এখন তোমাকে কয়েকটা কথা বলব। তুমি শুধু শুনে যাবে, কোনো প্রশ্ন করবে না। ড্রাইভার সাহেব।'

'জ্বি আপা।'

'আপনি গাড়ি একটু আস্তে চালান।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কথাবার্তা যা শুনবেন, নিজের মধ্যে রাখবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

শারমিন ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। রফিক অপেক্ষা করতে লাগল।

'রফিক।'

'বল শুনছি।'

'তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?'

রফিক কোনো জবাব দিতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। শারমিন নিচু গলায় বলল, 'আমি খুব বড়ো ধরনের কনফিউশনে ভুগছি। কী করব কিছু বুঝতে পারছি না।'

'কনফিউশন হবার কারণ কী?'

'কারণ কী, তুমি ভালো করেই জান। কেন তুমি বারবার এসেছ আমার কাছে?'

বলতে বলতে শারমিন ফুঁপিয়ে উঠল।

'সাব্বির ভাইকে বিয়ে করতে আমি রাজি না, এই কথাটা আমি কিছুতেই বাবাকে বলতে পারব না। আমি আমার বাবাকে যে কী পরিমাণ ভালোবাসি, তা একমাত্র আমিই জানি। অন্য কেউ জানে না।'

রফিক সিগারেটের জন্যে পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিল। সিগারেট নেই। হাত পড়ল দশ টাকার একটি ময়লা নোটে, এই টাকাটাই তার সম্বল।

শারমিন মৃদুস্বরে বলল, 'আমাকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে যাবার সাহস কি তোমার আছে।'

'আছে।'

রফিক শান্তস্বরে বলল, 'তোমার বাবাকে গিয়ে সব কিছু খুলে বললে কেমন হয়?'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তোমাকে বলতে হবে না। আমি বলব।'

'না।'

শারমিন শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে বসে রইল। রফিক বলল, 'ড্রাইভার সাহেব, আপনার কাছে সিগারেট আছে?' ড্রাইভার সিগারেট দিল। নিচু গলায় বলল, 'এখন কোন দিকে যাইবেন?'

রফিক বলল, 'খুব স্পিডে একটু ঘুরে বেড়ান, আমার মাথাটা ঠাণ্ডা

হোক। কোথায় যাব এখনো জানি না।'

রফিক আড়চোখে তাকাল শারমিনের দিকে। সে শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে বসে আছে চুপচাপ। রফিকের ইচ্ছা করল, আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে, 'এই মেয়েটিকে পৃথিবীর কেউ আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। এ একান্তই আমার।'

২৩

মনোয়ারা অবাক হয়ে বললেন, 'রফিক একে বিয়ে করেছে? তুমি এসব কী বলছ বৌমা।'

নীলু মনোয়ারার হাত ধরল।

'মা, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি। আসুন আমার সঙ্গে।'

'আমাকে কিছুই বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি সবই বুঝতে পারছি। রফিক কোথায়?'

'ও একটু বাইরে গেছে। আসবে। মা আপনি একটু আসুন আমার সঙ্গে।'

'তুমি বৌমা আমার হাত ধরে টানাটানি করবে না। আমি এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলব।'

শারমিন ভেজা-চোখে তাকাল মনোয়ারার দিকে। হোসেন সাহেব বললেন, 'কথা বলার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? এই মেয়ে তো আর চলে যাচ্ছে না। তুমি যাও বৌমার সঙ্গে।'

মনোয়ারা কড়া চোখে তাকালেন। হোসেন সাহেব থতমত খেয়ে থেমে গেলেন। মনোয়ারা কড়া গলায় বললেন, 'বৌমা, তুমি সবাইকে নিয়ে এ ঘর থেকে যাও, আমি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব। একা কথা বলব।'

নীলু সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। হোসেন সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বড়ো ঝামেলা হয়ে গেল তো বৌমা। শফিক এসেছে?'

'জ্বি—না।'

'বাজে ক'টা?'

'আটটা।'

'কাণ্ডটা রফিক কী করল!'

'বাবা, আপনি টুনী আর বাবলুকে নিয়ে বসেন।'

'হ্যাঁ, বসছি। তুমি যাও, তোমার শাশুড়ির কাছে গিয়ে দেখ, কিছু করা যায় কিনা। মেয়েটার জন্য বড়ো মায়া লাগছে।'

হোসেন সাহেব টুনী এবং বাবলুকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। শাহানা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিসফিস করে বলল, 'কী হবে, ভাবী?'

'কিছুই হবে না। হবে আবার কি?'

'মা যে কী করছেন! তুমি লক্ষ করেছ ভাবী, মা রাগে কাঁপছিলেন। রফিক ভাই আবার কোথায় গেল?'

'কী জানি কোথায়?'

শাহানা চাপা গলায় বলল, 'আমার এমন রাগ লাগছে ভাইয়ার উপর! কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।' শাহানা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল।

মনোয়ারা কড়া গলায় বললেন, 'তুমি বস এখানে।'

শারমিন বসল। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

'তুমি আমাকে বল, তুমি কেমন মেয়ে? বাবা–মাকে কিছুই না বলে বিয়ে করে ফেললে?'

শারমিন নিঃশ্বাস চাপতে চেষ্টা করল। পারল না।

'চাকরি নেই, কিছু নেই, এমন এক জন অপদার্থকে বিয়ে করে ফেললে! যার নিজের থাকার জায়গা নেই। তুমিও তার মতোই অন্যের ঘাড়ে বসে খাবে। চক্ষুলজ্জাও তোমার নেই?'

নীলু এসে মনোয়ারাকে প্রায় টেনে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। শারমিন শুকনো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তার মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। চারদিকে কি ঘটছে না–ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছে না। পরিচিত কেউ নেই যে এসে তার পাশে দাঁড়াবে। আশা ও সান্ত্বনার কিছু বলবে। জীবন এত কঠিন কেন?

চমৎকার একটি চাঁদ উঠেছে আকাশে। শফিক বারান্দায় বসে সিগারেট টানছে। নাটকীয় এই সংবাদ সে শুনেছে। সে কোনো কথা বলে নি। রাতে নীলু যখন তাকে খাবার জন্যে ডাকল, সে বলল, 'আমার কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না নীলু।'

শারমিনও কিছু খায় নি। সে রফিকের ঘরে মাথা নিচু করে বসে আছে। রফিক তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেছে, কোনো কাজ হয় নি। সে একটিও কথা বলে নি। রফিক বলল, 'আমাদের জীবনটা শুরু হল খুব খারাপভাবে। তাই না?' শারমিন জবাব দিল না।

'তবু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এক দিন সব ঠিক হয়ে যাবে। শারমিন।'

'বল।'

'খুব সুন্দর জোছনা হয়েছে বাইরে। চল না একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি।'

'তুমি যাও। আমার ইচ্ছা করছে না।'

'শারমিন, প্লিজ।'

'রফিক, আমাকে বিরক্ত করবে না।'

'এত সুন্দর একটা রাত নষ্ট করব?'

শারমিন জবাব দিল না। কিন্তু উঠল। রফিক ছুটে গেল নীলুর কাছে। তার খুব শখ, ভাবীকে দিয়ে একটা গান যদি গাওয়াতে পারে। অনেক দিন আগে এ-রকম এক জোছনা-রাতে তারা সবাই মিলে ছাদে হাঁটছিল। হঠাৎ কী মনে করে ভাবী গুনগুন করে গেয়েছিল—চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। ভাবীকে চেপে ধরলে সে কি তাদের নতুন জীবনকে সুসহ করবার জন্যে একটা গান গাইবে না? ভাবীর পক্ষে কি এতটা নির্দয় হওয়া সম্ভব?

জোছনার ফিনিক ফুটেছে চারদিকে। আকাশ ভেঙে পড়ছে আলোয়। কি উথালপাথাল জোছনা! ছাদে একটি পাটি পাতা হয়েছে। শারমিন মাথা নিচু করে বসে আছে পাটিতে। শাহানা টী-পট ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছে। নীলু মৃদুস্বরে বলল, 'মন-খারাপ করো না শারমিন। দেখ, কী সুন্দর একটা রাত! এমন চমৎকার জোছনা কখনো দেখেছ?'

শারমিন কোনো জবাব দিল না।

তাদের অবাক করে দিয়ে নীলু গুনগুন করে উঠল, 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে।' তার গলা তেমন কিছু আহামরি নয়।

কিন্তু তবু কী অপূর্বই শোনাল সেই গান!

অবাক হয়ে চিলেকোঠার ঘর থেকে বেরিয়ে এল আনিস।

হোসেন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, 'কে গাইছে? আমাদের বড় বৌমা? বড়ো মিঠা গলা তো আমার মা'র।'

গাইতে গাইতে নীলু শাড়ির আঁচলে তার চোখ মুছল। শারমিনের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। তার মন বলছে, আজকের এই চোখের জলে জীবনের সমস্ত দুঃখ ও বেদনা ধুয়ে-মুছে যাবে। সে হাত বাড়িয়ে রফিককে স্পর্শ করল। ভালবাসার স্পর্শ, যার জন্যে প্রতিটি পুরুষহৃদয় তৃষিত হয়ে থাকে। রফিক তাকাল আকাশের দিকে। আহ্, কী চমৎকার জোছনা! এত সুন্দর কেন পৃথিবীটা?

২৪

আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে।

হোসেন সাহেবের কাছে এক রোগী এসে উপস্থিত। সাফারি গায়ে লম্বা-চওড়া এক জন মানুষ। দরজা খুলতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার সাহেব কি আছেন?' হোসেন সাহেব নিজেই দরজা খুলেছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কোন ডাক্তার?'

'ডঃ হোসেন, হোমিওপ্যাথ।'

হোসেন সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। কয়েক মিনিট বুঝতেই

পারলেন না, কী করবেন কী বলবেন। শেষ পর্যন্ত রোগী এসে পড়েছে! রোগীদের সঙ্গে ডাক্তাররা কীভাবে কথা বলে, কে জানে? খুব বেশি খাতির করতে নেই বোধহয়। তাতে রোগী মনে করতে পারে ডাক্তারটা কিছু জানে না। আবার খুব গম্ভীর হয়ে থাকলে পরের বার আসবে না।

'জ্বি ভাই, জ্বি। আমিই ডঃ হোসেন। বসুন, আরাম করে বসুন। চায়ের কথা বলে আসি।'

'না না, চা লাগবে না।'

'লাগবে। অবশ্যই লাগবে।'

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তিনি চায়ের কথা বলতে গেলেন। ফিরে এলেন হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে। স্টেথিসকোপ একটা কেনা দরকার। থার্মোমিটারটা নষ্ট। টুনি ভেঙেছে। এইসব যন্ত্রপাতি এখন দরকার। প্রেসার মাপার ঐ জিনিসও কিনতে হবে।

'অসুখটা কী, ভাই বলুন।'

'আমার কিছু না। আমার স্ত্রীর গলায় মাছের কাঁটা বিঁধেছে। সে বলল, হোমিওপ্যাথিতে নাকি এর ওষুধ আছে। আপনার সাইনবোর্ড দেখলাম। ভাবলাম…।'

'ভালো করেছেন, খুব ভালো করেছেন। এক্ষুণি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। কোনো অসুবিধা নেই। মাছের কাঁটা পালাবার পথ পাবে না। কী মাছ?'

'কৈ মাছ।'

'ও আচ্ছা, কৈ মাছ। ছোট কৈ না বড়ো কৈ?'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এসবও কি ওষুধ দিতে লাগে!'

'হ্যাঁ, লাগে। হোমিওপ্যাথি খুবই জটিল চিকিৎসা। মনে হয় সোজা। সোজা মোটেই না।'

ভদ্রলোক ওষুধ নিয়ে যাবার সময় ওষুধের দাম এবং ভিজিট বাবদ দু'টি চকচকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে গেলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। হোসেন সাহেব হড়বড় করে বললেন, 'গলার কাঁটাটা গেল কিনা একটু খবর দিয়ে যাবেন। না গেলে কড়া ডোজের আরেকটা ওষুধ দেব।'

হোসেন সাহেব লক্ষ করলেন, জীবনের প্রথম বেতন পেয়ে যেমন আনন্দ হয়েছিল, আজ তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দ হচ্ছে। চেঁচিয়ে সবাইকে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হল, বাসায় কেউ নেই। বড়ো বৌমা অফিসে, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা। শাহানা গেছে তার কোনো বান্ধবীর বাড়ি। ছোট বৌমা এবং রফিকও নেই। হোসেন সাহেব নোট দু'টি হাতে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

মনোয়ারার মেজাজ আজ অন্য দিনের চেয়েও খারাপ। দাঁতের ব্যথা শুরু হয়েছে। রান্না করতে গিয়ে জেনেছেন, ঘরে লবণ নেই। রহিমার মাকে লবণ আনতে পাঠিয়ে তিনি রান্নাঘরে বসে আছেন। হোসেন সাহেবকে ঢুকতে দেখে

চট করে জ্বলে উঠলেন।

'এখানে কী চাও?'

'না, কিছু চাই না।'

'যাও, রান্নাঘর থেকে যাও। পুরুষমানুষকে রান্নাঘরে দেখলেই আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়।'

হোসেন সাহেব ক্ষীণস্বরে বললেন, 'মাথায় রক্ত তো তোমার উঠেই আছে, নতুন করে আর কী উঠবে।' বলেই তিনি অপেক্ষা করলেন না, অত্যন্ত দ্রুত বসার ঘরে চলে এলেন। এ-রকম একটা সুসংবাদ কাউকে দিতে না-পারার কষ্টে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। অবশ্যি বাড়িওয়ালার বাসা থেকে বৌমার অফিসে টেলিফোন করা যায়। সেটাই বোধহয় সবচে নিরাপদ।

বীণা মেয়েটি বড়ো ভালো। দেখতে পেয়েই বলল, 'টেলিফোন করতে এসেছেন, তাই না চাচা?'

'হ্যাঁ, কী করে বুঝলে?'

'আপনি যখন লজ্জা-লজ্জা মুখে আসেন, তখনই বুঝতে পারি।'

বীণা হাসতে লাগল। হোসেন সাহেব গলা নিচু করে বললেন, 'আমার এখন একটা টেলিফোন নিতে হবে। রোগী-টোগী আসছে। ওরা খোঁজখবর করে।'

'কিসের রোগী?'

হোসেন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'হোমিওপ্যাথি করছি তো! জান না তুমি? সাইন বোর্ড দেখ নি--এম. হোসেন! গলিটায় ঢুকতেই সাইনবোর্ড। নারকেল গাছে লাগানো।'

টেলিফোনে নীলুকে পাওয়া গেল। নীলু উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'কোনো খারাপ খবর নাকি বাবা?'

'না, না, খবর সব ভালো। এমনি টেলিফোন করলাম। তুমি ভালো তো মা?'

'জ্বি, ভালো।'

'কাজের চাপ খুব বেশি নাকি?'

'না, খুব বেশি না।'

'আসার পথে একটা থার্মোমিটার নিয়ে এসো তো। থার্মোমিটার ছাড়া বড্ড অসুবিধা হচ্ছে। রোগীপত্র আসতে শুরু করেছে। আজ এক জন এসে কুড়ি টাকা ভিজিট দিল।'

'কুড়ি টাকা ভিজিট, বলেন কি বাবা!'

'না, মানে, কুড়ি টাকা দিতে চেয়েছিল, আমি দশ টাকা রাখলাম। এরচে বেশি রাখলে জুলুম হয়ে যায়, কী বল মা?'

'হ্যাঁ, তা তো হয়ই।'

'ডাক্তার হয়েছি বলে তো রোগীর চামড়া খুলে নিতে পারি না। কী বল

মা?'

'জ্বি, তা তো ঠিকই।'

'আর শোন মা, ঐ সাইনবোর্ডটা বদলে একটা বড়ো সাইনবোর্ড করাতে হবে। এত ছোট অনেকের চোখে পড়ে না। বীণা তো দেখেই নি।'

'হ্যাঁ, তা তো করাতেই হবে।'

হোসেন সাহেব প্রায় পনের মিনিট কথা বললেন। বীণা এর মধ্যে চা এবং জেলি-মাখানো টোস্ট বিসকিট নিয়ে এসেছে। চা খেতে-খেতে বীণার সঙ্গেও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথা বললেন। হোমিওপ্যাথি জিনিসটা যে অসম্ভব জটিল, সেটা জলের মতো বুঝিয়ে দিলেন। পাওয়ার ২০ এবং পাওয়ার ২০০-এর পার্থক্যটা কী, তাও বললেন। তাঁর আজ বড়ো আনন্দ হচ্ছে। এই আনন্দ পৃথিবীর সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারলে ভালো হত। তা করা যাচ্ছে না। হাতের কাছে যে ক'জনকে পাওয়া যাচ্ছে, তাদেরকেই আপাতত বলা যাক।

তিনি সারা দুপুর ভাবলেন, প্রথম রোজগারের টাকাটা দিয়ে কী করবেন। সবাইকেই একটা কিছু কিনে দিতে পারলে ভালো হত। সেটা বোধহয় সম্ভব নয়, তবু বিকেলে একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে দেখা যেতে পারে। তিনি সাধারণত দুপুরে খানিকটা ঘুমান। আজ মানসিক উত্তেজনায় ঘুমুতেও পারলেন না। শুয়ে-শুয়ে বিকাল পর্যন্ত হোমিওপ্যাথির বইয়ে লক্ষণ-বিচার চ্যাপ্টারটা দু' বার পড়লেন। সন্ধ্যাবেলা নিউ মার্কেট থেকে সবার জন্য একটা করে কাঠ পেনসিল কিনে আনলেন।

মনোয়ারা তিক্ত গলায় বললেন, 'পেনসিল দিয়ে আমি কী করব?'

'লিখবে। আর কি করবে?'

'লেখালেখির কোন কাজটা আমি করি?'

'বেশ তো, লিখতে না চাও কান চুলকাবে।'

মনোয়ারা রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন ঠিক তাঁর মতো একটি পেনসিল রহিমার মা'ও পেয়েছে। সে বটিতে তার পেনসিলটি চাঁচতে চেষ্টা করছে।

হোসেন সাহেব অনেক রাত পর্যন্ত বসার ঘরে বসে রইলেন। ঐ ভদ্রলোক যদি খবর দিতে আসেন-সেটা শোনা দরকার। ওষুধ দিয়েই কর্তব্য শেষ এ-রকম ডাক্তার তিনি হতে চান না।

শাহানা একমনে কী-একটা বই পড়ছে। এত মনোযোগ দিয়ে যখন পড়ছে নিশ্চয়ই গল্পের বই। মাঝে মাঝে আবার চোখ মুছছে। চোখ মোছার দৃশ্যগুলি দেখতে হোসেন সাহেবের বড়ো ভালো লাগছে। এত সুন্দর হয়েছে মেয়েটা। মনেই হয় না তাঁর মেয়ে, যেন অচিন দেশের কোনো এক রাজকন্যা পথ ভুলে এ বাড়িতে এসে পড়েছে। টাঙ্গাইলের সাধারণ একটি সুতি শাড়ি পরে বসে আছে তাঁর সামনে। আবার যেন কিছুক্ষণ পরই চলে যাবে।

'ও শাহানা!'

'কি বাবা?'
'এত মন দিয়ে কী পড়ছিস? গল্পের বই?'
'হুঁ।'
'বই পড়তে পড়তে কেউ এত কাঁদে? গল্পটা কী রে?'
শাহানা বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'একটা মেয়ে একই সঙ্গে দু'টি ছেলেকে পছন্দ করে। যখন যার কাছে যায়, তাকেই ভালো লাগে। এই নিয়ে গল্প।'
হোসেন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এ কী অসম্ভব কথা! একই সঙ্গে দু'টি ছেলেকে পছন্দ করবে কীভাবে? আজেবাজে একটা কিছু লিখলেই হল?'
শাহানা কপাল কুঁচকে বলল, 'বিরক্ত করো না তো বাবা, পড়ছি দেখছ না।'
হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন।
দেয়াল-ঘড়িতে বারটার ঘন্টা পড়ল, তার মানে এখন বাজছে এগারটা। ঘড়িতে একটা ঘন্টা কম পড়ে। রাত যখন ১টা হয় তখন আবার ঘন্টা পড়ে বারটা।
'খামোকা বসে আছ কেন বাবা, শুয়ে পড় না।'
'বসি খানিকক্ষণ। তোকে তো বিরক্ত করছি না।'
'কতক্ষণ বসে থাকবে?
'তোর পড়া শেষ হোক, তারপর যাব।'
'আমি তো বাবা বই শেষ না করে উঠব না।'
'না উঠলে না উঠবি, আমি কি উঠতে বলছি?'
বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এবার বর্ষা অনেক দেরিতে শুরু হল। আজ আষাঢ়ের মাঝামাঝি, বর্ষণ হচ্ছে এই প্রথম।
'শাহানা।'
'কি?'
'তোর বিয়ে যেন কবে, বিশে আষাঢ় না একুশে?'
'জানি না বাবা।'
'সে কি! নিজের বিয়ের তারিখ নিজে জানিস না?'
'তুমিও তো নিজের মেয়ের বিয়ের তারিখ জান না। আর একটি কথাও বলবে না বাবা, প্লিজ!'
'আচ্ছা, বলব না। কত পাতা বাকি?'
'এই তো আবার কথা বলছ।'
'আর বলব না। জানালাটা বন্ধ করে দে, বৃষ্টির ছাঁট আসছে।'
'তুমি বন্ধ করে দাও না কেন? তুমি তো আর কিছু করছ না, বসেই আছ।'

হোসেন সাহেব উঠে জানালা বন্ধ করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, সোফায় পিঠ বাঁকা করে বসে থাকা এই অসম্ভব রূপবতী মেয়েটি এক দিন বুড়ি হয়ে যাবে। চুলে পাক ধরবে। চোখের কালো রঙ হবে ঘোলাটে। কী প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা! তাঁর মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। তিনি দেখলেন, শাহানা আবার চোখ মুছছে।

'ও শাহানা।'

'কি।'

'শব্দ করে পড় না। আমিও শুনি কী লিখেছে।'

'তোমার ভালো লাগবে না বাবা। এটা আমাদের গল্প। তোমাদের না।'

ঠিক ঠিক, খুব ঠিক। সময় আলাদা করে রেখেছে তাদের দু' জনকে। চেষ্টা করেও হয়তো একে অন্যকে ছুঁতে পারবে না। ঢালা বর্ষণ হচ্ছে বাইরে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বড়ো বৌমার ঘরে টুনি জেগে উঠেছে। বাথরুম করবে হয়তো। শোবার আগে ভালোমতো বাথরুম করিয়ে নিল রাত-দুপুরে ঝামেলা করতে হয় না।

নীলু টুনিকে কোলে করে বের হল। অবাক হয়ে বলল, 'রাত-দুপুরে কী করছেন বাবা?'

'কিছু না, এই বসে আছি। বৃষ্টির নমুনাটা দেখেছ মা? ভাসিয়ে দেবে। তুমি কি মা একটু কষ্ট করে--'

হোসেন সাহেব কথা শেষ করলেন না। নীলু শান্ত স্বরে বলল, 'দিচ্ছি। চায়ের সঙ্গে আর কিছু দেব?'

'এক স্লাইস রুটি দিতে পার যদি থাকে। মাখন দিও না। এই বয়সে মাখনটা সহ্য হয় না।'

নীলু মুহূর্তের মধ্যেই চা-রুটি নিয়ে এল। মুখে একটি বিরক্তির রেখাও পড়ল না। ঠোঁট বাঁকল না। পরের ঘরের একটি মেয়ে কত যত্নই না করল! এই ঋণ তো কখনো শোধ হবে না। পরের বাড়ির একটি মেয়ের কাছে আকাশপ্রমাণ ঋণ রেখে তাঁকে মরতে হবে।

'বৌমা, একটু বস না। এই দু' মিনিট।'

নীলু বসল। হোসেন সাহেব হাসিমুখে বলতে লাগলেন, 'গ্রামের বাড়িতে প্রথম বর্ষণে কত মাছ মেরেছি। প্রথম বর্ষণে কী হয় জান? মাছগুলি সব মাথাখারাপের মতো হয়ে যায়। পানি ছেড়ে শুকনোয় উঠে আসে, স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতরায়। কত কী যে করে!'

শাহানা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আবার বকবক শুরু করলে বাবা!'

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন। বৃষ্টিতে ঢাকা শহর আজ হয়তো ডুবে যাবে। এখন আবার বাতাস দিচ্ছে।

এক রাতের বৃষ্টিতে বাড়ির সামনে হাঁটুপানি জমে গেছে। আরেকটু হলে ঘরে

পানি ঢুকত। শাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি দেখছে। নীলু অফিসে যাবার জন্য তৈরি হয়ে বাইরে এসে আঁৎকে উঠল। ভীত গলায় বলল, 'বন্যার পানি নাকি শাহানা? সমুদ্রের মতো লাগছে।'

শাহানা হাসিমুখে বলল, 'আজ আর অফিসে যেতে পারছ না। শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত যদি তুলতে পার, তাহলে অবশ্যি ভিন্ন কথা। কিংবা একটা রিকশা যদি বারান্দা পর্যন্ত আনা যায়।'

'কে আনবে রিকশা?'

সেটা একটা সমস্যা। রফিককে বলা যাবে না। সে এখনো ঘুমুচ্ছে। না ঘুমুলেও পানি ভেঙে রিকশা আনার পাত্র সে নয়।

শাহানা বলল, 'তোমার কি যাওয়াটা খুবই দরকার ভাবী?'

'হুঁ।'

'আনিস ভাইকে বলি, একটা রিকশা এনে দিক।'

'যাও প্লিজ। দেখ সে আছে কিনা।'

'সে নেই। বাজার করতে গিয়েছে। এক ঘন্টার উপর হয়েছে, এসে পড়বে। এলেই রিকশা আনতে পাঠাব।'

'থ্যাংক্‌স্‌ শাহানা।'

নীলু ভেতরে ঢুকে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারি একটা বাজারের ব্যাগ হাতে আনিসকে আসতে দেখা গেল। লাউয়ের মাথা, পুঁই শাক বের হয়ে আছে। অন্য হাতে একটা হাঁস। এত বাজার-টাজার আনিসের নিশ্চয়ই নয়। বীণাদের বাজার। আনিসের প্যান্ট ভাঁজ করে হাঁটু পর্যন্ত তোলা। কী কুৎসিতই না দেখাচ্ছে!

আনিস হাসিমুখে বলল, 'কি ব্যাপার শাহানা, তুমি এখনো বারান্দায়?'

'তাতে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?'

'আরে না, আমার অসুবিধা কি? আমার বরং সুবিধাই হল। তোমার মুখ দেখে যাত্রা করেছি বলে কুড়ি টাকায় হাঁস পেয়ে গেলাম। এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে এই হাঁসের দাম হত কমসে কম চল্লিশ।

'কেন শুধু শুধু কথা বলেন? কে আপনার এইসব কথা শুনতে চায়? আপনি চট করে একটা রিকশা ডেকে দিন তো আনিস ভাই। ভাবী অফিসে যাবে। আর প্যান্টটা নামান, কি যে বিশ্রী দেখাচ্ছে!'

আনিস অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। শাহানা বলল, 'খামোকা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাজার দিয়ে রিকশা নিয়ে আসুন?'

আনিস বাজারের থলি নামিয়ে রেখে প্যান্টের ভাঁজ খুলতে-খুলতে বলল, 'দু'দিন পর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, এখনো তুমি এত রেগে রেগে কথা বল! পরে অসুবিধা হবে।'

'কী অসুবিধা হবে?'

'তোমার নিজেরই খারাপ লাগবে। মনে হবে, লোকটা তো ভালোই ছিল,

কেন যে এত খারাপ ব্যবহার করেছি!'

শাহানা একটা বিরক্তির ভঙ্গি করে ঘরে ঢুকে গেল। আবার যদি বের হয় এই আশায় আনিস বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শাহানা এল না। আনিসকে আবার প্যান্ট ওঠাতে হল। রিকশা আনতে যেতে হবে। তারপর যাবে পুরানো ঢাকায়—আজ শরাফ আলি ভাইকে বাড়িতে পাওয়ার সম্ভাবনা। গতরাতের ঝুম বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই প্রাণভরে বোতল টেনেছে। এবং যদি টেনে থাকে, তাহলে এখনো ঘুমে। দড়ির একটা কৌশল যদি আদায় করা যায়।

গলির সামনে এসে আনিসকে থমকে দাঁড়াতে হল। নর্দমা উপচে উঠেছে। পূতিগন্ধময় পানি ঢুকছে গলিতে। নাড়ি উল্টে আসার মতো দুর্গন্ধ। সুস্থ মাথায় কেউ এই পানিতে পা ডুবিয়ে গলিতে ঢুকবে না। আনিসের অবশ্যি ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। আজ গেলেই শরাফ আলিকে পাওয়া যাবে। বড়ো কিছু পেতে হলে কষ্ট করতেই হয়। সে প্রায় চোখ বন্ধ করে গলিতে ঢুকে পড়ল।

পানবিড়ির দোকানের ঝাঁপ খোলা। বুড়ো লোকটি কৌতূহলী হয়ে আনিসকে দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই বলল, 'শরাফ আলির খোঁজে যান?'

'জ্বি।'

'আইজ পাইবেন। বাড়িত আছে। এট্টু আগে পাঁচটা স্টার সিগ্রেট কিনল।'

আনিস বলল, 'আমাকে এক প্যাকেট ভালো সিগারেট দিন। সিগারেট দেখলে খুশি হবে।'

বুড়ো বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। যার অর্থ, খুশি হবার লোক শরাফ আলি নয়।

দরজা খুলল রেশমা। ঝলমলে একটা শাড়ি গায়ে পেঁচানো। মুখটি করুণ ও বিষণ্ন। ভারি চোখ–মনে হচ্ছে এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে। আনিস ভয়ে–ভয়ে বলল, 'শরাফ ভাই আছেন?'

'হুঁ, আছেন।'

মেয়েটি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরে ঢুকতে দেবার ইচ্ছা নেই হয়তো। আনিস বলল, 'ভেতরে এসে বসব?' রেশমা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

'পা ধোওয়া দরকার, একটু পানি দেবেন?'

'পা ধোওয়ার দরকার নাই, এইটা মসজিদ না।'

আনিস ঘরে ঢুকল। মেয়েটি কটু গলায় বলল, 'দুই দিন পরে পরে ক্যান আসেন? কি চান আপনে?'

আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। এত স্নিগ্ধ মুখ মেয়েটির, অথচ কী কঠিন গলায় কথা বলছে।

'কী, কথা কন না কেন? ভদ্রলোকের ছেইলা।'

'ম্যাজিক শিখতে আসি। পামিং শিখি।'

'আসল ম্যাজিক আমার কাছে আছে, শিখবেন?'

মেয়েটির চোখে-মুখে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা হাত দরজার কপাটে। অন্য হাত কোমরে। যেন প্রচণ্ড একটা ঝগড়ার প্রস্তুতি। অথচ মুখ এখন হাসি-হাসি।

'কি, দেখবেন ম্যাজিক?'

বলতে-বলতে মেয়েটি এক হাতে শাড়ি ঘোমটার মতো মাথায় দিয়ে নরম গলায় বলল, 'এই দেখেন, এখন আমি ভদ্দরলোকের মাইয়া। দেখলেন?'

আনিস কিছু বোঝবার আগেই রেশমা বুক থেকে শাড়ি সরিয়ে ফেলল। ব্লাউজ বা ব্রা কিছুই নেই। সাদা শঙ্খের মতো মেয়েটির সুগঠিত বুক ঝলমল করছে। আনিসের গা ঝিমঝিম করতে লাগল। রেশমা শান্ত গলায় বলল, 'একটু আগে ছিলাম ভাল মাইনষের ঝি, এখন হইলাম, নটি বেটি। এরে কয় ম্যাজিক। আপনেরে একটা কথা কই—আপনে ভালো মাইনষের পুলা, খারাপ জায়গায় ঘুরাঘুরি করেন ক্যান? এইখানের বাতাসে দোষ আছে। খারাপ বাতাস শইলে লাগব। যান, বাড়িত যান।'

আনিস নিঃশব্দে বের হয়ে এল। আকাশে আবার ঘন হয়ে মেঘ করেছে। পথে নামতেই বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়তে লাগল। পানওয়ালা হাসিমুখে বলল, 'দেখা হইছে শরাফ ভাইয়ের সাথে?'

আনিস জবাব দিল না।

২৫

কবির মাষ্টারের শরীরটা ভালো না।

কয়েক দিন আগে পা পিছলে পুকুরপাড়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন কিছু হয় নি, কিন্তু এখন জানান দিচ্ছে। গত রাতে কোমরব্যথায় ঘুমুতে পারেন নি। সেঁক দিতে গিয়ে শওকত আগুন-গরম কাপড় কোমরে ধরেছে—নির্ঘাৎ ফোসকা পড়েছে। এখন টনটনে ব্যথা। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে আছেন। উঠোনে বৃষ্টিভেজা জোছনা। রাত তেমন হয় নি, কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। শুনশান নীরবতা। এতক্ষণ ঝিঁঝি ডাকছিল, এখন তাও ডাকছে না। তবে মশার পিনপিন হচ্ছে। বড্ড মশা। কিছুক্ষণ বসে থাকলে মনে হয় গা খুবলে নিয়ে যাবে।

শওকত মালশায় ধূপ দিয়ে পায়ের কাছে রেখে দিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, 'সেঁক লাগব স্যার?'

কবির মাষ্টার হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'সাবধান, সেঁকের কথা মুখে আনবি না। আমাকে আলুপোড়া করেছিস, খেয়াল নেই। সাহস কত, আবার সেঁক দিতে চায়! দূর হ সামনে থেকে।'

শওকত সরে গেল, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে উঠোনে দেখা গেল। সাজসজ্জা বিচিত্র। পায়ে গামবুট, হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ।

কবির মাষ্টার থমথমে গলায় বললেন, 'যাস কোথায়?'

'মাছ মারতে যাই।'

'গামবুট পেলি কোথায়?'

শওকত জবাব দিল না। কবির সাহেব ভারি গলায় বললেন, 'অসুস্থ একটা মানুষকে ফেলে চলে যাচ্ছিস, ব্যাটা তুই মানুষ না অন্য কিছু!'

কবির মাষ্টারের কথা শওকতের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করল বলে মনে হল না। সে টর্চ ফেলে তার কোঁচ পরীক্ষা করল। এবং গামবুটে মচমচ শব্দ করে বের হয়ে গেল। কবির মাষ্টার বিড়বিড় করে কি সব বললেন। তাঁর কোমরের ব্যথা বেড়েছে। পানির পিপাসা হচ্ছে। কিন্তু উঠে গিয়ে পানি খাবার উৎসাহ বোধ করছেন না। সারা শরীরে সীমাহীন আলস্য। এর নাম বয়স। বেলা শেষ হয়েছে। অজানা দেশে যাবার প্রস্তুতি তেমন নেই। একা যখন থাকেন, ভয়–ভয় লাগে। এক দিকে মায়া, অন্য দিকে ভয়। অসম্ভব সুন্দর এই জায়গা ছেড়ে যেতে মায়া লাগছে। প্রিয়জন কেউ নেই, তবু যখন মনে হয়, এই শওকতের সঙ্গে আর দেখা হবে না––দেখা হবে না শফিক–রফিকদের সঙ্গে, তখন বুকের ভেতর চাপ ব্যথা অনুভব করেন। তিনি গৃহী মানুষ নন। তাঁরই যখন এমন অবস্থা, তখন গৃহী মানুষদের অবস্থাটা কী ভাবাই যায় না।

কবির মাষ্টার লক্ষ করলেন তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। তিনি লজ্জিত বোধ করলেন। আশেপাশে দেখার কেউ নেই, তবু কেন জানি মনে হয় কে যেন দেখে ফেলল। যে দেখেছে সে যেন একটি তরুণী মেয়ে। দেখেই চট করে পর্দার আড়ালে সরে গিয়ে হাসছে। মেয়েটির মুখ শাহানার মতো। সরল স্নিগ্ধ একটি মুখ, যে–মুখ দেখলেই মনে এক ধরনের পবিত্র ভাব হয়।

শাহনার বিয়ে খুব শিগগিরই হবার কথা, কিন্তু কেউ এখনো কোনো চিঠিপত্র লিখছে না। হয়তো ভুলে গেছে। তাঁর কথা বিশেষ করে কারোর মনে থাকে না। নিমন্ত্রিত মানুষদের তালিকা যখন তৈরি হয় তখন কেমন করে যেন তাঁর নামটা বাদ পড়ে যায়। কেউ ইচ্ছা ক'রে করে না, তিনি তা জানেন। হয়ে যায়। ভুল ধরা পড়লে খুব লজ্জা পায়। অসংখ্য বার ভাবে এই ভুল আর হবে না। কিন্তু আবার হয়। কেন হয় কে জানে? মানুষ বড়ো রহস্যময় প্রাণী। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ–তারকার যে–রহস্য, মানুষের রহস্য তারচে কম নয়। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘমালা এগিয়ে আসছে। চাঁদ প্রায় ঢাকা পড়তে বসেছে। কী সুন্দরই না লাগছে। কোমরের ব্যথা তাঁর আর মনে রইল না। তিনি প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। শওকত খালিহাতে ফিরে এসেছে, এটিও লক্ষ করলেন না। শওকত যখন বলল, 'ঘুমাইছেন?' তখনই শুধু চমকে উঠলেন।

'কি রে, মাছ পাস নি?'

'না। পাই নাই।'

'এত মাছ–মাছ করে আবার খালিহাতে ফিরে এলি?'

'জমির মিয়ার সাথে যাওনের কথা ছিল, তারে ভূতে ধরছে।'

'কী বললি?'

'নিয়ামত খাঁর বাড়ির সামনে যে তেঁতুল গাছ আছে, হেইখানে ভূতে ধরল। কুস্তি হইছে দুই জনে। জমির মিয়া খুব ভয় পাইছে। শইল দিয়া বিজল বাইরহইতেছে।'

'কী পাগলের মতো কথা বলছিস! ভূতে ধরবে কী?

'ধরলে আমি কি করমু কন, আমারে জিগাইয়া তো ধরে নাই।'

গা জ্বলে যাওয়ার মতো কথা। ভূতের সঙ্গে কুস্তি করেছে এক জন, অন্য জন তা বিশ্বাস করে বসে আছে। কবে এদের বুদ্ধি হবে? কবে এরা সাদা চোখে পৃথিবী দেখতে শিখবে?

'বিছনা করছি, যান শুইয়া পড়েন। চা–টা কিছু খাইবেন?'

'না। তুই আবার যাস কই?'

'জমির মিয়ার বাড়িত। লোকটা বাঁচত না। তওবা করতে চায়। মৌলবি আনতে লোক গেছে।'

'কী বলছিস তুই?'

'সারা শইল দিয়া বিজল বাইর হইতেছে।'

কবির মাষ্টার উঠে দাঁড়ালেন। বিরক্ত স্বরে বললেন, 'ঘরে তালা দে, তারপর চল মূর্খটাকে দেখে আসি। কুস্তি যে জায়গায় হয়েছে, সেখানটায় আগে নিয়ে যা।'

'এই অসুখ শইলে যাইবেন? দিনের অবস্থাও বালা না।'

'কথা বলিস না। তোদের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।'

যে তেঁতুলতলায় ভূতের সঙ্গে কুস্তি হয়েছে, সে জায়গাটায় ধস্তাধস্তির ছাপ সত্যি সত্যি আছে। কবির মাষ্টার টর্চ ফেলে–ফেলে উবু হয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। শওকত শীতল গলায় বলল, 'এখন বিশ্বাস হয় স্যার? জায়গাটা খারাপ। আসেন, যাই গিয়া।'

'তোর ভয় লাগছে?'

শওকত জবাব দিল না। তার সত্যি সত্যি ভয় লাগছে। ভয় কাটনোর জন্যে সে একটি বিড়ি ধরিয়েছে। হাতে আগুন থাকলে এরা কাছে আসতে পারে না। জ্বলন্ত বিড়ি স্যারের নজর থেকে লুকিয়ে রাখাও এক সমস্যা।

'স্যার, চলেন যাই। দিনের অবস্থা খারাপ।'

কবির মাষ্টার উঠে পড়লেন।

জমির মিয়ার বাড়িতে রাজ্যের লোক এসে জড়ো হয়েছে। তিন–চারটা হারিকেন জ্বলছে। মালশায় ধূপ এবং লোহা পুড়তে দেওয়া হয়েছে। জমির মিয়া বারান্দায় চাটাইয়ে শুয়ে ছটফট করছে। ভূতে–পাওয়া মানুষকে ঘরে

ঢোকানো যায় না। কবির মাষ্টারকে দেখেই জমির শব্দ করে কেঁদে উঠল।

'দিন শেষ গো মাষ্টার সাব। ভূতে কামড় দিছে।'

কবির মাষ্টারের বিস্ময়ের সীমা রইল না। লোকটি সত্যিই মৃত্যুশয্যায়। চোখ ডেবে গেছে। গা দিয়ে হলুদ রঙের পিচ্ছিল ঘাম বেরুচ্ছে। বাঁ হাত রক্তাক্ত। কবির মাষ্টারের নিজেকে সামলাতে সময় লাগল।

'জমির মিয়া, তুমি যে গিয়েছিলে তেঁতুলতলায়, তোমার পায়ে জুতো ছিল?'

'জ্বি—না।'

'তাহলে আমার কথা মন দিয়ে শোন। তোমার সঙ্গে যে কুস্তি করেছে, তার পায়ে ছিল রবারের জুতো। জুতোর ছাপ আছে মাটিতে। ভূত কি আর জুতো পায় দেয়, বল দেখি?'

জমির মিয়ার কোনো ভাবান্তর হল না। টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। মৌলানা সাহেব আসবার আগেই ডাক্তার এসে পড়ল। নিমতলির সোবাহান ডাক্তার। নেত্রকোণায় এক সময় কম্পাউণ্ডারি করত, এখন পুরো ডাক্তার। রোগীকে ভূতে ধরেছে শুনেই সে তার কালো ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জ বের করে ফেলল। কবির মাষ্টার বললেন, 'কিসের ইনজেকশান দিচ্ছ?' ডাক্তার সোবাহান হাসিমুখে বলল, 'কোরামিন। সুঁইয়ের এক গুঁতোয় দেখবেন রোগী ঘোড়ার মতো লাফ দিয়ে উঠছে। ওষুধ তো না, আগুন!'

সেই আগুন ইনজেকশানেও কাজ হল না। রোগী আরো ঝিমিয়ে পড়ল। সোবাহান ডাক্তারকে তা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন মনে হল না। সে নিচু গলায় পাশের লোকটিকে বলল, 'একটা পান দিতে বল তো। মুখটা মিষ্টি হয়ে আছে।'

কবির মাষ্টার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কী অবস্থা! আশেপাশে কোথাও এক জন পাশ-করা ডাক্তার পর্যন্ত নেই যে জানবে কী হচ্ছে, সমস্যা কোথায়। মৃত্যু নামক কুৎসিত জিনিসটির সঙ্গে যে প্রাণপণ যুদ্ধ করবে, ঠাণ্ডা গলায় বলবে—বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী। এই লোকটির মতো বিরস মুখে পান চিবোবে না।

সোবাহান ডাক্তারের জন্যে জলচৌকি এসেছে। সে জলচৌকি প্রত্যাখ্যান করল। তার আরেক জায়গায় যেতে হবে। জরুরি কল। তার অপেক্ষা ভিজিটের জন্যে। টাকা আসছে না বলে যেতেও পারছে না। পাশের লোকটিকে খানিকটা আড়ালে টেনে নিয়ে গুজগুজ করে আবার কী-সব বলছে। সম্ভবত ভিজিটের কথা।

মৌলানা সাহেব এসে পড়েছেন। অনেক আয়োজন করে তিনি তওবা পড়ালেন। এবং তার কিছুক্ষণ পরই জমির মিয়া মারা গেল। তার অল্পবয়স্ক বউটি গড়াগড়ি করে কাঁদছে।

এত অল্প সময়ে এত বড়ো একটি ঘটনা ঘটে যেতে পারে! মৃত্যু

ব্যাপারটা কি এতই সহজ? কবির মাষ্টার হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল, এ রকম কিছু বোধহয় ঘটে নি। এটা তাঁর কল্পনা।

'শওকত।'

'জ্বি স্যার।'

'চল্ বাড়ি যাই।'

শওকত বিস্মিত হল। এ অবস্থায় মাষ্টার সাহেব বাড়ি চলে যেতে চাইবেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। সে কথা বাড়াল না। রাস্তায় নেমে এল।

'শওকত।'

'জ্বি?'

'চল তো তেঁতুল তলায় আরেক বার যাই।'

'আবার যাওনের দরকার কী?'

'ভূতের কথাটা ঠিক না। ভূত রবারের জুতো পায়ে দেয় না।'

'যা হওনের হইছে স্যার। অখন ভূত হইলেই-বা কি, না হইলেই-বা কি। বৃষ্টিতে ভিজ্যা লাভ নাই, চলেন যাই গিয়া।'

কবির মাষ্টার আর আপত্তি করলেন না। রাতে তাঁর চেপে জ্বর এল। বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন। শেষরাতের দিকে চোখ লেগে এসেছিল, তখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখলেন। যেন তিনি মারা গেছেন। তাঁর বাবা-মা এসেছেন তাঁকে কোথায় যেন নিয়ে যেতে। তাঁদের মুখ বিষণ্ন। চোখে জল টলমল করছে। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন মাথা নিচু করে। কবির মাষ্টার খুব আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছেন কেন আপনারা? বসুন।'

তাঁরা বসলেন না। দু' জনেই কাঁদতে শুরু করলেন।

স্বপ্ন এই পর্যন্তই। কবির মাষ্টার জেগে উঠলেন। ঘামে গা ভিজে গিয়েছে। ক্লান্ত স্বরে ডাকলেন, 'শওকত, ও শওকত।'

শওকত উঠল না। পাশ ফিরে আবার নাক ডাকাতে লাগল। শেষ রাতের দিকে তার ভালো ঘুম হয়।

২৬

শাহানার গায়ে হলুদের দিন-তারিখ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।

প্রথম ঠিক হল সোমবার সকালে। বরের বাড়ি থেকে ঠিক ন'টায় মেয়েরা আসবে। দশটার ভেতর বিদেয় করে দিতে হবে। বিয়ে শুক্রবারে, গায়ে হলুদ এত আগে আগে কেন? হলুদের পর কিছু নিয়মকানুন পালন করতে হয়। ঘর থেকে হলুদ-দেওয়া মেয়ে বেরুতে পারে না। ছেলেদের দিকে তাকাতে পারে না। বরপক্ষের কেউ কিছু শুনলেন না। ওদের একটিই কথা, সোমবারই হবে। এবং ন'টার সময়ই হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সোমবার খুব ভোরে তাঁরা জানালেন, একটা বিশেষ ঝামেলা হয়েছে—হলুদ হবে মঙ্গলবার বিকেলে। ঠিক তিনটার সময় তাঁরা আসবেন, চারটার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত সেই দিনও বদলাল। ঠিক হল বুধবার সকাল।

নীলু খুব বিরক্ত হল। বরের চাচাকে বলেই ফেলল, 'আপনারা মন ঠিক করুন।' বরের চাচা মনে হল এই কথায় খুব অপমানিত বোধ করলেন। গলার স্বর চট করে পাল্টে ফেলে বললেন, 'অসুবিধা আছে বলেই তো বদলানো হচ্ছে। শখ করে নিশ্চয়ই বদলাচ্ছি না।'

ভদ্রলোক মুখ অন্ধকার করে রইলেন। চা-নাস্তা কিছুই মুখে দিলেন না। যাবার সময় সহজ ভদ্রতায় বিদায়ও পর্যন্ত নিলেন না। নীলু খুব অপ্রস্তুত বোধ করল।

মনোয়ারা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'ক্যাটক্যাট করে ঐ কথাগুলি না-বললে হত না বৌমা?'

'বলার ইচ্ছা ছিল না মা। মুখ ফসকে বলে ফেলেছি। এমন কিছু অন্যায় কথাও কিন্তু বলি নি।'

'আমাকে ন্যায়-অন্যায় শেখাতে এস না। বয়স কম হয় নি। ন্যায়-অন্যায় চিনি। তোমরা সবাই চাও বিয়েটা নিয়ে একটা ঝামেলা হোক। ভালোয়-ভালোয় এটা পার করি তা চাও না।'

নীলু চুপ করে গেল। মনোয়ারা চুপ করলেন না। তাঁর স্বভাবমতো কথা বলতেই লাগলেন। শেষের দিকে তাঁর কথায় মনে হতে লাগল, যেন নীলু আগের থেকে সব ঠিকঠাক করে বরপক্ষীয়দের সঙ্গে এই ঝামেলাটা বাধিয়েছে। এক পর্যায়ে শাহানা কড়া গলায় বলল, 'তুমি যদি এই মুহূর্তে চুপ না কর, তাহলে কিন্তু আমি একটা কাণ্ড করব।'

'কী কাণ্ড করবি?'

'সেটা যখন করব তখন বুঝবে। এখন বল চুপ করবে কি না। শুধু শুধু ক্যাচক্যাচ করে বাড়িসুদ্ধ সবার মাথা ধরিয়ে দিয়েছ।'

মনোয়ারার রক্ত চড়ে গেল। তিনি নিতান্তই অবান্তর সব কথা বলতে লাগলেন। যার মধ্যে একটি হচ্ছে নীলুদের পরিবার হচ্ছে ছোটলোকের পরিবার। তিন বছর পর মা মেয়েকে দেখতে এসেছিল খালিহাতে। একটা বিসকিটের প্যাকেট পর্যন্ত ছিল না। পরিবারের আছর যাবে কোথায়? মা'র যেমন ছোট মন, মেয়েরও তেমনি হয়েছে। মানুষের ভালো দেখতে পারে না—ইত্যাদি

এইসব কথাবার্তার কোনো রকম জবাব দেওয়া অর্থহীন। নীলু রান্না চড়িয়ে দিয়ে প্রাণপণে ভাবতে লাগল, সে এখন কিছুই শুনছে না। কিন্তু মনোয়ারা নীলুর একটি দুর্বল জায়গায় আঘাত করেছেন, যা তিনি প্রায়ই করেন। নীলুর মা খালিহাতে মেয়েকে দেখতে এসেছিলেন। এই কথা নীলুকে

অতীতে লক্ষ বার শুনতে হয়েছে। বাকি জীবনে হয়তো আরো কয়েক লক্ষ বার শুনতে হবে।

হোসেন সাহেব নিঃশব্দে রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। নিচু গলায় ডাকলেন, 'বৌমা!'

নীলু স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'চা লাগবে বাবা?'

'না মা, চা-টা কিছু না। তোমার শাশুড়ি কী সব শুরু করেছে। কিছু মনে করো না গো লক্ষ্মী ময়না।'

'আমি কিছু মনে করি নি।'

'যে-সব সে বলছে, ওগুলি তার মনের কথা না।'

নীলু জবাব দিল না। তার চোখে পানি এসে গিয়েছে। এই স্নেহময় বৃদ্ধটি অসংখ্য বার তার চোখে পানি এনে দিয়েছেন। এই ভালোবাসার তেমন কোনো প্রতিদান নীলু কি দিতে পেরেছে?

'তোমার শাশুড়ি হচ্ছে তোমার মেয়ের মতো, বুঝলে মা? মেয়ের উপর কি আর রাগ করা যায়, বল? কথা বলছ না কেন? রাগ করা যায়?'

'না, যায় না। আপনাকে চা করে দিই?'

'দাও।'

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় শফিক হাই তুলে বলল, 'মা-র সঙ্গে নাকি তুমুল একটা যুদ্ধ করলে?'

'হ্যাঁ, করলাম। খবরটা তোমাকে দিল কে?'

'টুনি দিয়েছে। বাতি নেভাও। শোন, মা-র সঙ্গে আর একটু মানিয়ে চলতে পার না? বুড়ো মানুষ কিছু একটা বললেই যদি কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু কর, তাহলে তো মুশকিল।'

নীলু বাতি নিভিয়ে দিল।

গা ঘামে চটচট করছিল, অনেকখানি সময় নিয়ে গোসল করল। চুল ভেজাবে না ভেজাবে না করেও চুল ভেজাল। নির্ঘাৎ ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু বাথরুম থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছা করছে শাওয়ারের নিচে সারা রাত মাথা ধরে রাখতে, যাতে মনের সব গ্লানি জলধারার সঙ্গে ধুয়েমুছে যায়। কিন্তু তা কি আর যায়? যায় না। গ্লানি থেকেই যায়।

শাহানার ঘরে বাতি জ্বলছে। আজকাল অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে বাতি জ্বলে। সে কি ইচ্ছে করেই জেগে থাকে, না তার ঘুম আসে না? বিয়ে-ঠিক-হওয়া মেয়েকে একা একা ঘুমুতে দিতে নেই। কিন্তু শাহানাকে দিতে হচ্ছে। সে তার মা'র সঙ্গে ঘুমুতে রাজি না।

অবশ্যি তার ঘরের একটি চৌকিতে বাবলু ঘুমায়। তাকে কি মানুষের মধ্যে গণ্য করা যায়? বোধহয় যায় না। সে বাস করে ছায়ার মতো। ক'দিন ধরে জ্বর যাচ্ছে কিন্তু একটি কথাও কাউকে বলে নি। শফিক প্রথম লক্ষ করল এবং বেশ কিছু কড়া কড়া কথা শোনাল। সে-সব কথার সারমর্ম

হচ্ছে--এই ছেলেটা কোনো আসবাবপত্র না। এও একটি মানুষ।

বাতি জ্বলছে রান্নাঘরেও। রফিক ফিরেছে বোধহয়। ঘুমুবার আগে সে এক কাপ চা খায়। এতে নাকি তার সুনিদ্রা হয়। নীলু এগোলো রান্নাঘরের দিকে। চিরকাল সে শুনে এসেছে চা খেলে ঘুম কমে যায়, রফিকের বেলায় উল্টো।

রান্নাঘরে রফিককেই পাওয়া গেল। চা নয়, প্লেটে ভাত নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। ঠাণ্ডা কড়কড়া ভাত। বড়ো বড়ো দলা মেখে মুখে দিচ্ছে। নিশ্চয়ই প্রচুর খিদে। নীলুকে দেখে রফিক অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে হাসল।

'এটা কেমন খাওয়ার নমুনা, রফিক? শারমিনকে বললেই সে গরমটরম করে দিত।'

'ও ঘুমুচ্ছে। বেকার মানুষ, বৌকে রাত-দুপুরে ঘুম ভাঙাই কি করে?'

'আমাকে ডাকতে। যাও, টেবিলে গিয়ে বস। আমি গরম করে আনছি।'

'আমার খাওয়া শেষ, কাজেই তোমাকে কিছুই করতে হবে না, ঘুমুতে যাও!'

'এত রাত পর্যন্ত বাইরে কী করছিলে?'

'নাথিং। তুমি আবার এখন উপদেশ দিতে শুরু করলে ঝামেলা হয়ে যাবে। যা বলছি তাই কর, ঘুমুতে যাও।'

'চল, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।'

'আমার দেরি হবে। চা খাব।'

রফিক চায়ের পানি বসাল। এঁটো থালা-বাসন পরিষ্কার করল। নীলু তাকিয়ে আছে। বেশ মজা লাগছে তার।

'ড্যাবড্যাব করে কী দেখছ ভাবী?'

'তোমার ঘরকন্না দেখছি। এক হাতে প্লেট পরিষ্কার করার এই কায়দা কোথায় শিখলে?'

'সব কিছু কি ভাবী শিখতে হয়? কিছু বিদ্যা মানুষ সঙ্গে নিয়েই জন্মায়। তুমিও কি চা খাবে?'

'না।'

'আমি কিন্তু দু' জনের পানি দিয়েছি।'

'তুমি নিজেই দু' কাপ খাও। ভালো ঘুম হবে।'

রফিক চা বানাতে পারল না। ঘরে চায়ের পাতা নেই। নীলুর খুবই খারাপ লাগতে লাগল। বেচারা এত কষ্ট করে পানিটানি গরম করেছে।

'সরি রফিক। আমি খেয়াল করি নি।'

'সরি হবার কোনোই কারণ নেই ভাবী। আজকের দিনটিই আমার জন্য খারাপ। যে ক'টা কাজ করতে গিয়েছি, প্রতিটি ভণ্ডুল হয়েছে।'

'মোড়ের চায়ের দোকানটা খোলা আছে না? ওখান থেকে খেয়ে আস।'

'দরজা খুলে দেবে কে?'

'আমি জেগে থাকব।'

রফিক সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল। তার মুখ হাসি-হাসি। নীলু বসার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল। এক বার যখন বের হয়েছে এত সহজে ফিরবে না। শাহানার ঘরে এখনো বাতি জ্বলছে। এক বার উঁকি দিয়ে দেখলে হয়। কিন্তু কেমন আলসে লাগছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না।

মাঝে মাঝে এমন আলসেমি লাগে। কোনো কিছুই করতে ইচ্ছা করে না। তারও কি বয়স হয়ে যাচ্ছে? হচ্ছে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু কেন জানি তা মেনে নিতে ইচ্ছা করে না। আয়নায় নিজেকে দেখলে মনে হয়, কই, বয়স তো কিছুই বাড়ে নি। সুন্দর একটি মায়াভরা মুখ। ঘন কালো চোখ। এই চোখ নিয়ে কত কাণ্ড। তাদের কলেজের ইংরেজির স্যার আফতাব উদ্দিনের কাছে গিয়েছে পার্সেন্টেজ দিতে। ক্লাসে দেরি করে এসেছিল, সেখানে দেয়া হয় নি। আফতাব স্যার রেজিস্ট্রার খাতা খুলে বললেন, 'তোমার ক'টা পার্সেন্টেজ দরকার বল তো? মোটে একটা?' নীলু বিস্মিত হয়ে তাকাতেই তিনি বললেন, 'বাহ্, তোমার চোখ তো ভারি সুন্দর! ভালো করে তাকাও আমার দিকে।' এই বলেই কিছু বোঝাবার আগেই গালে হাত দিয়ে নীলুর মুখ তাঁর দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন বিকেল হয়ে গেছে। কমন রুমে একটি মানুষ নেই। আফতাব স্যার তাকাচ্ছেন অদ্ভুত চোখে। কী সর্বনাশা কাণ্ড! প্রতিটি মেয়ের জীবনেই এ-রকম দু'-একটা ঘটনা ঘটে, যা চিরকাল গোপন রাখতে হয়। কোথায় এখন আফতাব স্যার কে জানে। কী সুন্দর ভরাট গলায় শেকসপীয়ার পড়াতেন! এখনো কানে বাজে।

Tell them that God bid's us do goods for evil.
And thus I clothe my naked villainity
With odd old ends stol'n forth of holy writ.
And seem a saint when most I play the devil.

কিং রিচার্ড দ্য থার্ড। আচ্ছা, তার যদি আফতাব স্যারের সঙ্গে বিয়ে হত তাহলে কেমন হত? জীবনটা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অন্য রকম হত। টুনি জন্মাত না। অন্য কোনো মেয়ে জন্মাত কিংবা কোনো ছেলে। এখন সে যেমন টুনিকে ভালোবাসে, সেই ছেলে বা মেয়েটিকে সে তেমনই ভালোবাসত। বাসত না?

'ভাবী। একা একা বসে আছ কেন?'

শাহানা বের হয়ে এসেছে। একটা সাদা চাদর এমনভাবে গায়ে জড়িয়েছে যে, অদ্ভুত লাগছে দেখতে।

'কথা বলছ না কেন ভাবী?'

'রফিকের জন্যে বসে আছি। রফিক দোকানে চা খেতে গিয়াছে। ঘরে চা ছিল না।'

'ছিল না, তবু খেতেই হবে? ছেলে হবার কত মজা, দেখলে ভাবী? একটা ছেলে যা চাইবে, সবাই তাকে তা করতে দেবে, কিন্তু একটা মেয়েকে দেবেনা।'

'আমি দেব। তুমি যদি এখন বাইরে চা খেতে যেতে চাও, আমার কোনো আপত্তি নেই, যেতে পার।'

শাহানা গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলল। নীলুও হাসল। শাহানা বলল, 'তুমি শুয়ে পড়, আমি দরজা খুলে দেব। আমার ঘুম আসবে না। রাতে আমি প্রায় জেগেই থাকি। দিনে ঘুমাই।'

'অভ্যেসটা ভালো, বিয়ের পর তাহলে আর খুব কষ্ট হবে না।'

'কষ্ট হবে না কেন?'

'বিয়ের পর অনেক দিন পর্যন্ত স্বামী নামক জিনিসটি বৌদের রাতে ঘুমুতে দেয় না।'

শাহানা কিছু বলল না। নীলু লক্ষ করল মেয়েটির ফর্সা গাল টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। কথাগুলি বলা ঠিক হয় নি। নীলুর লজ্জা লাগতে লাগল। এত বাচ্চা মেয়ে। জীবন সম্পর্কে কোনো বোধ পর্যন্ত জন্মায় নি। এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা ঠিক হয় নি।'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন শাহানা, বস।'

শাহানা বসল না। দাঁড়িয়েই রইল। রফিক এখনো আসছে না। এক ঘন্টার মতো হয়ে গেল। কী যে সে করে!

২৭

বাহান্নটা কার্ড বাহান্ন রকম।

দর্শকরা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করবেন। তারপর ফিরিয়ে দেবেন ম্যাজিশিয়ানকে। ম্যাজিশিয়ানের হাতে নয়, টেবিলে রাখা একটি চারকোণা বাক্সে। ম্যাজিশিয়ান দূর থেকে মন্ত্র পড়বেন। ম্যাজিক ওয়াণ্ড শূন্যে দোলাবেন, ওমনি বাহান্নটি তাস হয়ে যাবে বাহান্নটি সাহেব। খেলার আসল মজাটা হচ্ছে ম্যাজিশিয়ান এক বারও হাত দিয়ে তাস ছোঁবেন না। তিনি দাঁড়িয়ে থাকবেন দূরে। কাজেই দর্শকরা এক বারও ভাববে না এর মধ্যে হাতসাফাইয়ের কিছু আছে। অসাধারণ একটি খেলা, তবে পুরোপুরি যান্ত্রিক। ম্যাজিশিয়ানের করবার কিছু নেই। যা করবার স্প্রিং লাগানো কাঠের বাক্সটাই করবে। তাসের প্যাকেট রাখামাত্র তা চলে যাবে লুকানো একটি খোপে। উপরে উঠে আসবে আগে থেকে রাখা এক প্যাকেট তাস। তাসের বদলে অন্য কিছুও উঠে আসতে পারে। একটি ডিম উঠে আসতে পারে। ছোট্ট চড়ুইছানা উঠে আসতে পারে। কিন্তু তা করা ঠিক হবে না। তাহলে দর্শকরা ভাববে কাঠের বাক্সেই কিছু একটা আছে। তখন তারা বাক্স পরীক্ষা করতে চাইবে। তাসের বদলে যদি তাস আসে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। দর্শকরা ভাববে গণ্ডগোলটি তাসে। তারা ব্যস্ত থাকবে তাস পরীক্ষায়। ম্যাজিক হচ্ছে মনস্তত্ত্বের খেলা।

আনিস স্প্রিং-দেওয়া বাক্সটি নিজেই বানিয়েছে, কিন্তু ঠিকমতো কাজ করছে না। ডালা নেমে আসার সময় ঝপ্ করে শব্দ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সব সময় নামছেও না। স্প্রিংটি আরো শক্ত করে সেই ত্রুটি দূর করা যায়, কিন্তু তাতে ঝপ্ শব্দ আরো বেড়ে যায়। এই মুহূর্তে সেই শব্দ-সমস্যার কোনো সমাধান মনে আসছে না।

শাহানা অনেকক্ষণ থেকেই ছাদে হাঁটছে। আনিসকে লক্ষ করছে। কিন্তু আনিস এক বারও তাকাচ্ছে না। কেউ এক জন যে ছাদে আছে, এই বোধটুকুও সম্ভবত তার নেই। শাহানা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। হালকা গলায় ডাকল, 'আনিস ভাই।'

আনিস অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার, অসময়ে?'

'অসময়ে মানে? আপনার এখানে কি পঞ্জিকা দেখে আসতে হবে?'

'না, তা হবে না। ভেতরে আসবে?'

'আসতে বললে হয়তো আসব। আগে বলুন।'

'আস। ভেতরেআস।'

'আপনি বাক্স হাতে নিয়ে কী করছেন? ধ্যান করছেন নাকি? অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ করছি। এক বার দেখি বিড়বিড় করে কথা বলছেন। কার সঙ্গে কথা বলছেন? বাক্সটার সঙ্গে?'

'দাঁড়াও, তোমাকে ব্যাপারটা বলি। এই বাক্সটাকে বলে টু-ওয়ে বক্স। দুটো কম্পার্টমেন্ট আছে। একটা দেখা যায়, অন্যটা দেখা যায় না।'

আনিস দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। স্প্রিংটা কীভাবে কাজ করে সেটা দেখাল। বর্তমানে কী সমস্যা হচ্ছে, সেটা বোঝাতে চেষ্টা করল। শাহানা গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে। যেন সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারছে। আনিস বলল, 'কত সহজ টেকনিকে কেমন চমৎকার একটা কৌশল, দেখলে?'

'হ্যাঁ, দেখলাম। আপনি কথা বলার সময় আমি একটা কথাও বলি নি, চুপ করে শুনেছি। এখন আমি কিছুক্ষণ কথা বলব, আপনি চুপ করে শুনবেন। আমার কথা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলবেন না। হাঁ হুঁ কিছুই বলবেন না।'

আনিস অবাক হয়ে তাকাল। শাহানার চোখ জ্বলজ্বল করছে। মুখ রক্তাভ। গলার স্বর গাঢ়। ব্যাপারটা কী!

'আনিসভাই।'

'বল।'

'শুক্রবারে আমার বিয়ে. আপনি তো জানেন। আপনাকে কার্ড দেওয়া হয়েছে না?'

'হয়েছে।'

'এখন আপনি যদি মনে করেন আপনার সাহস আছে, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে অন্য কোথাও চলে যেতে পারি। কোর্টে কীভাবে নাকি বিয়ে

করে। আমি তো কিছু জানি না, আপনিই ব্যবস্থা করবেন। আমার কাছে চারশ' টাকা আছে।'

আনিস হতভম্ব হয়ে গেল। কী বলছে শাহানা! সুস্থ মাথায় বলছে, না অন্য কিছু?

'আনিস ভাই, আমি একটা স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছি। আপনি আপনার দরকারী জিনিসগুলি গুছিয়ে নিন।'

'এসব তুমি কী বলছ শাহানা!'

'আপনি কি চান না আমি সারা জীবন আপনার সঙ্গে থাকি?'

'চাইলেই কি সব হয়? আমি তোমাকে নিয়ে যাব কোথায়? কী খাওয়াব তোমাকে?'

শাহানা উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, 'আনিস ভাই, আমি যাচ্ছি।'

'শাহানা শোন, একটা কথা শোন।'

শাহানা দাঁড়াল না। সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত নেমে গেল। আনিস সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ঘরে বসে রইল। সন্ধ্যা মেলাবার পর নিচে নেমে এল। বারান্দায় নীলু কী যেন করছে। আনিসকে দেখেই বলল, 'তোমার কি শরীর খারাপ নাকি আনিস?'

'জ্বি না।'

'চোখ মুখ বসে গিয়েছে।'

'মনটা ভালো নেই ভাবী। বারান্দায় কী করছেন?'

'কিছু করছি না। তুমি আমাকে দুটো মোমবাতি এনে দিতে পারবে? আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই।'

আনিস মোমবাতি আনতে গেল। মোমবাতি এনে দেখল, ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে। সমস্ত বাড়ি আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। একটি রিকশায় করে কারা যেন এসেছে, সম্ভবত নীলু ভাবীর মা। বিয়ে বাড়ির লোকজন আসতে শুরু করেছে। করাই তো উচিত। আনিস মন্থর পায়ে দোতলায় উঠে এল।

২৮

তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়াই শাহানার বিয়ে হয়ে গেল। বড়ো সমস্যা ছিল বিয়ের খরচের সমস্যা। তার সমাধান হল অদ্ভুত ভাবে। হোসেন সাহেব কবির মাষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন রফিকের শ্বশুর রহমান সাহেবকে দাওয়াত দিতে। দু' জনই ভেবে রেখেছিলেন পরিচয়পর্ব খুব সুখকর হবে না। হোসেন সাহেব আসতে চান নি। তিনি বারবার বলছিলেন, 'ছোট বৌমা আগে যাক, বাবার সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে আসুক, তারপর আমি যাব।' মনোয়ারা বিরক্তিতে মুখ কুঁচকেছেন, 'ছোট বৌমা যেতে চাচ্ছে না, তাকে জোর করে পাঠাব?'

'তাকে জোর করে পাঠাবে না, তাহলে আমাকে জোর করে পাঠাচ্ছ কেন?'

'বাজে কথা বলবে না। তৈরি হও, কবির ভাই যাবে তোমার সাথে। কথাবার্তা যা বলবার সেই-ই বলবে, তুমি চুপ করে থাকবে।'

'তাহলে আমার যাবার আর দরকারই-বা কী?'

'আবার বাজে কথা?'

হোসেন সাহেব চুপ করে গেলেন। দাওয়াতের চিঠি হাতে এমনভাবে বের হলেন যেন ফাঁসিকাঠে ঝোলবার জন্যে যাচ্ছেন। ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা ফেললেন। আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিলেন। দোয়ার কারণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক রফিকের শ্বশুর হোসেন সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন। আন্তরিক স্বরে বললেন, 'আমার এত সৌভাগ্য, এত বড় মেহমান আমার ঘরে!' আদরযত্নের চূড়ান্ত করলেন ভদ্রলোক। নিজের মেয়ের কথা এক বারও জিজ্ঞেস করলেন না। কবির মাষ্টার সে-প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ের সঙ্গে যা বোঝাপড়া তা আমাকেই করতে দিন। ঐটা বাদ থাক। আপনি আপনার নীলগঞ্জের ব্যাপারটা বলুন। এই বয়সে একটা শক্ত কাজ হাতে নিলেন।'

'যখন বয়স কম ছিল, তখন এইসব চিন্তা মাথায় আসে নি। এখন এসেছে। এখন কি বয়সের কারণে ঐ চিন্তা বাদ দেওয়া ঠিক হবে?'

'মোটেই ঠিক হবে না। বয়স কোনো ব্যাপার নয়।'

'আপনি আমার মনের কথাটা বলেছেন বেয়াই সাহেব।'

'এক দিন যাব আপনার নীলগঞ্জ দেখতে।'

'ইনশাআল্লাহ। বড়ো খুশি হলাম বেয়াই সাহেব, বড়ো খুশি হলাম।'

শাহানার বিয়েতে তিনি থাকতে পারবেন না বলে খুব দুঃখ করলেন, কারণ আজ সন্ধ্যায় তাঁকে ব্যাংকক যেতে হচ্ছে। কিছুতেই থাকা সম্ভব নয়।

'বুঝলেন বেয়াই সাহেব, এক দিন আগে জানতে পারলেও ব্যাংককের প্রোগ্রাম ক্যানসেল করতাম। এখন তো সম্ভব না। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

তাঁরা উঠে আসবার সময় রহমান সাহেব বেশ বিব্রত মুখেই একটি খাম এগিয়ে দিলেন। নরম স্বরে বললেন, 'এটা দিতে খুবই লজ্জা পাচ্ছি। নিজের হাতে কোনো একটা গিফ্‌ট্‌ দেওয়া দরকার ছিল। এত অল্প সময়ে কিছু কেনা সম্ভব নয়। আপনার মেয়েকে বলবেন, সে যেন নিজের পছন্দ মতো ভালো একটা কিছু কেনে।'

বাড়ি ফেরার পথেই খাম খোলা হল। দশ হাজার টাকার একটা ক্রস্‌ড্‌ চেক। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! হোসেন সাহেব ভেবেছিলেন চেক দেখে মনোয়ারা রেগে যাবেন। ক্যাটক্যাট করে বলবেন, এত বড় সাহস, আমাকে টাকা দেখাচ্ছে! টাকার গরম আমার কাছে?

আশ্চর্যের ব্যাপার--সে রকম কিছু হল না। মনোয়ারা একটি কথাও বললেন না। ঐ টাকায় শাহানাকে কিছু কিনে দেওয়া হল না। পুরোটাই খরচ হল বিয়েতে। আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হল। খাবারের মেনুতে আগে টিকিয়া ছিল না, এখন টিকিয়া এবং দৈ মিষ্টি যোগ হল। গরিব আত্মীয়স্বজন যারা বিয়েতে এসেছে, তাদের অনেকের জন্যে শাড়ির ব্যবস্থা হল। ছেলেকে যে আংটি আগে দেবার কথা ছিল, তার চেয়ে অনেক ভালো একটা আংটি কেনা হল। মনোয়ারার ইচ্ছা ছিল স্যুটের কাপড় আরেকটু ভালো দেওয়া। কিন্তু আগেই কাপড় কিনে দরজির দোকানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সেটা সম্ভব হল না।

শাহানা বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুব সহজভাবেই পার করল। মনোয়ারা ভেবেছিলেন মেয়ে কেঁদেকেটে বিশ্রী একটা কাণ্ড করবে। সে রকম কিছু হল না। শাহানার আচরণ সহজ এবং স্বাভাবিক। এক বার শুধু নীলুকে বলল, 'ভাবী, আনিস ভাইকে একটু ডেকে আনবে? কথা বলব।'

নীলু বিরক্ত স্বরে বলল, 'এখন ওর সঙ্গে কথা বলবে মানে? কী কথা?'

'তেমন কিছু না। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করেছে কিনা।'

'ঐসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'আচ্ছা যাও, ভাবব না।'

শাহানা মিষ্টি করে হাসল। বিয়ের সাজে আজ তাকে তেমন সুন্দর লাগছে না। কেমন যেন জবড়জং দেখাচ্ছে। গা ভর্তি গয়না। ফুলেফেঁপে আছে জমকালো শাড়ি। ঠোঁটে কালচে রঙের লিপস্টিক। একেবারেই মানাচ্ছে না। এক দল মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। এরা অকারণে হাসছে। এদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে শাহানা। একেক বার হাসতে–হাসতে ভেঙে পড়ছে। দৃশ্যটি কেমন যেন ভালো লাগে না। নীলু এক সময় শাহানাকে এক পাশে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'এত হাসছ কেন?'

'হাসির গল্পগুজব হচ্ছে, তাই হাসছি। কেন ভাবী, আমার হাসায় কোনো বাধা আছে?'

শাহানার গলার স্বরও যেন অন্য রকম। কঠিন এবং কিছু পরিমাণে কর্কশ। নীলু আর কিছু বলল না। শাহানা ফিরে গিয়ে আরো শব্দ করে হাসল।

২৯

বিয়ের প্রথম কিছু দিন ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। অনেকগুলি ঘটনা একসঙ্গে ঘটে এবং খুব দ্রুত ঘটে। অনেকটা স্বপ্নদৃশ্যের মতো। নিজের জীবনেই ঘটছে অথচ যেন নিজের জীবনে ঘটছে না। এটা যেন অন্য কারো জীবন।

বিয়ের রাতটি নিয়ে শাহানাকে অনেক রকম দুশ্চিন্তা ছিল। না জানি কী

হয়, না জানি কী ঘটে! বাসর রাত নিয়ে কত রকম গল্প সে বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছে। কিছু কিছু ভারি মিষ্টি। বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। গল্পের বইয়েও এই রাতের কত সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। অপরাজিতায় কী সুন্দর বর্ণনা। অপুর সঙ্গে তার স্ত্রীর প্রথম দেখা। ছোট-ছোট কথা বলছে দু' জনে। কত দ্রুত বন্ধুত্ব হচ্ছে দু' জনের মধ্যে। আবার সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গল্পও আছে। নারীজীবনের চরম অবমাননার গল্প। গ্লানি ও পরাজয়ের গল্প। সেখানে ভালোবাসা নেই, অন্য কিছু আছে।

শাহানার বেলায় এর কোনোটাই হল না। জহির এল রাত একটার দিকে। তার মুখ দেখে মনে হল সে খুব বিরক্ত। জহিরের বড়ো বোনের গলা শোনা যাচ্ছে। খুব চেঁচিয়ে কী-যেন বলছে, অন্য সবাই তাকে সামলাতে চেষ্টা করছে। বড়ো রকমের ঝগড়া হচ্ছে। শাহানার এক বার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে কী নিয়ে ঝগড়া। সে অবশ্যি জিজ্ঞেস করল না। খাটে হেলান দিয়ে বসে রইল। তার ঘুম পাচ্ছিল। আবার একই সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। ভোঁতা ধরনের ব্যথা। সারা দুপুর ঘুমুলে যেমন ব্যথা হয়, তেমন।

জহির নিজে কিছু বলল না। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে হাত-মুখ ধুতে লাগল। এই সময় বাইরের হৈচৈ আরো বেড়ে গেল, মোটা পুরুষালি গলায় কে একজন বলছে, এসব আমি টলারেট করব না। যথেষ্ট টলারেট করেছি। তার পরপরই ঝনঝন করে কী যেন ভাঙল। জহির বাথরুম থেকে বের হয়ে এসেছে। সে অসহায় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। কিছু বলবে না বলবে না করেও শাহানা বলল, 'কী হয়েছে?'

'একটা পুরোনো পারিবারিক ঝগড়া। উৎসব-টুৎসবের দিনে এই ঝগড়াগুলি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আজ এসব শুনে দরকার নেই। পরে শুনবে। তুমি থাক কিছুক্ষণ একা একা, আমি এক্ষুণি সব মিটিয়ে দিয়ে আসছি। সরি এবাউট ইট।'

অপেক্ষা করতে-করতে কখন যে শাহানা ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে নিজেই জানে না। জহির তাকে আর জাগায় নি। বিয়ের প্রথম রাতটি সে ঘুমিয়ে পার করে দিল। নিজকে কেমন যেন অপরাধী মনে হচ্ছিল। ভোরবেলা জেগে উঠে দেখে, জহির পাশের ইজিচেয়ারে বসে। অঘুমজনিত কারণে তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। জহির বলল, 'ঘুম ভালো হয়েছে শাহানা?'

শাহানা জবাব দিল না।

'তুমি এত তৃপ্তি করে ঘুমুচ্ছিলে যে জাগাতে মন চাইল না।'

শাহানার খুব ইচ্ছে করল জিজ্ঞেস করে, আপনি ঘুমুন নি? জিজ্ঞেস করতে পারল না। লজ্জা লাগল।

জহিরের বড়ো বোনের নাম আসমানী। কাল রাতে যে-মেয়ে এত কাণ্ড করেছে, আজ ভোরে তাকে দেখে তা কে বলবে? খুব হাসিখুশি। যেন কিছুই হয় নি। শাহানার হাত ধরে বাড়ি দেখাচ্ছে। হড়বড় করে কত কথা বলছে—

'কত বড়ো বারান্দা, দেখলে শাহানা? ফুটবল খেলা যায়, তাই না? অনেকেই বলেন এত বড়ো বারান্দা একটা ওয়েস্টেজ। আমার তা মনে হয় না। ছোট বারন্দার বাড়িগুলিতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। তোমার আসে না?'

'না। আমার জীবন কেটেছে ছোট বারান্দার বাড়িতে।'

'এখানে কিছু দিন থাকলে আর ছোট বারান্দার বাড়িতে থাকতে পারবে না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে। এস শাহানা, লাইব্রেরি ঘরটা তোমাকে দেখাই। তোমার তো আবার গল্পের বইয়ের খুব নেশা।'

'কে বলল আপনাকে?'

'কেউ বলে নি। এক বার তোমাদের বাসায় গিয়ে দেখি বই পড়ছ আর চোখে আঁচল দিচ্ছ।'

শাহানা কিছু বলল না। আসমানী হাসতে-হাসতে বলল, 'গল্প উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সুখদুঃখে যারা কাতর, তারা সাধারণত নিজেদের সুখদুঃখের ব্যাপারে উদাসীন হয়। এ-রকম হয়ো না। নিজের সুখ নিজে আদায় করে নেবে। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'জহির অবশ্যি খুবই ভালো ছেলে, সুখ তুমি পাবে। যথেষ্টই পাবে। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে এক লক্ষ টাকা বাজি রাখতে পারি। রাখবে বাজি?'

শাহানা হেসে ফেলল। আসমানী প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'কাল রাতে বড়ো রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে, তুমি কিছু-কিছু বোধহয় শুনেছ। জহির কি কিছু বলেছে?

'না।'

'সত্যি বলে নি?'

'না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'ও, আচ্ছা। তুমি কি শুনতে চাও?'

'জ্বি-না, আমি শুনতে চাই না।'

আসমানী অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সহজ স্বরে বলল, 'শুনতে না চাইলেও তুমি শুনবে। অন্য কারো কাছ থেকে শোনার চাইতে আমার কাছ থেকে শোন। ঝামেলাটা বাড়ি নিয়ে। এই বাড়ি আমি চাই, কিন্তু বাবা আমাকে দিতে রাজি না। ঢাকায় বাবার আরো দু'টি বাড়ি আছে, সে দু'টি বাবা জহিরকে দিয়ে দিক। তা দেবে না। বাবা আমার কোনো কথাই শুনতে চাচ্ছে না। জহির যখন তাঁর ছেলে, আমিও তেমনি তাঁর মেয়ে। আমি তো নদীর পানিতে ভেসে আসি নি। তাই না শাহানা?'

'তা তো ঠিকই।'

'শোন শাহানা, তোমার কাছে অনুরোধ—পারিবারিক এই ঝামেলায় তুমি নিরপেক্ষ থাকবে, এবং আমার মন খুব ছোট, এইসব ভাববে না। আমার মন

ছোট না। তবে আমি অধিকার ছেড়ে দেবার মেয়েও না। আই উইল ফাইট টু দি লাস্ট। এস, তোমাকে বাগানটা দেখাই। খুব সুন্দর বাগান।'

বাগান সত্যিই খুব সুন্দর। দু'টি গোলাপঝাড় বাগান আলো করে আছে। শাহানা মুগ্ধকণ্ঠে বলল, 'বাহ্ কী সুন্দর!' আসমানী চাপা গলায় বলল, 'এই বাগানের প্রতিটি গোলাপচারা আমার লাগান। কোনটিতে কবে ফুল ফুটল, সব আমার ডাইরিতে লেখা আছে। এ বাড়িতে কারো বাগানের শখ ছিল না। এই শখ আমার। চল ছাদে যাই, দেখবে কত ধরনের অর্কিড আছে। কত কষ্ট করে একেকটা জোগাড় করেছি। এক বার অর্কিড আনতে গিয়ে দু'টি খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছি।'

আসমানী ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। শাহনার খুব ভালো লাগল মেয়েটিকে। কথা বলার কী সহজ–স্বাভাবিক ভঙ্গি!

হাত ধরে–ধরে হাঁটছে। যেন কত দিনকার পুরানো বন্ধু। অথচ এই মেয়েই কী কর্কশ গলায় কাল রাতে ঝগড়া করছিল! আজও হয়তো করবে। এক জন মানুষের অনেকগুলি চেহারা থাকে। একটি চেহারার সঙ্গে অন্য চেহারার কিছুমাত্র মিল থাকে না।

শাহানা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল নতুন বাড়িতে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে। স্রোতের মতো লোকজন আসছে। সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলতে হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, যারা আসছে সবাই বিত্তবান। কেউ বিলেত ঘুরে এসেছে। কেউ এই সামারে আমেরিকা যাবে। এক জন শাহানাকে বলল, শাহানা যদি শপিং–এর জন্যে কোলকাতা যেতে চায় তাহলে যেন তাকে খবর দেয়। সেও সঙ্গে যাবে। কোলকাতা যাওয়া তো নয়, যেন বায়তুল মুকাররামে বাজার করতে যাওয়া। শাহানা ধাঁধায় পড়ে গেল। বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করতে লাগল। সবচে বিরক্ত করল দাড়ি–গোঁফওয়ালা বৃষস্কন্ধ এক প্রৌঢ়। সে শাহানাকে ডাকছে আন্টি করে এবং বেশ উঁচুস্বরেই বলছে তার নেক্সট ছবিতে আন্টিকে একটা রোল করতেই হবে। এ–রকম সুন্দর একটা চেহারা, অথচ বাংলাদেশের লোক সেটা দেখবে না, তা হতেই পারে না। যদি হয়, তাহলে সেটা হবে ক্রাইম। ক্ষমার অযোগ্য একটা অপরাধ। কী কুৎসিত লোকটির বলার ভঙ্গি, অথচ কেউ রাগ করছে না। বরং মজা পেয়ে হাসছে। খুশি–খুশি গলায় বলছে-–দাও একটা রোল শাহানাকে। মনে হয় ভালোই করবে। যেভাবে ব্লাশ করছে, তাতে ভার্জিন ভিলেজ গার্ল হিসেবে চমৎকার হওয়ারই কথা।

কোথায় ছিল শাহানা, আর আজ সে কাথায়? পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে মনও বোধহয় বদলে যায়। এত ভালোবাসত গল্পের বই, অথচ এখন বই নিয়ে বসার কথা মনেই হয় না। তবুও *অচিন রাগিনী* নামের একটা বই সে বের করেছে। পড়ছে, কিন্তু মন লাগছে না। আগে একটি বই পড়া শুরু করলেই মনে হত গল্পের নায়িকা আসলে সে। এসব তার জীবনের ঘটনা। এখন মনে

হচ্ছে না। উপন্যাসের নায়িকার জীবন এবং তার জীবন আলাদা। এত তাড়াতাড়ি মানুষ এত বদলে যায়? এই বাড়িতে কত মানুষ, অথচ কেউ তার পরিবর্তন লক্ষ করছে না কেন? যে–মানুষটি সবচে কাছের হওয়া উচিত, সে–ই কেমন দূরে দূরে আছে। কী একটা মামলা নিয়ে ব্যস্ত। তাকে নাকি চিটাগাং যেতে হবে। না গেলেই নয়। গত রাতে সে খুব আগ্রহ নিয়ে মামলার কথা বলল—

'বুঝলে শাহানা, মামলাটা সম্পত্তি নিয়ে। হাজি নুরুল ইসলাম নামে এক বিরাট ধনী ব্যক্তি চিটাগাং–এ থাকেন। জন্মসূত্রে বাড়ি হচ্ছে ঢাকার বিক্রমপুর। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধার্মিক। এতিমখানা, স্কুল, কলেজ, মসজিদে বহু টাকা দেন। শুধু তাই না, তিনি একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ বাবা। ভদ্রলোক মারা যাবার পর একটা সমস্যা দেখা গেল। চিটাগাংয়ের খারাপ পাড়ার এক মেয়ে তাঁর সম্পত্তির বিরাট এক অংশ দাবি করে মামলা রুজু করে দিল। ভদ্রলোক নাকি তাকে দানপত্র করে দিয়ে গেছেন। কাগজপত্র আছে। কেলেঙ্কারি অবস্থা! কেমন ইন্টারেস্টিং না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কিন্তু তেমন ইন্টারেস্ট পাও নি। কেমন করে বুঝলাম বল তো?'

শাহানা চুপ করে রইল। জহির হাসতে–হাসতে বলল, 'তুমি জানতে চাও নি আমি কোন পক্ষের হয়ে মামলায় নেমেছি। তা থেকেই বুঝলাম।'

জহির শব্দ করে হাসতে লাগল। কাউকে হাসতে দেখলেই হাসতে ইচ্ছে করে। শাহানাও হেসে ফেলল। জহির অবাক হওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলল, 'তুমি আবার হাসতেও জান নাকি? অবাক করলে তো! আমি এক মেয়েকে জানতাম, সে কিছুতেই হাসত না। যত হাসির কথা বলা হোক, সে গম্ভীর হয়ে থাকত। শেষটায় রহস্য জানা গেল।'

'কী রহস্য?'

'হাসলে মেয়েটাকে খুব বাজে দেখাত।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, কাউকে কাউকে বাজে দেখায়। আচ্ছা শোন শাহানা, একটা কাজ করলে কেমন হয়? তুমিও আমার সঙ্গে চিটাগাং চল।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুমি। চিটাগাং–এর কাজ শেষ করে তোমাকে নিয়ে নেপাল থেকে ঘুরে আসব। এই সময়টা নেপালে যাবার জন্যে ভালো নয়। তবু খারাপ লাগবে না, আমি কয়েক বার গিয়েছি। যাবে?'

'যাব।'

'তোমাদের বাসায় এখন কিছু জানানোর দরকার নেই। নেপাল পৌঁছে সবার নামে একটা করে ভিউকার্ড পাঠিয়ে দেবে। আইডিয়াটা কেমন? ভালো না?'

'হ্যাঁ, ভালো।'

'এমন শুকনো মুখে বলছ কেন? হাসিমুখে বল।'

শাহানা হাসল। জহিরের সঙ্গে কথা বলতে তার বেশ ভালোই লাগছে। কে জানে, এই লোকটির সঙ্গে তার জীবন হয়তো খুব খারাপ কাটবে না।

৩০

টলম্যান শফিককে ডেকে পাঠিয়েছে।

বেয়ারা দিয়ে ডেকে পাঠানো নয়–একটা নোট দিয়েছে, যার অর্থ দুপুর এগারটায় আমার সঙ্গে দেখা করবে—জরুরি।

জরুরি কিছু তো মনে হচ্ছে না। সাধারণ কিছু হলে নোট পাঠাত না। নিজেই উঠে এসে বলত, শফিক আমার ঘরে এস, একসঙ্গে চা খাব। টী–ব্রেক।

যতই দিন যাচ্ছে, লোকটিকে শফিকের ততই পছন্দ হচ্ছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। অফিস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জলের মতো স্বচ্ছ ধারণা। শুধু অফিস ম্যানেজমেন্ট নয়--এডভারটাইজিং, পাবলিক রিলেশন সবই তার নখদর্পণে। শুধু একটি সমস্যা, কারোরই কাজ করার কোনো স্বাধীনতা নেই, সব কাজ সে একাই করছে। বিভাগীয় প্রধানদের এখন আর কিছু করার নেই।

শ্রমিক–সমস্যা সে মোটামুটি ধামাচাপা দিয়েছে। পদ্ধতিটিও চমৎকার। শ্রমিকদের প্রধান দাবি ছিল--দু'টি ঈদ বোনাস, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, বাড়িভাড়া।

সে দু'টির জায়াগায় তিনটি বোনাস দিয়ে দিল। যাতায়াত ভাতা দেওয়া হল না। ঠিক হল, বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে গাড়ি ওদের নিয়ে আসবে এবং দিয়ে আসবে। ওদের দাবি ছিল মাসে পঞ্চাশ টাকা চিকিৎসা ভাতা, সেটাকে করা হল পঁচাত্তর। মূল বেতনের বিশ ভাগ বাড়ি ভাড়া দেওয়া হল এবং ঘোষণা দেওয়া হল, এক বৎসরের মধ্যে প্রতিটি শ্রমিকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রমিকদের জন্যে অপ্রত্যাশিত বিজয়। তারা আন্দোলনের সাত জন মূল নেতাকে গলায় মালা দিয়ে কাঁধে করে নাচতে লাগল। তাদের বিজয়–উল্লাসে বারবার শোনা গেল--শ্রমিক–বন্ধু টলম্যান, জিন্দাবাদ। উৎসাহের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পরপর দেখা গেল টলম্যান সাত জন শ্রমিক–নেতাকে বরখাস্ত করেছে।

টলম্যান নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'আমার আদেশের কোনো রকম নড়চড় হবে না। তোমাদের কথা আমি মেনে নিয়েছি, তোমরা আমার কথা মানবে। যদি না মান, কারখানা বন্ধ করে চলে যাব। এই ক্ষমতা আমাকে দেওয়া

হয়েছে। এক দিনের ছুটি তোমাদের দেওয়া হল। তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। এক দিন কারখানা বন্ধ থাকবে। মন ঠিক কর, কাজ করবে কি করবে না। যে এক দিন ছুটি দেওয়া হল, সেই এক দিন একটু কষ্ট করে খোঁজ নেবে, অন্য কারখানায় শ্রমিকরা কী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। আচ্ছা, এখন যেতে পার। পরশু সকাল ন'টায় যারা কাজে যোগ দেবে না, তাদের চাকরি বাতিল ধরা হবে। পরবর্তী সময়ে এই নিয়ে কোনো রকম দেন-দরবার চলবে না।'

টলম্যান বাংলা জানে না। সে কথা বলল ইংরেজিতে। শফিককে অনুবাদ করে দিতে হল। শ্রমিকরাও কথা বলছিল। শফিক তার ইংরেজি করে দিতে গেলে টলম্যান শুকনো গলায় বলল, 'ওরা কী বলছে, তা শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই, প্রয়োজনও নেই। আমি কী বলছি তুমি শুধু সেটাই ওদের কাছে পৌঁছে দেবে।'

'আমার মনে হয় ওদের কথাও জানা থাকা ভালো।'

'শুধু তোমার মনে হলে তো হবে না, আমারও মনে হতে হবে। আমার সে-রকম মনে হচ্ছে না।'

অফিসের রামেশ্বর বাবুরও চাকরি চলে গেল। এমন যে ঘটবে, কেউ কল্পনাও করে নি। রামেশ্বর বাবু নিরীহ নির্বিরোধ মানুষ। কারো সাতেপাঁচে নেই। পানের কৌটা নিয়ে অফিসে আসেন। একটু পরপর পান খান। পায়ের কাছে পিকদানিতে পিক ফেলেন। একদিন টলম্যান তাঁকে ডেকে পাঠাল। হাসিমুখে বলল, 'ভালো আছেন?'

'জ্বিস্যার।'

'দু'দিনের ক্যাজুয়েল নিয়েছিলেন, অসুখ সেরেছে?'

'জ্বিস্যার।'

'কী অসুখ?'

'আমার বড়ো নাতনীর আমাশা হয়েছিল।'

'ও, আচ্ছা। নাতনীর অসুখ, আপনার নিজের কিছু না?'

'জ্বি-না, স্যার।

'আপনি দু' দিনের ছুটি নিয়েছিলেন, কিন্তু এসেছেন চার দিন পর। বাড়তি দু' দিনের ব্যাপারে কিছুই করেন নি। মনে হয় ভুলে গিয়েছিলেন।'

'জ্বিস্যার।'

'অফিস ন'টার সময় শুরু হয়, কিন্তু আপনি কোনো দিন সাড়ে দশটার আগে আসতে পারেন না।'

'অনেক দূরে থাকি স্যার, রামপুরা।'

'এখন তো অফিসের বাস যায়। দূরে থাকলেও অসুবিধা হবার কথা নয়।'

'এত সকালে ভাত রান্না হয় না স্যার।'

'আপনি বাড়ি যান খুব সকাল-সকাল। ঠিক না?'

রামেশ্বর বাবু কোনো জবাব দিলেন না। প্রচুর ঘামতে লাগলেন। টলম্যান

বলল, 'গত এক মাসে আপনি কখন অফিসে এসেছেন কখন গিয়েছেন সব লিখে রেখেছি। এই কাগজে আছে। নিন, পড়ে দেখুন।'

রামেশ্বর বাবু কাগজের উপরে চোখ বুলিয়ে গেলেন। কিছু পড়লেন বলে মনে হল না।

'ঠিক আছে, এখন যেতে পারেন।'

তিনি নিজের চেয়ারে এসে পানের কৌটা খোলামাত্র টলম্যানের চিঠি চলে এল যার বক্তব্য হচ্ছে—এই অফিস মনে করছে তোমার চাকরি অফিসের কল্যাণে আসছে না। সম্ভবত অফিসের কাজে তোমার মন বসছে না। কাজেই—। সার কথা চাকরি শেষ।

রামেশ্বর বাবুর জন্যে সুপারিশ নিয়ে অনেকেই গিয়েছিল টলম্যানের কাছে। সেই অনেকের এক জন হচ্ছে শফিক। টলম্যান হাসিমুখে বলেছে, 'দয়া দেখাবার কথা তুমি বলছ কেন? দয়া দেখাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি। এটা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। আমরা এদেশে টাকা কামাতে এসেছি। এই সহজ সাধারণ সত্যটি তোমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পার ততই ভালো।'

'রামেশ্বর বাবু অনেক দিন এই কোম্পানির জন্যে কাজ করেছেন। কোম্পানির তাঁর প্রতি দায়িত্ব আছে।'

'উনি বিনা বেতনে চাকরি করেন নি। কাজেই কোম্পানির দায়িত্বের প্রশ্নটা কেন আসছে? এই ব্যাপারটি নিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না। তুমি অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করলে করতে পার। তোমাদের দেশের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা কোনটি বল তো? সুন্দরবনের কথা খুব শুনছি। কীভাবে যাওয়া যায়?'

টলম্যানের নোটটি শফিকের সামনে। এগারটা বাজতে এখনও দশ মিনিট। শফিক লক্ষ করল, তার মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করছে––যার কোনো কারণ নেই। সে চা দিতে বলল। না বললেও হত। টলম্যানের কাছে যাওয়া মানেই প্রথম এক কাপ চা খাওয়া। এই চা সে নিজে বানায়। পানি গরম করা থেকে দুধ চিনি মেশানো পর্যন্ত সে নিজেই করে। অধস্তন যে-মানুষটির জন্যে চা বানান হচ্ছে, সে অস্বস্তি বোধ করে। এটাও বোধহয় অফিস ম্যানেজমেন্টের একটা অঙ্গ।

আজ টলম্যান চায়ের কথা বলল না। ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, 'দুপুরে আজ তুমি আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে। অসুবিধা আছে?'

'না স্যার।'

'কোনো একটা ভালো রেস্তোরাঁয় যাই চল। তুমি কি মদ্য পান কর?'

'না।'

'আমিও করি না, তবে কোনো স্পেশাল অকেশন হলে খানিকটা করি।'

'আজ কি কোনো স্পেশাল অকেশন?'

'না। স্পেশাল কিছু না। আর দশটা দিনের মতো সাধারণ একটা দিন। ভালো রেস্তোরাঁ কি আছে এখানে? মেক্সিকান ফুড পাওয়া যায়?'

'না। তবে বড়ো হোটেলগুলি মাঝে মাঝে মেক্সিকান নাইট, স্প্যানিশ নাইট এইসব করে, তখন পাওয়া যায়।

'চল, ভালো, একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যাওয়া যাক।'

'আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ, বলব। খেতে-খেতে বলব।'

খেতে-খেতে যে কথাগুলি টলম্যান বলল, শফিক তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

'প্রায় দু' বছর আগে আগস্ট ফিফটিনথ্ এক ব্যাচ ওষুধ তৈরি হয়েছিল, যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বাতিল করে দেওয়া হয়। তোমার মনে আছে?'

'মনে নেই। কাগজপত্র দেখতে হবে।'

'কাগজপত্র আমার সঙ্গে আছে, তুমি দেখতে পার। তুমি ছিলে প্রডাকশান সুপারভাইজার, তোমার সই আছে।'

'সই থাকলে ঠিক আছে।'

'না, ঠিক নেই। কারণ কারখানার লগ বুকে ঐ দিন ঐ তারিখে কোনো ওষুধ তৈরির কথা নেই। ঐ দিন কোনো ওষুধ তৈরি হয়। নি। নষ্ট করার প্রশ্নই ওঠে না।'

শফিক তাকিয়ে রইল। টলম্যান ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তার তিন মাস পর তুমি আশি হাজার টাকার একটা চেক ইস্যু করেছ স্টোরের দু'টি এয়ারকুলার কেনার জন্যে। সেই এয়ার কুলার কেনা হয় নি, চেক কিন্তু ভাঙানো হয়েছে।'

শফিক কিছু বলল না। টলম্যান বলল, 'ঐ মাসেই তার দিন দশকের ভেতর 'মডার্ন কার' নামের এক এজেন্সিকে গাড়ি কেনা বাবদ অগ্রিম এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয় ফরেন কারেন্সিতে—ছ' হাজার ডলার। মডার্ন কার বলে কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই। যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে, ঐ ঠিকানারও কোনো অস্তিত্ব নেই। তুমি কিছু বলবে?'

'না।'

'কাগজপত্র সব নিয়ে এসেছি, দেখতে পার। প্রয়োজন বোধ করলে আমার সঙ্গে ডিসকাস করতে পার। তুমি কি দায়িত্ব অস্বীকার করতে চাও?'

'না। অস্বীকার করার পথ কোথায়?'

'দ্যাট্স্ রাইট, অস্বীকার করবার পথ নেই। এটা একটি জটিল চক্রান্ত। আমার ধারণা, তোমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। চিংড়ি মাছটা খাও, ভালো বানিয়েছে। এতটা স্পাইসি না করলেও পারত। আমার তো জিব পুড়ে গেছে।'

টলম্যান রুমালে মুখ মুছল। চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা কোটের পকেট থেকে মুখবন্ধ একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল শফিকের দিকে। সহজ গলায় বলল, 'সরি। আই হ্যাভ টু বি ক্রুয়েল ওনলি টু বি কাইণ্ড। তোমাকে আপাতত

সাসপেণ্ড করা হল। পুরো তদন্ত হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার--তদন্ত হবে নিরপেক্ষ। চিঠিটা খুলে পড়। হাতে নিয়ে বসে আছ কেন?

শফিক চিঠি খুলল, মূল সাসপেনশন অর্ডারের সঙ্গে পেনসিলে টলম্যানের লেখা একটা নোট। নোটের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি খুবই দুঃখিত। এই ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিতে চেষ্টা কর।

শফিক অসময়ে বাড়ি ফিরেছে। নীলুও সকাল-সকাল এসেছে। তার শরীর ভালো লাগছিল না--ছুটি নিয়ে এসেছে। শফিককে দেখে হঠাৎ তার মনটা ভালো হয়ে গেল। সে খুশি-খুশি গলায় বলল, 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল বাসায় এসে তোমাকে দেখব।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা চল না একটা কাজ করি, কোথাও বেড়াতে যাই। যাবে?'

নীলুকে অবাক করে দিয়ে শফিক বলল, 'চল যাই। কোথায় যেতে চাও?'

'সত্যি যাবে?'

'হ্যাঁ, যাব।'

নীলু তৎক্ষণাৎ চুল বাঁধতে বসল, শফিক যাতে মত বদলাবার সময় না পায়। আগে এ-রকম হয়েছে, বেড়াতে যাবার জন্যে রাজি হয়ে শেষ মুহূর্তে বলেছে, আজ না গেলে হয় না? শরীরটা কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে।

শফিক পা ঝুলিয়ে খাটে বসেছে। তার মুখ দেখে মনের আঁচ পাওয়া যায় না। তবু নীলুর মনে হল শফিক কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত।

নীলু বলল, 'শাহানার কাণ্ড শুনেছ?'

'না। কী কাণ্ড?'

'আজ জহিরকে নিয়ে কাঠমুণ্ডু চলে গিয়াছে। কাউকে কিছু বলে নি। রফিক টুনি আর বাবলুকে নিয়ে ও বাড়িতে গিয়ে শোনে, কিছুক্ষণ আগে এযারপোর্ট রওনা হয়েছে।'

'ভালোই তো।'

'আমাদের কাউকে কিছু জানাল না কেন কে জানে। আসুক জহির, ওকে ধরব শক্ত করে।'

'টুনি, বাবলু ওরা কোথায়?'

'ছাদে। এখন ওদের ডাকাডাকি করবে না। বেরুচ্ছি দেখলে আর রক্ষা থাকবে না, সঙ্গে যাবার জন্যে হৈচৈ শুরু করবে। তুমি কি এক কাপ চা খাবে?'

'না।'

'আচ্ছা শোন, তুমি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত নাকি? কেমন যেন অন্য রকম লাগছে তোমাকে?'

'না, চিন্তিত না।'

'এই শাড়িতে কি আমাকে ভালো দেখাচ্ছে?'

'হ্যাঁ দেখাচ্ছে। কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছ?'

'আমার এক বান্ধবীর বাসা আছে নয়া পল্টনে, যাবে?'

'চল যাই।'

নয়া পল্টনের বাসায় নীলুর বান্ধবীকে পাওয়া গেল না। তারা ঘরে তালা দিয়ে কোথায় যেন গিয়েছে। নীলুর অসম্ভব মন খারাপ হল।

শফিক বলল, 'অন্য কোথাও চল। তোমার আরো বান্ধবী আছে নিশ্চয়ই।'

'থাক, এমনি চল রাস্তায় একটু হাঁটি।'

শফিক তাতেও রাজি। তারা কিছুক্ষণ হাঁটল। নীলু একটি মিষ্টি পান কিনল। রাস্তায় দু' টাকা করে বেলি ফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে। নীলুর একটা কিনতে ইচ্ছা হচ্ছে, আবার বলতে লজ্জাও লাগছে। আশ্চর্য কাণ্ড, নীলুকে অবাক করে দিয়ে শফিক বেলি ফুলওয়ালার দিকে এগিয়ে গেল। কত সামান্য ব্যাপার, অথচ এতেই নীলুর হৃদয় আবেগে পূর্ণ হল। তার মনে হতে লাগল, এই পৃথিবীতে তার মতো সুখী মেয়ে আর একটিও নেই। তার ইচ্ছে করছে শফিকের হাত ধরে হাঁটতে। আজকাল ছেলেমেয়েরা কেমন সুন্দর হাত ধরাধরি করে হাঁটে। দেখতে ভালো লাগে। দিন বদলে যাচ্ছে। নতুন দিনের সবই যে ভালো তা নয়, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস ভালো।

শফিক বলল, 'আরো হাঁটবে?'

'তোমার হাঁটতে ভালো লাগছে না?'

'লাগছে।'

'জান, আজ শরীরটা ভালো লাগছিল না বলে সকাল-সকাল চলে এসেছিলাম, এখন এত চমৎকার লাগছে!'

শফিক হাসল।

হাসলে এই গম্ভীর মানুষটাকে এত সুন্দর লাগে! অথচ এই লোকটি একেবারেই হাসে না।

নীলু নরম সুরে বলল, 'আমার একটা কথা শুনবে?'

'হ্যাঁ, শুনব।'

'চল না আজ আমরা বাইরে কোথাও খাই। কোনো নিরিবিলি রেস্টুরেন্টে। যাবে?

'চল যাওয়া যাক।'

'তোমার মন থেকে ইচ্ছে না করলে থাক।'

শফিক হেসে বলল, 'আমার ইচ্ছে করছে। টাকা আছে তো তোমার কাছে? আমার মানিব্যাগ ফাঁকা।'

'টাকা আছে। বেশি কিছু তো আর খাব না।'

রেস্টুরেন্টে বসে নীলুর একটু খারাপ লাগল। বেচারি টুনিকে ফেলে একা–একা খাওয়া। সে হয়তো না খেয়ে বাবা–মা'র জন্য বসে থাকবে।

নীলু বলল, 'কিছু খাওয়ার দরকার নেই, চল বাসায় চলে যাই। বরং দু'টো কোল্ড ড্রিংকের অর্ডার দাও, নয়তো এরা আবার কী ভাববে।'

শফিক মেনু দেখে একগাদা খাবারের অর্ডার দিল।

নীলু বলল, 'এত কে খাবে?'

'টুনি খাবে। প্যাকেটে করে বাসায় নিয়ে যাব।'

'এটা ভালোই করেছ, টাকায় শর্ট পড়বে না তো? আমার কাছে তিন শ' টাকা আছে।'

'শর্ট পড়লে কোট খুলে রেখে দেব।'

বলতে–বলতে শফিক শব্দ করে হাসল। খাবারগুলি চমৎকার। কিংবা কে জানে অনেক দিন পর বাইরে খেতে এসেছে বলেই হয়তো এত ভালো লাগছে। মাঝে মাঝে এমন এলে হয়। তা কি আর সম্ভব হবে? কতগুলি টাকা আজ দিতে হবে! হিসেবের টাকা।

শফিক বলল, 'চুপচাপ খাচ্ছ কেন, কথা বল।'

'কী বলব?'

'মজার মজার কিছু গল্প বল।'

'মজার গল্প বুঝি আমি জানি? তুমি বরং একটা গল্প বল।'

শফিক কি একটা বলতে গিয়ে বলল না। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, 'খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'কেন?'

'জানি না। শরীরটা বোধহয় খারাপ।'

'শরীর খারাপ, তাহলে এলে কেন?'

'তোমার সঙ্গে কখনো আসা হয় না। সুযোগ হল একটা।'

নীলু দেখল, শফিক আবার হাসছে। কী চমৎকারই না তাকে লাগছে। গ্রে কালারের এই কোটটায় কী সুন্দর মানিয়েছে! নীলুর খুব ইচ্ছা করছে শফিকের কোলে একটা হাত রাখে। মজার কোনো একটা গল্প বলে শফিককে আবার হাসিয়ে দেয়। তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে।

৩১

শাহানার এই প্রথম প্লেনে চড়া।

আকাশে ওড়বার মতো বিরাট একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু তার জন্যে যতটা উত্তেজিত হওয়া উচিত ততটা উত্তেজিত সে হচ্ছে না। অথচ প্রথম ট্রেনে চড়ার উল্লাস তার এখনও মনে আছে।

প্রথম প্লেনে চড়া সেই রকমই তো হওয়া উচিত। তা না, কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে। তার সবচে মন খারাপ হল প্লেনের সাইজ দেখে। এত ছোট? সত্যি-সত্যি পাখির মতো লাগছে। শাহানা বলেই ফেলল, 'প্লেন এত ছোট হয়?'

জহির হাসতে-হাসতে বলল, 'ছোট কোথায়, দু'শ' ত্রিশ জন যাত্রী যেতে পারে। বেশ বড়ো। দূর থেকে দেখছ তো, তাই এ রকম লাগছে।'

খুব দূর থেকে তারা দেখছে না। বসে আছে ডিপারচার লাউঞ্জে। কী-একটা সমস্যা হয়েছে। প্লেন ছাড়তে এক ঘন্টা দেরি হবে। সময় কাটানোর জন্যে চা-টা খাচ্ছে যাত্রীরা।

জহির বলল, 'কিছু খাচ্ছ না কেন শাহানা?'

'ভালো লাগছে না। ঢোক গিলতে পারছি না।'

'সে কী! টনসিলাইটস নাকি?'

'জানি না। কাঠমুণ্ডু না গেলে কেমন হয় বল তো? আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'এক বার পৌঁছে দেখ, ফিরে আসতে ইচ্ছে করবে না। তোমার কি প্লেনে চড়তে ভয় লাগছে?'

'হুঁ।'

'ওটা কাটতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে। প্লেনভ্রমণ হচ্ছে পৃথিবীতে সবচে নিরাপদ ভ্রমণ।'

শাহানা বলল, 'আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।'

'দু'টা প্যারাসিটামল খাও। ব্যাগে আছে না? আমি পানি এনে দিচ্ছি।'

শুধু পানি নয়, জহির একটা পানও নিয়ে এসেছে। মাইকে বলা হচ্ছে—ফ্লাইট নাম্বার বি জি ২০৭, কাঠমুণ্ডুগামী যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে…। অদ্ভুত এক ধরনের উচ্চারণ। যেন অর্ধেক যন্ত্র এক জন মানুষ কথা বলছে। শাহানার মনে হল এই কথাগুলি সহজ স্বাভাবিকভাবে বলা যায় না?

'তোমার গা তো বেশ গরম মনে হচ্ছে শাহানা।'

'জ্বর আসছে বোধহয়।'

'তোমার খুব বেশি খারাপ লাগলে না হয় বাদ দেওয়া যাক। এখন টিকিট ক্যানসেল করলে অবশ্যি পয়সাকড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না।'

শাহানা যন্ত্রের মতো বলল, 'ক্যানসেল করতে হবে না। চল যাই।'

শাহানা বসেছে জানালার পাশে, কিন্তু এক বারও জানালা দিয়ে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। তার কেবলি ভয়, এই বুঝি সে বমি করে ফেলবে। বমি আসার আগে আগে মুখে যেমন টকটক স্বাদ চলে আসে, সে-রকম চলে এসেছে। তার সামনের এক ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছেন, কী কুৎসিত কটূ গন্ধ! শাহানার ইচ্ছে করছে এই টেকো লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড়

মারতে।

জহির বলল, 'খুব বেশি খারাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

'প্রায় এসে গেছি। প্লেন নামতে শুরু করেছে। কান ভোঁ-ভোঁ করছে না?'

'হুঁ, করছে।'

'ঢোক গেল কমে যাবে।'

'ঢোক গিলতে পারছি না।'

'তাকাও জানালা দিয়ে। দেখ, প্লেনের চাকা নামছে। তুমি তো কিছুই দেখছনা।'

শাহানা ক্লান্ত গলায় বলল, 'পানি খাব।'

জহির হাত ইশারায় এক জন এয়ার হোস্টেসকে ডাকল। কোনো লাভ হল না। এক্ষুণি প্লেন নামবে। ওরা তাই নিয়ে ব্যস্ত। নো স্মোকিং সাইন বারবার জ্বলছে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সমানে সিগারেট টানছে। জহির এয়ার সেইফটির উপর একটি প্রবন্ধ পড়েছিল নিউজ উইকে। সেখানে বলা হয়েছে-এশিয়া মহাদেশের বিমানযাত্রীরা বিমান ভ্রমণের আইনকানুন ভঙ্গ করে এক ধরনের মজা পায়। যে সময় সিট-বেল্ট বাঁধার কথা, সে-সময় সিট-বেল্ট খুলে ফেলে। নো স্মোকিং সাইন দেখলেই তাদের সিগারেটের পিপাসা পেয়ে যায়। তারা সবচে পছন্দ করে বিমানের করিডরে হাঁটতে। যেন এটা প্লেন নয়, বাস।

প্লেন বেশ বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেয়ে ভূমি স্পর্শ করল। জহির হাসিমুখে বলল, 'এসে গেছি শাহানা। হোটেলে পৌছেই ডাক্তার ডাকব।'

বড়ো হোটেলের নিয়মকানুনগুলি বেশ চমৎকার। দশ মিনিটের মাথায় ডাক্তার এসে উপস্থিত। কুড়ি মিনিটের মাথায় এলেন খোদ হোটেলের ম্যানেজার। পরনে হাফপ্যান্ট, কড়া লাল রঙের স্পোর্টস শার্ট। মুখভর্তি হাসি। সে হাসিমুখে যে কথা বলল, তা শুনে জহিরের মুখ শুকিয়ে গেল। রুগিণীকে হোটেলে রাখা যাবে না। হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। জহির বলল, 'পেশেন্টকে হোটেলে রেখে চিকিৎসা হবে না?'

'না।'

'কেন?'

'কারণ হোটেল কোনো হাসপাতাল নয়।'

'তাহলে আমি অন্য কোনো হোটেলে চেষ্টা করতে চাই, যেখানে আমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে দেবে।'

'নতুন বিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'হানিমুন?'

'হ্যাঁ, বলতে পার। লেট হানিমুন।'

'আমার সমস্ত সহানুভূতি তোমার জন্যে। কিন্তু আমার উপদেশ শোন। আমি যে ব্যবস্থা নিচ্ছি, তা আমাকে নিতে দাও। বিশ্বাস কর আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আমি যত ঠাণ্ডা মাথায় একটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারি কোনো রাষ্ট্রপ্রধানও তা পারেন না। এ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে। তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যাও, তাকে ভর্তি করিয়ে ফিরে এস।'

জহির চুপ করে রইল। ম্যানেজার হাসিমুখে বলল, 'কী আমার কথায় আপসেট হচ্ছ নাকি? আমার পরামর্শ কিন্তু চমৎকার। স্ত্রীকে হাসপাতালে দিয়ে ফিরে এসে একটা হট শাওয়ার নাও, এবং দু'টি বিয়ার খাও।'

জহিরের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। শাহানা প্রায় অচেতন। জ্বর এক শ তিন পয়েন্ট পাঁচ। জহির শুকনো গলায় বলল, 'খুব বেশি খারাপ লাগছে?'

শাহানা কাতর গলায় বলল, 'খুব খারাপ লাগছে।'

নেপালের হাসপাতালটির অবস্থা খুবই মলিন। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। ফিনাইলের গন্ধের বদলে কেমন একটা টক গন্ধ। একটা ডেডবডি পড়ে আছে বারান্দায়। কেউ তার মুখ ঢেকে দেবার প্রয়োজনও বোধ করে নি। নীল রঙে ডুমো ডুমো মাছি মৃত মানুষটির উপর ভনভন করে উড়ছে। জহিরের অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। ডাক্তার ভদ্রলোক হেসে ইংরেজিতে বললেন, 'অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে।'

'তা, কিছু ঘাবড়ে গেছি তো বটেই।'

'বাংলাদেশের হাসপাতাগুলি কি এর চেয়ে ভালো?'

'হ্যাঁ, ভালো। অনেক ভালো।'

'আমি যখন ছিলাম, তখন কিন্তু ভালো ছিল না।'

'আপনি বাংলাদেশে ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছি। আমাদের দেশে মেডিকেল কলেজ নেই। ডাক্তারি পড়তে হলে আমাদের বাইরে যেতে হয়।'

রোগী ভর্তির ব্যাপারটি অতি দ্রুত শেষ হল। শাহানাকে নিয়ে যাওয়া হল কেবিনে। জহির বলল, 'আমি কি ঐ কেবিনে রাতটা কাটাতে পারি?'

'না, পারেন না।'

'হাসপাতালে কোথাও অপেক্ষা করতে পারি?'

'তা নিশ্চয়ই পারেন। আমার এই ঘরেই বসতে পারেন। তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? আপনার কষ্ট হবে। প্রচণ্ড মশা।'

'না, আমার কষ্ট হবে না।'

'আপনার রাতের খাওয়া কি হয়েছে?'

'না, হয় নি।'

'আমি কিছুক্ষণ পর পাশের একটি হোটেলে খেতে যাব। পাশেই একটা

ভালো হোটেল আছে। ইচ্ছে করলে আপনি আসতে পারেন।'

জহির বলল, 'তার আগে জানতে চাই, আমার স্ত্রীর চিকিৎসা কি শুরু হয়েছে?'

'এখনও শুরু হয় নি, হবে। থ্রোট কালচার করা হচ্ছে। হানিমুনে এসেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আপনার মনে ভয় ঢুকে গেছে যে, হয়তো-বা আপনাকে একা ফিরতে হবে। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ভয় পাবেন না, খুবই সামান্য ব্যাপার।'

ডাক্তার ডান হাতে জহিরের কাঁধ স্পর্শ করলেন। জহিরের মনে যে ভয়-ভয় ভাব ছিল তা পুরোপুরি কেটে গেল। সে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিল—সারারাত এখানে বসে মশার কামড় খাওয়ার কোনো মানে হয় না। হোটেলে ফিরে একটা শাওয়ার নেওয়া যেতে পারে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি যাওয়া হল না। জহির রাতটা হাসপাতালেই কাটিয়ে দিল। চায়ের একটি হোটেলের খোঁজ ডাক্তার সাহেবই করে দিলেন। প্রচুর দুধ ও গরম মশলা দেয়া অদ্ভুত ধরনের চা। ঝাঁজাল খানিকটা তেতো ধরনের স্বাদ। খেতে ভালোই লাগে।

শাহানাকে দেখতে গেল সকাল ন' টায়। জ্বর কমে গেছে। তবে এক রাতেই কেমন রোগা লাগছে শাহানাকে। গালের হাড় বেরিয়ে গেছে। চোখের নিচে কালি। জহির বলল, 'কী অবস্থা?'

শাহানা হাসল।

'এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

'লাগছে।'

'একটু ভালো, না অনেক ভালো?'

'অনেক ভালো।'

'তাহলে একটু হাস, আমি দেখি।'

শাহানা হাসল। জহির পাশেই চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'আমি সারা রাত হাসপাতালেই ছিলাম।'

'জানি।'

'কীভাবে জানলে? কেউ বলেছে?'

'না, কেউ বলে নি। আমার মনে হয়েছে।'

'এখন আমি চলে যাব, আবার বিকেলে আসব।'

'আচ্ছা।'

'তোমার জন্যে কিছু ভিউকার্ড নিয়ে এসেছি। শরীরটা যদি ভালো লাগে, তাহলে কার্ডগুলিতে নাম-ঠিকানা লিখে রেখ, বিকেলে আমি পোস্ট করে

দেব।'

'আচ্ছা।'

'অসুখের কথা কিছু লেখার দরকার নেই। সবাই চিন্তা করবে। অবশ্যি অসুখ তেমন কিছু হয়ওও নি। থ্রোট ইনফেকশন। ডাক্তার সাহেব বললেন, পরশুর মধ্যে রিলিজ করে দিতে পারবেন। পরশু পর্যন্ত একটু কষ্ট কর।'

'আমার কষ্ট হচ্ছে না।'

'তোমার এখান থেকে হিমালয় দেখা যায়। উঠে বসে জানালা দিয়ে তাকাও। হিমালয় দেখবে।'

'আমার হিমালয় দেখতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা না করলেও দেখ। এস, তোমাকে হাত ধরে দাঁড় করাই—ঐ যে চূড়াটা দেখছ না, ওর নাম অন্নপূর্ণা। সুন্দর না?'

'হ্যাঁ, সুন্দর।'

'তুমি সুস্থ হয়ে উঠলেই তোমাকে পোখ্‌রা বলে একটা জায়গায় নিয়ে যাব। আমার মতে পোখ্‌রা হচ্ছে পৃথিবীর সবচে সুন্দর জায়গা।'

শাহানা হাই তুলল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল।

'তোমার ঘুম পাচ্ছে শাহানা?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছে।'

'তাহলে ঘুমাও। ইন্টারেস্টিং একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল। তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ঢাকায় গিয়ে গল্প করতে পারবে। তুমি ঘুমাও, আমি পাশে বসে আছি।'

'তোমাকে বসতে হবে না, তুমিও বিশ্রাম কর। রাত জেগে যা বিশ্রী দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'খুব বিশ্রী?'

'হ্যাঁ, খুব বিশ্রী।'

শাহানা মিষ্টি করে হাসল। হাসপাতালের ধবধবে সাদা বেডে কী সুন্দর লাগছে তাকে। মুখের উপর তেরছা করে রোদের আলো এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে এটি স্বপ্নে দেখা একটি ছবি। বন্দী রাজকন্যা শুয়ে আছে। এক্ষুণি জেগে উঠবে।

সমস্তটা দিন জহির ঘুমিয়ে কাটাল। দুপুরে উঠে দু'টি স্যাণ্ডউইচ মুখে দিয়ে আবার ঘুম। সেই ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। তার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। বেচারি শাহানা। অপেক্ষা করে আছে নিশ্চয়ই। খুবই অন্যায় হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ঘুমিয়ে পড়াটা উচিত হয় নি। সন্ধ্যার পর এরা ফিমেল ওয়ার্ডে পুরুষদের যেতে দেয় না। নিয়মটি হয়ত বিদেশিদের জন্যে। কারণ কাল বেশ কিছু পুরুষদের সে ঢুকতে দেখেছে। এরা সবাই যে হাসপাতালের কর্মচারী, তাও মনে হয় নি।

গতকালের ডাক্তার ভদ্রলোককে পাওয়া গেলে একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু কাল সেই ভদ্রলোকের নাম জানা হয় নি। আজ হয়তো তার ডিউটি নেই। পরপর দু' রাত নাইট ডিউটি না-থাকারই কথা। আজ হয়তো আছে বদমেজাজী কোন ডাক্তার, যে কোনো কথাই বলবে না।

আগের ডাক্তারকেই পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি রুগিণীর কাছে যাবার কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। কয়েক দিন আগে ফিমেল ওয়ার্ড নিয়ে লেখা নানান কেচ্ছা-কাহিনী কোনো এক কাগজে ছাপা হয়েছে, তারপর থেকে এই কড়াকড়ি। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনি বসুন, আমি খবর এনে দিচ্ছি। তবে আপনার স্ত্রী বেশ সুস্থ, এইটুকু বলতে পারি। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনি বসুন। আমি আসছি।'

ভদ্রলোক মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এলেন। হাসিমুখে বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় আপনার স্ত্রীকে রিলিজ করে দেওয়া যেতে পারে। জ্বর রেমিশন হয়েছে।'

'থ্যাংকইউ।'

'এই ভিউকার্ডগুলি তিনি দিলেন। আপনাকে পোস্ট করতে বলেছেন।'

চারটা ভিউকার্ড। প্রতিটিতেই কয়েক লাইনের চিঠি। নীলুর জন্যে একটি, শারমিনের জন্যে একটি। বাবা ও মা'র জন্যে একটি এবং চতুর্থটি আনিসের জন্যে। জহির বিস্মিত হয়ে আনিসের ভিউকার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে গোটা গোটা হরফে লেখা-"আনিস ভাই, আমার খুব অসুখ করেছে।"

৩২

লম্বা একটা মানুষ বসার ঘরে।

কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে। গায়ে হলুদ রঙের চাদর। কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। লোকটা বসে আছে মূর্তির মতো। যেন সে আসলেই একটা মূর্তি, মানুষ নয়।

টুনি অনেকক্ষণ ধরেই লোকটিকে দেখছে। এক বার তার চোখের উপর চোখ পড়ল। তবু লোকটা নড়ল না। টুনি সাহসে ভর করে বলল, 'আপনি কে?'

লোকটি হেসে ফেলল। হাত ইশারা করে কাছে ডাকল। টুনি পর্দার আড়াল থেকে বেরুল না। তার কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। লোকটি বলল, 'তোমার নাম টুনি?'

'হ্যাঁ। আপনার নাম কী?'

'আমার নাম সোভাহান। তোমাদের বাসায় বাবলু থাকে?'

'হ্যাঁ, থাকে।'
'তাকে ডেকে আনতে পারবে?'
'না, পারব না। বাবলু ছাদে। আমি ছাদে যাই না।'
'যাও না কেন? ছাদে কি ভূত আছে?'
'আছে। দিনের বেলা থাকে না। রাতে আসে।'
'তাই নাকি?'
'হুঁ। রাতের বেলা এরা ছাদে লাফালাফি করে।'
'তুমি শুনেছ?'
'হুঁ।'

ভেতর থেকে নীলু বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলিস রে?' টুনি বলল, 'সোভাহানের সঙ্গে।' এই কথায় লোকটি শব্দ করে হেসে উঠল। নীলু পর্দার ফাঁক দিয়ে বসার ঘরের দিকে তাকাল। তার চোখেমুখে বিস্ময়। সে কঠিন গলায় বলল, 'আপনি কী মনে করে?'

'তোমাদের দেখতে এলাম। ভালো আছ নীলু?'
'আমাদের দেখতে এসেছেন?'
'হ্যাঁ।'
'দুলাভাই, আপনার অসীম দয়া। আমরা ধন্য হলাম।'
'কেন ঠাট্টা করছ নীলু?'
'ঠাট্টা? ঠাট্টা করব কেন? আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করবার মতো সাহস কি আমার আছে? আপনি হচ্ছেন মহাপুরুষ ব্যক্তি। সাধারণ প্রেম-ভালোবাসা আপনাকে আকর্ষণ করে না। আপনার ছেলে কোথায় আছে, কী করছে, তা জানারও আপনার আগ্রহ নেই। আপনার মতো মহাপুরুষকে ঠাট্টা করব?'
'বস নীলু। বস আমার সামনে।'

নীলু বসল না। তার রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। সোভাহান বলল, 'একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে মনে হয় হাঁপিয়ে গেছ।'

'চা খাবেন?'
'যদি দাও, তাহলে খাব।'

নীলু রান্নাঘরে আসতে আসতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই লোকটির সঙ্গে রাগারাগি করা অর্থহীন। রান্নাঘরের সামনে রফিক দাঁড়িয়ে আছে। সে কৌতূহলী গলায় বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলে ভাবী?'

'কারো সঙ্গে না।'
'স্বাগত ভাষণ? কিন্তু আমি যেন পুরুষের গলা শুনলাম।'
'আমার বড়ো দুলাভাই।'
'বাবলু সাহেবের গ্রেট ফাদার?'
'হ্যাঁ।'
'আমি কি ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারি? মনে হচ্ছে ইন্টরেস্টিং

ক্যারেকটার।'

'এটা আবার কী ধরনের কথা রফিক? তোমার কথা বলতে ইচ্ছে করলে তুমি কথা বলবে।'

'মেজাজ মনে হচ্ছে নট-গুড।'

নীলু রান্নাঘরে ঢুকল। শুধু চা দিতে ইচ্ছে করছে না, অথচ ঘরে কিচ্ছু নেই। বিসকিটের টিনে আধ খানা বিসকিট, সেখানে পিঁপড়া ধরেছে। অথচ দুলাভাইকে শুধু চা দিতে ইচ্ছে করছে না। নীলু আনিসের খোঁজে দোতলায় গেল। আনিস নেই। বাবলু ছাদে একা একা কী যেন করছে। হাত-পা নাড়ছে। নিজের মনে বিড়বিড় করছে।

'বাবলু!'

'কী?'

'কত বার বলেছি, জ্বি বলবে। একটা জিনিস ক' বার বলতে হয়? যাও, নিচে যাও। তোমার আব্বা এসেছে। এক্ষুণি নিচে যাও। এই শার্টটা বদলে একটা ভালো শার্ট পরে যাও।'

একটা মানুষ নেই, যাকে পাঠিয়ে দোকান থেকে কিছু আনাবে। এত দিন পর এসেছে মানুষটা, শুধু চা খাবে? নিজে গিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়? শফিক বাসায় নেই, নয়তো শফিককে বলা যেত। দুলাভাইয়ের সঙ্গে একটু আগেই খুব কড়া-কড়া কথা সে বলেছে। মনটা এই জন্যেই বেশি খারাপ লাগছে। এই দুঃখী মানুষটিকে সে খুব পছন্দ করে।

বসার ঘরে রফিক খুব জমিয়ে গল্প করছে। সোভাহান কিছু বলছে না। তবে তার মুখও হাসি-হাসি। রফিক বলল—

'তারপর ভাই, কিছু মনে করবেন না, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি—আপনি করেন কী?'

'কিছুই করি না।'

'বলেন কী। কিছু না-করলে আপনার চলে কী করে? আপনি কি সন্ন্যাসী? অবশ্যি সন্ন্যাসীরাও তো কিছু একটা করেন। ভিক্ষা করেন।'

'আমি মানুষের হাত দেখে ভাগ্য বলি।'

'ভাগ্য বলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি একজন পামিস্ট?'

'জ্বি।'

'বিশ্বাস করেন এসব?"

'জ্বি-না। বিশ্বাস না করেও তো আমরা অনেক কিছু করি।'

'উদাহরণ দিন।'

'দেশের কিছু হবে না, এই জেনেও আমরা দেশের জন্যে জীবন দিয়ে

দিই। দিই না?'

'গুড। আপনি তো ভাই ফিলসফার কিসিমের মানুষ। নিন, আমার হাত দেখে নিন।'

'আজ থাক। আরেক দিন দেখব।'

'অসম্ভব, আজই দেখতে হবে। হাত দেখে শুধু বলুন—টাকাপয়সা হবে কিনা। আর কিছু জানতে চাই না। সুখ-টুখ কিচ্ছু আমার দরকার নেই, টাকা থাকলেই হল।'

সোভাহান রফিকের হাতের দিকে তাকাল। মৃদুস্বরে বলল, 'বুধের ক্ষেত্র প্রবল। চন্দ্র শুভ। মঙ্গলে আছে ত্রিভুজ চিহ্ন। আপনি অত্যন্ত ধনবান হবেন। তবে তা নিজের চেষ্টায় হবে না। হৃদয়রেখা থেকে একটি রেখা ভাগ্যরেখাকে স্পর্শ করেছে। কাজেই আপনি ধনবান হবেন স্ত্রীভাগ্যে।'

'বেইজ্জতি কথা বলছেন ভাই। স্ত্রীভাগ্যে ধন?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'একটু আগে বললেন আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন না, কিন্তু এখন এত জোরের সঙ্গে কথা বলছেন কেন?'

'জোর দিয়ে বলারই নিয়ম। যে হাত দেখাতে আসে, সে এতে মনে করে এই লোক বড়ো জ্যোতিষী।'

'তার মানে এটা হচ্ছে আপনার একটা ব্যবসায়িক চাল?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তাহলে আমি কি ধরে নিতে পারি যে নিজের ভাগ্যেও আমি বড়োলোক হতে পারব?'

'না, পারবেন না। আপনার যা হবার তা হবে স্ত্রীভাগ্যে।'

'আরে, আপনাকে নিয়ে তো মহা মুশকিল!'

'হাতে যেমন দেখছি তেমনি বলছি।'

'এক মিনিট দাঁড়ান, আমার স্ত্রীর হাতটা দেখে দিন। পালিয়ে যাবেন না যেন।'

'রফিক সাহেব, আজ থাক।'

'অসম্ভব। আজই দেখবেন। এক্ষুণি নিয়ে আসছি। যাব আর আসব। এক মিনিট।'

শারমিন ভেতরের বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে। গতকাল সকালে সে একটি চিঠি পেয়েছে। আমেরিকা থেকে পাঠিয়েছে সাব্বির। চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে নতুন জীবন কেমন লাগছে তাই জানতে চাওয়া এবং সে যে সুইডেনে একটি চাকরি পেয়েছে, এই খবর জানানো। চিঠি পাওয়ার পর থেকে শারমিন অস্বাভাবিক গম্ভীর। রাতে রফিকের সঙ্গে একটি কথাও বলে নি। রফিক এক বার হাত ধরতেই ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে, 'হাত ধরবে না।'

রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, 'হাত ধরব না কেন? এই হাত কি আমেরিকায় বন্ধক?'

কী কুৎসিত কথা! এর জবাব দিতে ইচ্ছা করে নি। আজ বারান্দায় একা-একা বসে তার রীতিমতো কান্না পাচ্ছে। কাঁদতে পারলে মন হালকা হত, কিন্তু বাড়িটা এত ছোট যে কাঁদবার জন্যে গোপন জায়গাও নেই।

'এই যে শারমিন, এখানে বসে আছ? আস আমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাব?'

'এক গ্রেট পামিস্ট এসেছে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব ফড়ফড় করে বলে দেয়। তাকে হাত দেখাবে।'

'আমাকে বিরক্ত করবে না, একা থাকতে দাও।'

'সে কী! তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জানতে চাও না?

'না।'

'জানতে চাও না যে, স্বামীর সঙ্গে জীবন কেমন কাটবে?'

'কেমন কাটবে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তার জন্যে জ্যোতিষীকে হাত দেখাতে হবে না।'

'তোমার হয়েছে কী বল তো?'

'কিছুই হয় নি।'

'এটা তো সত্যি বললে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমেরিকার চিঠি আসার পর থেকেই মেজাজ ফোর্টিনাইন।'

শারমিন কড়া গলায় বলল, 'কী হয়েছে সত্যি জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'তাহলে এস আমার সঙ্গে, ঘরে এস। এখানে বলব না।'

'কী এমন কথা যে মন্দিরের ভেতর গিয়ে বলতে হবে। চল যাই।'

শারমিন দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'বস এখানে।'

রফিক বসল। তার বেশ মজা লাগছে। শারমিনের প্রচণ্ড রাগের কারণটা ধরতে পারছে না। রাগে শারমিনের মুখ লাল হয়ে আছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে।

'তুমি আমেরিকার চিঠিটা গতকাল আমাকে দিয়েছ।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তার আগে খাম খুলে তুমি চিঠি পড়েছ।'

'মুখবন্ধ খামই তোমাকে দিয়েছি।'

'তা দিয়েছ। কিন্তু খাম খুলে চিঠি পড়ে তারপর আবার মুখ বন্ধ করেছ।'

'এ-রকম সন্দেহ হবার কারণ?'

'কারণ খামের মুখ ভাত দিয়ে বন্ধ করা ছিল। আমেরিকা থেকে কেউ ভাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে খাম পাঠায় না।'

রফিক চুপ করে রইল। কথা সত্যি। শারমিন বলল, 'আমার চিঠি তুমি

কেন পড়লে?'

'হাসবেও তার স্ত্রীর চিঠি পড়তে পারবে না?'

'নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু চুরি করে না।'

'আমার ভুল হয়েছে, এ–রকম আর হবে না।'

শারমিন ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। শোকের এমন তীব্র প্রকাশ রফিক আগে দেখে নি। তার লজ্জার সীমা রইল না। সে নরম স্বরে বলল, 'শোন শারমিন, এই যে, তাকাও আমার দিকে।'

'প্লিজ, আমার সঙ্গে কথা বলবে না।'

'কথা না–বলে আমি থাকতে পারি না।'

শারমিন জবাব না দিয়ে উঠে চলে গেল।

বাবলুকে কোথাও পাওয়া গেল না। ছাদে ছিল, এখন নেই। আশেপাশে কোনো বাড়িতেও নেই। টুনি খুঁজে এসেছে।

সোভাহান বলল, 'থাক, বাদ দাও। আরেক দিন নাহয় আসব।'

নীলু বলল, 'ঢাকাতেই থাকেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নাহয় ছেলের জন্যেই আরেক বার কষ্ট করে আসুন। দেখে যান সে কেমন আছে।' ?

'সে ভালোই আছে। ওকে নিয়ে আমি ভাবি না।'

'কাউকে নিয়েই ভাবেন না। এটা কোনো গুণ না দুলাভাই।'

সোভাহান তার ঝুলির ভিতরে হাত দিয়ে প্লাস্টিকের সস্তা ধরনের একটা খেলনা বের এগিয়ে দিল টুনির দিকে। নীলু বলল, 'টুনিকে দিতে হবে না দুলাভাই। বাবলুর জন্যে এনেছেন, রেখে দিন, বাবলুকেই দেবেন।'

সোভাহান হেসে ফেলল। হাসতে–হাসতেই বলল, 'এইখানে তুমি একটা ভুল করলে নীলু। এটা আমি টুনির জন্যেই এনেছি। দেখ, এটা একটা পুতুল। মেয়েরাই পুতুল খেলে। বাবলুর জন্যে আমি একটা পিস্তল এনেছি। নাও, এটা ওকে দিও।'

নীলু বেশ লজ্জা পেল। সোভাহান হাসছে। নীলুর এই লজ্জা সে যেন উপভোগ করছে।

'যাই, নীলু।'

'আমার কথায় কিছু মনে করবেন না, দুলাভাই।'

'যাদের আমি পছন্দ করি, তাদের খুব কড়া কথাও আমার ভালো লাগে।'

সোভাহান রাস্তায় নেমে গেল। নীলু অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তার খুব খারাপ লাগছে। শুধু–শুধু এতগুলি কঠিন কথা বলা হল। সে কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না। ভেতর থেকে মনোয়ারা ডাকছেন,

'বৌমা, ও বৌমা।'

কোন বৌকে ডাকছেন কে জানে। দুই ছেলের বৌকেই তিনি বৌমা ডাকেন—বড়ো বৌমা বা ছোট বৌমা নয়। কিন্তু এক জনের জায়গায় অন্য জন এলে রেগে আগুন হন। বিরক্ত গলায় বলেন–'তোমাকে তো ডাকি নি বৌমা। তুমি এসেছ কেন?'

এখন তিনি কাকে ডাকছেন কে জানে! নীলু ক্লান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকল। মনোয়ারা বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর মুখ থমথম করছে।

'আমাকে ডেকেছেন মা?'

'হ্যাঁ। কে এসেছিল?'

'আমার বড়ো দুলাভাই, বাবলুর বাবা।'

'আমাকে ডাকলে না কেন? আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে না যে! নাকি আমাকে তোমরা মানুষ বলে মনে কর না।'

'আপনি শুয়ে ছিলেন, তাই।'

'শুয়ে ছিলাম--মরে তো যাই নি? নাকি তোমার ধারণা মরে গিয়েছি?'

'ছিঃ মা, কী বলছেন এসব!'

'আত্মীয়স্বজন এলে দেখাসাক্ষাতের একটা ব্যাপার আছে!'

'তা তো আছেই।'

'ঠিক আছে মা, তুমি যাও। বেশি দিন বেঁচে থাকার এইটাই সমস্যা। কেউ মানুষ মনে করে না। মনে করে ঘরের আসবাবপত্র। ছিঃ ছিঃ। ছিঃ ছিঃ। দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও।'

মনোয়ারা রাগ করে রাতের বেলা ভাত খেলেন না।

৩৩

রফিকের আজ হঠাৎ করে তিন শ' টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। বায়োডাটা দিয়ে চাকরির দরখাস্ত করবে জাপানের এক ফার্মে। দরখাস্তের সঙ্গে ওদের দশ ডলার পাঠাতে হবে। দশ ডলার কেনার জন্যেই টাকাটা দরকার। ব্যাপারটা হয়তো পুরোপুরি ভাঁওতা। তবে কোম্পানিটা বিদেশি। বিদেশিরা এতটা চামার নাও হতে পারে। হয়তো সত্যি–সত্যি কিছু হবে।

মুশকিল হচ্ছে তিন শ' টাকার জোগাড় এখনো হয় নি। নীলুর কাছে চেয়েছিল। নীলু দিতে পারে নি। পঞ্চাশ টাকার একটি নোট বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে, 'বেতন পেলে বাকিটা নিও। টাকা আমার কাছে কিছু ছিল, বাবা নিয়ে নিয়েছেন।' রফিক বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'বাবার আবার টাকার দরকার কী?'

'তোমার দরকার থাকলে তাঁরও থাকতে পারে।'

'তাঁর তো পেনশনই আছে।'

'পেনশনের টাকার সবটা তো মাকে দিয়ে দিতে হয়।'

রফিক রীতিমত চিন্তায় পড়ে গেল। শারমিনের কাছে হয়তো কিছু টাকা আছে, কিন্তু এখন চাওয়া যাবে না। কথাবার্তা পুরোপুরি বন্ধ। সামান্য এক চিঠি নিয়ে এই কাণ্ড। কত দিন এরকম চলবে কে জানে। রফিকের মাঝে-মাঝে মনে হয়, এ রকম আবেগপ্রবণ একটি মেয়েকে বিয়ে করে সে বোধহয় ভুল করেছে। তার জন্য দরকার ছিল হাসিখুশি ধরনের একটি মেয়ে, যে খুব রাগ করবে, আবার পরমুহূর্তেই সব কিছু ভুলে হেসে ফেলবে। রাত একটার সময় ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজতে যার কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু শারমিন মোটেই সে-রকম নয়।

রফিক শেষ পর্যন্ত ঠিক করল শফিকের অফিসেই যাবে। ভাইয়ার অফিসে গিয়ে টাকা চাওয়ার একটা সুবিধা আছে। ভাইয়া কখনো না বলবে না। সঙ্গে টাকা না থাকলে বলবে—ঘন্টাখানিক পরে আয়। এই এক ঘন্টায় কোনো-না কোনোভাবে সে ম্যানেজ করবেই।

রফিকের জন্যে বড়ো রকমের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। শফিক অফিসে নেই। যে-ঘরটায় বসত, সেখানে অপরিচিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, 'কাকে চাই?'

'শফিক সাহেবকে, এখানে বসতেন।'

'তাঁর সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

'উনি আমার বড়োভাই।'

'ও আচ্ছা, আসুন, আসুন, বসুন এখানে।'

ভদ্রলোক অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সরু গলায় বললেন, 'আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ নেই?'

'যোগযোগ থাকবে না কেন? আমরা তো একসঙ্গেই থাকি।'

'ও আচ্ছা।'

ভদ্রলোক খুবই অবাক হলেন। তারপর যা বললেন, তা শুনে রফিকের মাথা ঘুরতে লাগল। কী সর্বনাশের কথা। শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না।

'ভাইয়াকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে?'

'জ্বি।'

'তিনি অফিসে আসেন না?'

'জ্বি-না। আপনারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না?'

'জ্বি-না। এই প্রথম জানলাম। ভাইয়া খুব চাপা স্বভাবের মানুষ।'

'আমার বোধহয় এটা আপনাকে বলা ঠিক হল না। অফিসের আমরা সবাই ব্যাপারটায় খুব আপসেট।'

'ওঁর বিরুদ্ধে অভিয়োগটা কী?'

'বেশ কিছু অভিযোগ আছে।'

'আমার বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে। কোনো রকম অন্যায় করার

ক্ষমতাই ভাইয়ার নেই। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে।

'তা তো হচ্ছেই। অভিযুক্ত হবার জন্যে সব সময় কিন্তু অন্যায় করতে হয় না। নিন, সিগারেট নিন। চা খাবেন?'

'জ্বি–না। চা–সিগারেট কিছুই খাব না। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি খাওয়াতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই পারি।'

ভদ্রলোক কোল্ড ড্রিংক আনালেন। রফিক দীর্ঘ সময় ভদ্রলোকের সামনে বসে রইল। উঠে যাবার মতো শক্তিও তার নেই। এই বিশাল সমস্যার কি সমাধান হবে?

সে সেখান থেকে সরাসরি নীলুর অফিসে চলে গেল। নীলু কী একটা ফাইল নিয়ে খুব ব্যস্ত। চোখে চশমা। এই চশমা সে বাসায় পরে না। অফিসে এলে চোখে দেয়, তখন তাকে একবারেই অন্য রকম লাগে। নীলু হাসিমুখে বলল, 'কী খবর রফিক?'

'কোনো খবর নেই ভাবী। আমি যখনই আসি, তখনই দেখি তুমি কী ব্যস্ত। একটা দিন দেখলাম না তুমি কলিগদের নিয়ে জমিয়ে গল্প করছ।'

'কী করব, তুমি বেছে–বেছে কাজের দিনগুলোতেই শুধু আস। আজ কী ব্যাপার?'

'তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে ভাবী। চল, তোমাদের ক্যান্টিনে যাই।'

'এখানে বলা যাবে না?'

'না।'

ক্যান্টিন পুরো ফাঁকা। চা পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চ আওয়ার শুরু হবে। এখানে লাঞ্চ আওয়ারে চা হয় না। নীলু বলল, 'কী বলবে তাড়াতাড়ি বল। জরুরি কথার নাম দিয়ে তুমি যা বল, সেটা কখনো জরুরি হয় না।'

'এবারেরটা হবে।'

'বল, শুধু–শুধু দেরি করবে না।'

'তার আগে একটা হাসির গল্প শুনে নাও, ভাবী। এতে খারাপ খবর সহ্য করা সহজ হবে। গল্প হচ্ছে—এক লোক এক্সিডেন্ট করেছে। গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেছে। ট্রাফিক সার্জন বলল, তুমি গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেলে, ব্যাপারটা কি···'

নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কী বলতে এসেছ বলে চলে যাও।'

'ভাইয়াকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এক সপ্তাহ আগে। তদন্ত কমিটি বসেছে, তদন্ত হচ্ছে। গত এক সপ্তাহ ভাইয়া অফিসে যায় নি। ঘর থেকে বের হয়ে পার্কে–টার্কে কোথাও বসে সময় কাটাচ্ছে হয়তো।'

নীলু হতভম্ব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না।

'যা বলছ, ঠিক বলছ?'

'সব জিনিস নিয়ে কি ভাবী রসিকতা করা যায়?'

'এত বড়ো একটা ঘটনা, সে আমাকে বলবে না?'

'কী করবে বল, স্বভাব।'

'স্বভাব-টভাব কিছু না, এত দিন হয়েছে আমাদের বিয়ের, এখনও সে আমাকে দূরে-দূরেই রেখেছে। কেন, আমি কি এতই তুচ্ছ, এতই ফেলনা?'

নীলু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ক্যান্টিনের বয়গুলি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী শুরু করলে এসব। তোমাদের এই জিনিসটা দু'চোখে দেখতে পারি না। এটার মধ্যে কেঁদে ফেলবার কী আছে?'

নীলু চোখ মুছে বলল, 'না , কাঁদবার তো কিছুই নেই। খুব আনন্দের সংবাদ। মনিপুরী নাচ শুরু করলে তুমি বোধহয় খুশি হও।'

রফিক হেসে ফেলল। লাঞ্চের আগেই নীলু ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এল। শফিক নেই। হোসেন সাহেব মনোয়ারাকে নিয়ে খিলগাঁয়ে গিয়েছেন। টুনি, বাবলু স্কুল থেকে ফেরে নি। বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। বিকেল পর্যন্ত নীলু বিছানায় শুয়ে রইল। মাঝখানে শারমিন এক বার এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি শরীর খারাপ ভাবী?'

নীলু সে-কথার জবাব দিল না। তার আজ কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না। শারমিন আবার বলল, 'কী হয়েছে ভাবী?' নীলু তিক্ত গলায় বলল, 'প্লীজ, আমাকে বিরক্ত করবে না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

'ও সরি। তোমার কার্ডটা নাও।'

'কিসের কার্ড?'

'শাহানা পাঠিয়েছে। ভিউকার্ড।'

'টেবিলে উপর রেখে দাও।'

শারমিন চলে যেতে গিয়ে আরেক বার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কী হয়েছে, বল। এস, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।'

'ডাক্তারের কাছে নেওয়ার মতো কিছু হয় নি।'

এ বাড়িতে শরীর খারাপ অজুহাতে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকার কোনো উপায় নেই। হোসেন সাহেব তাঁর হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে এসে পড়লেন।

'মা দেখি, উঠে বস তো।'

'আমার তেমন কিছু হয় নি, বাবা। মনটা শুধু খারাপ।'

হোসেন সাহেব বিজ্ঞের হাসি হাসলেন।

'মনখারাপও একটা অসুখ। সব অসুখের মূলে হচ্ছে এই অসুখ। ইংরেজিতে একে বলে মেলাংকলি। মনখারাপ সারাতে পারলে সব অসুখই সারান যায়। মাথাব্যথা আছে?'

'আছে অল্প।'

'চাপা ব্যথা, নাকি সুঁচের মতো ব্যথা?'

'চাপা ব্যথা।'

'দেখি মা, জিব দেখি। হুঁ, হজমেরও অসুবিধা হচ্ছে। হাতের তালু কি খুব ঘামে?'

'একটু একটু ঘামে।'

'যা ভেবেছি তাই। তোমার কি মৃত্যুচিন্তা হয়? চট করে উত্তর দিও না, ভালো করে ভেবে বল।'

এত দুঃখেও নীলু হেসে ফেলল। হোসেন সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'লক্ষণ বিচারটাই হচ্ছে আসল। ঠিকমতো লক্ষণবিচার করে একটা ডোজ দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। এই যে দেখ তোমার শাশুড়ির মেজাজ। এরও ওষুধ আছে। তিনটা ডোজ দিতে পারলে মেজাজ কনট্রোল হয়ে যাবে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে।'

'দিচ্ছেন না কেন তিনটা ডোজ?'

'দিলেই কি সে খাবে? তাকে চেন না তুমি? সকাল থেকে হৈচৈ করছে। দুপুরেও কিছু খায় নি।'

'কেন?'

'জানি না কেন। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ তো মা। আমি এই ফাঁকে তোমার অসুখটা নিয়ে একটু ভাবি। এটা তো আর এ্যালোপ্যাথি না যে চোখ বন্ধ করে ব্রড স্পেকট্রাম এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেব। লক্ষণ বিচার করতেই দুই-তিন ঘন্টা লাগবে। বইপত্র দেখতে হবে। বড়ো কঠিন জিনিস মা হোমিওপ্যাথি। বড়ো কঠিন।'

মনোয়ারার আজকের রাগের কারণ হচ্ছে—শাহানা সবাইকে কার্ড পাঠিয়েছে, তাঁকে পাঠায় নি। নিজের পেটের মেয়ে এই কাণ্ড কী করে করল? তিনি কি তাকে অন্যদের চেয়ে কম ভালোবাসেন? সবাই তাঁকে অপছন্দ করে কেন? অপছন্দ করার মতো কী আছে তাঁর মধ্যে?

নীলু দরজার কাছে এসে বলল, 'মা আসব?'

'আসতে ইচ্ছে হলে আস।'

'আপনি নাকি দুপুরে কিছু খান নি?'

'তাতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়েছে? আমি খেলেই কী না-খেলেই কী?'

'খাবার গরম করে টেবিলে দিয়েছি মা।'

'খামোকা আগ বাড়িয়ে কাজ করতে যাও কেন? কে তোমাকে টেবিলে খাবার দিতে বলেছে?'

নীলু বেশ কড়া করে বলল, 'আপনি মা শুধু-শুধু অশান্তি করেন, সবাইকে বিরক্ত করেন।'

মনোয়ারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এই মেয়ে তাঁর মুখের উপর এসব কী বলছে! এত সাহস এই মেয়ে পেল কোথায়? তিনি রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, 'নীলু, এই ঘর থেকে বের হয়ে যাও।'

এই প্রথম তিনি বৌমা না বলে নীলু বললেন। তাঁর মনে হল তাঁর চারপাশের ঘরবাড়ি থরথর করে কাঁপছে। চোখে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। নীলু ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলল। হোসেন সাহেব ডাক্তার আনতে ছুটলেন। ডাক্তার বলল, 'প্রেশার খুবই হাই। এক বার সোহরাওয়ার্দিতে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি করিয়ে নিল। এতগুলি ঘটনা ঘটল খুব দ্রুত। নীলু বলল, 'বাবা, রাতে আমি থাকব হাসপাতালে, আপনি শারমিনকে নিয়ে চলে যান। ডাক্তার তো বলেছেন ভয়ের কিছু নেই।'

হোসেন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, 'এত বড়ো একটা ঝামেলা, রফিক-শফিকের কোনো খোঁজ নেই। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে মা।'

'ওরা বোধহয় এতক্ষণ এসে পড়েছে। ওদের গিয়ে খবর দিন।'

'যাচ্ছি। তোমার একা-একা খারাপ লাগবে না তো?'

'একা কোথায়? মা আছেন। তাছাড়া হাসপাতাল-ভর্তি রোগী।'

'রাতে তুমি ঘুমুবে কোথায়?'

'এক রাত না ঘুমুলে কিছু হবে না। বাবা, আপনারা একটা বেবি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যান।'

মনোয়ারা বেশ খুশি। তাঁকে নিয়ে যে এত বড়ো একটা হৈচৈ হচ্ছে, এই আনন্দে তিনি উৎফুল্ল। নীলুকে ডেকে এক বার বললেন, 'আত্মীয়স্বজন সবাইকে তো খবরটা দেওয়া দরকার। কখন কী হয়! হার্টের ব্যাপার।'

'হার্টের আপনার কিছু হয় নি, মা। খুব প্রেশার ছিল, তাতেই—'

'তুমি কি ডাক্তারদের চেয়ে বেশি জান? যা করতে বলেছি কর। সবাইকে খবর দাও। ঢাকার বাইরে যারা, তাদের চিঠি দিয়ে দিও।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'রফিক-শফিকের কাণ্ডটা দেখ তো! নিজের মা মরে যাচ্ছে, কোনো খেয়াল নেই।'

'এখনও খবর পায় নি।'

'তোমার কি ধারণা, খবর পেলেই ছুটতে-ছুটতে চলে আসবে? নিজের ছেলেদের আমি চিনি না? খুব চিনি।'

নীলু তার শাশুড়ির পাশে বসে মৃদুস্বরে বলল, 'মা, আপনি আমার কথায় রাগ করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। আমার কী যে খারাপ লাগছে!'

বলতে-বলতে নীলুর চোখ ভিজে উঠল। গলা ভার-ভার হল। মনোয়ারা বিরক্ত গলায় বললেন, 'বলেছ ভালো করেছ। আমি দিনে এক হাজার কড়া

কথা বলি, আর তুমি একটা বলতে পারবে না? কাঁদতে শুরু করবে না তো মা। গায়ের মধ্যে কুটকুট করছে। বিছানায় ছারপোকা আছে কিনা কে জানে। মা, তুমি ঐ নার্সটাকে জিজ্ঞেস করে আস তো, বিছানায় ছারপোকা আছে কিনা।'

নীলু বাধ্য মেয়ের মতো উঠে গেল। মনোয়ারা মনে মনে বললেন, 'আল্লাহ্, তুমি আমার এই লক্ষ্মী বৌটাকে সুখে রেখ। কোনো রকম দুঃখ তাকে দিও না।'

রফিক এল রাত ন'টার দিকে। নীলু অবাক হয়ে বলল, 'তুমি একা? তোমার ভাই আসে নি?'

'সকালেআসবে।'

'বল কী তুমি! সকালে আসবে মানে? অসুস্থ মাকে দেখতে আসবে না?'

রফিক চুপ করে গেল। সে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার নিয়ে এসেছে। ভাত, কৈ মাছ ভাজা, ফুলকপির ভাজি।

'খেয়ে নাও ভাবী। খিদে লেগেছে নিশ্চয়ই।'

খিদে লেগেছে, কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। তোমার ভাইয়ের কি মন-টন বলে কিছু নেই?'

'সেটা ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করো। আমাকে জিজ্ঞেস করে তো লাভ নেই।'

'তুমি এখানে আর রাত করে কী করবে? মাকে দেখে চলে যাও।'

'আমিও আছি তোমার সঙ্গে। হাসপাতালের বারান্দায় বসে থাকব। তুমি একা-একা রাত জাগবে, তা হয় নাকি? একটা চায়ের দোকান দেখে এসেছি, সারা রাত খোলা থাকে। ঐখানে গিয়ে এক ঘন্টা পরপর চা খাব আর হাসপাতালের বারান্দায় বসে মশার কামড় খাব। রাতটা ভালোই কাটবে।'

নীলু হেসে ফেলল। রফিক সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলল, 'হাসপাতাল নিয়ে একটা জোক শুনবে? খুব হাসির।'

ঘটনার উত্তেজনায় মনোয়ারা এখন খানিকটা ক্লান্ত। ডাক্তাররা ঘুমের ওষুধ দিয়েছে, তাতে ঘুম ঠিক আসছে না। ঝিমুনির মতো আসছে। নীলুকে তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে শুয়েছেন। জেগে আছে নীলুও। কিছুতেই তার মনের গ্লানি কাটছে না। এক সময় মনোয়ারা বললেন, 'বৌমা, ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'জ্বি-না।'

'তোমার শ্বশুরের কাণ্ডটা দেখেছ? তার উচিত ছিল না হাসপাতালে থাকা? একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, আর সে আরাম করে ঘুমাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ। বৌমা ঘুমিয়ে পড়লে?'

'জ্বি-না।'

'রফিক আছে তো?'

'জ্বি, বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে।'

'ব্যাটাছেলে এক জন থাকা ভালো। কখন কী দরকার হয়, তাই না? হার্টের অসুখ।'

'জ্বি। আপনি ঘুমান মা। মাথায় হাত বুলিয়ে দিই?'

'দাও।'

নীলু মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেক দিন পর গভীর তৃপ্তি নিয়ে মনোয়ারা ঘুমুতে গেলেন।

৩৪

সাত দিন হাসপাতালে কাটিয়ে মনোয়ারা আজ বাড়ি ফিরবেন। এই উপলক্ষে রফিকের ইচ্ছা ছিল একটা নাটকের মতো করা। দরজার বাইরে লেখা থাকবে শুভ প্রত্যাবর্তন। ফুলটুল দিয়ে ঘর সাজানো হবে। রাতে ছোট্ট একটা ঘরোয়া গানের আসর। রফিক তার এক বন্ধুকে খবর দিয়েছে, সে সন্ধ্যাবেলায় এসে গজল গাইবে। এই জিনিসটির আজকাল বেশ প্রচলন হয়েছে। ঘরে ঘরে গজল।

কিন্তু অবস্থা গতিকে মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব হবে না। ভোরবেলায় ভাবী এবং ভাইয়ার মধ্যে তুমুল ঝগড়া। এরা দু'জন যে এভাবে ঝগড়া করতে পারে, তা রফিক কল্পনাও করে নি। এক বার ভেবেছিল ঝগড়ার ধাক্কাটা কমানোর জন্যে সে কিছু বলবে। শারমিন তাকে বেরুতে দেয় নি। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে এভাবে--অফিসের সময় শফিক যথারীতি কাপড় পরছে। কাপড় পরতে- পরতে বলল, 'এক কাপ চা দিতে পার নীলু?'

নীলু চা এনে দিয়ে শান্তগলায় বলল, 'আজ মা হাসপাতাল থেকে ফিরবেন জান বোধহয়।'

'হ্যাঁ, জানি। আমিও সকাল-সকাল ফিরব।'

'কোথায় যাচ্ছ তা জানতে পারি কি?'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। রোজ যেখানে যাই, সেখানে যাচ্ছি।'

'অফিসে যাচ্ছ?'

শফিক এই প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে জুতো ব্রাশে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়ল। নীলু বলল, 'কী কথা বলছ না কেন? অফিসে যাচ্ছ?'

'না।'

'কোথায় গিয়ে বসে থাক জানতে পারি?'

'আস্তে কথা বল, চেঁচাচ্ছ কেন?'

'তোমার চাকরি নেই, এই খবরটা আমাকে কেন অন্যের কাছ থেকে শুনতে হল? কেন তুমি বলতে পারলে না?'

'চাকরি নেই এই কথাটা তো ঠিক না। তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলেই আমি আগের জায়গায় ফিরে যাব।'

'ফিরে যাবে ভালো কথা। আমাকে কেন বলবে না?'

'কী মুশকিল, তুমি চেঁচাচ্ছ কেন?'

'চেঁচাব। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলব।'

ঝগড়ার এই পর্যায়ে শারমিনের আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে রফিক এসে বলল, 'ভাবী একটু শুনে যাও তো, খুব দরকার।'

নীলু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল। শান্তমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রফিক বলল, 'তোমার অফিসের গাড়ি অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছে। হর্ন দিচ্ছে। যাও, অফিসে যাও। এইসব কী হচ্ছে?'

'আজ অফিস যাব না।'

'সেই খবরটা গাড়িতে যারা আছে, তাদের দিয়ে আসতে হবে তো। নাকি তোমার একার জন্যে সবাইকে লেট করাবে?'

নীলু খবর দিতে গেল, কিন্তু ফিরে এল না। শেষ মুহূর্তে মনে হল, বাসায় ফিরে কী হবে? এরচে অফিসে সময় কাটানোই ভালো। তার শাশুড়ি সন্ধ্যার আগে-আগে বাসায় আসবেন। তার আগে ফিরে এলেই হবে।

শফিক আজ প্রথম অফিসে গেল। বিনা প্রয়োজনে নয়, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা তুলতে হবে। বাড়িভাড়া, হাসপাতালের খরচ--নানান ফ্যাঁকড়া। অফিসে ঢুকতে তার লজ্জা-লজ্জা লাগছে। নিজের অফিস, অথচ নিজের মনে করে আসতে পারছে না। অফিসের কর্মচারীরাও কেউ এই ক'দিন তার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। সিঁড়ির মাথায় সিদ্দিক সাহেবের সঙ্গে দেখা।

'আরে শফিক সাহেব, আপনি? আসুন আসুন। আজ কেন জানি মনে হচ্ছিল আপনি আসবেন।'

'তাই নাকি। আপনার যে সিক্সথ্ সেন্স ডেভেলপ করছে, তা তো জানতাম না সিদ্দিক সাহেব।'

'আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, তাই না? আপনার সামনেই আমি মুজিবুরকে ডেকে জিজ্ঞেস করছি। আধ ঘন্টা আগে আমি মুজিবুরকে বলেছি যে আপনি আজ আসবেন। আসুন, আমার ঘরে আসুন। প্লিজ!'

'আমি একটু ক্যাশ সেকশনে যাব, কিছু টাকা তুলব।'

'ক্যাশ সেকশনের পাখা গজায় নি, পালিয়ে যাচ্ছে না। তা ছাড়া টাকা আপনি আমার ঘরে বসেও তুলতে পারবেন।'

'অফিসের খবর কী?'

'তদন্তের খবর জানতে চাচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'তদন্ত পরশু শেষ হয়েছে। সাহেবদের তদন্ত একটা দেখবার জিনিস রে

ভাই। চা খেতে খেতে চার-পাঁচ জন লোককে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করল, ব্যাস, তদন্ত শেষ।'

'ফলাফল কী?'

'তাও তো জানি না। ব্যাটা কিছু বলে না। আমি গতকাল জিজ্ঞেস করলাম, সে বকের মতো ঠোঁট সরু করে বলল, এই খবরের জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন? ব্যাটার কথায় গা জ্বলে যায়। অফিসের খবরে আমার আগ্রহ থাকবে না? আপনি কী খাবেন, চা না কফি?'

'আমি কিছুই খাব না।'

'এসব বলে কোনো লাভ হবে না। খেতেই হবে। ক্যাশিয়ারকে ডাকাচ্ছি, টাকা-পয়সার ব্যাপার সেরে নিন। ইন্টারকমের ব্যাবস্থা হয়েছে, দেখেছেন? টলম্যান ব্যাটা দারুণ অ্যাকটিভ। ছ'কোটি টাকার একটা নতুন প্লান্ট হচ্ছে। ব্যাটার এক চিঠিতে হেড অফিস প্ল্যান স্যাংশন করে দিয়েছে।'

'কিসের প্লান্ট?'

'সালফিউরিক অ্যাসিড প্লান্ট। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে জয়েন্ট কোলাবরেশন। সিক্সটি-ফোর্টি শেয়ার। সিক্সটি কোম্পানি, আর ফর্টি লোকাল গভর্নমেন্ট।

'ভালোই তো।'

'আমাদের জন্যে ভালো। কোম্পানি গ্রো করবে, আমরাও গ্রো করব।'

সিদ্দিক সাহেব ইন্টারকমের বোতাম টিপে ক্যাশিয়ারকে আসতে বললেন। তার এক মিনিট পরই টলম্যান খবর পাঠাল--শফিককে যেন তার ঘরে পাঠান হয়। সিদ্দিক সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, 'আপনি এসেছেন ব্যাটার কাছে খবর চলে গেছে। নাৎসি জার্মানির অবস্থা হয়েছে, বুঝলেন। জীবন অতিষ্ঠ। চারদিকে ব্যাটার স্পাই।'

টলম্যান হাসিমুখে বলল, 'কেমন আছ শফিক?'

'ভালো আছি, স্যার।'

'অফিসে এসেছিলে কেন?'

'প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা কিছু তুলব।'

'তুলেছ?'

'না, এখনও তোলা হয় নি।'

'বস। আরাম করে বস। অফিসের খোঁজখবর কিছু রাখ?'

'না। তবে আজ কিছু শুনেছি। কোম্পানি বড়ো হচ্ছে।'

'হ্যাঁ! বড়ো হচ্ছে। বিগ প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। কিন্তু তোমাদের সরকারী অফিস কুমিরের মতো হাঁ করে আছে। সারাক্ষণ এদের মুখে কিছু-না কিছু দিতে হচ্ছে। হা হা হা। চা খাবে?'

'না।'

'তদন্তের রিপোর্ট জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'তোমার কী ধারণা, বল। তুমি কি মনে কর, তদন্তে তোমাকে নির্দোষ বলা হবে?'

'আমার তাই ধারণা। আমি কোনো অন্যায় করি নি। এসবের কিছুই আমি জানি না।'

'যে এসবের কিছুই জানে না, অথচ যার সিগনেচার নিয়ে এত চুরি-জুয়াচুরি হয় সে কি বড়ো রকমের একজন অপদার্থ নয়?'

শফিক চুপ করে রইল। টলম্যান থেমে থেমে বলল, 'নিতান্তই অক্ষম ব্যক্তিদের এইভাবে ব্যবহার করা হয়। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'তদন্তে তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদিও আমি এবং তদন্ত কমিটির মেম্বাররা ভালোই জানি—অন্যায়টা তোমার করা নয়।'

'তদন্ত কমিটি দোষী ব্যক্তিদের বের করতে পারে নি, এটা কি কমিটির একটা বড়ো রকমের ব্যর্থতা নয়?'

'হ্যাঁ, ব্যর্থতা তো বটেই। বিগ ফেইলিয়ুর।'

'স্যার, আমি কি এখন উঠব?'

'না, একটু বস। আমি হাতের কাজ সেরে নিই। ধর দশ মিনিট।'

'ঠিক আছে স্যার, বসছি।'

'কিংবা আরেকটা কাজ করতে পার। যে কাজে এসেছিলে সেটা শেষ করে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'আর দেখা করে কী হবে?'

'কথাবার্তা বলব। আজ আমার কাজ করার মুড নেই। কথা বলতে ইচ্ছে করছে।'

শফিক বের হয়ে গেল। টলম্যান দু'টি অর্ডারে সই করল। একটি হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড প্লান্টের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসেবে শফিকের নিয়োগপত্র। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঢাকা জোনাল অফিসের জি. এম. পদে শফিকের পদোন্নতি।

তদন্ত কমিটি শফিকের কোন ত্রুটি ধরতে পারে নি। তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে টলম্যান তার রিপোর্টে লিখেছে—সৎ এবং দক্ষ, এই দুই ধরনের গুণের সমন্বয় সাধারণত হয় না। শফিকের মধ্যে তা লক্ষ করেছি। বড়ো রকমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ একে দেয়া যেতে পারে। তা ছাড়া শফিক আহমদের বিপুল জনপ্রিয়তাও আমি সর্বশ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে লক্ষ করেছি। কোম্পানির স্বার্থেই এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানো উচিত।

শফিক বাড়ি ফিরে যাবার আগে টলম্যানের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সে নেই, লাঞ্চ করতে চলে গিয়েছে। টলম্যানের পি এ দু'টি খাম এগিয়ে দিল। নরম গলায় বলল, 'বড়ো সাহেব আপনাকে দিতে বলেছেন। আর আপনার

জন্যে এই চিঠি লিখে রেখে গেছেন। চিঠিটা আগে পড়তে বলেছেন।'

শফিক চিঠি পড়ল। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে "আজ রাতে অবশ্যই তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কোনো একটা ভালো রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে। খাবার এবং পানীয়ের অর্ডার দেবার পর খাম দু'টি খুলে পড়বে। আশা করি এর অন্যথা হবে না।"

শফিক অফিসে বসেই খাম খুলে পড়ল। তার বেশ মন খারাপ হল। টলম্যান যেভাবে বলেছিল, কাজটা সেভাবেই করা উচিত ছিল। নীলু কত খুশি হত। আনন্দ একা ভোগ করা যায় না।

সিদ্দিক সাহেব বললেন, 'কী ব্যাপার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছেন? স্যারের সঙ্গে দেখা হয় নি?'

'হয়েছে।'

'ব্যাটা কী বলল?'

'তেমন কিছু না।'

শফিক একটা রিকশা নিল। যাবে মতিঝিল। নীলুর অফিসে। নীলুর অফিস এখনো দেখা হয় নি। নীলু আজ অফিসে গিয়েছে কিনা কে জানে। আজ হয়তো অফিসেই যায় নি। ঝগড়া-টগড়া করে বাসায় বসে আছে।

নীলু অফিসেই ছিল। শফিককে ঢুকতে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'কী ব্যাপার, তুমি !'

'দেখতে এলাম তুমি কী কর না-কর। নিজের কিছু করার নেই, সময়টা তো কাটাতে হবে।'

শফিক নীলুর সামনে চেয়ার টেনে বসল। পকেটে হাত দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'সিগারেট খেতে কোনো বাধা নেই তো?'

অফিসের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে। নীলুর কেন জানি খুব লজ্জা লাগছে। শফিকের হঠাৎ এখানে আসার কারণটা ধরতে পারছে না। সে চাপা গলায় বলল, 'সত্যি করে বল, কী জন্যে এসেছ।'

'তোমার যখন কাজকর্ম ছিল না, তখন তুমি আসতে না আমার অফিসে?'

'অকারণে যেতাম না, কোনো একটা কাজ নিয়ে যেতাম।'

'বেশির ভাগ সময়ই যেতে টাকার জন্যে, হঠাৎ টাকার দরকার হয়ে পড়লে তখন...'

'তুমি নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যে আস নি।'

শফিক গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার উদ্দেশ্যও তাই। গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পারবে?'

শফিক হাসছে। সমস্ত রহস্য নীলুর কাছে এখন পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। ভালো খবর আছে। নিশ্চয়ই খুব ভালো খবর। আজ সকালে এই

নাটকটা সে যদি না করত! বেচারা জানাতে চায় নি, কেন সে জোর করে জানল? জানাতে চায় নি লজ্জায় এবং অপমানে। সে স্ত্রী হয়ে স্বামীর লজ্জা এবং অপমানকে সবার সামনে প্রকাশ করে দিল। তার পরও এই লোকটি রাগ করে নি। ভালো খবরটি নিয়ে হাসি-মুখে এসেছে তার কাছে। রহস্য করার চেষ্টা করছে। রহস্য করার তার ক্ষমতা নেই। মোটেই জমাতে পারছে না। নীলুর চোখ ভিজে উঠল।

নীলু বলল, 'কিছু খাবে? আমাদের এখানে খুব ভালো ক্যান্টিন আছে।'

শফিক হাসতে-হাসতে বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়, চল না বাইরে কোথাও খেয়ে বাসায় চলে যাই। আজ একটু সকাল-সকাল বাসায় ফেরা দরকার।'

'একটু বস, আমি স্যারকে বলে আসি।'

নীলু কিছু দূর গিয়েই আবার ফিরে এল। নরম স্বরে বলল, 'তুমি একটু আসবে আমার সঙ্গে?'

'কেন?'

'স্যারের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতাম।'

'কী পরিচয় দেবে, বেকার স্বামী?'

'হ্যাঁ, তাই। প্লিজ আস।'

শফিক হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল।

মনোয়ারা সন্ধ্যার আগেই ফিরলেন। ডাক্তার বলে দিয়েছে, 'এঁকে নিজের মতো থাকতে দিতে হবে। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা একেবারেই চলবে না।' মনোয়ারার মন ভালো নেই। তিনি আরও কিছু দিন হাসপাতালে থাকতে চেয়েছিলেন।

গৃহপ্রবেশের আয়োজন মোটামুটি ভালোই। রফিক সত্যি-সত্যি একটা কাগজে লিখেছে—'শুভ প্রত্যাবর্তন'। সেটা টাঙানো হয়েছে দরজার সামনে। ফুলের একটি তোড়া টুনির হাতে। সেই ফুলের তোড়া টুনি তার দাদীর হাতে তুলে দিল । মনোয়ারা গম্ভীর হয়ে ফুলের তোড়া নিলেন। মনে হচ্ছে তিনি জানতেন, এ-রকম একটা কিছু হতে যাচ্ছে।

আশপাশের বাড়ির মেয়েরা তাঁকে দেখতে আসছে। তিনি সবার সঙ্গেই হাসপাতালের ভয়াবহ গল্প করছেন--

'বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিল। নেহায়েৎ ভাগ্যগুণে ফিরে এসেছি।'

কথা পুরোপুরি মিথ্যা। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করছে।

রফিকের বন্ধু সেই গজল-গায়ক সন্ধ্যা থেকেই বসে আছে। মনোয়ারা শুনলেন, তাঁর ফিরে আসা উপলক্ষে গান-বাজনার আয়োজনও আছে। তাঁর বেশ আনন্দ হল। শাহানা আর তার বর এখনও আসে নি। এইটি তাঁকে পীড়া

দিচ্ছে। এরা দু'জন তাঁকে দেখতে হাসপাতালেও যায় নি। নেপাল থেকে ফিরেছে তো বেশ কিছু দিন হল। তিনি উঁচু গলায় ডাকলেন, 'বৌমা, ও বৌমা।'

শারমিন এসে ঢুকল। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'তোমাকে তো ডাকি নি, তুমি এসেছ কেন? বড়ো বৌমাকে আসতে বল।'

নীলু ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'শাহানাদের খবর দেওয়া হয়েছে?'

'জ্বি, হয়েছে।'

'ওরা আসছে না কেন?'

'কোনো কাজ পড়েছে বোধহয়।'

'যমে-মানুষে টানাটানি হচ্ছে, আর তার কাজ পড়ে গেল? বড়ো কাজের মেয়ে হয়ে গেছে দেখি! রফিককে বল, ওদের নিয়ে আসুক।'

'ওকে বললে এখন যাবে না মা। বন্ধুবান্ধব এসেছে, ওদের নিয়ে হৈচৈ করছে।'

'তোমাকে বলতে বললাম, তুমি বল। তোমরা সবাই মিলে আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছ। ডাক্তার কী বলেছে মনে নেই?'

রফিক নীলুর কথার কোনো পাত্তাই দিল না। পাত্তা দেবার প্রশ্নও ওঠে না। তার গায়ক বন্ধু মাথা দুলিয়ে মেয়েলি গলায় গান ধরেছে—

"মেরা বালাম না আয়ে।"

বালাম না-আসার কারণে তাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে।

হোসেন সাহেবের এই গান খুবই পছন্দ হচ্ছে, তিনি চোখ বন্ধ করে হাতে তাল দিচ্ছেন। টুনি এবং বাবলু একটু পরপর হেসে উঠছে। তিনি এতে খুব বিরক্ত হচ্ছেন। গজল-গায়কও বিরক্ত হচ্ছে।

৩৫

কবির মাষ্টারের ঘুম ভাঙে সূর্য ওঠার আগে। কিন্তু গত ক' দিন ধরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। তিনি আটটা-ন'টার আগে বিছানা থেকে নামতে পারছেন না। সকালবেলা গাঢ় ঘুমে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে থাকে। শরীরে কোনো রকম জোর পান না। ঘুম ভাঙার পরও অনেকক্ষণ তাঁকে বিছানার উপর বসে থাকতে হয়, নড়াচড়া করতে পারেন না। তাঁর মনে ভয় ঢুকে গেছে, হয়তো-বা এক সময় পুরোপুরি বিছানা নিতে হবে। জীবন কাটবে অন্যের করুণায়। এরচে দুঃখের ব্যাপার আর কী হতে পারে? চট করে মরে যাওয়া ভালো। কিন্তু দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভয়াবহ ব্যাপার। এটা তিনি চান না।

আজ অবশ্যি তাঁর ঘুম সূর্য ওঠার আগেই ভেঙেছে। শওকত তাঁকে ডেকে

তুলেছে। শওকতের মুখ গম্ভীর। বড়ো রকমের কোনো ঝামেলা হয়েছে বোধহয়। কিন্তু শওকত তাঁকে কিছু বলছে না। ঘুম ভাঙিয়ে চা বানাতে গিয়েছে। একেক সময় শওকতের উপর রাগে তাঁর গা জ্বলে যায়।

'হয়েছে কী রে শওকত? ব্যাপারটা বল।'

রান্নাঘর থেকে শওকত বলল, 'চা খান, তারপরে কইতাছি। খবর খারাপ।'

চা খাবার পরও শওকত কিছু বলল না। কবির মাষ্টার বড়ো বিরক্ত হলেন।

'ব্যাপারটা কী?'

'আসেন আমার সাথে। নিজের চউক্ষে দেখেন। মুখের কথায় কাম কী?'

এর সঙ্গে বাক্যালাপ করা অর্থহীন। করিব মাষ্টার গায়ে চাদর জড়ালেন। ছাতা হাতে নিলেন। কত দূর যেতে হবে কে জানে।

বেশি দুর যেতে হল না। স্কুলের পুকুরের কাছে এসে শওকত বলল, 'দেখেন, নিজের চউক্ষে দেখেন।'

কবির মাষ্টার কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলেন না। পুকুরের সব মাছ মরে ভেসে উঠেছে। দুধের সরের মতো মাছের সর পড়ে গেছে। অনেক লোকজন জড়ো হয়েছে এর মধ্যেই। তারা কবির মাষ্টারের দিকে এগিয়ে এল, কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

কবির মাষ্টার বসে পড়লেন। তাঁর মাথা ঘুরছে। বহু যত্নে তিনি এই পুকুর তৈরি করেছেন। মাটি ভরাট হয়ে গিয়েছিল। মাটি কাটিয়েছেন। পোনা মাছের চারা ছেড়েছেন। ফিশারি ডিপার্টমেন্টের লোক এনে পানিতে সার দিয়েছেন। শ্যাওলা পরিষ্কার করিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নিজের জন্যে তো এটা তিনি করেন নি। করেছেন সুখী নীলগঞ্জের জন্যে। মাছের আয় পুরোটা যেত স্কুলে। স্কুল নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু এটা কী করল?'

শওকত বলল, 'স্যার উঠেন, বাড়িত যাই। বইস্যা থাইক্যা কী করবেন? কার জন্যে বসবেন?'

তিনি উঠলেন, বাড়ি গেলেন না, পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসলেন। এই বছরই ঘাট পাকা করেছেন। কী সুন্দর এখন দেখতে হয়েছে।

খবর রটে গিয়েছে। ছেলে–বুড়ো এখন পুকুরপাড়ে ভেঙে পড়েছে। কেউ–কেউ বড়ো–বড়ো মাছ তুলে নিচ্ছে। ভয়ে–ভয়ে রান্না করবে। খাবে। মাছের শরীরে বিষ কতটুকু গিয়েছে কে জানে। বিষাক্ত মাছ খেয়ে হয়তো অসুস্থ হবে অনেকে। তাঁর ইচ্ছা হল এক বার বলেন, এই মাছ খেয়ো না। কিন্তু বললেন না। বলতে ইচ্ছা হল না। কেনই–বা বলবেন?

বেশ কিছু সাপ মরে ভেসে উঠেছে। ছোট–ছোট ছেলেমেয়েরা সেইসব সাপ কঞ্চির আগায় নিয়ে মহানন্দে ছোটাছুটি করছে। মাঝে–মাঝে এ ওর গায়ে ফেলে দিচ্ছে। কবির মাষ্টার ঘাটে বসে শিশুদের খেলা দেখতে লাগলেন।

শওকত বেশ কয়েক বার চেষ্টা করল স্যারকে বাসায় নিয়ে যেতে। পারল না। তিনি মূর্তির মতো বসে রইলেন। রোদ বাড়তে লাগল।

দুপুর এগারটায় থানার ওসি সাহেব তদন্তে এলেন। দু' জন কনস্টেবল নিয়ে পুকুরের চারদিকে কয়েক বার ঘুরলেন। স্কুলের হেডমাষ্টার সাহেবের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে কবির মাষ্টারের পাশে এসে বসলেন। আশপাশের সবাইকে অবাক করে দিয়ে কবির মাষ্টারের পা ছুঁয়ে সালাম করলেন। খাকি পোশাক-পরা কেউ সাধারণত পা ছুঁয়ে সালাম করে না। কবির মাস্টার বললেন, 'ভালো আছ বাবা?'

'জ্বি স্যার। আপনার দোয়া।'

'তাহলে তো ভালো থাকার কথা না, কারণ দোয়া আমি তোমার জন্যে করি নি।'

'এখন করবেন। রোদের মধ্যে বসে আছেন কেন? বাড়ি চলে যান।'

'বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। রোদে বসে থাকতে ভালোই লাগছে।'

'এনড্রিন দিয়ে মেরেছে। আপনার সঙ্গে কি স্যার কারো শত্রুতা আছে?'

'না।'

'চট করে কিছু বলবেন না স্যার। ভালো করে ভেবে বলুন।'

'ভেবেই বললাম। শত্রুতা থাকবে কেন?'

'স্যার, আপনি ঘরে গিয়ে কিছু মুখে দিন। শীতকালের রোদই গায়ে লাগে বেশি।'

'হ্যাঁ, যাব। খানিকক্ষণ পরেই যাব। শুধু-শুধু বসে থেকে লাভ কী? কেনই-বা বসব?'

তিনি কিন্তু উঠলেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত একই জায়গায় একইভাবে বসে রইলেন। মনে হচ্ছে তিনি একটা ঘোরের মধ্যে আছেন। নীলগঞ্জ স্কুলের হেডমাষ্টার অন্য স্যারদের সঙ্গে নিয়ে অনেকক্ষণ বোঝালেন, 'কী জন্যে বসে আছেন? নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভটা কী হচ্ছে? সারা দিন কিছু মুখে দেননি। হিম পড়তে শুরু করেছে। বড়ো রকমের একটা অসুখ না বাধিয়ে আপনি ছাড়বেন না মনে হচ্ছে। তাতে লাভটা হচ্ছে কার?'

কবির মাষ্টার ক্লান্ত গলায় বললেন, 'লাভ-লোকসান নিয়ে ভাবি না।'

'আপনি না ভাবলেন, আমরা তো ভাবি। কেন আপনি শুধু-শুধু বসে আছেন?'

'একটা প্রতিবাদ করছি, বুঝলে? একটা প্রতিবাদ। যে এই কাজ করেছে, সে এক সময় আমার কাছে এসে ক্ষমা চাইবে, তখন আমি উঠব। তার আগে আমি উঠব না। সারা রাত বসে থাকব।'

সন্ধ্যার পর শওকত বলল 'কাজটা সে-ই করেছে। ক্ষমা চায়। আর কোনো দিন করবে না।'

শুধু শওকত নয়, একের পর এক অনেকেই আসতে লাগল। সবাই বলছে

কাজটা তারই করা। পাশের দু'-একটি গ্রাম থেকেও লোকজন এসে বলল, কাজটা তারা করেছে।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারলেন না। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে। সেখানে তিন দিন রেখে ঢাকায় পিজিতে। ঢাকায় পঞ্চম দিনের বিকেলে তিনি চোখ মেললেন। শুনলেন কে যেন বলছে--বুড়ো মনে হচ্ছে এই যাত্রায় টিকে গেল।

কথা বলছে রফিক। তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন, রফিক এখানে এল কী করে। মাথা ঘোরাতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। শরীর সীসার টুকরার মতো ভারি হয়ে আছে।

'মামা, কথাবার্তা কিছু শুনতে পারছ? তাকাও দেখি আমার দিকে। বল তো কে?'

'রফিক।'

'মনে হচ্ছে আরও কিছু দিন আমাদের যন্ত্রণা দেবে?'

'তুই এখানে কোত্থেকে?'

'আমি যেখানকার, সেখানেই আছি। তুমি বর্তমানে আছ ঢাকায়। পিজিতে। বেঁচে উঠবে এ রকম কোনো আশা ডাক্তারদের ছিল না। তুমি তাদের বোকা বানিয়ে বেঁচে উঠেছ। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা আমরা পালা করে তোমাকে পাহারা দিচ্ছি। বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আমার ডিউটি।'

'তোর সঙ্গে উনি কে?'

'ইনি হচ্ছেন বাবলুর বাবা। সোভাহান সাহেব। বিখ্যাত জ্যোতিষী। তুমি আরেকটু সুস্থ হলেই তোমার হাত দেখে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব বলে দেবে। এমনকি তোমার পুকুরের মাছ কে মারল, সেই খবরও বলে দেবে।'

সোভাহান বলল, 'রফিক সাহেব, ওনাকে এখন ঘুমুতে দিন, বিরক্ত করবেন না। আসুন আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।'

কবির মাষ্টার কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। গভীর ঘুমে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। চেষ্টা করেও তিনি জেগে থাকতে পারছেন না।

রফিক বলল, 'বুড়ো তো মনে হয় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছে। এখন আর পাহারা দেবার কোনো মানে নেই। চলুন, বাড়ি চলে যাই।'

'বাড়ি গিয়ে কী করবেন?'

'তাহলে চলুন আপনার আস্তানায় যাই। আপনি কী-ভাবে জীবনযাপন করেন দেখে আসি।'

'দেখার মতো কিছু না। বস্তির মতো একটা জায়গায় বাস করি। ওখানে গেলে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে।'

'বন্ধ হলে হবে, চলুন যাই।'
'সত্যি যাবেন?'
'আরে, কী মুশকিল। আমি কি ভদ্রতা করে যাবার কথা বলছি?'
'কী করবেন আমার ওখানে গিয়ে?'
'গল্প করব। যদি চা খাওয়ান, চা খাব।'
'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আপনার অন্য উদ্দেশ্য আছে।'
'তা আছে। আপনি খুব ভালো করে আরেক-বার আমার হাত দেখবেন। ঐদিন তেমন মনোযোগ দেন নি। ভাসা-ভাসা কথা বলেছেন।'
'ব্যাপারটাই তো ভাই ভাসা-ভাসা।'
'ভাসা-ভাসা হলেও যত দূর সম্ভব আপনি একটু তলিয়ে দেখবেন। আপনার কাছে হাত দেখার ম্যাগনিফায়িং গ্লাসফ্লাস আছে না?'
সোভাহান হেসে ফেলল। রফিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'হাসবেন না। ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস। আপনার হাত দেখার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। বাসায় চলুন, সেখানে আমি সব বলব।'
'বেশ তো চলুন। কিন্তু তার আগে আপনি কি একটা খবর দেবেন না?'
'কী খবর?'
'আপনার মামার যে জ্ঞান ফিরেছে, সেই খবর।'
'খবর দেবার দরকার নেই। আটটার সময় নীলু ভাবী এসে নিজের থেকেই জানবে। মরবার খবর চটপট দিতে হয়। বাঁচার খবর না দিলেও চলে।'

সোভাহান যেখানে থাকে, তাকে ঠিক বস্তি বলা যাবে না। কাঁচা ঘর নয়। হাফ বিল্ডিং। দু'টি কামরা। আসবাবপত্র যা আছে, তা বেশ গোছানো। হাত দেখা, কোষ্ঠি গণনার প্রচুর বইপত্র।
রফিক বলল, 'এইসব বই পড়েছেন নাকি?'
'হ্যাঁ, পড়েছি।
'তার পরেও বলেন, আপনি এসব বিশ্বাস করেন না?'
'জ্বি-না, করি না।'
'অদ্ভুত লোক ভাই আপনি। দেখি, চায়ের ব্যবস্থা করুন।'
সোভাহান কেরোসিনের চুলা ধরাল। চায়ের কাপ সাজাল। সহজ গলায় বলল, 'রফিক সাহেব, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন?'
'খিদে-খিদে অবশ্যি লাগছে। কী আছে ঘরে?'
'মুড়ি খাবেন? তেল-মরিচ দিয়ে মেখে দিই?'
'দিন। লোকজন আসে কেমন আপনার কাছে?'
'বেশি আসে না। তবে আসে কিছু কিছু। টাকা যা পাই, তার থেকে বাড়িভাড়া দিই। খাবার খরচ ওঠে।'
'জমে না কিছু?'

'না। সঞ্চয়ের ব্যাপারটা আমার মধ্যে নেই। কার জন্যে সঞ্চয় করব বলুন। আমরা নগ্ন হয়ে পৃথিবীতে এসেছিলাম, নগ্ন হয়ে ফিরে যেতে হবে।'

'কিন্তু যত দিন বাঁচবেন, নগ্ন হয়ে বাঁচতে পারবেন না। কিছু একটা গায়ে দিতে হবে।'

'দিতেই হবে, এমন কোনো কথা কিন্তু নেই। কেউ কেউ জীবনও নগ্নগাত্রে কাটিয়ে দেন।'

'কাইগুলি আপনার হাই ফিলসফি রেখে আমার হাতটা দেখুন। আপনি বলেছিলেন, আমি প্রচুর পয়সা করব।'

'তা বলেছিলাম।'

'সে-রকম লক্ষণ অবশ্যি দেখা যাচ্ছে , কিন্তু স্ত্রীভাগ্যে ধন, তা তো মনে হচ্ছে না। যা হচ্ছে, বন্ধুভাগ্যে হচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি, তাই। আজ একটু সময় নিয়ে হাতটা দেখুন। ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাসফ্লাস যা আছে বের করুন। বিনা পয়সায় হাত দেখাব না, রীতিমতো ফী দেব। কত নেন আপনি? রেট কত?'

'বাঁধা কোনো রেট নেই। যার যেমন খুশি দেয়।'

'আমার কাছে কুড়িটা টাকা আছে, এর অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব। দেরি করে লাভ নেই। এখনই নিয়ে নিন।'

সোভাহান হাসল। চায়ের পানি ফুটছে। কেৎলিতে চায়ের পাতা ছাড়ল। রফিক ছেলেটিকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। চমৎকার ছেলে।

রফিকের ভাগ্য পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটা অনেকটা গুপ্তধন পাওয়ার মতো। ঢাকা কলেজে তার সঙ্গে ইদরিস বলে একটা ছেলে পড়ত। মহা হারামি। সবার সঙ্গে ফাজলামি করত। ফিজিক্স-এর নবী স্যারের মতো কড়া লোকের ক্লাসেও এক দিন বাঘের একটা মুখোশ পরে হাজির। নবী স্যার বেশ অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সবার নিঃশ্বাস বন্ধ। না জানি কী হয়। নবী স্যার খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'কী ব্যাপার?'

ইদরিস বলল,'কোনো ব্যাপার না স্যার। ছোট ভাইয়ের জন্যে কিনেছিলাম। একটু পরে দেখলাম। এখন খুলে ফেলব।'

'খুব ভালো কথা। নাম কী তোমার?'

'আমার নাম ইদরিস।'

'ক্লাসের শেষে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

'জ্বি-আচ্ছা, স্যার।'

নবী স্যার ইদরিসকে পঁচিশ টাকা ফাইন করে দিলেন।

সেই ইদরিস এক দিন বাসায় এসে উপস্থিত। গলায় মাইক লাগিয়ে চিৎকার-'তুই দেখি ব্যাটা দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়ে গেছিস!'

'চেষ্টা করছি।'

'শুনলাম, বেকার।'

'আগে তো শুনেছিস, এবার স্বচক্ষে দেখ্।'

'হা হা হা। ব্যাটা তোর রস কমে নি দেখি। চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'একটা ব্যবস্থা করে দিই।'

'কী ব্যবস্থা করবি?'

'বিজনেসে লাগিয়ে দিই। একটা ইনডেনটিং ফার্ম খুলে ফেল্।'

'সেটা আবার কী?'

'কাগজে–কলমে ব্যবসা। দালালি যাকে বলে।'

'করতে হয় কী?'

'কিছুই করতে হয় না। বড়ো–বড়ো কানেকশন থাকতে হয়। তোর তা আছে। তোর শ্বশুর তো বিরাট মালদার পার্টি। চল তোকে নিয়ে বের হই।'

রফিক বের হল। সারা দিন ঘুরল। ব্যবসার কথাটথা বলল।

'বুঝলি রফিক, তোর ব্রেইন আছে, তুই এই লাইনে উন্নতি করবি। ব্যবসা বুঝে নিতে মাস ছয়েক লাগবে, তারপর দেখবি আঙুল ফুলে বটগাছ। মানুষের বেলায় সাধারণত কলাগাছ হয়, আমার ধারণা তোর বেলা হবে বটগাছ। যাকে বলে বটবৃক্ষ।'

'ক্যাপিটেল লাগবে না?'

'তা তো লাগবেই। লাখ তিনেক টাকা শুরুতে লাগবে।'

'সর্বনাশ! নয় মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। তিন লাখ টাকা কে দেবে আমাকে।'

'ব্যাঙ্ক দেবে।'

'ব্যাঙ্ক কেন দেবে। ?'

'কেনর প্রশ্ন তুলিস না। ব্যাঙ্কের লক্ষ লক্ষ টাকা দশ ভূতে লুটে খাচ্ছে। ব্যাঙ্কগুলি হচ্ছে কিছু সুবিধাবাদী লোকের টাকা মারার যন্ত্র। তোকে আমি লোন পাইয়ে দেব।'

'তোর স্বার্থ কী?'

'আছে, স্বার্থ আছে। বিনা স্বার্থে আমি কিছু করব নাকি? ইদরিস সেই ইদরিস নয়। এখনই সেটা বলব না। তুই আগে মনস্থির কর, বিজনেস করবি, না আদর্শ বাঙালি ছেলের মতো দশটা–পাঁচটা অফিস করবি। তোকে সাত দিন সময় দিলাম। সাত দিন বসে বসে ভাব। এই সাত দিন আমার অফিসের কাজকর্ম দেখ। লোকজনের সঙ্গে কথাটথা বল। তারপর এসে বল—ইয়েস অর নো।'

আজ রফিকের সেই সাত দিনের শেষ দিন। সন্ধ্যাবেলায় ইদরিসকে কিছু একটা বলতে হবে। রফিক ঠিক করেছে, সোভাহানের এখান থেকে বের

হয়েই সোজাসুজি ইদরিসের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হবে। হ্যাঁ বলবে। না বলার কোনো অর্থ হয় না।

সোভাহান দীর্ঘ সময় হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় বলল, 'আপনার ব্যবসা হবে। লেগে যান।'

'সত্যি বলছেন?'

'যা দেখছি, তাই বললাম। আপনার হবে।'

'মেনি থাংক্স্‌। তাহলে উঠি?'

'উঠবেন?'

'আমার একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। একজনের কাছে যাব।'

ইদরিসের বাসা কলাবাগানের লেক সার্কাসে। বিশাল তিনতলা দালান। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। ফোয়ারা, কালো পাথরের কী–একটা মূর্তি অনেকটা ময়ূরের মতো দেখতে, যদিও এটা ময়ূর না। ইদরিস বাসায় ছিল না। সে এল রাত এগারটায়। অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে রফিক। যায় নি। এখনও বসে আছে। খিদের যন্ত্রণায় প্রাণ যাবার মতো অবস্থা। এক ফাঁকে রাস্তার এক রেস্টুরেন্ট থেকে দু'টা পরোটা এবং এক টাকার ভাজি কিনে খেয়েছে। এইসব জিনিস সহজে হজম হতে চায় না। তাও হজম হয়ে দ্বিতীয় বার যখন খিদে পেল, তখন ইদরিসের গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকল। গাড়ি থেকে নিজে নামার সামর্থ নেই। দু'তিন জন ধরে–ধরে নামাল। রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, 'তোর কী হয়েছে?'

ইদরিস হাসিমুখে বলল, 'কিছুই হয় নি দোস্ত। মদিরা পান করেছি। হপ্তায় এক দিন মোটে খাই। আজ হচ্ছে সেই দিন। তোর কী ব্যাপার?'

'আজ থাক, অন্য এক দিন বলব।

'অন্য দিন বলার দরকার কী, আজই বল। আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, কিন্তু মাথা পরিষ্কার আছে। হ্যাঁ নাকি না?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। কাল অফিসে আসবি। এগারটার আগে আসবি।'

'ঠিক আছে, আসব।'

'মুনির মিয়া, আমার দোস্তকে বাড়ি পৌঁছে দাও।'

বলতে–বলতেই ইদরিস হড়হড় করে বমি করল। যে দু' জন তাকে ধরে রেখেছিল, তাদের এক জন নোংরায় মাখামাখি হয়ে গেল। কিন্তু মুখ বিকৃত করল না। এই দৃশ্য সম্ভবত এদের কাছে নতুন নয়।

'রফিক আছিস এখনও?'

'আছি।'

'জিনিসটা সহ্য হয় না, তবু খাই। তোর কাছে মিথ্যা বলেছিলাম, সপ্তাহে এক দিন না, রোজই খাই। রোজই এই অবস্থা।'

'তাহলে তো চিন্তার কথা।'

'চিন্তার কথা তো ঠিকই। মদ খেয়ে কোম্পানি লাটে তুলে দিয়েছি। তোর কাছে মিথ্যা বলব না রে ভাই, লাখ টাকা আমার দেনা। ডুবে যাচ্ছি, বুঝলি? তোর লেজ ধরে এখন ভেসে উঠতে চাই।'

ইদরিস আবার বমি করতে লাগল। গেটের দারোয়ান এগিয়ে এসে রফিককে বলল, 'স্যার, আপনি চলে যান। একটা রিকশা নিয়ে চলে যান।'

রফিক যেতে পারছে না। মাতালরা বমি করতে-করতে সত্যি কথা বলতে থাকে, এই দৃশ্য সে কোনো ছবিতেও দেখে নি। বড়ো অবাক লাগছে।

'রফিক আছিস?'

'আছি।'

'আমার জীবন নষ্ট হয়ে গেল রে দোস্ত। এক বেশ্যা মেয়ের জন্য নষ্ট হয়ে গেল।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, মাগীর নাম কাঞ্চন। বুঝলি, আমি এক নরাধম। আচ্ছা দোস্ত, 'নরাধম' কি সন্ধি না সমাস? সব ভুল মেরে বসে আছি।'

দারোয়ান আরেক বার রফিকের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'বাড়ি যান স্যার। আপনি থাকলেই সমস্যা।'

রফিক নড়ল না। দৃশ্যের শেষটা তার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

৩৬

আজ শাহানা এসেছে। বিয়ের পর এটা তার তৃতীয় বার আসা। বাড়িটা তার এখন কিছুতেই আগের মতো লাগে না। এটা যেন অচেনা কোনো মানুষের বাড়ি, নিজের বাড়ি নয়। অথচ সব আগের মতোই আছে। শাহানার লাগানো টবের গাছগুলি আগের চেয়েরও সুন্দর হয়েছে। সে এ বাড়িতে নেই, তাতে এদের যেন কিছুই যায়-আসে না। সে যদি এসে দেখত, তার অনুপস্থিতিতে এ বাড়ির সবাই পানি দিতে ভুলে গেছে, গাছগুলি শুকিয়ে মরা-মরা হয়েছে, তাহলে তার ভালো লাগত।

সুন্দর সতেজ গোলাপ গাছগুলি দেখে তার রীতিমতো কান্না পাচ্ছে। কত ফুল ফুটেছে। বিরাট বিরাট ফুল। সে প্রতিটি গাছেই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে লাগল। গোলাপের দু'টি কচি পাতা নিয়ে দু'আঙুলে পিষে নাকের সামনে ধরল। ফুলে ঘ্রাণের চেয়ে তার পাতার ঘ্রাণ ভালো লাগে। টুনি এবং বাবলু কৌতূহলী হয়ে দেখছে।

টুনি বলল 'কী করছ ফুপু?'

'গাছগুলিকে আদর করছি।'

'আদর করছ কেন?'

'অনেক দিন পরে এসছি তো, তাই। বাবলু সাহেবের কী খবর?'

বাবলু জবাব দিল না। পর্দার আড়ালে সরে গেল। তার লজ্জা বড়ো বেশি। তা ছাড়া শাড়ি–গয়নায় এখন শাহানাকে অপরিচিত লাগছে।

টুনি বলল, 'ফুপু, বাবলুর বাবা এসেছিল।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। মা খুব বকা দিয়ে দিয়েছে।'

'বকা দিয়েছে?'

'হুঁ। মা এক দিন আব্বুকেও বকা দিল।'

'ভাবী মনে হচ্ছে বকা দেওয়ায় ওস্তাদ হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, হচ্ছে। দাদীকেও বকা দিল, এই জন্যে দাদীর অসুখ হয়ে গেল।'

'আমি থাকলে হয়তো আমাকেও বকা দিত। কি, দিত না?'

'হ্যাঁ, দিত।'

টুনি মুগ্ধ হয়ে শাহানাকে দেখছে। তার খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর হয়েছে ফুপুমণি। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।'

'এমন ড্যাবড্যাব করে কী দেখছিস রে টুনি?'

'তোমাকে দেখছি। তুমি কত সুন্দর হয়েছ।'

'নতুন করে আবার হব কিরে বোকা? আমি তো আগে থেকেই সুন্দর। তাই না?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা টুনি, আনিস ভাই আর ফুল নিতে আসে না? গোলাপের ম্যাজিক দেখাতে তার ফুল লাগে না?'

'ম্যাজিক দেখায় না তো।'

'সে কি! কী করে এখন?'

'মাষ্টারি করে।

'বলিস কি!'

শাহানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চেহারাটা কেমন দুঃখী–দুঃখী হয়ে গেল। সে মৃদু গলায় বলল, 'চট করে ছাদে গিয়ে দেখে আয় তো, আনিস ভাই আছে কি না। আমার কথা কিছু বলবি না, খবরদার। বললে চড় খাবি।'

শাহানা মা'র ঘরে ঢুকল। মনোয়ারা গম্ভীর মুখে শুয়ে আছেন। গলা পর্যন্ত চাদর টানা। শাহানাকে ঢুকতে দেখেও কিছু বললেন না। শাহানা বলল, 'অসময়ে শুয়ে আছ যে মা? জ্বর নাকি?'

মনোয়ারা জবাব দিলেন না। মেয়ের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন।

'আমার উপর রাগ করেছ নাকি মা?'

'না, রাগ করব কেন?'

'তাহলে এমন রাগী–রাগী মুখ করে রেখেছ কেন?'

'বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ের উপর রাগ করব কোন সাহসে?'

'তার মানে?'

'পরের বাড়ির মেয়ে রাতের পর রাত হাসপাতালে থেকে আমার সেবা করে। আর নিজের পেটের মেয়ে একবার খোঁজ নিতেও আসে না।'

শাহানা লজ্জিত স্বরে বলল, 'আমরা চিটাগাং চলে গিয়েছিলাম মা। আমার একেবারেই যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ও এমন করে বলল!'

'গিয়েছ, ভালো করেছ। শুধু চিটাগাং কেন, হিল্লি যাও, দিল্লি যাও। কাশ্মীর যাও।'

মনোয়ারা পাশ ফিরলেন। শাহানা কিছু সময় বসে রইল তাঁর বিছানায়। মা'র রাগ মনে হচ্ছে চট করে ভাঙানো যাবে না। মাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করতে হবে। কিন্তু কেন জানি তার কাঁদতে ইচ্ছা করছে না। সে যে মাকে দেখতেও যায় নি, তার জন্যে খুব অনুশোচনাও বোধ হচ্ছে না। সে এমন বদলে গেল কেন?

শাহানা মা'র ঘর থেকে বের হয়ে আবার বারান্দায় তার টবের গাছগুলির কাছে গেল। সেখান থেকে বসার ঘরে। তার কিছু করার নেই।

বসার ঘরে জহির চুপচাপ বসে আছে। হোসেন সাহেব অতি উৎসাহে হোমিওপ্যাথির গল্প করছেন।

'বুঝলে জহির, যাকে বলে মিরাকল। কিডনিভর্তি গজগজ করছিল পাথর। সবচে বড়োটার সাইজ পায়রার ডিমের মতো। দাস বাবু রোগীকে দিলেন থ্রী হানড্রেড পাওয়ারের কেলিফস। মজার ব্যাপার কী, জান? কিডনির পাথরের জন্যে কিন্তু কেলিফস না।'

'কাজ হল কেলিফসে?'

'হবে না মানে! বললাম না মিরাকল। দু'টা মাত্র ডোজ। প্রথম ডোজের আটচল্লিশ ঘন্টা পর সেকেণ্ড ডোজ। অল ক্লিয়ার।'

'বাহ্ খুব আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য তো বটেই। এক্সরে করে দেখা গেল পাথরের বংশটাও নেই। ভ্যানিশ। অল গন।'

শাহানা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাবার বক্তৃতা শুনল। এমন মজা লাগছে শুনতে। কেমন শিশুর মতো ভঙ্গিতে বাবা কথা বলেন। বিস্মিত হবার কী অসাধারণ ক্ষমতা এই মানুষটির।

হোসেন সাহেব মেয়ের দিকে এক পলক তাকিয়েই ছোট একটা ধমক দিলেন, 'জহিরকে চা–টা কিছু দে। তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?'

শাহানার কাছে এই ধমক বড়ো মধুর লাগল। ঠিক আগের মতো বাবা তাকে ধমক দিলেন। যেন এখনও তার বিয়ে হয় নি। সে এ বাড়িরই একটি

আদুরে মেয়ে, যে কোনো কাজকর্ম শেখে নি। শুধু গল্প শোনে।

আবেগে শাহানার চোখ ভিজে উঠল। সে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

রান্নাঘরে নীলু খুব ব্যস্ত। একটি চুলায় সে ফুলকপির বড়া ভাজছে। অন্যটিতে চায়ের পানি ফুটছে।

'বাবা চা চাচ্ছেন ভাবী।'

'দিচ্ছি। বড়াগুলি হয়ে যাক।'

'চা-টা আমি বানাই?'

'তোমাকে কিছু করতে হবে না। মা'র সঙ্গে গিয়ে গল্প কর।'

'তুমি আজ অফিসে যাও নি?'

'না, আমি দশ দিনের ছুটি নিয়েছি।'

'কেন?'

'অনেক রকম ঝামেলার মধ্যে আছি। কবির মামার জন্যে হাসপাতালে খাবার পাঠাতে হয়। এদিকে মা'র অসুখ। তোমার কিন্তু এক বার কবির মামাকে দেখতে যাওয়া উচিত, শাহানা।'

'যাব। কাল-পরশুর মধ্যে যাব।'

'কবির মামা তোমার কথা আর জহিরের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। নাও, একটা বড়া খেয়ে দেখ তো কেমন হয়েছে। সস দিয়ে মাখিয়ে খাও। কী, ভালো?'

'খুব ভালো হয় নি ভাবী। কেমন যেন ঘাসের মতো লাগছে।'

নীলুর মুখ কালো হয়ে গেল। সে খুব যত্ন করে বানিয়েছে। শাহানা বলল, 'ঠাট্টা করছিলাম ভাবী। খুব চমৎকার হয়েছে।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি। এই যে তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। ছোট ভাবী কোথায়?'

'নিউ মার্কেটে গিয়েছে, এসে পড়বে। যাও তো শাহানা, এগুলি দিয়ে আস। আমি চা নিয়ে আসছি।'

শাহানা ট্রেতে খাবার সাজাতে-সাজাতে বলল, 'এ বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দ করে না, ভাবী।'

নীলু চুপ করে রইল। লক্ষ বার শাহানার মুখে এই কথা তার শুনতে হয়েছে। জবাব দিতে হয়েছে। জবাব শাহানার পছন্দ হয় নি। যে কোনো কারণেই হোক, ব্যাপারটা শাহানার মনে গেঁথে গিয়েছে। এই কাঁটা সহজে তোলা যাবে না।

'ভাবী।'

'শুনছি। বল কী বলবে।'

'মা'র অসুখ হয়েছে, তাঁকে হাসপাতালে নিয় গেছে--এই খবর কেউ আমাকে দেয় নি।'

'সঙ্গে সঙ্গে দেয় নি, কিন্তু দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ দেওয়ার উপায় ছিল না।

তোমার ভাই এবং রফিক, কেউ বাসায় ছিল না। ওরা ফিরেছে অনেক রাতে।'

'ইচ্ছা করলে কিন্তু দেওয়া যেত ভাবী। হাসপাতাল থেকে সহজেই টেলিফোন করতে পারতে। আমার টেলিফোন নাম্বার তোমরা জান।'

'ঝামেলার মধ্যে এটা মনে আসে নি।'

'আমাকে যদি তোমরা পছন্দ করতে, তাহলে ঠিকই মনে আসত।'

নীলু হেসে ফলল। শাহানা শুকনো গলায় বলল, 'ভাইয়া এত বড়ো প্রমোশন পেয়েছে, এই খবরও কিন্তু দাও নি।'

'দিতে চেয়েছিলাম। তোমার ভাইয়া নিষেধ করল। তার স্বভাব তো তুমি জান। কাউকেই কিছু জানাতে চায় না।'

নীলুর কথা শেষ হবার আগেই শাহানা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার রীতিমতো কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেন সে এ বাড়িতে এসেছে। কোনো দরকার ছিল না। কেউ তাকে নিয়ে ভাবে না। সে কেন ভাববে? তার এমন কী গরজ? টুনিকে আনিস ভাইয়ের খবর আনতে পাঠিয়েছিল। সেও ফিরে আসে নি। কেনইবা আসবে? সে তাদের কে? কেউ না।

শাহানা খাবার কিছুই মুখে দিল না। দু' চুমুক চা খেয়ে ছাদে গেল। আনিসের ঘর খোলা। সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হালকা স্বরে বলল, 'আসব আনিস ভাই?'

আনিস নিজের বিস্ময় চাপা দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'আরে কী মুশকিল, এস।'

'করছেন কী?'

'তেমন কিছু না। বস শাহানা।'

'বসবার সময় নেই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চলে যাব। ম্যাজিক নাকি ছেড়ে দিয়েছেন?'

'কে বলল?'

'টুনি। এখন নাকি মাষ্টারি করেন?'

'পাগল হয়েছ! মাষ্টারি করব কোথায়? দু'টো প্রাইভেট টিউশ্যনি জোগাড় করেছি। সন্ধ্যাবেলা তাই করি। খাদ্য জোগাড় করতে হবে না? ম্যাজিক দিয়ে পেটে ভাত আসছে না। একটু বস না শাহানা।'

শাহানা বসল। আনিস বলল, 'চা খাবে? চা বানাব?'

'হুঁ, খেতে পারি। আচ্ছা আনিস ভাই, আপনাকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছিলেন?'

'পেয়েছি।'

'এক বার তো জিজ্ঞেস করলেন না, আমার কী অসুখ হয়েছিল।'

'চোখের সামনে তোমাকে এত সুস্থ দেখছি যে অসুখের কথা আর মনে এল না।'

'এখন অন্তত জিজ্ঞেস করুন।'
'কী হয়েছিল?'
'খুব খারাপ ধরনের অসুখ। আমি বোধহয় বেশি দিন বাঁচব না।'
'কী বলছ তুমি!'
'সত্যি বলছি। বিশ্বাস করুন। এই খবরটা আর কাউকে বলি নি। শুধু আপনাকে বললাম।'
'অসুখটা কী?'
'তা আমি জানি না।'

শাহানা তার মুখ খুব করুণ করতে চেষ্টা করল। যেন তার সত্যি-সত্যি খুব খারাপ একটা অসুখ হয়েছে। মৃত্যু অবধারিত। আর মাত্র অল্প ক' দিন সে বাঁচবে। পৃথিবীর চমৎকার সব দৃশ্য আগের মতোই থাকবে। বর্ষারাতে বৃষ্টি পড়বে ঝমঝম করে। চৈত্র মাসে উথালপাথাল জোছনা হবে। শুধু সে দেখতে পাবে না। ভাবতে-ভাবতে তার চোখে পানি এসে গেল। গাল বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে, কিন্তু আনিস সেটা দেখছে না। সে চা বানানোয় ব্যস্ত। অথচ শাহানার খুব ইচ্ছা, আনিস দৃশ্যটা দেখুক।

আনিস না দেখলেও জহির দৃশ্যটি দেখল। সে ছাদে এসেছিল সিগারেট খাবার জন্যে। আনিসের ঘর খোলা দেখে উঁকি দিয়েই চট করে সরে গেল। ছাদের এক কোণায় দাঁড়িয়ে পরপর দু'টি সিগারেট শেষ করে নিঃশব্দে নেমে গেল। আনিসের খোলা দরজা দিয়ে তার আরেক বার তাকানোর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাকাল না। সব ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। সে নিচে নেমে এল।

বসার ঘরে দ্বিতীয় বার ঢুকতে ইচ্ছা করছে না। হোসেন সাহেবের হোমিওপ্যাথির গল্প তাকে কখনো আকর্ষণ করে নি, আজ আরও করছে না। ঘরে ঢুকলেই তিনি আবার শুরু করবেন। হাসি-হাসি মুখে গল্প শুনতে হবে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে হবে, যাতে মনে হয় খুব আগ্রহ নিয়েই সে শুনছে।

'এই যে জহির, তুমি এখানে?'
'জ্বি।'

হোসেন সাহেবের হাতে মোটা একটা বই। তিনি দ্রুত বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন, 'তোমাকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কেইস হিস্ট্রি পড়ে শোনাই।'
'জ্বি আচ্ছা।'
'বিরক্ত হচ্ছ না তো আবার?'
'জ্বি-না, বিরক্ত হব কেন?'
'আস, ঘরে আস।'

তারা ভেতরে গিয়ে বসল। জহির প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল মুখ হাসি-হাসি রাখতে। হোসেন সাহেব কী বলছেন, তা শুনতে। কিন্তু মন বসছে না। হোসেন সাহেব চোখ বড়ো-বড়ো করে বলছেন, 'বিমলা নামের একটা

মেয়ের কেইস হিস্ট্রি। বয়স একুশ, বিবাহিতা, গাত্রবর্ণ গৌর, একহারা গড়ন, মৃদুভাষী, ভোগী স্বভাব, কিছুটা অলস। পয়েন্টগুলি মন দিয়ে শুনছ তো? প্রতিটি পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ডায়াগনোসিস এই পয়েন্টগুলির উপর হবে।'

'আমি মন দিয়েই শুনছি।'

'আরেক কাপ চা খেয়ে শুরু করা যাক। কী বল তুমি?'

'না, থাক।'

'থাকবে কেন? খাও আরেক কাপ। আমি বৌমাকে বলে আসছি। তোমাকে পেয়ে ভালোই হল। কারো সঙ্গে ডিসকাস করতে পারি না। কেউ উৎসাহ দেখায় না। তোমার ভালো লাগছে না শুনতে?'

'জ্বি, লাগছে।'

'লাগতেই হবে। গল্প-উপন্যাসের চেয়ে এগুলি অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং।'

হোসেন সাহেব চায়ের কথা বলতে গেলেন।

জহিরদের রাতে এ বাড়িতে খাওয়ার কথা ছিল না। নীলুর পীড়াপীড়িতে খেয়ে যেতে হল। অল্প সময়েই ভালো আয়োজন হয়েছে। রফিক নিউ মার্কেট থেকে বিশাল সাইজের কৈ মাছ নিয়ে এসেছে। মটরপোলাও, কৈ মাছ ভাজা এবং ভুনা গোশ্‌ত। খেতে বসে শাহানা বলল, 'আনিস ভাইকে ডেকে নিয়ে এলে কেমন হয়? বেচারা বোধহয় আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খাবে।'

নীলু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল শাহানার দিকে। শাহানা সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝল না। সে হাসিমুখে বলল, 'ভাবী, আনিস ভাইকে আমি ডেকে নিয়ে আসি? তোমাদের খাবারে কম পড়বে না তো আবার?'

নীলু কিছু বলার আগেই জহির বলল, 'কম পড়বে কেন? তোমরা খাওয়া শুরু কর, আমি ডেকে নিয়ে আসছি।'

শাহানা বলল, 'তোমার যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি। যাব আর আসব।'

শাহানা বের হয়ে গেল। জহির তাকিয়ে আছে নীলুর দিকে। নীলু কি তা বুঝতে পারছে? সে এক বারও জহিরের দিকে তাকাচ্ছে না। হোসেন সাহেব বললেন, 'হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন, খাওয়া শুরু কর।'

জহির বলল, 'আনিস সাহেব এলেই শুরু করব।'

আনিসকে পাওয়া গেল না। সে প্রাইভেট ট্যুশানিতে গিয়েছে। শাহানাকে দেখে মনে হল, সে খুব মন খারাপ করেছে। তার মুখ শুকনো। চোখ দু'টি ছায়াচ্ছন্ন।

হোসেন সাহেব বললেন, 'অপূর্ব রান্না হয়েছে বৌমা, অপূর্ব! কৈ মাছ কি আরেকটা নেওয়া যাবে?'

৩৭

রফিকের ধারণা ছিল, মাতাল অবস্থায় লোকজন সত্যি কথা বলে। সে অবশ্যি মাতাল দেখেছে খুব কম। যাদের দেখেছে তাদের সবই কুলি বা রিকশাওয়ালা শ্রেণীর। এদের এক জন কাপড়চোপড় খুলে মেয়েদের দিকে অশ্লীল ভঙ্গি করছিল। এতে আশপাশের পাবলিক খেপে গিয়ে তাকে ধোলাই দিতে শুরু করে। সে হাতজোড় করে বারবার বলতে থাকে--ভাই মাফ করেন। আর জীবনে মদ খামু না। এই কানে ধরলাম ভাই। দ্বিতীয় মাতালটি একটি ঠেলাগাড়ির উপর বসে বেশ করুণ সুরে গান গাচ্ছিল। ঠেলাওয়ালা সবাইকে হাসিমুখে বলতে-বলতে যাচ্ছে--ব্যাটা মদ খাইছে। ঠেলাওয়ালাকে খুব হাসিখুশি মনে হচ্ছিল। এক জন মাতাল তার গাড়িতে বসে সবার চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করছে, এটা বোধহয় তাকে খুব আনন্দ দিচ্ছিল। পাবলিকও দৃশ্যটিতে মজাই পাচ্ছিল।

মাতালরা সত্যবাদী হয়, এ-রকম ধারণা হবার মতো কোনো কারণ রফিকের জানা ছিল না। তবু কেন জানি সে এটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরেই নিয়েছিল। ইদরিসের ব্যাপারটা সেই কারণে তাকে চিন্তায় ফেলে দিল। ব্যাটার মতলবটা কী?

বেশ কয়েক বার যাওয়া-আসা করেও তার মতলব পরিষ্কার হল না। বরং মনে হল সত্যি সত্যি ইদরিস রফিকের জন্যে কিছু করতে চায়। ব্যাঙ্কলোনের জন্যে ক্লান্তিহীন ছোটাছুটিও সে বেশ আগ্রহ নিয়ে করছে। তার চেয়েও অদ্ভুত কথা, মাতাল অবস্থায় ঐ রাতে সে যা বলেছে, তার কোনটিই দেখা গেল সত্যি নয়। ধারদেনা তার একেবারেই নেই। মদ সে সপ্তাহে এক দিনই খায়, তাও নিজের পয়সায় নয়, অন্যদের পয়সায়।

কাঞ্চন বলে একটা মেয়ের অস্তিত্ব অবশ্যি আছে। কলগার্ল ধরনের মেয়ে। ইদরিস তার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মেয়েটিকে প্রায়ই ক্লায়েন্টের কাছে পাঠায়। কাঞ্চন সেই উপলক্ষে মোটা কমিশন পায়। ব্যাপার এইটুকুই।

রফিক এক দিন বেশ অবাক হয়েই বলল, 'মাতল অবস্থায় তুই ভাহা মিথ্যা কথাগুলি বললি?'

ইদরিস হাসিমুখে বলল, 'সত্যি কথা বলব আমি? পাগল হয়েছিস? ব্যবসা করে খাই না? সত্যি কথা বললে ভাত জুটবে?'

'ব্যবসায়ী হলেই সারাক্ষণ মিথ্যা কথা বলতে হবে?'

'তা তো হবেই। সত্যি কথাগুলিও এমনভাবে বলতে হবে, যাতে শুনলে মনে হবে মিথ্যা। হা হা হা। তারপর যখন ব্যবসা ফুলেফেঁপে বিশাল হয়ে যাবে, তখন কথাবার্তা বলা একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। তখন কথা বলবে ভাড়া-করা লোক। বুঝতে পারছিস?

'এখনও পারছি না, তবে চেষ্টা করছি।'

'বিরাট ব্যবসায়ীরা দেখবি ব্যবসা নিয়ে একেবারেই কথাবার্তা বলে না। তারা কথাবার্তা বলে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে।'

'তাই নাকি?'

'তোকে এক দিন এ-রকম এক জনের কাছে নিয়ে যাব। বিড়ির বিজনেস করে লাল হয়ে গেছে। এখন রবীন্দ্রচর্চা করে। বিরাট এক প্রবন্ধও লিখেছে—রবীন্দ্রকাব্যে মুসলমানি শব্দ।'

'পয়সা হয়েছে বলেই সে রবীন্দ্রচর্চা করতে পারবে না, এমন তো কোনো কথা নেই।'

'তা নেই। রবীন্দ্রচর্চা, পিকাসোচর্চা, সব চর্চার মূল হচ্ছে টাকা। এইটা থাকলে সব কলার চর্চা করা যায়।'

ইদরিসের যোগাযোগ এবং কাজ করবার, কাজ গোছাবার কায়দা দেখে রফিক সত্যিকার অর্থেই মুগ্ধ। একটি পয়সা অ্যাডভান্স না দিয়ে সে মতিঝিলে রফিকের জন্যে দু' কামরার এক অফিস জোগাড় করে ফেলল। টি এণ্ড টির বড়ো বড়ো কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সে কী বলল কে জানে তাঁরা আশ্বাস দিলেন এক মাসের মধ্যে টেলিফোন লাইন পাওয়া যাবে। ফার্নিচারের দোকান থেকে বাকিতে ফার্নিচার চলে এল। রফিক মুখ শুকনো করে বলল, 'আমার তো ভাই ভয়-ভয় লাগছে, সামাল দেব কী ভাবে?'

'সামাল দেওয়ার লোকও তোর জন্যে ব্যবস্থা করেছি। এই লাইনের মহা ঘাগু লোক। তোর নতুন ম্যানেজার। নাম হল সাদেক আলি। তবে ব্যাটাকে বিশ্বাস করবি না। তোর বিশ্বাস অর্জনের সব চেষ্টা সে করবে। তুইও ভাব দেখাবি যে বিশ্বাস করছিস, কিন্তু আসলে না।'

'এ-রকম একটা লোককে তুই আমার সঙ্গে গেঁথে দিচ্ছিস কেন?'

'তোর ভালোর জন্যেই দিচ্ছি। সাদেক আলি তোর ফার্মকে দাঁড় করিয়ে দেবে। যখন দেখবি তুই নিজে মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছিস, তখন ব্যাটাকে লাথি দিয়ে বের করে দিবি।'

'এটা কেমন কথা?'

'খুবই জরুরি কথা। নয়তো ব্যাটা তোর সর্বনাশ করে ভাগবে।'

রফিক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। সব কিছু হচ্ছে ঝড়ের গতিতে। এটা কি ঠিক হচ্ছে? শেষ পর্যন্ত বড়ো রকমের ঝামেলায় পড়তে হবে না তো? আমও যাবে ছালাও যাবে। তার ভরাডুবি কি আসন্ন?

এইসব কথাবার্তা সে অবশ্যি বাসায় কিছুই বলে নি। শারমিনের সঙ্গেও নয়। শারমিনের সঙ্গে তার একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছে। সন্ধির কোনো রকম ইশারাও পাওয়া যাচ্ছে না। রাতে দু' জন দু' দিকে ফিরে ঘুমায়। এই অবস্থায় ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা জমে না। তাছাড়া শারমিনের সন্দেহ-বাতিক আছে। এক লক্ষ প্রশ্ন করবে--কেন তোমার 'এই বন্ধু তোমার জন্যে এত কিছু

করছে? তার স্বার্থ কী? তোমার কত দিনের বন্ধু? কই, আগে তো তার নাম শুনি নি। তার আসল মতলবটা কী?

এই জাতীয় প্রশ্ন রফিকের মনেও আছে বলেই সে অন্য কারো মুখ থেকে শুনতে চায় না। তারচে যেভাবে এগোচ্ছে এগোক।

নীলুর সঙ্গে এক বার অবশ্যি কিছু কথা হয়েছে। তাও ভাসা-ভাসা কথা। যেমন একদিন রফিক বলল, 'Arron International নামটা তোমার কেমন লাগে ভাবী?'

'ভালোই লাগে।'

'এটা হচ্ছে আমার ফার্মের নাম।'

'ফার্ম আবার কবে দিলে?'

'দিই নি এখনও। দেব।'

'ও, তাই বল। এখনও পরিকল্পনার স্টেজে আছে।'

'হুঁ, তবে খুব শিগগিরই ড্রামাটিক একটা ডিক্লেরেশন আমার কাছ থেকে শুনতে পাবে। তখন আকাশ থেকে পড়বে।'

'তোমার সব ডিক্লেরেশনই তো ড্রামাটিক।'

রফিক আর কিছু বলল না। বেশি কিছু বলতে সাহসও হল না। যদি ব্যাঙ্কলোন শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায়? তরী সাধারণত তীরে এসেই ডোবে। মাঝনদীতে ডোবে না।

রফিক চিন্তিত মুখে ঘুরে বেড়ায়। ব্যাঙ্কলোন নিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে তার নতুন ম্যানেজার--সাদেক আলি। ভালোমানুষের মতো চেহারা। মনে হয় বুদ্ধিবৃত্তি পুরোপুরি বিকশিত হয় নি। অথচ রফিক এর মধ্যেই বুঝেছে--এ মহা ধুরন্ধর।

সাদেক আলিকে নিয়েও রফিক সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় ভোগে। তার রাতে ভালো ঘুম হয় না। বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। সেই দুঃস্বপ্নগুলিরও কোনো আগামাথা নেই। একটা স্বপ্ন ছিল এ-রকম--সে এবং সাদেক আলি প্রাণপণে ছুটছে। দু'জনের গায়েই কোনো কাপড় নেই। তাদের তাড়া করছে বাবলুর বয়েসী একদল ছেলে। সাদেক আলি বারবার বলছে--এরা বড় যন্ত্রণা করছে। স্যার, বন্দুক দিয়ে একটা গুলী করেন।

এই জাতীয় স্বপ্নের কোনো মানে হয়?

হোসেন সাহেব বসার ঘরে ঢুকে দেখলেন মাঝবয়েসী এক জন অপরিচিত লোক বসে আছে। লোকটি খুব কায়দা করে সিগারেট টানছে এবং পা নাচাচ্ছে। হোসেন সাহেবকে দেখে সিগারেট ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিস্মিত হোসেন সাহেব বললেন, 'জনাব, আপনার নাম?'

'স্যার, আমার নাম সাদেক আলি।'

বলতে-বলতে লোকটি এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। তিনি

হকচকিয়ে গেলেন। বিব্রত কণ্ঠে বললেন, 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।'

'আমি দি অ্যারন ইন্টারন্যাশনালের জেনারেল ম্যানেজার।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা।'

'স্যার কি আছেন?'

'শফিক তো চিটাগাং গিয়েছে।'

'আমি রফিক স্যারের কাছে এসেছিলাম।'

'ওর কাছে কী জন্যে?'

'দি অ্যারন ইন্টারন্যাশনালের ব্যাঙ্কলোন পাওয়া গেছে, এই সুখবরটা স্যারকে দেবার জন্যে এসেছিলাম।'

হোসেন সাহেব কিছুই বুঝলেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'বেশিক্ষণ বসতে পারব না। স্যারকে খবরটা দিয়ে দেবেন। স্যার এটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন।'

'কী খবর দেব?'

'বলবেন, ব্যাঙ্কলোনটা হয়েছে।'

'জ্বি আচ্ছা, বলব। একটু চা খান।'

'চা আমি খাই না, তবে আপনি মুরুব্বি মানুষ বলছেন, এই জন্যই খাব।'

সাদেক আলি কিছুক্ষণের মধ্যেই জমিয়ে ফেলল। হোসেন সাহেবের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হল যে, দেশ থেকে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা তুলে দেওয়া দরকার। প্রতি ডিসট্রিক্টে থাকা দরকার একটা করে হোমিও হাসপাতাল। দরকার একটি হোমিও ইউনিভার্সিটির। হোসেন সাহেব লোকটির আদব-কায়দা ও ভদ্রতায় মুগ্ধ হলেন। রাতে ভাত খাবার সময় নীলুকে বললেন, 'ম্যানেজার সাহেব বিশিষ্ট ভদ্রলোক।'

'কোন ম্যানেজার?'

'সাদেক আলি সাহেব। রফিকের কাছে ব্যাঙ্কের কী-একটা কাজে এসেছে। আমার তো মা মনে থাকবে না। তুমি রফিককে বলে দিও।'

'কী বলব?'

'ম্যানেজার সাহেব এসেছেন, এটা বললেই হবে।'

রফিক এল রাত এগারটার দিকে। সে হাসপাতালে কবির মামাকে দেখতে গিয়ে আটকা পড়ে গিয়েছিল। কবির মামার জ্বর হঠাৎ বেড়ে গেছে। আবোলতাবোল কথা বলছেন। অনেকটা বক্তৃতার ঢং। সাধু ভাষার বক্তৃতা--সুধী সমাজের নিকট আকুল আবেদন। হে বন্ধু হে প্রিয়। সংযত হোন। যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করুন। শরৎকালের এই সুন্দর মেঘমুক্ত প্রভাত....

রফিক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'ব্যাপার কী?' মাঝবয়েসী এক জন ডাক্তার শুকনো মুখে বললেন, 'বুঝতে পারছি না, ডিলেরিয়াম মনে হচ্ছে। ডিলেরিয়াম হবার মতো জ্বর তো নয়। এক শ দুই।'

'কিছু একটা করুন। মামার এই কুৎসিত বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে না। হাসি এসে যাচ্ছে। এখানে হাসা ঠিক হবে না।'

ডাক্তার বিরক্ত মুখে তাকালেন।

'আপনি রোগীর কে হন?'

'ভাগ্নে হই।'

'আমার মনে হয়, রোগীকে বাড়ি নিয়ে ফ্যামিলির কেয়ারে রাখাই ভালো।'

'শেষ অবস্থা নাকি?'

'কী ধরনের কথা বলছেন? শেষ অবস্থা হবে কেন?'

'এখনি বাড়ি নিয়ে যেতে বলছেন। এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি।'

'কাল–পরশু নিয়ে যান।'

'সেখানে যদি এ–রকম বক্তৃতা শুরু করেন, তখন কী করব?'

ডাক্তার সাহেব বেশ কিছু সময় কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'দয়া করে আমার সঙ্গে রসিকতা করবেন না। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন।'

'বাইরে তো বসার কোনো ব্যবস্থা নেই।'

'বসার ব্যবস্থা না–থাকলে হাঁটাহাঁটি করুন।'

রফিক আর কথা বাড়াল না। হাসপাতালের বারান্দায় রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। ফেরার আগে দেখে এল কবির মামা শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। এখন সে বাড়ি চলে গেলে দোষ হবে না।

দরজা খুলে দিল শারমিন। শারমিনের মুখ গম্ভীর। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সে হাই চাপতে–চাপতে বলল, 'খাবে?' না খেয়ে এসেছ?'

রফিক তার জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকল। তাদের দু' জনের মধ্যে এখন কথাবার্তা প্রায় নেই বললেই হয়। প্রায় রাতেই রফিক বাড়ি ফিরে দেখে শারমিন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজই ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটল। এখনও জেগে আছে।

শারমিন তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। রফিককে তোয়ালে এগিয়ে দিতে–দিতে বলল, 'ভাত খাবে?'

'হ্যাঁ, খাব। তোমার থাকার দরকার নেই, ঘুমিয়ে পড়। যা হয় আমিই ব্যবস্থা করব।

'তোমাকে একটি কথা বলার জন্যে জেগে আছি।'

'বল।'

'খেতে বস, বলছি।'

'সিরিয়াস কিছু?'

'না, খুবই সাধারণ। তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা কী বলব?'

খুবই সাধারণ কথাগুলি রফিক শুনল। হ্যাঁ–না কিছুই বলল না। শারমিনের বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে সে পি–এইচ.ডি করার জন্যে দেশের বাইরে যাবে। খাওয়া এবং ঘুমানোর এই রুটিন তার আর ভালো লাগছে না।

রফিক হাত ধুতে–ধুতে বলল, 'যাবে কী ভাবে?'

শারমিন বলল, 'অন্য সবাই যেভাবে যায় সেইভাবেই যাব। প্লেনে করে। হেঁটে–হেঁটে যাওয়া তো সম্ভব নয়।'

'সব ঠিকঠাক নাকি?'

'মোটামুটি ঠিকঠাক বলতে পার। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ফরেন স্টুডেন্ট এ্যাডভাইজার আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন, আমার একটা টিচিং এ্যাসিসটেন্টশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'চিঠি কবে এসেছে?'

'সপ্তাহখানেক আগে।'

'এই এক সপ্তাহ বসে–বসে ভাবলে?'

'হ্যাঁ। আমি ঘুমুতে গেলাম। তুমি বাতি নিবিয়ে এস।'

রফিক বসার ঘরে দীর্ঘ সময় বসে রইল। এক বার ভাবছিল জিজ্ঞেস করবে--ব্যবস্থা কে করে দিলেন, সাব্বির সাহেব? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। সাব্বির প্রসঙ্গে সে কোনো দিন কিছু বলবে না, এ–রকম প্রতিজ্ঞা এক বার করেছে। প্রতিজ্ঞা করা হয় প্রতিজ্ঞা ভাঙার জন্যেই। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা সে ভাঙবে না। তার চা খেতে ইচ্ছে করছে। রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই বানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু আলসে লাগছে। ঘুম–ঘুমও পাচ্ছে, যদিও সে জানে বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম পালিয়ে যাবে। তার পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমুবে শারমিন। তার গায়ে হাত রাখলে ঘুমের ঘোরেই সে হাত সরিয়ে দিয়ে বিরক্ত গলায় বলবে- 'আহা!' তারচে এখানে বসে–বসে মশার কামড় খাওয়াই ভালো।

অনেক রাতে নীলু টুনিকে বাথরুম করবার জন্যে দরজা খুলল।

'কী ব্যাপার রফিক, জেগে আছ যে?'

'ঘুম আসছে না ভাবী।'

'তোমার কাছে কে যেন এসেছিল। কী এক ম্যানেজার। বাবার সঙ্গে গল্প করছিল।'

রফিক কোনো রকম উৎসাহ দেখাল না। ক্লান্ত গলায় বলল, 'শারমিন তোমাকে কি কিছু বলেছে ভাবী?'

'কোন প্রসঙ্গে?'

'বাইরে যাবার ব্যাপারে।'

'না তো! কোথায় যাচ্ছে?'

রফিক জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল। বাতি নেভাতে–নেভাতে বলল 'সকালে বলব।'

যা ভাবা গিয়েছিল তাই। ঘুম আসছে না। পাশেই শারমিন। গায়ের সঙ্গে গা লেগে আছে, তবুও দু' জনের মধ্যে অসীম দূরত্ব। এই দূরত্বকে কমানোর কোনোই কি উপায় নেই? রফিক ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল। কবির

মামার কথাটা ভাবীকে বলা হয় নি। তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। ঝামেলার উপর ঝামেলা।

রফিক একটু লজ্জিত বোধ করল। নিজের সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য সব এখন ঝামেলা।

নীলুও জেগে আছে। শফিক বাড়িতে না থাকলে তার এ-রকম হয়। সারাক্ষণ একটা চাপা ভয় বুকের উপর বসে থাকে। মনে হয় এ বাড়িতে যেন কোনো পুরুষমানুষ নেই। বড়ো কোনো বিপদ-আপদ হলে কে সামলাবে? হয়তো আগুন লেগে গেল, চোর এল বাড়িতে, কিংবা ডাকাত পড়ল। তখন কী হবে?

নীলু মাঝে মাঝে ভাবে সব মেয়েরাই কি তার মতো ভাবে? এই নির্ভরশীলতার কারণটা কী?

টুনি শক্ত করে তার গলা চেপে ধরে আছে। ফাঁসের মতো লাগছে। বিশ্রী অভ্যাস মেয়েটার। ঘুমের সময় হাতের কাছে যা পাবে তাই শক্ত করে ধরবে। নীলু ক্ষীণ স্বরে বলল, 'টুনি ঘুমাচ্ছিস?'

টুনি জবাব দিল না।

'হাতটা একটু আলগা কর মা। দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

টুনি আরো শক্ত করে গলা চেপে ধরল। ঘুমের ঘোরেই বলল, 'কমলা খাব না। বললাম তো খাব না।'

৩৮

কবির মামা বাড়ি ফিরে এসেছেন। বাড়ি মানে নিজের বাড়ি নয়--নীলুদের ভাড়াটে বাসা। এ বাসায় কত অসংখ্য বার তিনি এসেছেন, এমনও হয়েছে টানা এক মাস কেটে গেছে--নড়ার নাম নেই। কিন্তু এ-বার এসে কিছুটা অদ্ভুত আচরণ করছেন। যেন তিনি অপরিচিত একটা জায়গায় এসেছেন-লোকজন ভালো চেনা নেই। শারমিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, বাথরুমটা কোন দিকে?' বাথরুম কোন দিকে তাঁর না-জানার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্নের ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে তিনি জানেন না।

রাতে খাবার টেবিলে বসলেন, কিন্তু কিছু মুখে দিলেন না। মনোয়ারা বললেন, 'ভাইজান, আপনাকে দু'টা রুটি বানিয়ে দেবে?' তিনি বললেন--'জ্বি-না। আপনাদের কষ্ট দিতে চাই না।'

মনোয়ারার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ভাইজান তাঁর সঙ্গে আপনি-আপনি করছেন কেন? তিনি তাকালেন নীলুর দিকে। নীলু বলল, 'মামা, আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে?'

'না। আমি ভালো।'

'মামা আসুন আপনাকে শুইয়ে দি। দুধ গরম করে দিচ্ছি। দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ুন।'

কবির মামা নিঃশব্দে উঠে পড়লেন। তাঁর খুব খারাপ লাগছে। তিনি এ-রকম করছেন কেন? তাঁর গায়ে জ্বর নেই। এ-রকম করার তো কথা নয়।

মাখন-লাগানো দু' স্লাইস রুটি আর এক গ্লাস দুধ নিয়ে নীলু কবির মামার ঘরে ঢুকল।

মৃদু স্বরে ডাকল, 'মামা।'

'আয় বেটি। আয়।'

'আপনার জন্যে রুটি আর দুধ এনেছি।'

'রেখে দাও মা। খিদে পেলে খাব।'

'না, আপনাকে এখনই খেতে হবে। আপনাকে খাইয়ে তারপর আমি যাব।'

কবির মামা একটু হাসলেন, তারপর নেহায়েত যেন নীলুকে খুশি করবার জন্যেই পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুধে ডুবিয়ে মুখে দিতে লাগলেন।

'মাখন দেয়া রুটি মামা, দুধে ডোবাচ্ছেন কেন?'

'নরম হয়, খেতে সুবিধা।'

'আপনার খেতে ইচ্ছা না-হলে খাবেন না মামা। শুধু দুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলুন।'

তিনি বাধ্য ছেলের মতো দুধ খেয়ে ফেললেন।

'পান খাবেন মামা? একটু পান এনে দিই। মুখের মিষ্টি-মিষ্টি ভাবটা যাবে।'

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 'পান তো আমি খাই না। ঠিক আছে, তোমার যখন ইচ্ছা, দাও।'

পান এনে নীলু দেখল মামা চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। চোখ বন্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধহয়। সে চাপা গলায় বলল, 'মামা ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'না, জেগে আছি। দাও, পান দাও। আর একটু বস আমার পাশে।'

নীলু বসল। তিনিও উঠে বসলেন। নরম গলায় বললেন, 'আচ্ছা মা, তোমার বিয়েতে কি আমি কিছু দিয়েছিলাম?'

নীলু বিস্মিত হয়ে বলল, 'হঠাৎ এই কথা কেন মামা?'

'না, মানে, হঠাৎ মনে হল। এ জীবনে তোমার কাছ থেকে শুধু সেবাই নিয়েছি। কিছু ফেরত দেয়া হয় নি।'

'আপনার ভালোবাসা যা পেয়েছি, সেটা বুঝি কিছু না মামা? তা ছাড়া আপনার মনের শান্তির জন্যেই বলছি, আপনি বিয়েতে খুব দামী একটা শাড়ি দিয়েছিলেন। নীল রঙের একটা কাতান। চার শ' টাকা দাম ছিল শাড়িটার। তখন চার শ টাকায় একটা গয়না হয়ে যেত।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ মামা। আমার বিয়ের শাড়ির দাম ছিল তিন শ' টাকা। আমার বড়ো বোন বললেন, বিয়ের শাড়িটা থাক, এইটা দিয়েই বৌ সাজিয়ে দিই।'

কবির মামা গভীর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই করা হল বুঝি?'

'না মামা। বিয়েতে নাকি লাল শাড়ি পরতে হয়, তাই সবাই মিলে আমাকে লালটা পরাল। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা করছিল নীলটা পরতে।'

কবির মামা হাসতে লাগলেন। কোনো এক বিচিত্র কারণে এই গল্পে তিনি খুব আনন্দ পাচ্ছেন। তাঁর চোখেও পানি এসে যাচ্ছে। যদিও চোখে পানি আসার মতো গল্প এটা না।

'মামা।'

'বল মা।'

'তখন তো আপনার নীলগঞ্জ ছিল না, টাকাপয়াসা যা পেতেন আমাদের পেছনেই খরচ করে ফেলতেন। শুয়ে পড়ুন মামা।'

'রফিক কি বাসায় আছে মা?'

'জ্বি, আছে। এই কিছুক্ষণ আগে এসেছে।'

'ওকে কি একটু আমার কাছে পাঠাবে?'

'পাঠাচ্ছি।'

রফিক খেতে বসেছে। কবির মামা ডেকেছেন শুনে মুখ বাঁকা করে বলল, 'ওল্ড ম্যান আমার কাছে কী চায়? এখন যেতে পারব না।'

নীলু বলল, 'চট করে "না" বলে ফেল কেন? এক জন অসুস্থ মানুষ ডাকছে, তুমি যাবে না?'

'শুধু ভ্যাজরভ্যাজর করবে।'

'যদি করে, হাসিমুখে শুনবে সেই ভ্যাজরভ্যাজর।'

'তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন ভাবী? আমি তো জাস্ট কথার কথা হিসেবে বলেছি। তুমি খুব ভালো করে জান আমি মুখে "না" বললেও কবির মামাকে দেখতে ঠিকই যাব। হাসিমুখে তাঁর সব ফালতু কথা শুনব। যে ক'দিন উনি হাসপাতালে ছিলেন, আমি কি রোজ তাঁকে দেখতে যাই নি?'

নীলু লজ্জা পেয়ে গেল। রফিক ভাত শেষ না-করেই উঠে পড়েছে। নীলু বলল, 'তুমি কি আমার উপর রাগ করলে রফিক?'

'না, তা করি নি। আমি তো মেয়েমানুষ না যে কথায়-কথায় রাগ করব। আর যদি করিও তাতে কার কী যায় আসে?'

রফিক কবির মামার ঘরে ঢুকল।

'মামা জেগে আছ?'

'বস রফিক।'

'বসব না। যা শোনবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনব। বল কী বলবে?'

'তুই আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবি?'

'কোন জায়গায়?'

'আগে বল নিয়ে যাবি কিনা?'

'নিয়ে যাব।'

বারাসাতে যাব। ঐখানে আমাকে নিয়ে যা।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'চব্বিশ পরগণা জেলা।'

'ইণ্ডিয়া?'

'হ্যাঁ। বেনাপোল বর্ডার দিয়ে…।'

'তুমি কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে নাকি মামা!

'জন্মস্থান দেখতে ইচ্ছা করছে। আমি আর বাঁচব না।'

'তুমি একা কেন, আমরা কেউ বাঁচব না। জন্মস্থান দেখলে হবেটা কী? ঐখানে গিয়ে মরতে চাও?'

তিনি জবাব দিলেন না। রফিক খাটে বসল। নরম স্বরে বলল, 'জন্মস্থানে মরতে যেমন কষ্ট, বিদেশে মরতেও ঠিক সে-রকম কষ্ট। মরার কষ্ট সব জায়গায় সমান।'

'তুই তাহলে নিতে পারবি না?'

'না মামা, পারব না। পাসপোর্ট-ফাসপোর্টের অনেক ঝামেলা। আমার মনে হয় মরতে চাইলে তুমি তোমার সুখী নীলগঞ্জেই মর। সেটাই ভালো হবে।'

তিনি হেসে ফেললেন। রফিকও হাসল। হাসতে-হাসতেই বলল, 'তুমি আবার আমার উপর রাগ করলে না তো?'

'না, তোর কোনো কথায় আমি রাগ করি না।'

'খুব ফালতু কথা বলি, এই জন্যে?'

'তাও না। তোর কথাবার্তা ঠিকই আছে। তোর কথাবার্তা আমার পছন্দ। যা শুয়ে পড়।'

'বারাসাতে যেতে চাচ্ছ কেন?'

'মনটা হঠাৎ টানছে। হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে অনেক ভেবেছি। বারাসাতে শৈশব কেটেছে। একটা বিরাট পুকুর ছিল, নাম হল গিয়ে ভূতের পুকুর। ছোটবেলায় ভূত দেখার জন্যে এর পাড়ে বসে থাকতাম।'

'দেখেছ?'

'না, দেখি নি।'

'মামা আমার কথা শোন—এখন যদি যাও, তোমার খুবই খারাপ লাগবে। দেখবে, সব বদলে গেছে। ভূতের পুকুর হয়তো ভরাট করে দালান তুলেছে। এরচে শৈশবের স্মৃতিটাই থাকুক।'

কবীর মামা শুয়ে পড়লেন। রফিক মশারি গুঁজে দিতে-দিতে বলল, 'এর পরেও যদি তোমার যেতে ইচ্ছে করে, তাহলে কী আর করা, নিয়ে যাব। কী, ইচ্ছে করে?'

তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ করে।'

রফিক নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'মাস তিনেক তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে মামা। আমি একটা কাজ শুরু করেছি। একটু গুছিয়ে নিই।'

'কী কাজ?'

'ব্যাবসা। মতিঝিলে রুম নিয়েছি। কাউকে কিছু বলি নি। বুধবারে বলব। সবাইকে অফিস দেখিয়ে আনব। তুমি থাকছ তো বুধবার পর্যন্ত?'

'থাকব। দেখে যাই তোর কাণ্ডকারখানা।'

'মামা, এখন যাই?'

'আচ্ছা যা। বাতি নিভিয়ে যা।'

শারমিন জেগে আছে। আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। মেয়েদের চুল বাঁধার দৃশ্যটি বেশ সুন্দর। দেখতে ভালো লাগে। রফিক খানিকক্ষণ দেখল। ছন্দবদ্ধ ব্যাপার। চিরুনি উঠছে–নামছে। ওঠা–নামা হচ্ছে নির্দিষ্ট তালে। রফিক সিগারেট ধরাল। শারমিন বলল, 'দয়া করে সিগারেটটা বাইরে গিয়ে খাও।'

'কেন?'

'ঘরে কুৎসিত গন্ধ হয়, আমার ভালো লাগে না।'

'গন্ধ তো আগেও হত, তখন তো কিছু বল নি।'

'তখন বলি নি বলে কখনও বলতে পারব না এমন তো কোনো কথা নেই। এখন বলছি।'

রফিক সিগারেট ফেলে দিল। যেন কিছুই হয় নি এমন ভঙ্গিতে শারমিন চুল বাঁধা শেষ করে উঠল। দরজা বন্ধ করে বাতি নেভাল। মশারি ফেলে হালকা গলায় বলল, 'তুমি কি ঘুমুবে, না আরো কিছুক্ষণ জেগে বসে থাকবে?'

'ঘুমুব।'

বিছানায় উঠতে–উঠতে শারমিন বলল, 'তোমার মতিঝিলের অফিস স্টার্ট হচ্ছে কবে?' রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, 'অফিসের খবর তুমি কোথায় পেলে?'

'কেন, এটা কি গোপন কিছু?'

'না, গোপন কিছু না। কাউকে তো বলি নি। তুমি জানলে কী ভাবে? কে বলল?'

'আজ বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাবা বললেন।'

'তিনি জানলেন কোত্থেকে?'

'তিনি জানবেন না কেন? সব তো তাঁরই করা। বেকার জামাই বোধহয় সহ্য হচ্ছিল না। দূর থেকে কলকাঠি নাড়লেন।'

রফিক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এই সম্ভাবনা তার মাথায় আসে নি। রহস্য

পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। কেন সব এমন ঘড়ির কাঁটার মতো সহজে হচ্ছিল, এটা বোঝা গেল।

শারমিন বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে অধিক শোকে পাথর। শ্বশুরের সাহায্য নিতে চাও না?'

রফিক সে প্রশ্নের জবাব দিল না। বারান্দায় চলে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে সিগারেট টানবে। মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবে। ঘুমুতে যাবে অনেক রাতে। যখন যাবে, তখন দেখবে শারমিন পরম তৃপ্তিতে ঘুমুচ্ছে। তার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসবে না। নানান আজে-বাজে চিন্তা তার মাথায় ভিড় করবে। একেক দিন একেক জিনিস নিয়ে সে ভাবে। আজ ভাববে শারমিন হঠাৎ করে বাবার কাছে কেন গেল? পিতা-কন্যার মিলন তাহলে হয়েছে। কীভাবে হল কে জানে! শারমিন নিশ্চয়ই কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, খুব ভুল করেছি বাবা। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আর কোনোদিন তোমার অবাধ্য হব না। তুমি যা বলবে তাই শুনব। এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা কর।

কবির মামার জ্বর পুরোপুরি ছাড়ল না। সকালের দিকে সুস্থ থাকেন। বিকেল থেকেই কাতর। গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে। ম্যালেরিয়ার রোগীর মতো লেপ জড়িয়েও শীত মানানো যায় না, যদিও অসুখটা ম্যালেরিয়া নয়। ডাক্তাররা নিঃসন্দেহ, জীবাণুঘটিত কিছু নয়। হোসেন সাহেব এই জ্বর নিয়ে খুব উত্তেজিত। তাঁর ধারণা, এক সপ্তাহ চিকিৎসা করবার সুযোগ দিলে তিনি হোমিওপ্যাথি যে কী, তা প্রমাণ করে দেবেন। এই সুযোগ তিনি পাচ্ছেন না। কবির মাষ্টার পরিষ্কার বলেছেন, 'সারা জীবন যে-কয়েকটা জিনিস অবিশ্বাস করে এসেছি, হোমিওপ্যাথি হচ্ছে তার একটা। এখন শেষ সময়ে যদি হোমিওপ্যাথিতে সেরে উঠি, সেটা খুব দুঃখজনক হবে। আমাকে অবিশ্বাস নিয়েই মরতে দাও।'

হোসেন সাহেব হাল ছাড়লেন না। নীলুর সঙ্গে পরামর্শ করে গোপনে কবির মাষ্টারের খাবার পানিতে এক পুরিয়া 'কেলিফস' মিশিয়ে দিলেন। নীলুকে বললেন, 'এক ডোজেই কাজ হবে। দেখবে আজ আর জ্বর আসবে না। এক শ' টাকা তোমার সঙ্গে বাজি।'

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যি সত্যি জ্বর এল না। আনন্দে ও উত্তেজনায় হোসেন সাহেব অন্য রকম হয়ে গেলেন। রান্নাঘরে ঢুকে নীলুকে বললেন, 'কী, যা বলেছিলাম তা হল? বিশ্বাস হল আমার কথা? এত যে তোমাদের অবিশ্বাস! আশ্চর্য!' নীলু হেসে ফেলল।

'আমার অবিশ্বাস নেই তো!'

'আছে আছে, তোমারও আছে; সবই বুঝি। টুনির মাথাব্যথা হচ্ছিল, সেই চিকিৎসা কি করিয়েছ আমাকে দিয়ে? অবিশ্বাস কর আর যাই কর, চিকিৎসাটা এক বার তো করিয়ে দেখবে? দেখা উচিত নয়?'

'জ্বি বাবা, উচিত।'

'আমি মা চিন্তা করছি একটা ঘর ভাড়া করে প্রফেশন্যাল চিকিৎসা শুরু করব। ফার্মেসি দেব। তুমি একটা নাম ঠিক কর ফার্মেসির।'

হোসেন সাহেব হৃষ্টচিত্তে রান্নাঘর থেকে বেরুলেন। টুনি ও বাবলু বইপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের বললেন, 'তোরা নিজে নিজে পড়, আজ আমি ব্যস্ত। কাজ আছে।' তিনি হোমিওপ্যাথির বই খুলে বসলেন।

তাঁর আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। ভোররাতে কবির মামার প্রচণ্ড জ্বর এল। জ্বরের ঘোরে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মাঝে মাঝে উঠে বসেন, শূন্যদৃষ্টিতে সবারদিকে তাকান। গম্ভীর গলায় বলেন, 'হে বন্ধু হে প্রিয়। দেশের দরিদ্র বন্ধু আমার। হে আমার প্রিয় বন্ধু। আজ এই শরতের মেঘমুক্ত প্রভাত---।'

কিছুক্ষণ প্রলাপ বকেন, তারপর আবার সহজ–স্বাভাবিক কথাবার্তা। যেন কিছুই হয় নি। নীলুকে বললেন, 'বৌমা, আমার জ্বরটা একটু কমলেই কিন্তু আমি নীলগঞ্জ রওনা হব। সেখানে বড়ো কোনো ঝামেলা হয়েছে।'

নীলু বলল, 'কোনো ঝামেলা হয় নি মামা। আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন। মাথায় পানি ঢালছি।'

'ঝামেলাা হয়েছে মা, খুব ঝামেলা, নয়তো শওকত আসতো। এত দিন হয়ে গেছে ঢাকায় আছি, কিন্তু শওকতের কোনো খোঁজ নেই।'

'আপনি এখন কথা বলবেন না তো মামা। প্লিজ।'

কবির মামা চোখ বন্ধ করে আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন, "হে বন্ধু হে প্রিয়। হে দেশবাসী। হে আমার দরিদ্র বন্ধু।---"

রফিক ডাক্তার আনেতে গেল।

হোসেন সাহেব হতভম্ব হয়ে বিছানার পাশে বসে রইলেন। টুনি খুব ভয় পেয়েছে। সে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে।

দুপুরের আগেই জ্বর নেমে গেল। কবির মামা শিঙি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। নীলু অফিসে গিয়েছে। অফিসে জরুরি মীটিং, না গেলেই নয়। দায়িত্ব দিয়ে গেছে শারমিনের উপর। শারমিন তার দায়িত্ব পালন করছে চমৎকারভাবে। কবির মামা বারান্দায় আছেন, সেও আছে বারান্দায়।

'মামা, আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'

'না মা, লাগবে না। তুমি খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম কর। আমার শরীর এখন ভালো। বেশ ভালো। ইনশাআল্লাহ্ কাল রওনা হব।'

'অসম্ভব! কাল কী ভাবে রওনা হবেন?'

'রওনা হতেই হবে মা, উপায় নেই। তোমার বাবা এক বার বলেছিলেন নীলগঞ্জ যাবেন। আমারও খুব শখ ছিল তাঁকে নিয়ে যাবার। আর সম্ভব হল না।'

'সম্ভব হবে না কেন?'

কবির মামা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'মৃত্যু এখন আমার পাশেই অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে সে হাত দিয়ে আমাকে ছুঁয়ে দেয়। আমি বুঝতে পারি। আমার সময় কোথায় মা? সময় শেষ মা।'

'আমি বাবাকে বলব, যেন তিনি তাড়াতাড়ি নীলগঞ্জ চলে যান। আমি আজই বলব।'

কবির মামা হেসে ফেললেন। বারান্দায় বসে থাকতে-থাকতে তাঁর ঝিমুনি ধরে গেল। শীত-শীত করছে। আবার হয়তো জ্বর আসবে। তাঁর বড়ো লজ্জা লাগছে। এ বাড়ির প্রতিটি মানুষকে তিনি বিব্রত করছেন। সেই অধিকার তাঁর কি সত্যি আছে?

পরদিন তিনি অসুস্থ শরীরেই নীলগঞ্জ রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে গেল সোভাহান। রফিকের যাবার কথা ছিল—তার অফিস উদ্বোধন হবে, সে যেতে পারল না। জুটিয়ে দিল সোভাহানকে। এই লোকটি কোনো রকম আপত্তি করল না।

স্টেশন থেকে বাড়ি অনেকটা দূর। কবির মাষ্টারের হেঁটে যাবার সামর্থ্য নেই। আবার আকাশ-পাতাল জ্বর। সোভাহান গরুর গাড়ি জোগাড় করে আনল। রওনা হবার আগে এক জন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। আশপাশে কোথাও ডাক্তার নেই। নবীনগরে এক জন ডাক্তার আছেন—এল·এম·এফ·। কবির মাষ্টার বললেন, 'নিজের চোখে দেখ, গ্রামগুলির কী খারাপ অবস্থা। ডাক্তাররা কি এই গণ্ডগ্রামে আসবে? তারা যাবে শহরে।'

সোভাহান বলল, 'আপনি এইখানে বসে বিশ্রাম করতে থাকুন, আমি নবীনগর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসব।'

'পাগল নাকি তুমি! বহু দূরের পথ।'

'কোনো অসুবিধা নেই। এই অবস্থায় আপনাকে নিয়ে রওনা হব না। গরুর গাড়িতে বিছানা করে দিচ্ছি, শুয়ে থাকুন। আমি যাব আর আসব।'

নবীনগরের ডাক্তার সাহেবকেও পাওয়া গেল না। তিনি বিরামপুর কলে গিয়েছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। নাও ফিরতে পারেন। বিরামপুরের কাছেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি। রাতটা হয়তো শ্বশুরবাড়িতেই কাটাবেন।

সোভাহান ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখল—গরুর গাড়ির চারপাশে অসংখ্য মানুষ।

চারদিকে খবর রটে গিয়েছে, অসুস্থ কবির মাষ্টার গ্রামে ফিরেছে। দলে দলে লোক আসছে। ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। বিশাল একদল মানুষ নিয়ে গরুর গাড়ি রওনা হল।

আশপাশের মানুষ জিজ্ঞেস করে, 'কে·যায় গো?'

'কবির মাষ্টার যায়।'

'কী হইছে মাষ্টার সাবের?'

'শইল খুব খারাপ। উল্টাপাল্টা কথা কইতাছে।'

'কও কী! কী সর্বনাশের কথা!'

খেতের কাজ ফেলে রেখে চাষীরা উঠে আসে রাস্তায়। তারা এক পলক দেখতে চায় মাষ্টার সাহেবকে। দু'টি কথা শুনতে চায়।

সূর্যের তেজ বাড়তে থাকে। চলমান মানুষগুলির ছায়া ছোট হয়ে আসে। কবির মাষ্টার চোখ মেলে এক বার জিজ্ঞেস করেন, 'আর কত দূর সোভাহান?' আর যে কত দূর সোভাহান নিজেও জানে না। এই অঞ্চল তার অপরিচিত। তবু সে বলে, 'এসে পড়েছি। ঐ তো দেখা যাচ্ছে।'

'সুখী নীলগঞ্জ সাইনবোর্ড দেখা যায়? বিরাট সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছি।'

কবির মাষ্টার টেনে টেনে হাসেন। সোভাহান কোনো সাইনবোর্ড দেখতে পায় না। শুধু দেখে, মানুষ আসছে পিলপিল করে। চিৎকার নেই। হৈচৈ নেই। নিঃশব্দ মানুষ। মাথা নিচু করে এরা হাঁটছে।

'সোভাহান।'

'জ্বি মামা।'

'শুধু সইনবোর্ডটাই আছে। নীলগঞ্জকে সুখী নীলগঞ্জ করতে পারলাম না। আফসোস রয়ে গেল।'

'এক জীবনে তো হয় না মামা। আপনি শুরু করেছেন, অন্যরা শেষ করবে। শুরু করাটাই কঠিন। শুরু তো হয়েছে।'

'ঠিক ঠিক। খুব ঠিক।'

'আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে মামা?'

'হচ্ছে। আবার আনন্দও হচ্ছে। কত লোক এসেছে, দেখলে?'

'জ্বি, দেখলাম।'

'কিছুই করতে পারি নি এদের জন্যে। তবু এরা আসছে। বড়ো আনন্দ লাগছে সোভাহান।'

'আনন্দ হবারই কথা।'

'জীবনটা তাহলে একেবারে নষ্ট হয় নি। কী বল?'

'জ্বি–না। অসাধারণ জীবন আপনার!'

'পানি খাওয়াতে পার? বুক শুকিয়ে আসছে।'

বটগাছের ছায়ার নিচে গরুর গাড়ি রাখা হল। চার–পাঁচ জন ছুটে গেল পানির খোঁজে। আশপাশের বাড়ির বৌ–ঝিরা সব বেরিয়ে আসছে। এদের মধ্যে অল্পবয়স্ক একটা মেয়ে খুব কাঁদছে। সে নীলগঞ্জের মেয়ে। এই গ্রামে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের দিন খুব গণ্ডগোল হচ্ছিল। জামাইকে সাইকেল দেয়ার কথা, সেই সাইকেল দেওয়া হয় নি। বিয়ে ভেঙে বরযাত্রীর দল উঠে যাবে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। খবর পেয়ে ছুটতে–ছুটতে এলেন কবির মাষ্টার।

থমথমে গলায় বললেন, 'সাইকেল আমি দেব। বিয়ে হোক।'

কবির মাষ্টারের কথাই যথেষ্ট। বিয়ে হয়ে গেল। তার পনের দিন পর নতুন সাইকেল নিয়ে কবির মাষ্টার এসে উপস্থিত। তিনি সাইকেল নতুন জামাইয়ের হাতে দিয়েই আচমকা প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'হারামজাদা ছোটলোক। সাইকেলটা তোর কাছে বড়ো হল? তুই একটা মেয়েকে বিয়ের দিন লজ্জা দিলি? তোর এত বড়ো সাহস!'

ছেলেটা ভালো ছিল। সাত দিন পর সাইকেল ফিরিয়ে দিয়ে গেল। লাজুক গলায় বলল, 'আপনার দোয়া চাই মাস্টার সাব, আর কিছু চাই না। আপনে খাস দিলে আমার জন্যে দোয়া করেন।'

কবির মাষ্টার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দোয়া লাগবে না। সৎ মানুষের জন্যে দোয়া লাগে না। দোয়া দরকার অসৎ মানুষের জন্যে। তোর বৌটাকে আদর-যত্ন করিস। ভালো মেয়ে।'

সেই মেয়েটাই এখন চিৎকার করে কাঁদছে। কয়েক জন বৃদ্ধা মহিলা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। কবির মাষ্টার বিরক্ত গলায় বললেন, 'তুই এরকম করছিস কেন? সালাম করেছিস আমাকে? আদব-কায়দা কিছুই শিখিস নি। নীলগঞ্জের মেয়ে না তুই? গ্রামের বদনাম। আয়, সালাম কর। তোর জামাই কই? ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আয়।'

নীলগঞ্জে ঢোকার ঠিক আগে আগে কবির মাষ্টার মারা গেলেন। নিঃশব্দ মৃত্যু। কেউ কিছুই টের পেল না। সবাই ভাবল, বোধহয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক। সোভাহান তাঁর হাত ধরে বসে ছিল, শুধু সে টের পেল। হাত নামিয়ে দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে এল। অসংখ্য লোকজন চারপাশে। সবাই নিঃশব্দে হাঁটছে। সেও হাঁটছে তাদের সঙ্গে। এই মানুষগুলিকে মৃত্যুর খবর দিতে তার মন চাচ্ছে না।

গরুর গাড়ি নীলগঞ্জের সীমানায় এসে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল। নীলগঞ্জের সীমানায় বিশাল এক রেইনট্রি গাছ। সেই গাছে সাইনবোর্ড ঝুলছে। সেখানে লেখা :

"আপনারা সুখী নীলগঞ্জে প্রবেশ করছেন। স্বাগতম।"

নীলগঞ্জের সমস্ত বৌ-ঝিরা জড়ো হয়েছে সেখানে। ছুটতে-ছুটতে আসছে শওকত। আজ সকালেই সে থানা-হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে। নীলগঞ্জের চেয়ারম্যান তাকে একটা ডাকাতি মামলায় আসামী দিয়েছিল। ওসি সাহেব নিজ দায়িত্বে তাকে জামিন দিয়েছেন। শওকত চেঁচাতে-চেঁচাতে আসছে- 'কী হইল? আমার স্যারের কী হইল?'

দুপুরবেলার শান্ত নিস্তব্ধ গ্রাম। করুণ সুরে ঘুঘু ডাকছে। ক্যাচ-ক্যাচ শব্দে এগিয়ে চলছে গরুর গাড়ি। সোভাহান দাঁড়িয়ে আছে রেইনট্রি গাছের কাছে। তার দৃষ্টি সাইনবোর্ডের দিকে :

"আপনারা সুখী নীলগঞ্জে প্রবেশ করছেন। স্বাগতম"

সোভাহানের মনে হচ্ছে সুখী নীলগঞ্জ জায়গাটা বড়ো পবিত্র। এরকম একটা পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করবার মতো যোগ্যতা তার নেই। তার উচিত এই সীমানা থেকেই বিদেয় নেওয়া।

৩৯

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, কবির মাষ্টারের মৃত্যু এ বাড়ির কাউকে তেমন স্পর্শ করল না। রফিক তার নতুন অফিস, নতুন ব্যবসা নিয়ে অসম্ভব ব্যস্ত। ভোরবেলা বেরিয়ে যায় ফেরে অনেক রাতে। শফিকেরও এই অবস্থা। তার দায়িত্ব দিন-দিন বাড়ছে। সালফিউরিক অ্যাসিড প্লান্টের কাজ এগুচ্ছে দ্রুতগতিতে। শফিকের বেশির ভাগ সময়ই চলে যাচ্ছে সেখানে। যখন বাসায় ফেরে, এমন ক্লান্ত থাকে যে ভাত খেয়ে বিছানায় যেতে-না-যেতেই ঘুমে চোখজড়িয়েআসে।

দায়িত্ব বেড়েছে নীলুরও। সে একটি প্রমোশন পেয়েছে। অফিসে তার এখন ঘর আলাদা। ঘরের সামনে টুল পেতে এক জন বেয়ারা বসে থাকে। অফিসের নানান সমস্যা নিয়ে তাকে প্রতিদিনই মিটিং করতে হয়। এতসব ঝামেলা তার আগে ছিল না।

হোসেন সাহেবও ব্যস্ত। তিনি একটি বই লেখার কাজে হাত দিয়েছেন, বইটির নাম *সহজ হোমিওপ্যাথি*। যে-সব ডাক্তার গ্রামে চিকিৎসা করেন, বইটি লেখা হচ্ছে তাঁদের উদ্দেশ্য করে। কাজেই লিখতে হচ্ছে খুব সহজ ভাষায়। তিনি জোর দিচ্ছেন কেইস হিস্ট্রিতে। প্রতিটি রোগের জন্যে বেশ কয়েকটা কেইস হিস্ট্রি দিতে হচ্ছে। সে-সব খুঁজে বের করতে সময় নিচ্ছে। বেশ কিছু হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করছেন। তাদের এ ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। এতে হোসেন সাহেবের উৎসাহে ভাঁটা পড়ছে না।

মনোয়ারা আগের তুলনায় খানিকটা শান্ত। কাজের একটি মেয়ে রাখা হয়েছে, নাম—নাজমা। তাঁর বেশির ভাগ সময়ই কাটছে নাজমার খুঁত ধরে। এই মেয়েটার কোনো কিছুই তাঁর পছন্দ নয়। নামটাও অপছন্দ। তাঁর ধারণা, নাজমা হচ্ছে ভদ্রলোকের নাম। কাজের মেয়ের এ-রকম নাম থাকবে কেন? নাজমা মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশ। এইটিও তাঁর পছন্দ নয়। এই বয়সের মেয়ে ঘরে রাখা মানে আগুন ঘরে রাখা। কোনো দিন কী-এক ঝামেলা বাধাবে, ছি ছি পড়ে যাবে চারদিকে। মনোয়ারার বেশির ভাগ সময় এখন কাটছে কী করে মেয়েটিকে তাড়ানো যায়, এই বুদ্ধির সন্ধানে। তেমন কোনো পথ পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ নাজমা মেয়েটি খুবই কাজের। অতি অল্প

সময়েই সে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে। তবু মনোয়ারা চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। আজ ভোরবেলা তিনি রাগে কাঁপতে–কাঁপতে বললেন, 'এই, তুই ঘর মুছলি কেন? সকালবেলা পানি দিয়ে ঘর ভাসিয়ে ফেলেছিস!'

নাজমা সহজ স্বরে বলল, 'আপনেই তো কইছিলেন দাদী।'

'আমি কখন বললাম?'

'আপনে কইছিলেন সপ্তাহে এক দিন ঘর ধুইতে।'

'এ তোর ঘর ধোয়ার নমুনা? পানিতে চারদিক ছয়লাপ।'

'কই দাদী, পানি তো নাই। শীতের দিনে পানি শুকায় তাড়াতাড়ি।'

আসলেই তাই, ইতোমধ্যেই চারদিক শুকনো খটখট করছে। মনোয়ারা কিছুতেই মেয়েটিকে জব্দ করতে পারেন না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন না। তীক্ষ্ণ নজর রাখেন, যদি বেচাল কিছু চোখে পড়ে।

'এই, তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'ছাদে গেছিলাম দাদী।'

'তোকে না বললাম ছাদে যাবি না। ব্যাটাছেলে থাকে।'

'কাপড় শুকাতে গেছিলাম।'

'কাপড় শুকাতে সারা দিন লাগে?'

' গেলাম আর আসলাম দাদী, বেশিক্ষণ তো থাকি নাই।'

'আবার মুখে–মুখে কথা। তুই কি মনে করিস তোর মতলব আমি বুঝি না? আমি কচি খুকি?'

'বিশ্বাস করেন দাদী, আমার কোনো মতলব নাই।'

'তুই কাল সকালেই বিছানা–বালিশ নিয়ে বিদায় হবি। আমার পরিষ্কার কথা।'

'সত্যি যাইতে বলেন দাদী?'

'আমি কি তোর সাথে মশকরা করছি? ফাজিল কোথাকার! বড়ো বৌমা আসুক, তোকে আমি আজই বিদায় করব। পাখা উঠেছে!'

নীলু এই মেয়েটির বিদায়ের কথা শুনতেই পারে না। নাজমা তাকে অনেকভাবে নিশ্চিন্ত করেছে, নীলু এই সুখ হারাতে রাজি নয়। উল্টো মেয়েটার কাছে তার নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। যে–সংসার তার দেখার কথা, তা দেখছে সংসারের বাইরের এক জন মানুষ। মমতা এবং ভালোবাসা নিয়েই দেখছে। এটা যেন ঠিক নয়, অন্যায়।

আগে সংসারের অনেকখানি দায়িত্ব শারমিন পালন করত। তার দায়িত্বও কমেছে। সে এখন পুরো সময় দিচ্ছে পড়াশোনায়।

ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটির অ্যাসিসটেন্টশিপের চিঠি এসেছে। ভিসার জন্য আই টুয়েন্টি তারা পাঠিয়েছে, এখনও এসে পৌঁছায় নি। এখন আর সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শারমিন রাত–দিন পড়ে। রফিক দেখে, কিছু বলে না। তারা দু'জন এমনভাবে জীবন যাপন করে, যেন কেউ কাউকে

চেনে না।

এই পরিবারের সব ক'টি মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল শওকতের একটা চিঠি—কবির মাষ্টারের কুলখানি। সবই যেন আসে। সে থাকার ব্যবস্থা গরিবি হালতে করে রেখেছে।

কারোরই যাওয়ার ইচ্ছা নেই। অনিচ্ছার বিষয়টাও তারা চেপে রাখতে চায়। এই ব্যাপারটা নীলুর মন খারাপ করে দিল। এ-রকম কেন হবে? যে-মানুষটি এ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্যে গাঢ় ভালবাসা পোষণ করেছেন, তাঁর মৃত্যু উপলক্ষ করে এরা কেউ সামান্য ত্যাগ স্বীকার কেন করবে না?

এক দিন সে রফিককে কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করাল, 'কবে যাচ্ছ রফিক?'

রফিক খুব অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাব?'

'মামার কুলখানিতে যাবে না?'

'মামার কুলখানি তো দূরের কথা, আমার নিজের কুলখানি হলেও যেতে পারবনা।'

'তোমার কি মনে হয় না, যাওয়া উচিত?'

'না। এসব লোকদেখানো ব্যাপার। মারা গেল ফুরিয়ে গেল। আর কী?'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাই। তা ছাড়া এসব কুলখানি হচ্ছে হিন্দুয়ানি ব্যাপার। হিন্দুরা যেমন মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ করে, ওদের দেখাদেখি আমরা করি কুলখানি।'

'ধর্মজ্ঞানও তোমার হয়েছে মনে হয়।'

'তুমি এমন করে তাকাচ্ছ কেন ভাবী? আমার শতেক ঝামেলা। আমি পারছি না।'

শফিকও যাবে না। সে ছুটির চেষ্টা করেছিল। টলম্যান ছুটি দেয় নি। বলেছে—অসম্ভব। আগামী দু' মাস কোনো ছুটি নেই। সামনের মাস থেকে শুক্রবারেও তোমাকে কাজ করতে হবে।

শফিক মনে হল এতে খুশিই হয়েছে। অন্তত তার না-যাওয়ার একটা কঠিন অজুহাত আছে। ঠিক হল, হোসেন সাহেব সোভাহানকে নিয়ে যাবেন। হোসেন সাহেব শেষ পর্যন্ত যেতে পারলেন না। ঢাকা থেকে গেল শুধু সোভাহান। বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

কুলখানির দিন রাতে শফিক হঠাৎ বলল, 'খুব অন্যায় হয়েছে নীলু। আমাদের সবার যাওয়া উচিত ছিল। আমার খারাপ লাগছে।'

'এখন খারাপ লাগলেও তো কিছু করার নেই।'

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না নীলু, ছেলেবেলায় মামার কী পরিমাণ আদর যে আমরা পেয়েছি!'

নীলু চুপ করে রইল। সে এ বাড়ির সবার উপর খুব বিরক্ত হয়েছে।

শফিক বলল, 'আজ অফিসে বসে ভাবছিলাম—কোনো দিন মামাকে আমরা কিছু দিই নি।'

'তিনি কিছু ফেরত পাবার আশায় নিশ্চয়ই তোমাদের ভালবাসেন নি?

'কিন্তু আমাদের একটা দায়িত্ব ছিল।'

'হ্যাঁ ছিল।'

'এবার দেখলাম তাঁর স্যুয়েটারটা ছেঁড়া। আমি কি পারতাম না একটা নতুন স্যুয়েটার কিনে মামাকে বলতে—মামা, তোমার জন্যে এনেছি?'

'নিশ্চয়ই পারতে।'

'তাহলে কেন এটা বললাম না?'

'এখন আর এসব চিন্তা করে লাভ নেই। এস, শুয়ে পড়।'

তারা বাতি নিভিয়ে দু' জনই শুয়ে পড়ল। কিন্তু কেউই ঘুমুতে পারল না। রাত একটার দিকে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। প্রচণ্ড শব্দে তাদের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল।

দরজা খুলে দেখা গেল—রফিক। সে থরথর করে কাঁপছে। শফিক বলল, 'কী হয়েছে রে?'

রফিক কাঁপা গলায় বলল, 'সাংঘাতিক ভয় পেয়েছি। বসার ঘরে হঠাৎ দেখি কবির মামা বসে আছেন। আমাকে দেখে হাসলেন। আমি চিৎকার দিয়ে উঠতেই দেখি কেউ নেই।'

দরজা খুলে সবাই বের হয়ে এসেছে। রফিক লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু তার ভয় এখনও কাটে নি। সে মৃদু গলায় বলল, 'আমি সত্যি দেখেছি, স্পষ্ট দেখলাম। মনের ভুল না।'

নীলু বলল, ' তোমার মনে অপরাধবোধ কাজ করেছিল, তাই এসব দেখছ। যাও, শুয়ে পড়।'

'ভাবী, আমি সত্যি দেখেছি।'

'এস, তোমাকে চা বানিয়ে দিচ্ছি। চা খেয়ে ঘুমাও।'

মনোয়ারা বললেন, 'চা না, ওকে এক গ্লাস লবণপানি দাও। এটা খাওয়া দরকার। দেখ না কেমন ঘামছে।'

রফিক ভালোই ভয় পেয়েছে, কারণ তার জ্বর এসে গেল। বেশ ভালো জ্বর—একশ' দু' পয়েন্ট পাঁচ। শারমিনকে অনেক রাত পর্যন্ত মাথায় পানি ঢালতে হল। রফিক ক্ষীণস্বরে বলল, 'কেমন ছেলেমানুষি কাণ্ড করলাম, বল তো। দিনের বেলা সবাই এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে।'

'করলে করবে, তুমি চুপ করে থাক।'

'আমি কিন্তু সত্যি দেখেছি। বিশ্বাস কর।'

'তুমি কিছুই দেখ নি। ভাবী যা বলেছে সেটাই সত্যি।'

'স্পষ্ট দেখলাম শারমিন। কমলা রঙের স্যুয়েটার গায়ে। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।'

'ঠিক আছে, থাক। এখন এসব গল্প করতে হবে না।'

'তোমার ভয় লাগছে?'

'না, ভয় লাগছে না। ভয় কেন লাগবে? তাঁকে যদি দেখেই থাক, তাতে ভয়ের কী?'

রফিক জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। শারমিন অনেক দিন পর তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে গেল। রফিক বলল, 'ভয় পেয়ে একটা লাভ হয়েছে। তুমি কাছে এসেছ। কবির মামাকে ধন্যবাদ।'

বসার ঘরে বাকি সবাই গোল হয়ে বসে আছে। তাদের কেউই সেই রাতে ঘুমুল না। সবাই যেন কবির মামার উপস্থিতি অনুভব করছে। যেন এক্ষুণি ছায়াময় কোনো জগৎ থেকে তিনি দৃশ্যমান হবেন। এক সময় ভোর হল। গাছে গাছে পাখি ডাকতে লাগল।

৪০

নীলু হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তার চোখে গভীর বিস্ময়।

'কি রে, এমন করে দেখছিস কেন? চিনতে পারছিস না?'

'পারছি, পারব না কেন? তোর এ কী হাল হয়েছে।'

বন্যা হাসল। হাসি আর থামেই না। আশপাশের সবাই তাকাচ্ছে। অফিসে এসে কেউ এমন করে হাসে? নীলু বলল, 'এ্যাই, তোর কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি।'

'এত হাসছিস কেন?'

'জানি না কেন হাসছি। পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছি বোধহয়। তুই আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবি?'

নীলু বন্যাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। তার মনে হল বন্যা ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। চেহারা ভীষণ খারাপ হয়েছে। মাথার সামনের দিকের চুল উঠে কপাল অনেক বড়ো বড়ো লাগছে। শাড়িতে ইস্ত্রি নেই। ইস্ত্রি-ছাড়া শাড়িতে বন্যাকে কল্পনাও করা যায় না। নীলু বলল, 'তোর কী হয়েছে বল তো?'

'কিছুই হয় নি।'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস?'

'হুঁ, সে তো এক বছর আগে। তুই কোনো খোঁজখবর নিতি না, কাজেই জানিস না। কেউ খবর রাখে না।'

নীলু লজ্জিত বোধ করল। সে সত্যিই কোনো খোঁজ নেয় নি। অথচ তার আজকের এই চাকরি বন্যাই জোগাড় করে দিয়েছে। কত উৎসাহে সে ছোটাছুটি করেছে! কত ঝামেলা করেছে!

'নীলু, আমাকে হাজারখানেক টাকা দিতে পারবি?'

'পারব। কাল আসতে হবে। কাল আয়, আমি টাকা জোগাড় করে রাখব।'
'এখন তোর কাছে কত আছে?'
'পঞ্চাশ টাকার মতো আছে।'
'পঞ্চাশ টাকাই দে। কাল আবার আসব।'
নীলু ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। নিচু গলায় বলল, 'তোর আর সব খবর বল। কর্তা কেমন আছে?'
'জানি না কেমন আছে। আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'
'বলছিস কী তুই!'
'ডিভোর্স হয়েছে তিন মাস হল।'
নীলু ভয়ে-ভয়ে বলল, 'তোর বাচ্চাটা কার কাছে থাকে? তোর কাছে?'
'না।'
'ওনার সঙ্গে থাকে?'
'না, কারো সঙ্গেই থাকে না। চা খাওয়া তো নীলু। চায়ের সাঙ্গে আর কিছু থাকলে তাও দিতে বল। খিদে লেগেছে।'
'ভাত খাবি?'
'না, ভাত খাব না।'
বন্যা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগল, 'বাচ্চাটা মরে গেল, বুঝলি? চার মাস হবার আগেই শেষ। ওর ধারণা হল, আমার জন্যেই মরেছে। আমি যত্ন নিই নি, অফিস নিয়ে থেকেছি। কী যে কুৎসিত ঝগড়া! শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিলাম। তাতেও কিছু লাভ হল না। রোজ ঝগড়া। রোজ হৈচৈ, চিৎকার। এক দিন কী হয়েছে জানিস? লোকজনের সামনে হঠাৎ আমাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলল—'
'থাক, শুনতে চাই না। এখন কী করছিস তুই?'
'কিছু করছি না। বড়ো ভাইয়ের বাসায় থাকি আর ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া করি। ভাবী কী যে ঝগড়া করতে পারে, তুই কল্পনাও করতে পারবি না। ঝগড়ায় কোনো ডিগ্রি থাকলে ভাবী পি-এইচ.ডি. পেয়ে যেত।
বন্যা আবার হাসতে শুরু করল। হাসতে-হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। নীলু তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। বন্যা বলল, 'আমার হাসিরোগ হয়েছে, বুঝলি? গতকাল ভাবী আমাকে কালনাগিনী বলে গাল দিয়েছে। রাগ ওঠার বদলে আমার হাসি উঠে গেল। হাসি দেখে ভাবী মনে করল, আমি পাগল হয়ে গেছি। ভয়ে তার চোখ ছোট ছোট হয়ে গেল। হি হি হি।'
নীলু বলল, 'এই বন্যা। চুপ কর তো।'
'তোরও কি ধারণা, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'
'না হলেও শিগগিরই হবে। তুই একটা চাকরি-টাকরি কর। কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাক।'
'হ্যাঁ, তাই করব।'

বন্যা উঠে দাঁড়াল। সহজ স্বরে বলল, 'যাই রে নীলু। কাল আবার আসব, টাকাটা জোগাড় করে রাখবি।'

'নিশ্চয়ই রাখব।'

'কবে ফেরত দেব তা কিন্তু জানি না। নাও দিতে পারি।'

'টাকা ফেরত দিতে হবে না।'

'তাহলে তো আরো ভাল।'

নীলু বন্যাকে এগিয়ে দিতে গেল। তার খুবই খারাপ লাগছে। ইচ্ছা হচ্ছে বন্যার সঙ্গে চলে যেতে। দু' জনে মিলে সারা দিন ঘুরে বেড়াতে পারে। বন্যার ঠিক এই মুহূর্তে এক জন বন্ধু দরকার। যে তাকে সাহস দেবে, ভরসা দেবে। মাঝে-মাঝে জীবন ভিন্ন খাতে বইতে থাকে, সব কেমন জট পাকিয়ে যায়—তখন এক জন প্রিয়জনকে কাছে থাকতে হয়।

'নীলু, যাই রে।'

'কাল আসিস।'

'আসব। একটা কথা নীলু, আচ্ছা, তোর কি মনে হয় আমি যদি চাকরি না করতাম, যদি বাসায় থেকে বাচ্চার দেখাশোনা করতাম, তাহলে সে বাঁচত?'

'এখন আর এসব নিয়ে কেন ভাবছিস?'

'ভাবছি না তো! এমনি মনে হল, তাই বললাম।'

'আর ভাবিস না।'

'না, ভাবব না। বাচ্চাটার জন্যে বড়ো কষ্ট হয় নীলু। ওর নাম রেখেছিলাম অভীক। নামটা সুন্দর না?'

'হ্যাঁ, সুন্দর।'

'নামের মানে বল তো?'

নীলু তাকিয়ে রইল।

সারা দিন তার আর অফিসের কাজে মন বসল না। বন্যার মতো প্রাণময় মেয়ের আজ কী অবস্থা! কী কঠিন দুঃসময়! সন্তানের মৃত্যুর পুরো দায়ভাগ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার উপর। বন্যা নিজেও তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

নীলু ঠিক করল, আগামী কাল সে ছুটি নেবে। বন্যা এলেই তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। দূরে কোথাও যাবে বেড়াতে। বোটানিক্যালে গার্ডেনে কিংবা বলধা গার্ডেনে। কোথায় যেন সে পড়েছিল, গাছপালা মানুষের বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে পারে।

বন্যা পর দিন এল না। অফিস চারটায় ছুটি হয় নীলু পাঁচটা পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করল। অফিসের গাড়ি চলে গিয়েছে। সে একা-একা বাসায় রওনা হল। রিকশা নিতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ভালো লাগছে। সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যার বিষণ্ন আলোয় তার মন কেমন করতে থাকে। জগৎ-সাংসার

তুচ্ছ মনে হয়।

নীলুর হাতব্যাগে এক হাজার টাকা। তার কেন যেন মনে হল, এই টাকা নিতে বন্যা কোনো দিনই আর আসবে না।

শাহানা অসময়ে শুয়ে আছে।

এখন বাজছে সন্ধ্যা সাতটা। অথচ শাহানা মশারি খাটিয়ে শুয়ে আছে। জহির বিস্মিত হয়ে, 'ঘুমুচ্ছ নাকি?' শাহানা বলল, 'হ্যাঁ।'

'একটু মনে হয় সকাল-সকাল শুয়ে পড়লে?'

'ভালো লাগছে না।'

'ভালো না-লাগলে শুয়ে পড়তে হয় নাকি?'

'কী করব তাহলে?'

'কত কিছু করার আছে—বই পড়, টিভি দেখ, তোমাদের বাসা থেকে বেড়িয়ে আস, শপিং-এ যাও।'

শাহানা তার মাথার উপর লেপ টেনে দিল। সে আর কোনো কথা-বার্তায় উৎসাহী নয়। এখন সে ঘুমুবে।

জহির বলল, 'শাহানা, বাতি নিভিয়ে দেব?'

'দাও।'

'রাতে কিছু খাবে না?'

'না।'

'আমার উপর কি কোনো কারণে রাগ করেছ?'

শাহানা জবাব না-দিয়ে পাশ ফিরল। এর মানে পরিষ্কার বোঝা গেল না। হয়তো রাগ করেছে। অনেক চিন্তা করেও রাগের কারণ কী, জহির বের করতে পারল না। সে বাতি নিভিয়ে বসার ঘরে চলে গেল। টিভি চলছে। পর্দায় নানান ছবি, কিন্তু শব্দ নেই। এও শাহানার কাণ্ড। সে সন্ধ্যা হতেই টিভি ছেড়ে সামনে বসে থাকে। শব্দ ছাড়া টিভি দেখে। এর কী মানে, কে জানে! চেনাজানা কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট থাকলে আলাপ করা যেত। তেমন কেউ নেই। জহিরের মনে হয় যে-কোনো কারণেই হোক, শাহানার মন খুব বিক্ষিপ্ত। প্রচুর কাজে তাকে ডুবিয়ে রাখতে পারলে মানসিক এই অবস্থাটা হয়তো কাটত। তাও করা যাচ্ছে না। শাহানা আর পড়াশোনা করতে রাজি নয়। সে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু ক্লাসে যাচ্ছে না। আর পড়াশোনা করবে না, এ-রকম একটা ঘোষণা গত সপ্তাহে দিয়েছে। জহির বলেছে, 'কেন পড়াশোনা করবে না?'

'ভালো লাগে না, তাই করব না।'

'সময় কাটবে কী করে?'

'যেভাবে কাটছে সেইভাবে কাটবে। আমাকে নিয়ে তোমার এত ভাবতে হবে না।'

'কেন ভাবতে হবে না?'

'জানি না। আমি এত সব প্রশ্নের উত্তর জানি না।'

এই বলেই শাহানা উঠে গিয়ে শব্দহীন টিভির সামনে বসেছে। বসার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, পর্দার ছবিগুলির নড়াচড়া দেখে সে খুব মজা পাচ্ছে। জহির এসে বসল তার পাশেই। শাহানা তা যেন লক্ষই করল না। জহির বলল, 'সাউণ্ড দাও। বিনা শব্দের ছবিতে কী আছে?'

শাহানা ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমার এইভাবেই দেখতে ভালো লাগে।'

'শব্দ তোমার ভালো লাগে না?'

'না।'

'আগে লাগত? যখন তুমি তোমাদের বাড়িতে থাকতে?'

'জানি না। তোমাকে তো বলেছি, আমি এত সব প্রশ্নের উত্তর জানি না।'

জহির চুপ করে গেল। সে বুঝতে পারছে, তাদের দু' জনের ভেতর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। এটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। কীভাবে দূরত্ব কমান যায় তাও তার জানা নেই। এক দিন সে বলল, 'গান শিখবে শাহানা? গানের মাষ্টার রেখে দিই?' শাহানা হাঁ-না কিছুই বলল না। গানের মাষ্টার এক জন এলেন। হারমোনিয়াম, তবলা, সেতার এল। হুলুস্থূল ব্যাপার। শাহানা দু' দিন মাষ্টারের কাছে বসে তৃতীয় দিনে বলল, 'ওনার কাছে গান শিখব না।'

জহির বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন?'

'উনি কথা বলার সময় মুখ থেকে থুথু বের হয়। আমার গায়ে থুথু লেগে যায়।'

'নতুন এক জনকে রেখে দেব?'

'দাও।'

'তোমার উৎসাহ আছে তো, নাকি আমাকে খুশি করবার জন্যে⋯'

শাহানা উত্তর দিল না। দ্বিতীয় মাষ্টারও এক সপ্তাহের বেশি টিকলেন না। উনি খুব সিগারেট খান। সিগারেটের গন্ধে শাহানার মাথা ধরে যায়। তৃতীয় এক জন এলেন। ইনি কী করছেন না-করছেন জহির জানে না। গান শেখার সময়টাতে সে থাকে না। শাহানা রেয়াজ করে কিনা তাও জহিরের জানা নেই। রেয়াজ করতে তাকে সে কখনো শোনে নি। জহির গানটাকে দেখছে সময় কাটানোর একটা পথ হিসেবে। কিছু একটা নিয়ে শাহানা ব্যস্ত থাকুক। মনের অস্থিরতা কমুক। কিন্তু তা কি সত্যিই কমছে?

রফিকের অফিস শুরু হয়েছে গত মাসের গোড়ায়।

শুরুর পনের দিন কিছু করার ছিল না। রফিকের কাজ ছিল সকালে এসে অফিসে বসে থাকা। দুপুরবেলা ঘন্টখানিকের জন্যে ছুটি। হোটেল থেকে খেয়ে এসে আবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একনাগাড়ে বসে থাকা। কথা বলার দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, কারণ সাদেক আলি নানান জায়গায় ছোটাছুটি করছে। টাইপিস্ট

হিসেবে একটি মেয়েকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। সেও আসছে না। সাদেক আলিকে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতেই বিচিত্র একটা ভঙ্গি করে বলেছে, 'সময় হলেই সে আসবে। কাজ নেই কোনো, এসে করবেটা কী?' রফিক বিস্মিত হয়ে বলেছে, 'কাজ না থাকলে অফিসে আসবে না?'

'আসবে স্যার, আসবে। ওর কাজ তো স্যার অফিসে না। কাজ অন্য জায়গায়।'

'তার মানে?'

'এইসব স্যার এখন আপনার জানার দরকার নেই। তাহলে খারাপ লাগবে।'

রফিক আর কিছু জিজ্ঞেস করে নি। জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছেও হয় নি। দু' দিন মেয়েটির সঙ্গে তার কথা হয়েছে। তার কাছে মনে হয়েছে বেশ ভালো মেয়ে। চেহারা ভালো, স্মার্ট। কথায়-কথায় হাসে, এবং বেশ রসিক। রফিকের দু'-একটা রসিকতায় সে বেশ শব্দ করে হাসল। একটু গায়ে-পড়া ধরনের স্বভাব আছে। সেই স্বভাব রফিকের কাছে খুব খারাপ লাগে নি। প্রথম দিনেই সে রফিককে বলেছে, 'আমার ডাক নাম হল কুসুম। আপনি স্যার আমাকে কুসুম ডাকবেন। আমার ভালো নাম নিজের কাছেই সহ্য হয় না। অবশ্যি কুসুমও খুব বাজে নাম।'

'আপনি টাইপ কেমন জানেন?'

'কাজ চালাবার মতো জানি। এইসব অফিসে তো স্যার মিনিটে পঞ্চাশ ওয়ার্ড টাইপ করার দরকার নেই। সমস্ত দিনে হয়তো তিন থেকে চারটা চিঠি টাইপ করা হয়।'

'তাই নাকি?'

'জি স্যার। কাজকর্ম হয় টেলিফোনে এবং টেলেক্সে। এই জাতীয় কাজের সঙ্গে আমি অনেক দিন থেকেই আছি। সবই জানি।'

'অনেক দিন মানে কত দিন?'

'প্রায় ছ' বছর।'

'আগের চাকরিটা ছাড়লেন কেন?'

'খাটুনি বেশি ছিল, সেই তুলনায় রোজগার ছিল না। নতুন ফার্মগুলিতে খাটুনি থাকে কম, রোজগার হয় বেশি। স্যার, আপনি কিন্তু আমাকে তুমি করে বলবেন।'

'কেন?'

'ছোট ফার্ম, সবাই বলতে গেলে ফ্যামিলি মেম্বারের মতো। তাই নয় কি স্যার?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

একা-একা অফিসে বসে থাকার মতো যন্ত্রণা অন্য কিছুতেই নেই। টেলিফোন লাইন এসেছে গত সপ্তাহে। ইদরিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কিছু

সময় কাটছে। তবে ইদরিসও ব্যস্ত মানুষ। বকবক করার সময় কোথায় তার? টেলিফোন করলেই দু'-একটা কথা বলার পরই বলে, 'দোস্ত, তাহলে রাখলাম।' রফিক সহজে রাখতে দেয় না।

'ইদরিস, বসে থাকতে থাকতে তো শিকড় গজিয়ে গেল। কাজ-কর্ম কিছু নেই।'

'হবে দোস্ত, হবে। ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর—বাঁধ বাঁধ বুক।'

'আর কত ধৈর্য ধরব?'

'এইসব অফিসের কর্তাদের হতে হয় মাকড়সার মতো। জাল ফেলে লুকিয়ে বসে থাকতে হয়। জালে কিছু একটা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলতে হয়। এক বার তো পড়েছিল, তুই তো পেঁচাতে পারলি না, অন্য পার্টি নিয়ে নিল। চিন্তা করিস না, আমি সাদেক আলিকে একটা বড়ো টিপ্‌স্ দিয়েছি। হতে পারে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, হবার সম্ভাবনা আশি ভাগ, তবে এইসব লাইনে কিছুই বলা যায় না। শেষ মুহূর্তে দেখবি ডাইস উল্টে গেল। রাখলাম দোস্ত।'

'ব্যাপারটা কী বল। কাজটা কী?'

'কাজ শুনে তুই করবিটা কী? বসে মাছি মারছিস, মাছি মার। যা করবার সাদেক আলি করবে। ও টাকাপয়সা যা চায়, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিবি কী জন্যে চাচ্ছে, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করবি না।'

'রহস্যময় ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'রহস্য কিছু না। দোস্ত রাখলাম।'

ইদরিসের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে চার দিন আগে। এই চার দিনে কাজের অগ্রগতি কী হচ্ছে, রফিক কিছুই জানে না। সাদেক আলিকে যে কিছু জিজ্ঞেস করবে তারও উপায় নেই। তার দেখাই পাওয়া যায় না।

আজ রফিক অফিসে এসে খুব বিরক্তি বোধ করল। গাদাখানিক ম্যাগাজিন জোগাড় করে রেখেছিল, অফিসে নিয়ে আসবে। পড়ে সময় কাটাবে। আসার সময় ভুলে ফেলে এসেছে। আবার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। অফিসে কোনো লোকও নেই যাকে পাঠানো যাবে। রফিকের ইচ্ছা ছিল এক জন অফিস এ্যাসিসটেন্ট রাখার। সাদেক আলি রাজি হয় নি। দাঁত বের করে বলেছে, 'এখনো সময় হয় নি স্যার। সময় হলে সব হবে। অফিস এ্যাসিসটেন্ট হবে, পি.এ.হবে, ক্যাশিয়ার হবে, হেডক্লার্ক হবে। কয়টা দিন ধৈর্যধরেন।'

রফিক ধৈর্য ধরেই আছে। ধৈর্যেরও সীমা আছে। এখন একেবারে সীমা অতিক্রম করার মতো অবস্থা। রফিক ইলেকট্রিক হিটার বসিয়ে দিল। আপাতত চমৎকার জাপানি কাপে চা খাওয়া যাক। চা খেতে-খেতে জীবন সম্পর্কে কিছু ফিলসফিক চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। লেখার অভ্যাস

থাকলে সময়টা কাজে লাগত। দারুণ রোমান্টিক একটা গল্প ফাঁদা যেত যেখানে তিনটি মেয়ে ভালোবাসে একটি ছেলেকে। ছেলেটি আবার চতুর্থ একটি মেয়েকে ভালোবাসে। কিন্তু সেই মেয়ে বিবাহিতা। স্বামী–সন্তান নিয়ে সুখেই আছে। জটিল পঞ্চভুজ প্রেম। সবচে ভালো হয় নিজেকে নিয়ে গল্প শুরু করলে। ধনী বাবার কন্যা ভালবাসত প্রবাসী এক ছেলেকে। হঠাৎ কী মতিভ্রম হল, বিয়ে করে বসল চালচুলো নেই এক বেকার যুবককে। সেই বেকার যুবক হচ্ছে এক জন আদর্শবান, অনুভূতিপ্রবণ, কোমলহৃদয় পুরুষ।

রফিক বসে আছে চুপচাপ। গল্প তরতর করে এগুচ্ছে। মনে মনে গল্প লেখার কাজটা এত সহজ, তার ধারণা ছিল না। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে টেলিফোন ধরল।

'হ্যালো।'

'স্যার, আমি সাদেক।'

'কী খবর সাদেক সাহেব?'

'হাজার পাঁচেক টাকা দরকার স্যার। আধ ঘন্টার মধ্যে।'

'কেন?'

'ব্যাপার আছে স্যার। একটা মেয়ে আসবে আপনার কাছে। তাকে টাকাটা দেবেন। নাম হচ্ছে নমিতা। নমিতা নাম বললেই টাকাটা দিয়ে দেবেন। আমি আসতে পারছি না। অন্য জোগাড়যন্ত্র করতে হচ্ছে।'

'ক্যাশ টাকা তো নেই।'

'ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে আসেন স্যার। যাবেন আর আসবেন। মেয়েটা যেন আবার চলে না যায়।'

'মেয়েটা কে?'

'তা দিয়ে আমাদের দরকার নেই। কাজ হওয়া দিয়ে কথা। বহু কষ্টে একে জোগাড় করা হয়েছে।'

'ব্যাপারটা কী একটু বলুন।'

'একটা ঘরোয়া ধরনের পার্টির মতো হবে। ঐ সব পার্টির শোভা দু' জন মেয়ে যাবে শোভা হিসেবে। এক জন হচ্ছে আমাদের কুসুম, অন্য জন নমিতা। রাস্তার মেয়ে তো আর পাঠানো যায় না। সবটা নির্ভর করছে ওদের উপর। স্যার, আমি টেলিফোন রাখলাম, আপনি টাকাটার জোগাড় দেখেন।'

নমিতা কোনো রকম কথা ছাড়া টাকাটা তার ব্যাগে ভরল। কী মিষ্টি চেহারা মেয়েটির। চোখ দু'টি বিষণ্ণ। ছায়াময় চোখ বোধহয় একেই বলে। বড়ো বড়ো পল্লব ছায়া ফেলেছে চোখে। মেয়েটির গায়ে গাঢ় নীল রঙের একটা চাদর। এই নীল রঙের জন্যেই কি তাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে?

নমিতা বলল, 'আমি আপনার অফিসে খানিকক্ষণ বসব। সাদেক আলি সাহেব এসে আমাকে নিয়ে যাবেন।'

'বসুন।'

'উনি কি আমার ড্রেস সম্পর্কে কিছু বলেছেন?'

'না, কিছু বলে নি। যা পরে এসেছেন তাতেই আপনাকে খুব চমৎকার লাগছে।'

মেয়েটি এক পলক তাকাল রফিকের দিকে।

বরফের মতো শীতল চোখ। কোনো রকম আবেগ–উত্তেজনা সেখানে নেই। রফিক্ বলল, 'আপনি কি চা খাবেন?'

'না।'

'আমি খাব। আমার সঙ্গে এক কাপ চা খান।'

মেয়েটি হ্যাঁ–না কিছুই বলল না। রফিক দু' কাপ চা বানাল। এক কাপ রাখল মেয়েটির সামনে। সে এই চা ছুঁয়েও দেখল না। ক্লান্ত গলায় বলল, 'দু'টা প্যারাসিটামল এনে দিতে পারেন?'

'এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। যাব আর আসব।'

'আপনি নিজেই যাবেন?'

মেয়েটি হেসে ফেলল। কী সুন্দর হাসি! রফিকের ইচ্ছা হল বলে—আপনার কোথাও যেতে হবে না। আপনি বাড়ি যান। আমরা অধিকাংশ কথাই বলতে পারি না।

শারমিন ছাদে একা–একা হাঁটছিল। এ বাড়ির ছাদে সে খুব কম আসে। কেন জানি তার ভালো লাগে না। ছাদে উঠলেই নিজেদের বাড়ির বিশাল ছাদের কথা মনে হয়। উঁচু রেলিংঘেরা ছোটখাট ফুটবল মাঠ। সেখানে যখন শারমিন গিয়ে দাঁড়াত, আশেপাশের কেউ তাকে দেখতে পেত না। কত সহজেই একা হওয়া যেত। এখানে সে সুযোগ নেই। চিলেকোঠার ঘরে থাকে আনিস। আশপাশের বাড়ির কয়েক জন ছেলেমেয়েও এখানে খেলতে আসে। চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে দেয়।

আজ অবশ্যি কেউ নেই। আনিসের ঘর তালাবন্ধ। দরজার উপর একটা কাগজে বড়ো বড়ো করে লেখা—"আমি এ সপ্তাহের জন্যে বাইরে গেলাম।" সেই এক সপ্তাহ কবে শুরু হবে আবার কবেই–বা শেষ হবে, কে জানে। শারমিনের খুব ইচ্ছা করল ছোট ছোট করে লেখে—আপনার এই সপ্তাহ কবে থেকে শুরু?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। শারমিনের মন খারাপ হয়ে গেল। ভেবেছিল সন্ধ্যা মেলানোর আগ পর্যন্ত ছাদে থাকবে। সূর্য ডোবা দেখবে সেটা আর সম্ভব হল না। পৃথিবীটাই এমন, যারা একা থাকতে চায়, তারা একা থাকতে পারে না। রাজ্যের মানুষ এসে তাদের চারপাশে ভিড় করে।

'শারমিন।'

'আরে ভাবী, তুমি!'

'নাও, চা নাও।'

'বুঝলে কী করে আমি ছাদে?'

নীলু হাসতে বলল, 'আমি হচ্ছি মহিলা শার্লক হোমস। ছাদে কী করছ?'

'তেমন কিছু না। এবার শীত তেমন পড়ল না, তাই না ভাবী?'

'হুঁ। ফাল্গুন চলে এসেছে নাকি?'

'কী জানি। আমি এখন আর দিন-তারিখের হিসাব রাখি না।'

শারমিন রেলিং এ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। নীল বলল, 'তোমার কী হয়েছে শারমিন, বল তো?'

'কই, কিছু হয় নি তো!'

'কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছ। রফিকের সঙ্গে কি কোনো কিছু নিয়ে বাক্যালাপ বন্ধ?'

'না।'

'ও কী সব অফিস-টফিস খুলেছে, তুমি তো দেখতেও যাও নি!'

'যাব এক দিন, দেখে আসব।'

'তুমি বাইরে চলে যাবে, এ-রকম একটা কথা শুনতে পাচ্ছি। এটা কি গুজব না সত্যি?'

'সত্যি।'

'রফিক এক জায়গায়, তুমি এক জায়গায়?'

'হ্যাঁ।'

'এটা কি ভালো হবে?'

শারমিন অল্প হাসল। খুব সহজেই সেই হাসি ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে বলল, 'কত ছেলেই তো বৌকে ফেলে পি-এইচ.ডি. করতে যায়। আমি গেলে সেটা দোষের হবে কেন?'

'দোষের হবে না। এখন তোমাদের দু' জনেরই ভালোবাসাবাসির সময়। এ সময় আলাদা হওয়াটা ঠিক হবে না। তুমি আরো ভালো করে ভেবে দেখ।'

'দিন-রাতই ভাবছি।'

'বরং একটা কাজ কর, তুমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে থাক। একটা বেচিত্র্য আসুক। দিনের পর দিন এক জায়গায় থেকে তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ। কিছু দিন ওখানে থাকলে তোমার ভালোলাগবে।'

শারমিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমিও তাই ভাবছি ভাবী।'

'এত ভাবাভাবির কিছু নেই। বেশ কিছু দিন থেকে আস। এখানে দিন-রাত কেমন গম্ভীর হয়ে থাক, আমার ভয়-ভয় লাগে। রফিকের না-জানি কী অবস্থা!'

নীলু তরল গলায় হেসে উঠল। শারমিন বলল, 'আমি আজ সন্ধ্যায় চলে গেলে কেমন হয় ভাবী।'

'আজই যাবে?'

'বাড়িওয়ালার বাসা থেকে টেলিফোন করলেই গাড়ি চলে আসবে। ভাবী, যাব?'

'বেশ তো, যাও। রফিককেও আমি পাঠিয়ে দেব।'

নীলু লক্ষ করল শারমিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দিনের শেষ আলো পড়েছে শারমিনের চুলে। চুলগুলি কেমন লালচে দেখাচ্ছে। সুন্দর লাগছে শারমিনকে।

রফিক বাসায় ফিরল রাত ন'টায়। তাকে দেখেই টুনি বলল, 'ছোট চাচী চলে গিয়েছে।' রফিক বিস্মিত হয়ে বলল, 'কোথায় গেছে?'

'ওনার নিজের বাড়িতে। সব জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। মনে হয় আর আসবে না।'

রফিক গম্ভীর হয়ে গেল। রাত এগারটায় ম্যানেজার সাদেক আলি এসে পাংশুমুখে বলল, 'স্যার, কাজটা হয় নি।'

রফিক শান্ত স্বরে বলল, 'না হলে কী আর করা যাবে? আপনি আপনার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। বাড়ি যান, বিশ্রাম করুন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যাবেন।'

সাদেক আলি মৃদুস্বরে বলল, 'ওরা স্যার আগেই অন্য পার্টির সঙ্গে সব ঠিকঠাক করে আমাকে বলেছে একটু আমোদ-আহলাদের ব্যাবস্থা করতে। বলেছে—আমাদের খুশি করে দিন, তারপর দেখুন আপনাদের খুশি করতে পারি কিনা।'

'ঠিক আছে বাদ দিন। যা হবার হয়েছে।'

'আমি বাদ দেব? বলেন কী স্যার? আমার নাম সাদেক আলি না? আমার সাথে মামদোবাজি করবে, আমি চুপ করে থাকব?'

'কী করবেন আপনি?'

'আমি যে কী পরিমাণ শয়তান, আপনি তা জানেন না স্যার।'

'সাদেক আলি সাহেব!'

'জ্বি?'

'কাজটা না-হওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি। সামান্য একটা কাজের জন্যে আমি মেয়েমানুষ পাঠাব, এটা তো হয় না। আমি ভদ্রলোকের ছেলে। আমার বাবা জীবনে কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেন নি। আমার এক মামা—কবির মামা, তিনি তাঁর নিজের জীবনটা দিয়ে দিয়েছিলেন অন্যের জন্যে। সাদেক আলি সাহেব, আমার সারাটা দিন খুব মনখারাপ ছিল। কাজটা হয় নি শুনে মনটা ভালো হয়েছে।'

'আপনি তো স্যার ব্যবসা করতে পারবেন না!'

'বোধহয় পারব না। বসুন, এক কাপ চা খেয়ে তারপর যান।'

সাদেক আলি বলল, 'আপনার মন ভালো হয়েছে, খুব ভালো কথা। আমার মনটা এখনও খারাপ, ঐ শালাকে শিক্ষা দিতে না পারলে স্যার আমার

মন ভালো হবে না। চা খাব না স্যার। আমি যাই। স্লামালিকুম।'

৪১

নীলগঞ্জ থেকে বাবলুর একটা চিঠি এসেছে। চিঠি কার কাছে লেখা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ কোনো সম্বোধন নেই। চিঠির বক্তব্যও সার্বজনীন—'আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছ? ইতি বাবলু।' চিঠি যেমনই হোক চিঠির সঙ্গের শিল্পকর্মটি অসাধারণ—একটি তিন মাথাওয়ালা গরু ঘাস খাচ্ছে। মনোয়ারা ছবি দেখে আঁৎকে উঠে বললেন—তোমাকে কত বার বলেছি বৌমা, ছোঁড়াটার মাথা খারাপ। তুমি তো বিশ্বাস কর না। দেখ একটা গরু এঁকেছে, মাথা তিনটা। নীলু হাসতে-হাসতে বলল, 'ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ হলেই তিন মাথার গরু আঁকতে হবে? ছি ছি, কী ঘেন্নার কথা!'

ছবি দেখে টুনি বেশ মন খারাপ করল। বাবলু যে ছবি আঁকতে পারে, তাই তার জানা ছিল না। তাও এমন সুন্দর ছবি, যা সবাই কত আগ্রহ নিয়ে দেখছে। টুনি তার মাকে ধরল, 'মা, গরু আঁকা শিখিয়ে দাও।'

নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, 'গরু আঁকা আমি জানি না মা, তোমার দাদুর কাছে যাও।'

'না, তুমি শিখিয়ে দাও।'

'দেখছ না, আমি একটা চিঠি পড়ছি। কেন বিরক্ত করছ টুনি?'

'না, তুমি শিখিয়ে দেবে। তুমি...'

নীলু মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। টুনি ইদানীং খুব বিরক্ত করছে। যা এক বার বলবে, তা-ই করতে হবে। গত রাতেও তাই করেছে। রাতে খাবার টেবিলে বলে বসল, 'পোলাও খাব মা।' নীলু বলল, 'পোলাও তো রান্না হয় নি, খাবে কী করে?'

'এখন রাঁধ।'

'কী বলছ টুনি এখন পোলাও রাঁধব কি?'

'না, রাঁধতে হবে। এখনই রাঁধ।'

'কাল পোলাও হবে। এখন খেয়ে নাও।'

'তাহলে আমি খাব না।'

টুনী টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। কিছুতেই তাকে খেতে বসানো গেল না। সত্যি-সত্যি রাত দশটায় রান্না চড়াতে হল। মনোয়ারা গজগজ করতে লাগলেন, 'একটামাত্র বাচ্চা, এরকম তো করবেই। তিন-চারটা ভাইবোন থাকলে এমন হত না। কী আর করা যাবে? সবাই হয়েছে আধুনিক। একটামাত্র বাচ্চা। ছেলে হলেও একটা কথা ছিল, মেয়ে পরের বাড়ি চলে

যাবে।'

কিছু দিন থেকেই মনোয়ারা এই লাইনে কথাবার্তা বলছেন। কথার সারমর্ম হচ্ছে, আরো ছেলেপুলে দরকার। বংশরক্ষার জন্যে হলেও ছেলে দরকার। তা ছাড়া এক সন্তান সংসারে অলক্ষ্মী ডেকে আনে। এইসব কথাবার্তা হয় কাজের মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু উদ্দেশ্য নীলু। সেদিন নীলু অফিসে যাবার সময় শুনল, মনোয়ারা কাজের মেয়েটিকে বলছেন, 'এক সন্তান সংসারে থাকলে কী হয় জানিস? একা-একা থাকে তো, কাজেই অলক্ষ্মীকে ডাকে। তখন অলক্ষ্মী এসে সংসারে ঢুকে পড়ে। আর অলক্ষ্মী এক বার সংসারে ঢুকলে উপায় আছে? সব ছারখার হয়ে যায়।'

নীলু শুনেও না-শোনার ভান করে। মাঝে মাঝে বড়ো বিরক্ত হয়। তাঁর শাশুড়ির মাথায় এক বার কোনো জিনিস ঢুকে পড়লে খুব মুশকিল। তিনি সেটা নিয়ে দিনের পর দিন কথা বলবেন। অন্যে কী ভাবছে না-ভাবছে তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাবেন না। মানুষ এ-রকম একচোখো হয় কীভাবে!

তবে টুনি যে বেশ নিঃসঙ্গ, তা নীলু বুঝতে পারে। নিঃসঙ্গ মানুষ খুব জেদী হয়, টুনি যেমন হয়েছে। একটু আগে সে চড় খেয়েছে। চোখে পানি আসে নি। মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। নীলু বলল, 'কী হল, এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমি গরু আঁকতে পারি না এক বার তো বললাম।'

'তুমি পার।'

'তুমি বললেই তো হবে না। আমাকে আঁকা জানতে হবে।'

'তুমি জান।'

নীলু দ্বিতীয় চড়টা বসাল। টুনি এতেও কাঁদল না। কিছুক্ষণ চোখ বড়ো-বড়ো করে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। মনোয়ারা পুরো দৃশ্যটি দূর থেকে দেখছিলেন। তিনি বললেন, 'বেশ করেছ, ভালো করেছ। শুধু যন্ত্রণা করে।'

নীলুর বেশ মন খারাপ হল। তার শাশুড়ি এ রকম কেন বলবেন? দাদু-নানুরা সংসারে থাকেন কেন? নীলু নিজে যখন টুনির মতো বয়েসী, তখন তার দাদী থাকতেন তাদের সঙ্গে। চোখে ভালো দেখতেন না। হাঁটাচলাতেও কষ্ট হত। অথচ কেউ যদি নীলুকে কড়া কোনো কথা বলেছে, উনি ছুটে এসে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে নীলুকে নিয়ে গেছেন। আর কী রাগ! এক বার নীলু একটা কানের দুল হারিয়ে ফেলেছে। নীলুর মা তাকে খুব মার দিলেন। নীলুর দাদী এসে বললেন, 'বৌমা, তোমার এত সাহস! তুমি আমার সামনে মেয়েটাকে মারলে? কানের দুল হারিয়েছে তো কী হয়েছে? জিনিস হারায় না? তুমি বুঝি সারা জীবনে কিছু হারাও নি?'

নীলুর মা বললেন, 'আমার ভুল হয়ে গেছে মা। এ-রকম আর হবে না।'

নীলুর দাদী সেদিন ভাত খেলেন না। সবার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। নীলুর মা অনেক কান্নাকাটি করে হাত-পা ধরে তাঁর রাগ ভাঙালেন।

সংসারে দাদী-নানীরা এরকম হবেন। টুনির দাদীর মতো মুখ কুঁচকে বলবেন না—মেরেছ বেশ করেছ। ভালো করেছ। শুধু যন্ত্রণা করে।

নীলুর মনে হল, চাকরি করতে গিয়ে সে অফিসের সঙ্গে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়েছে। অবহেলা করছে তার মেয়েকে। মা'রা বাচ্চাদের হাত ধরে-ধরে স্কুলে নিয়ে যান, ফিরিয়ে আনেন। সারা পথে বাচ্চারা মনের আনন্দে কত গল্প করে মা'র সঙ্গে। স্কুলের গল্প, বন্ধুবান্ধবদের গল্প। টুনির সে সুযোগ নেই।

নীলু ঠিক করল, আজ অফিসে দেরি করে যাবে। টুনীকে নিজেই স্কুলে পৌঁছে দেবে। বিকেলে তাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে যাবে। কয়েকটা গল্পের বই, একটা স্কুলব্যাগ, এক বাক্স ভালো চকলেট। বাবলু না-থাকায় মেয়েটা খুব একা হয়ে গেছে। মামার কুলখানি তো কবেই হয়েছে, এখনও তারা আসছে না কেন, কে জানে। দুলাভাই মানুষটা কাণ্ডজ্ঞানহীন, কে জানে হয়তো নীলগঞ্জেই খুঁটি গেড়ে বসে গেছে। ছেলের স্কুলের কী হবে, কিছুই ভাবছে না।

টুনি তার মা'র সঙ্গে স্কুলে যাবার কোনো আগ্রহ দেখাল না। কঠিন মুখে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে স্কুলে যাব না।'

'কেন, আমি কী দোষ করেছি?'

'আমি যাব না।'

'দু' জনে গল্প করতে-করতে যাব।'

'বললাম তো যাব না।'

'বিকেলে তোমাকে নতুন স্কুলব্যাগ কিনে দেব।'

'না না না।'

'তুমি খুব অবাধ্য হয়েছ টুনী।'

'হয়েছি, ভালো করেছি।'

মনোয়ারা ভেতর থেকে বললেন, 'বৌমা, একটা চড় দাও। তেজ বেশি হয়ে গেছে। তেজ কমুক।'

নীলু অফিসে চলে গেল। তার মন বিষণ্ন। মেয়েটা অনেকটা দূরে সরে গেছে, সে বুঝতে পারে নি। আজ মেয়েটাকে নিয়ে বেরুতে হবে। সারা সন্ধ্যা ঘুরবে।

অফিসে পৌঁছতেই শরিফ সহেব বললেন, 'আপা, আপনাকে বড়ো সাহেব অর্জেন্ট মেসেজ দিয়ে রেখেছেন। আপনি যেন আসামাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। খুব জরুরি।'

'ব্যাপার কী?'

'আপনাকে চিটাগাং যেতে হবে।'

'কেন?'

'আছে অনেক ব্যাপার।'

'কবে যেতে হবে?'

'আজই। আজ দুপুরের মধ্যেই রওনা হতে হবে।'

'সে কি!'

'বড়ো সাহেব নিজেও যাবেন, আমিও যাচ্ছি। দু' দিনের মামলা। কোম্পানির মাইক্রোবাস যাবে।'

নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। দুপুরে রওনা হতে হলে হাতে একেবারেই সময় নেই। বাসায় যেতে হবে। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে হবে। শফিককে খবর দিতে হবে। আচ্ছা, টুনিকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না? না, তা কি আর হয়! সে থাকবে অফিসের কাজে ব্যস্ত, টুনি গিয়ে কী করবে? কী বিশ্রী ঝামেলা।

নীলু রওনা হল একটার সময়। সে শফিকের সঙ্গে দেখা করে গেল। কিন্তু টুনির সঙ্গে দেখা হল না, টুনির পড়ার টেবিলে একটা চিঠি লিখে গেল—

"মা গো, আমার দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটামাত্র মেয়ে। সেই মেয়ে যদি আমার উপর রাগ করে, তাহলে আমার খুব কষ্ট হয়।।"

৪২

আনিস গিয়েছিল দিনাজপুরের পঞ্চগড়ে। সেখানে হাত-সাফাইয়ের এক জন বড়ো ওস্তাদ থাকে। ঠিকানা জানা ছিল না। স্টার ফার্মেসির উল্টো দিকে তার বাসা। নাম—ইনামশেখ।

স্টার ফার্মেসি নামে কোনো ফার্মেসির সন্ধান পাওয়া গেল না। ইনাম শেখের নামও কেউ শোনে নি। এতগুলি টাকা খরচ করে আসা। আনিসের ইচ্ছা করছে ডাক ছেড়ে কাঁদে। যাদের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে, তারা ভুল খবর দেবে এটা বিশ্বাস্য নয়। ইনাম শেখ আছে নিশ্চয়ই—কেউ খোঁজ জানে না। ম্যাজিশিয়ানদের খোঁজখবর কে আর রাখবে? এককালে মুগ্ধ ও বিস্মিত হবার জন্যে মানুষ ম্যাজিক দেখত। আজকাল মানুষকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবার আয়োজনের কোনো অভাব নেই।

আনিস হাল ছাড়ল না। রিকসাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, চায়ের দোকানের মালিক, সিনেমা হলের গেট কিপার, সবাইকে জিজ্ঞেস করে, 'ভাই, আপনারা একটা খোঁজ দিতে পারেন? ইনাম শেখ। ম্যাজিক দেখায়। হাত-সাফাইয়ের খেলা জানে।'

উত্তরে সবাই বলে, 'উনার বাসা কোথায়?' মানুষের নির্বুদ্ধিতায় তার গা জ্বালা করে। বাসা কোথায় জানা থাকলে সে জনে-জনে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে কেন? নিজেই তো উপস্থিত হত সেখানে।

আনিস ঠিক করল, সে সব মিলিয়ে এক শ' জনকে জিজ্ঞেস করবে।

তারপর মাইক ভাড়া করে হারানো বিজ্ঞপ্তি দেবে—ভাইসব। ইনাম শেখ নামে এক জন ম্যাজিশিয়ানের সন্ধানপ্রার্থী। বয়স পঞ্চাশ। মুখে দাড়ি আছে, রোগা, লম্বা। পরনে নীল লুঙ্গি।

আনিস অবশ্যি জানে না, ইনাম শেখের বয়স পঞ্চাশ কিনা। মুখে দাড়ি, রোগা, লম্বা এসব তার কল্পনা। দরিদ্র মানুষ এ–রকমই হয়।

শেষ পর্যন্ত মাইকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার দরকার হল না। ইনাম শেখকে পাওয়া গেল। বয়স ষাটের উপরে। দু'টি চোখেই ছানি পড়েছে। চলাফেরার সামর্থ্য নেই। ছেলের বাড়িতে থাকে। ছেলে মোটর মেকানিক। বাসা মেয়েদের হাই স্কুলের পেছনে। দু' কামরার একটা টিনের ঘর। চট দিয়ে ঘেরা বারন্দায় ইনাম শেখের জন্যে খাটিয়া পাতা। বিকট দুর্গন্ধ আসছে লোকটির গা থেকে। কিছুক্ষণ পরপরই সে প্রবল বেগে মাথা চুলকাচ্ছে এবং বিড়বিড় করে বলছে—শালার উকুন।

ঢাকা থেকে এক জন লোক তার কাছে হাত–সাফাইয়ের কাজ শিখতে এসেছে শুনে সে বলল, 'যা শালা, ভাগ।'

বাড়ির ভেতর থেকে দশ–এগার বছরের একটি বালিকা বের হয়ে বলল, 'দাদার মাথা খারাপ। আপনে যান গিয়া। আপনেরে মারব।'

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, 'সবাইকে মারে নাকি?'

'হ, মারে। থুক দেয়। খুব বজ্জাত।'

বুড়ো ছানিপড়া চোখে তাকিয়ে আছে। যেভাবে তাকিয়ে আছে, তাতে মনে হচ্ছে কিছু একটা করে বসতে পারে।

'তোমার দাদা ম্যাজিক জানে?'

'না। খালি মানুষের শইলে থুক দেয়। খুব বজ্জাত। আফনে যান গিয়া। আপনেরে থুক দিব।'

আনিস একটু সরে দাঁড়াল। এ বুড়োর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। এত দূর এসে চলে যেতেও মন সরছে না। আনিস অনুনয়ের স্বরে বলল, 'চাচামিয়া, হাতের কাজ কিছু জানেন?'

বুড়ো কুৎসিত একটা গাল গিয়ে আনিসের দিকে সত্যি সত্যি থুথু ফেলল। অদ্ভুত নিশানা। সেই থুথু এসে পড়ল আনিসের প্যান্টে। ছোট মেয়েটা মজা পেয়েছে খুব। হাসতে–হাসতে ভেঙে পড়ছে। হাসি থামিয়ে বলল, 'আপনারে কইলাম না, বুড়া খুব বজ্জাত। বিশ্বাস হইল?'

'তোমার নাম কী খুকি?'

'ময়না।'

'স্কুলে পড়?'

'না।'

বুড়ো আবার থুথু দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। আনিস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে এল। শুধু শুধু এতগুলি টাকা নষ্ট হল। ঢাকায় ফিরে গেলেও সমস্যা

হবে। যে দু'টি বাচ্চাকে সে প্রাইভেট পড়ায়, তাদের মা কাটা-কাটা স্বরে কথা শোনাবেন—কোথায় ছিলেন এই ক' দিন? বাচ্চাদের পরীক্ষার সময় আপনি যদি এ-রকম ডুব মারেন, তাহলে কীভাবে হবে? একটা কাজ করছেন, দায়িত্ব নিয়ে করবেন না? আপনাকে তো রেগুলার বেতন দিচ্ছি। দিচ্ছি না?'

এইসব কথা অবশ্যি সে গায়ে মাখে না। কোনো কথাই আজকাল সে গায়ে মাখে না। কেউ যদি গায়ে থুথু ফেলে, তাও সে অগ্রাহ্য করতে পারে। এসব সহ্য হয়ে গেছে। তবে ট্যুশনি দু'টি চলে গেলে তার কষ্ট হবে। রাস্তায়-রাস্তায় ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতে হবে।

ঢাকায় ফেরবার পথে জাপানি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ হল। ভদ্রলোকের নাম 'কাওয়ানা'। বাসে তিনি বসেছেন আনিসের পাশে। টেকনিক্যাল টিমের সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিন বছর কাটিয়ে দেশে ফিরবেন। দেশে যাবার আগে বাংলাদেশ ঘুরতে বের হয়েছেন। হাসিখুশি ধরনের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু দেখায় ত্রিশের মতো। ভালো বাংলা বলতে পারেন। শুধু ক্রিয়াপদগুলি একটু ওলটপালট হয়ে যায়। আনিস এক জন ম্যাজিশিয়ান শুনে তিনি খুবই অবাক হলেন।

'আপনি কি এক জন পেশাদার ম্যাজিশিয়ান?'

'শখের ম্যাজিশিয়ান। পেশাদার ম্যাজিশিয়ান হবার মতো সুযোগ নেই।'

'সুযোগ থাকলে হতেন?'

'হ্যাঁ, হতাম।'

'ম্যাজিকের ব্যাপারে আমার নিজেরও আগ্রহ। আমি দেশের একটা ম্যাজিক ক্লাবের সদস্য।'

'আপনি নিজে ম্যাজিক জানেন?'

'না, আমি জানি না, আমার দেখতে ভালো লাগে। আপনি কী ধরনের ম্যাজিক দেখান? যন্ত্রনির্ভর?'

'জ্বি-না। যন্ত্রপাতি কোথায় পাব? বেশির ভাগই পামিংয়ের কৌশল।'

'পামিং কেমন জানেন?'

'ভালোই জানি।'

'এই সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে লুকাতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, পারব।'

আনিস মুহূর্তের মধ্যেই সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেলল। প্রথম ডান হাতে, সেখান থেকে অতি দ্রুত বাঁ হাতে। বাঁ হাত থেকে আবার ডান হাতে। জাপানি ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে দেখলেন। এতটা তিনি আশা করেন নি।

'দয়া করে আরেক বার করুন।'

আনিস দ্বিতীয় বার করল। বাসের অনেকেই কৌতূহলী হয়ে দেখছে। দু'টি ছোট বাচ্চা উঠে এসেছে আনিসের কাছে। জাপানি ভদ্রলোক বললেন, 'অপূর্ব!

আমি এত চমৎকার পামিং এর আগে দেখি নি। পামিংয়ের কৌশলে সবচে ভালো খেলা আপনার কোনটি?'

'গোলাপ ফুলের একটি খেলা আমি দেখাই। শূন্য থেকে গোলাপ তৈরি করি। ঐটি চমৎকার খেলা।'

'ক'টি গোলাপ বের করতে পারেন?'

'গোটা দশেক পারি।'

ভদ্রলোক আনিসের ঠিকানা রাখলেন। বললেন, 'আমি দেশে যাবার আগে অবশ্যই আপনার গোলাপের খেলা দেখে যাব।'

ভদ্রলোক তাঁর কথা রাখলেননা, তবে কিছু দিন পর আনিস "জাপান ইয়াং ম্যাজিশিয়ান সোসাইটি"র সম্পাদকের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। যার বক্তব্য হচ্ছে—তারা তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আনিসকে নিমন্ত্রণ করছে তার গোলাপের খেলা দেখানোর জন্যে। আনিসের যাওয়া-আসার খরচ এবং এক সপ্তাহ জাপানে থাকার খরচ সোসাইটি বহন করবে। আনিসের সম্মতি পেলেই তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আনিস দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল। কত আনন্দের খবর। কিন্তু এমন কষ্ট হচ্ছে কেন? সত্যি সত্যি তার চোখে পানি এসে গেছে।

পৃথিবী বড়োই রহস্যময়। সে যদি ইনাম শেখ বলে এক বুড়োর খোঁজে না যেত, তাহলে হৃদয়বান ঐ জাপানি ভদ্রলোকের সাথে তার দেখা হত না। এই যোগাযোগের পেছনে কারোর অদৃশ্য হাত সত্যি কি আছে? কেউ কি আড়ালে বসে লক্ষ করছে আমাদের? অসীম করুণাময় কেউ?

টুকটুক করে দরজায় টোকা পড়ছে। শাহানা যেমন করে টোকা দিত। আনিস বলল, 'কে?' বীণা বলল, 'আমি।'

আনিস দরজা খুলল। বীণার মুখ গম্ভীর। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই সে কেঁদেছে, চোখ ফোলা–ফোলা।

'কী খবর বীণা?'

'দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে আসতে দিন।'

আনিস সরে দাঁড়াল। বীণা ভেতরে ঢুকল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল। আনিস বলল, 'কী হয়েছে বল তো?'

'আপনাকে কি মা কিছু বলেছেন??'

'না, কিছু বলেন নি।'

'সত্যি করে বলুন।'

'সত্যি বলছি।'

'মা কিছুই বলেন নি?'

'না।'

'আনিস ভাই, আপনি এই বাসা ছেড়ে চলে যান।'

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, 'কোথায় যাব?'

'জানি না কোথায় যাবেন। মোটকথা, আপনি এখানে থাকবেন না। কাল ভোরে যেন আপনাকে আর না দেখি।'

'কী হয়েছে বল তো বীণা।'

'কিছু হয় নি। কাল ভোরে চলে যাবেন।'

'আমার যাবার তো কোনো জায়গা নেই।'

'জায়গা না–থাকলে রাস্তায় থাকবেন। ফুটপাতে ঘুমুবেন। এই শহরে হাজার হাজার লোক ফুটপাতে ঘুমায়। আপনিও ঘুমুবেন। যখন খাওয়া জুটবে না, ভিক্ষা করবেন।'

বীণা উঠে দাঁড়াল। আনিসকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না–দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আনিস বীণার অদ্ভুত কথাবার্তায় কিছুই বুঝল না। বোঝার কথাও নয়। বীণা কখনো পরিষ্কার করে কিছু বলে না। অর্ধেক কথা বলে, অর্ধেক নিজের মধ্যে রেখে দেয়।

গত রাতে মার সঙ্গে তার বড়ো রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়ার শুরুটা এরকম—রাতে ঘুমুতে যাবার আগে লতিফা একটা ছবি আঁচলে লুকিয়ে বীণার ঘরে ঢুকে নানান কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বীণা বলল, 'কী বলতে এসেছ বলে ফেল, আমি ঘুমুব। আঁচলে ওটা কী? কার ছবি?'

লতিফা বললেন, 'ছেলেটার নাম ইমতিয়াজ। ইন্টার্নি ডাক্তার।'

'ইন্টার্নি ডাক্তারের ছবি আঁচলে নিয়ে ঘুরছ কেন?'

'কী জন্যে ঘুরছি, তুই ভালোই জানিস। এমন করে আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন? আমি তোর মা না?'

'মা, তুমি ছবি নিয়ে বিদেয় হও। এই ঘোড়ামুখী ছেলে আমার পছন্দ না। ছবি দেখলেই ইচ্ছা করে ব্যাটার গালে এ্যাকটা খামচি দিই।'

লতিফা স্তম্ভিত। কী ধরনের কথাবার্তা বলছে মেয়ে! সামান্য ভদ্রতা, আদব–কায়দাও কি সে জানে না? অশিক্ষিত মূর্খ মেয়েও তো নয়। লতিফা হিসহিস করে বললেন, 'তোর সমস্যাটা কী, আমি জানি।'

'জানলে বল।'

'তোর গলার দড়ি বাঁধা আছে দু' তলার ছাদে। ঐ দড়ি না কাটলে তোর মুক্তি হবে না।'

'দড়ি কেটে মুক্তি দিয়ে দাও। দেরি করছ কেন?'

'তাই করব। হারামজাদাকে লাথি দিয়ে বের করব।'

'গালাগালি করছ কেন?'

'গালাগালি করব না তো কী করব? কোলে নিয়ে বসে থাকব? হারামজাদা ছোটলোক। সকাল হোক, কানে ধরে বের করে দেব। ফুটপাতের ছোকরা, ফুটপাতে থাকবে। ভিক্ষা করবে।'

'সকাল হলে বের করে দেবে?'

'হ্যাঁ, দেবই তো।'

'বেশ, দাও।'

বীণা হাই তুলল। মশারি ফেলতে-ফেলতে বলল, 'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কী? এখনি বিদেয় করে দাও। অপ্রিয় কাজ যত তাড়াতাড়ি করা যায়, ততই ভালো। তুমি মা দয়া করে এখন ওঠ। আমি এখন ঘুমুব।'

লতিফা উঠলেন। সেই রাতে তাঁর ঘুম হল না। অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপতে লাগল। আনিস ছেলেটি শনিগ্রহের মতো এ বাড়িতে ঢুকেছে। বড়ো কোনো সর্বনাশ সে করবে, এটা তিনি অনুভব করছেন। যে করেই হোক একে বিদেয় করতে হবে। হাতে শ' পাঁচেক টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলা যায়—এখানে আমার কিছু অসুবিধা আছে, তুমি অন্য কোথাও যাও।

না, এ-রকম বলা ঠিক হবে না। 'অসুবিধা আছে' বলার দরকার কী? কোনোই অসুবিধা নেই। বলতে হবে, ছাদের ঘরটা আমাদের দরকার, কাজেই তুমি কোনো মেসেটেসে গিয়ে ওঠ।

ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গলায় বলতে হবে, যাতে সে বুঝতে পারে যে, এবার তাকে আসর ভেঙে উঠতে হবে।

লতিফা গভীর রাতে বাথরুমে গিয়ে মাথায় পানি ঢাললেন। কপালের দু' পাশের শিরা দপদপ করছে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। ঠাণ্ডা পানি ঢেলেও সে-যন্ত্রণার আরাম হল না। বসার ঘরে একা জেগে বসে রইলেন। আনিসকে কী করে অতি ভদ্রভাবে অথচ শক্ত ভাষায় বাড়ি ছাড়ার কথা বলা যায়, তাই ভাবতে লাগলেন।

তাঁকে কিছু বলতে হল না। বীণার কথাতেই কাজ হল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা আনিস তার বিছানা ও সুটকেস গুছিয়ে বিদায় নিতে এল। লতিফাকে বলল, 'বীণা কোথায়, মামী?'

'পড়ছে।'

'ওকে একটু ডেকে দিন না।'

'পড়াশোনার মধ্যে ডাকাডাকি করলে ও খুব বিরক্ত হয়। যা বলাবার আমাকে বল, ওকে আমি বলে দেব।'

'আমি চলে যাচ্ছি মামী। অনেক দিন আপনাদের বিরক্ত করলাম।'

লতিফা বিব্রত স্বরে বলল, 'না না, বিরক্ত কিসের? নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছ, খুব ভালো কথা।'

'যদি অজান্তে কোনো অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা করবেন। কিছু মনে রাখবেননা।'

লতিফা কী বলবেন ভেবে পেলেন না। অতি দ্রুত চিন্তা করেও এই ছেলেটির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাঁড় করাতে পারলেন না।

'মামী, আপনি কি কোনো কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট?'

'না না, অসন্তুষ্ট হব কেন?'

'তাহলে যাই, মামী। স্লামালিকুম।'

লতিফা প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলছিলেন—কোথায় যাচ্ছ? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালেন। বাড়তি খাতির দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই। যাক যেখানে ইচ্ছা। আবার উদয় না হলেই হল।

আনিস চলে গিয়েছে, এই খবর বীণা সহজভাবেই গ্রহণ করল। কখন গিয়েছে, যাবার সময় কী বলেছে, এইসব নিয়ে কোনো আগ্রহ দেখাল না। অবহেলার ভঙ্গি করে বলল, 'গিয়েছে, ভালো হয়েছে। আপদ বিদেয় হয়েছে। তুমি এখন এক কাজ কর তো মা, চিলেকোঠার ঘরটা আমাকে পরিষ্কার করে দাও।'

লতিফা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ঐ ঘর দিয়ে তুই কী করবি?'

'ওখানে পড়াশোনা করব। ওটা হবে আমার রিডিংরুম, বেশ নিরিবিলি।'

লতিফা আর কথা বাড়ালেন না। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনো দরকার নেই। চাপা পড়ে থাকুক। চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল।

নীলু চিটাগাং গিয়েছিল দু' দিনের জন্যে। তাকে থাকতে হল ছ' দিন। অফিসের কাজকর্মে এমন এক জট তারা পাকিয়ে রেখেছে, যা খোলার কোনো রকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ছত্রিশ লক্ষ টাকার হিসেবে গরমিল। এক বার অডিট হওয়ার পর দ্বিতীয় বার অন্য একটি কোম্পানিকে দিয়ে অডিট করানো হল। তারা আবার সব ঠিকঠাক পেল। কোম্পানির একটি মাইক্রোবাস হরতালের দিন পুড়ে গেছে, এমন রিপোর্ট আছে। আবার গোপন চিঠিও আছে যে, বাসটি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। রং বদলে সেটা এখন চিটাগাং–নাজিরহাট লাইনে ট্রিপ দেয়। চিঠিতে চেসিস–এর নম্বর পর্যন্ত দেয়া।

অফিসে বিভিন্ন লোকের ইন্টারভ্যু নেওয়ার সময় মনে হয় কেউ সত্যি কথা বলছে না। এটাও বিশ্বাস্য নয়—এতগুলি লোকের সবাই মিথ্যা কথা বলবে কেন?

নীলু অস্থির হয়ে পড়ল। অফিসের এই ঝামেলা তার সহ্য হচ্ছে না। সন্ধ্যাবেলা ডাকবাংলোয় ফিরে তার কাঁদতে ইচ্ছে করে। চলে যাবে—সে উপায়ও নেই। তদন্তের দায়িত্ব তার উপর ক্রমে–ক্রমে চলে আসছে। দায়িত্ব অস্বীকার করার সাহস তার নেই।

রাতে তার ভালো ঘুম হয় না। এক রাতে ভয়াবহ একটা স্বপ্ন দেখল—উলের কাঁটা নিয়ে টুনি খেলছে, হঠাৎ খোঁচা লাগল চোখে। রক্তারক্তি কাণ্ড! ডাক্তার এল এবং গম্ভীর মুখে বলল, 'একটা চোখে খোঁচা লাগলেও দু'টি চোখই নষ্ট। তবে চিন্তার কিছু নেই, পাথরের চোখ লাগিয়ে দেব। আসল, নকল কেউ বুঝতে পারবে না।' নীলু স্বপ্নের মধ্যেই চেঁচিয়ে বলল, 'এসব আপনি কী বলছেন?'

ডাক্তার তার দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'পাথরের চোখ আপনার পছন্দ না-হলে মার্বেল বসিয়ে দিতে পারি। মার্বেলেও খারাপ হবে না। অনেক রকমের রঙ আছে, আপনি নিজে পছন্দ করে নিতে পারেন।'

ঘুম ভেঙে গেল। নীলুর গা দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। এ-রকম কুৎসিত স্বপ্ন মানুষ দেখে! এ-রকম স্বপ্ন দেখার পরও কি কেউ বাসায় ফিরে না-গিয়ে থাকতে পারে? নীলুকে থাকতে হল।

ঢাকায় যেদিন রওনা হল, সেদিন তার মনে হল যেন কত দীর্ঘকাল বাইরে কাটিয়ে ফিরছে। ঢাকা পৌঁছেই দেখবে, সব বদলে গেছে। সবাইকে অচেনা-অচেনা লাগবে। টুনি সম্ভবত লজ্জা-লজ্জা মুখে পর্দার আড়ালে থাকবে। লজ্জা ভাঙতে সময় লাগবে। ইস্, কতদিন যে সে মেয়েটাকে দেখে না!

কল্পনার সঙ্গে বাস্তব বোধহয় কখনোই মেলে না। নীলু ঢাকায় পৌঁছল বিকেলে। কিছুই বদলায় নি। সব আগের মতো আছে। টুনির হাতে একটা চকবার আইসক্রিম। আইসক্রিম তার জামা মাখামাখি হয়ে আছে। নীলু ভেবেছিল, তাকে দেখেই টুনি ছুটে আসবে, তা হল না। ঠিক সেই মুহূর্তে টুনির আইসক্রীমের একটা বড়ো অংশ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। সে তার ভাঙা টুকরো সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'কেমন আছ মা?'

'ভালো। তুমি আজ আসবে আমরা জানতাম।'

'কী ভবে জানতে?'

'আব্বু টেলিফোন করেছিল।'

'তোমাদের আর সব খবর কী?'

'দাদীর একটা দাঁত পড়ে গেছে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ, দাদীকে পেত্নীর মতো লাগছে।'

'ছিঃ এসব বলতে নেই।'

'বললে কী হয়?'

'আল্লাহ্ পাপ দেন। কাছে আস মা, আমাকে একটু আদর দাও।'

'উঁহু, তোমার গায়ে আইক্রিমের রস লেগে যাবে।'

'লাগুক। এস, আমাকে একটা চুমু দাও।'

টুনি লজ্জিত মুখে মাকে চুমু খেয়ে ফিসফিস করে বলল, 'জান মা, বাবলু এখনও আসে নি।'

'সে কী! কেন?'

'কী জানি!'

'বাসার আর সব লোকজন কোথায়? মনে হচ্ছে তুমি ছাড়া কেউ নেই।'

'বুয়া আছে। দাদা দাদীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে। আব্বু অফিসে।

চাচাও অফিসে।'

'তোমাকে একা ফেলে গেছে?'

'একা কোথায়, বুয়া তো আছে।'

নীলু গোসল করতে ঢুকল। টুনিকে বলল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে। টুনি বলল, 'কেন মা?' নীলু হেসে বলল, 'অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা তো, তাই। তোমার কথা শুনতে ভালো লাগছে।'

'আমি খুব সুন্দর করে কথা বলা শিখেছি, তাই না মা?'

'হ্যাঁ।'

'বাবলু কি আমার মতো সুন্দর করে কথা বলতে পারে?'

'না। সে তো কথাই বলে না।'

'ছোট চাচী কি আর আসবে না, মা?'

'নিশ্চয় আসবে।'

'বীণা খালার মা বলেছে আর আসবে না।'

'তাই বলেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

গোসলের পানি কনকনে ঠাণ্ডা। তবু নীলু মাথায় মগের পর মগ ঠাণ্ডা পানি ঢালছে। বন্ধ দরজার ওপাশে টুনি দাঁড়িয়ে ছেলেমানুষি সব কথা বলছে। বড়ো ভালো লাগছে শুনতে।

'তুমি আমার কথা ভেবেছিলে টুনি?'

'হ্যাঁ, ভেবেছি।'

'কেঁদেছিলে আমার জন্যে?'

'না।'

'কাঁদ নি কেন?'

'আমি বড়ো হয়েছি যে, তাই।'

'বড়োরা বুঝি কাঁদে না?'

'না।'

'বড়ো বড়ো মেয়েরা যখন বিয়ে করে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তখন তো কাঁদে। কাঁদে না?'

'হ্যাঁ, কাঁদে।'

'তুমি কাঁদবে না?'

'হ্যাঁ, কাঁদব।'

মনোয়ারা ফিরলেন সন্ধ্যা মেলাবার পর। নীলুকে দেখেও কিছু বললেন না। তাঁর মুখ গম্ভীর। রাগী-রাগী চোখ। হোসেন সাহেবও কেমন যেন বিপর্যস্ত। নীলু বলল, 'ঝামেলায় এত দেরি হল মা। আপনারা ভালো ছিলেন তো?'

তিনি জবাব না-দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। হোসেন সাহেব বললেন, 'আজ আর তোমার শাশুড়িকে কিছু জিজ্ঞেস করো না মা, জবাব পাবে না।'

নীলু বিস্মিত হয়ে তাকাল। হোসেন সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমার শাশুড়ির সামনের দুটা দাঁত ডাক্তার ফেলে দিয়েছেন। আগে পড়েছে একটা। বিশ্রী দেখাচ্ছে। তাকান যাচ্ছে না।'

হোসেন সাহেবের মুখ করুণ হয়ে গেল। যেন তাঁর নিজেরই সামনের দু'টি দাঁত নেই।

'মেয়েদের সৌন্দর্যই হচ্ছে দাঁত, বুঝলে মা?'

'বাঁধিয়ে নিলেই হবে বাবা।'

'বাঁধান দাঁত কি আগের মতো হয়? তুমি ভালো ছিলে তো মা?'

'জ্বি, ভলোই ছিলাম।'

'তুমি দূরে থেকে বেঁচে গেছ, তোমার শাশুড়ি দাঁতের যন্ত্রণায় চিৎকার—চেঁচামেচি করে সবার মাথাখারাপ করিয়ে দিয়েছে।

শফিক এবং রফিক দু' জন একই সঙ্গে এল—রাত এগারটায়। নীলুর চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে। তবু সে জেগে আছে। মনোয়ারাও জেগে। ডেনটিস্ট যে তাঁকে কী পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে, এটা তিনি চতুর্থ বারের মতো বলছেন।

'ব্যাটা গর্ধভ কিছুই জানে না। আমার মনে হয় নকল করে পাশ করেছে। অবশ না করেই দাঁত তুলে ফেলেছে।'

'বলেন কী মা!'

'মহা হারামজাদা। উল্টা আমাকে ধমক দেয়।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ, বলে কি—আপনি শুধু--শুধু এত হৈচৈ করছেন কেন?'

'খুব অন্যায়!'

'ইচ্ছা করছিল ছোকরার কানটা টেনে ছিঁড়ে দিই।'

'আপনি শুয়ে পড়ুন মা। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন।'

মনোয়ারা ঘুমুতে যেতে রাজি নন। তিনি আজকের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তাঁর দুই ছেলেকে না-শুনিয়ে ঘুমুতে যেতে রাজি নন। সেই সুযোগ তাঁর হল না। রফিক ঘরে ঢুকেই বলল, 'বাহ্ মা, তোমাকে তো সুন্দর লাগছে! কেমন যেন ড্রাকুলার মতো দেখাচ্ছে।'

মনোয়ারা কিছুক্ষণ অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রফিক বলল, 'ভাবী, তাড়াতাড়ি ভাত দাও। খিদে লেগেছে।'

'এত দিন পর এলাম, প্রথম কথাটাই এই? কেমন ছিলাম, কী, জিজ্ঞেস কর। সাধারণ ভদ্রতাটা দেখাও।'

'কেমন ছিলে ভাবী?'

প্রশ্ন করে রফিক উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। বাথরুমে ঢুকে গেল।

রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আগে শফিক তার অভ্যাসমতো এক কাপ চা

খেতে চাইল বলল, 'তোমার যাবার দরকার নেই। কাজের মেয়েটাকে বল ও দেবে।'

'আমিই বানিয়ে আনি।'

নীলু রাতে শোবার আগে কখনো চা খায় না। আজ সে নিজের জন্যেও এক কাপ বানাল। শফিককে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে-দিতে বলল, 'তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?'

'রাগ করব কেন?'

'দু' দিনের কথা বলে ছ' দিন কাটিয়ে এলাম, এই জন্যে।'

'প্রয়োজন হয়েছে থেকেছ, এই নিয়ে রাগ করব কেন? তোমার কথা শুনে মনে হয়, আমার স্বভাব হচ্ছে অকারণে রাগ করা। আমি কি সে রকম?'

'না।'

শফিক হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, 'এক বার ভাবছিলাম তোমাকে কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ টুনিকে নিয়ে চিটাগাং উপস্থিত হব। দেখব তুমি কী কর।'

'এলে না কেন? তোমরা এলে আমার কত ভালো লাগত।'

বলতে-বলতে কী যে হল, নীলু ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। শফিক অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার?'

কী যে ব্যাপার, তা কি নীলু নিজেও জানে? আমরা আমাদের কতটুকুই-বা জানি?

শফিক আবার বলল, 'কী হয়েছে নীলু?' তার গলার স্বর আশ্চর্য কোমল শোনাল। নীলু বলল, 'কিছু হয় নি, এস ঘুমুতে যাই।'

বিছানার মাঝামাঝি টুনি শুয়ে আছে। নীলু নিজেই তাকে এক পাশে সরিয়ে দিল। সরিয়ে দিতে গিয়ে লক্ষ করল, টুনির বাঁ চোঁখের নিচে ছোট একটা কালো বিন্দু উঁচু হয়ে আছে। নীলু বলল, 'ওর এখানে কী হয়েছে?'

'উলের কাঁটা দিয়ে খোঁচা লাগিয়েছে। আরেকটু হলে চোখে লাগত।'

নীলুর গা দিয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল। সে তার মেয়ের কপালে হাত রাখল। গা কেমন যেন গরম-গরম লাগছে। নীলু বলল, 'দেখ তো, ওর শরীরটা কি গরম?'

শফিক গা করল না। সহজ স্বরে বলল, 'এই ঠাণ্ডায় পাতলা একটা জামা গায়ে দিয়ে ঘুরে জ্বরজারি হয়েছে আর কি। বাচ্চাদের মাঝে-মাঝে অসুখবিসুখ হওয়া ভালো—এতে শরীরে এন্টিবডি তৈরি হয়।'

'কে বলেছে তোমাকে?'

'কেউ বলে নি। কোথায় যেন পড়েছি।'

'এস , ঘুমুতে এস।'

নীলু আবার মেয়ের কপালে হাত রাখল। গা গরম। নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাচ্চাদের জ্বরজারি সব সময়ই হয়। কত বার এমন হয়েছে, কিন্তু

আজ নীলুর এ-রকম লাগছে কেন?

৪৩

শারমিন বিকেলে বাগানে হাঁটছিল।

তার গায়ে আকাশী রঙের একটা চাদর। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে বলে চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা। তার দুপুরে ঘুমানোর অভ্যেস নেই। আজ কেন জানি ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠলে মন কেমন করে। অজানা এক ধরনের কষ্ট হয়। কেন হয় কে জানে।

সে হাঁটতে-হাঁটতে কুল গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। পেকে সব টসটস করছে। খাওয়ার মানুষ নেই।

'আপা, বরই পেড়ে দেই, খান।'

'না। তোমার নাম কী?'

'আমার নাম কুদ্দুস।'

এই ছেলেটিকে সে আগে দেখে নি। সতের-আঠার বছর বয়স। দেখলে মনে হয় কলেজে-টলেজে পড়ে। ঝকঝকে পরিষ্কার দাঁত। টুথপেস্টের সুন্দর একটা বিজ্ঞাপন হয় একে দিয়ে।

'কুদ্দুস, তুমি আমাকে চা খাওয়াতে পারবে?'

'এক্ষুণি আনছি আপা। বড়ো সাহেবের সঙ্গে চা খাবেন না?'

'বাবা কি বাসায় নাকি?'

'জ্বি, দোতলার বারান্দায়।'

'না, আমি বাগানে হাঁটতে-হাঁটতে চা খাব। তুমি এখানে নিয়ে এস।'

'চেয়ার দেই আপা?'

'চেয়ার দিতে হবে না। হাঁটতে ভালো লাগছে।'

ছেলেটি প্রায় দৌড়াতে-দৌড়াতে গেল। নতুন যারা আসে, প্রথম দিকে তাদের কাজের উৎসাহের কোনো সীমা থাকে না। কিছু দিন পার হলে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। তখন আর ডাকাডাকি করেও পাওয়া যায় না।

অবশ্যি এবার সবাই তার দিকে একটু বেশি নজর দিচ্ছে। কেউ-না-কেউ আশপাশে আছেই। এত যত্ন না-করলেই সে ভালো থাকত। নিজের মতো থাকতে ইচ্ছা করে। নিজের মতো থাকা সম্ভব হয় না।

মালী খুন্তি দিয়ে মাটি ঠিক করছিল। খুন্তি রেখে সে শারমিনের দিকে আসছে। সেও এখন দীর্ঘসময় ধরে নানান কথা বলবে। অপ্রয়োজনীয় অর্থহীন কথা।

'গোলাপের গাছের কী অবস্থা হইছে দেখছেন আফা?'

'না, দেখি নি। কী অবস্থা?'

'ছোট ফুল। এক দিনের বেশি থাকে না।'

'এ-রকম হল কেন?'

'সেইটাই তো আফা বুঝি না। সার দেই। পোকা-মারা অষুধ দেই।'

শারমিন চুপ করে রইল। মালী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মানুষজন বাগানে না-আসলে ফুল হয় না আফা।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি আফা। মানুষের মায়া মুহব্বত গাছ পছন্দ করে। যে-বাড়িতে দেখবেন মানুষজনে ভর্তি, সেই বাড়ির বাগানভর্তি ফুল। যে-বাড়িতে মানুষজন নাই, সেই বাড়িত ফুলও নাই।

'বেশ মজা তো!'

'অখন আপনে আইছেন, দেখেন কেমুন ফুল ফোটে!'

'ঠিক আছে, দেখব।'

'কয় দিন থাকবেন, আফা?'

শারমিন জবাব দিল না। সে ক'দিন থাকবে এটা নিয়ে সবাই বেশ উদ্বিগ্ন। সরাসরি কিংবা একটু বাঁকা পথে। এ বাড়ির সবাই কিছু একটা সন্দেহ করছে। সন্দেহ করাই স্বাভাবিক। এ বাড়িতে সে একা এসেছে। রফিক তার সঙ্গে আসে নি। প্রায় ন' দিন হয়ে গেল, এর মধ্যে এক বার দেখা করতেও আসে নি।

রহমান সাহেব ডাইনিং টেবিলে রফিকের প্রসঙ্গ এক বার তুলেছিলেন। শারমিন কোনো আগ্রহ দেখায় নি। ঠাণ্ডা স্বরে বলেছে, 'কাজটাজ নিয়ে থাকে, তাই আসে না।'

রহমান সাহেব বললেন, 'এমন কোনো কাজ তো থাকার কথা নয়।'

শারমিন বলল, 'তাহলে হয়তো এ বাড়িতে আসতে লজ্জা পায়।'

'এ বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে লজ্জা নেই, এ বাড়িতে আসতে লজ্জা? অন্য কোনো ব্যাপার কি আছে?'

'তা আমি কী করে জানব বাবা? আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি! ওর কথা কী করে বলব?'

'তোর কথাই না হয় শুনি।'

'কোন কথাটা শুনতে চাও?'

'Are you happy?'

'আমি জানি না বাবা।'

'জান না মানে?'

'সত্যি জানি না। আমার মনে হয়, আমার মধ্যে সুখী হবার তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। যারা সুখী হয়, তাদের মধ্যে সুখী হবার বীজ থাকে। জল-হাওয়া এবং ভালবাসায় সেই বীজ থেকে গাছ হয়।'

এই পর্যন্ত বলেই শারমিন থেমে গেল। উঁচুদরের ফিলসফি হয়ে

যাচ্ছে—খাবার টেবিলে যা মানাচ্ছে না। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে রহমান সাহেব বললেন, 'তোর শ্বশুরবাড়ির অন্য লোকদের সম্পর্কে বল।'

'কী বলব?'

'কে কেমন মানুষ।'

'জানতে চাও কেন?'

'পরিবেশটা কেমন জানতে চাচ্ছি।'

'পরিবেশ চমৎকার!'

'এককথায় সারছিস কেন? প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদা করে বল।'

'এখন থাক বাবা।'

'থাকবে কেন? এখনি বল। তোর শ্বশুর সাহেব কেমন মানুষ?'

'ঐ বাড়ির সবচে ভালো মানুষ। পাগলা ধরনের কিছু লোক থাকে না বাবা, যারা মনে করে পৃথিবী খুবই সুন্দর জায়গা? উনি সেই রকম একজন মানুষ। খুব সুখী মানুষ। এবং তাঁর ধারণা, পৃথিবীর সবাই তাঁর মতো সুখী।'

'আর তোর শাশুড়ি।'

'খিটখিটে ধরনের মহিলা। চেঁচামেচি না–করলে তাঁর ভালো লাগে না। অকারণে চেঁচান। কেউ তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না বলে আরো রেগে যান। তাঁর ধারণা, সবাই তাঁকে অগ্রাহ্য করছে। সংসারের কর্তৃত্ব তাঁর হাত থেকে চলে যাচ্ছে।'

'সংসারের কর্তৃত্ব কার কাছে?'

'ভাবীর কাছে। পুরো সংসার তাঁর মুঠোয়, অথচ আমার শাশুড়ি তা জানেন না। কারণ ভাবী যে কী চালাক, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। রোজ জিজ্ঞেস করবে––মা, আজ কী রান্না হবে? আমার শাশুড়ি হয়তো একটা কিছু বলবেন, কিন্তু রান্না হয়তো তার আগেই হয়ে গেছে। শুধু শাশুড়িকে খুশি করার জন্যে বলা।'

'মেয়েটার নাম কি যেন?'

'নীলু। নীলু ভাবী।'

'তোর সঙ্গে ভাব আছে?'

'ওনার সঙ্গে আমার খুব একটা ভাব নেই। উনি অতিরিক্ত রকমের বুদ্ধিমতী। এত বুদ্ধিমতী কাউকে আমার ভালো লাগে না। তবে তাঁর আমার কোনো অভিযোগ নেই।'

'মেয়েটি বুদ্ধিমতী, শুধু এই কারণেই তুই তাকে পছন্দ করিস না, নাকি অন্য কোনো কারণ আছে?'

'অন্য কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া ওনাকে পছন্দ করি না, এই কথা কিন্তু আমি বলি নি। ওনাকে পছন্দ না–করে উপায় নেই।'

'মেয়েটির হাসবেণ্ড সম্পর্কে বল। শফিক বোধ হয় ছেলেটির নাম, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওনার সঙ্গে আমার কথাই হয় না।'

'কেন?'

'উনি কথা খুব কম বলেন। বাবলু বলে একটা ছেলে ছিল, ওর সঙ্গে মাঝে-মাঝে কথা বলতেন। এখন বাবলু নেই, ওনারও মুখ বন্ধ।

'দু'ভাই তা হলে দু' রকম?'

'হ্যাঁ, উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। বাবা, আমি উঠি?'

'খাওয়া শেষ?'

'হ্যাঁ, শেষ।'

শারমিন উঠে গেল। রহমান সাহেবের সঙ্গে বেশিক্ষণ বসতে তার ভালো লাগে না। একটা অস্বস্তি মনের উপর চাপ ফেলতে থাকে। মনে হয়, এই বুঝি বাবা তাদের দু'জনকে নিয়ে এমন এক প্রশ্ন করবেন, যার জবাব দেওয়া যাবে না।

এই যে একা-একা বাগানে হাঁটছে, সে জানে রহমান সাহেব তাকে লক্ষ করছেন। হয়তো নিজেই বাগানে নেমে আসবেন।

'আপা, চা।'

কুদ্দুস এ বাড়ির নিয়মকানুন জানে না। চা খাবার জন্যে শারমিনের আলাদা কাপ আছে। নিজের কাপ ছাড়া শারমিন খেতে পারে না। কুদ্দুস পেটমোটা একটা কাপে চা এনেছে। দেখেই রাগ লাগছে।

'মিষ্টি হয়েছে আপা?'

'হ্যাঁ হয়েছে, তুমি এখন যাও।'

কুদ্দুস গেল না। দূর থেকে শারমিনকে লক্ষ করতে লাগল। শারমিন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। জীবন যদি নতুনভাবে শুরু করা যেত, তাহলে সে কী করত? রফিককে কি বিয়ে করত?

রহমান সাহেব নেমে এসেছেন। হাতের ইশারায় শারমিনকে ডাকছেন। শারমিন এগিয়ে গেল।

' টেলিফোন এসেছে।'

' কে বাবা?'

'জিজ্ঞেস করি নি, মনে হচ্ছে রফিক।'

শারমিন টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, রফিকই—তবে গলার স্বরটা কেমন অন্য রকম। ঠাণ্ডা লেগেছে হয়তো।

'হ্যালো, শারমিন?'

'হ্যাঁ।'

'সুখে আছ কিনা জানার জন্যে টেলিফোন করলাম।'

'তার মানে?'

'আছ কেমন?'

'ভালোই আছি।'

'বাড়ি ফিরে আসার কোনো পরিকল্পনা কি আছে?'
'বাড়িতেই তো আছি।'
'এই বাড়ি নয়, তোমার নিজের বাড়ির কথা বলছি।'
শারমিন ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমার তো মনে হয় এটা আমার নিজেরই বাড়ি, অন্য কারোর নয়।'
'আজকাল তাহলে জীবন সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা–ভাবনা শুরু করেছ।'
'যা বলতে চাও সহজ করে বল, এত পেঁচিও না। কী বলতে চাও তুমি?'
'কিছু বলতে চাই না।'
'বেশ, তাহলে টেলিফোন রেখে দিই।'
'তুমি কবে আসবে?'
'জানি না কবে আসব। ইচ্ছে হলেই আসব।'
'মনে হচ্ছে খুব সহজে ইচ্ছে হবে না।'
শারমিন কথা বলল না। রফিক বলল, ' তোমার বিদেশযাত্রার কত দূর?'
'বেশ অনেক দূর।'
'যাচ্ছই তাহলে?'
'সে তো তুমি জান। তোমাকে আগেই বলেছি।'
'আমার ইচ্ছা নয় তুমি যাও।'
'তোমার ইচ্ছা–অনিচ্ছার কথা এখানে উঠছে কেন? যাচ্ছি তো আমি? তুমি তো যাচ্ছ না।'
'তোমার যাবার ব্যাপারে আমার কিছু বলার থাকবে না?'
'না, থাকবে না।'
'তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ, তুমি আমার স্ত্রী।'
'না, ভুলি নি। তুমি আমাকে ভুলতে দিচ্ছ না। সারাক্ষণই মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছ।'
'মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভুলে যেতে চাও?'
শারমিন জবাব না–দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখল। তার মনে হল সামনের সময়টা খুব খারাপ। এই সময় পার করা সহজ হবে না। সে নিঃশব্দে ছাদে উঠে গেল। নিজেকে খুব একা লাগছে। এ–রকম কখনো লাগে না। আজ মনে হচ্ছে এই বিরাট বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ নেই।

৪৪

নীলগঞ্জ থেকে সোভাহানের চিঠি এসেছে। দীর্ঘ চিঠি। নীলুর কাছে লেখা। চিঠি পড়ে নীলু হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। এই লোকটির নির্বুদ্ধিতার কোনো সীমা নেই। একটা মানুষ এতটা নির্বোধ হয় কেন? গুটিগুটি হরফে

লিখেছে—

কল্যাণীয়াসু নীলু,

আশা করি সবাইকে নিয়ে তুমি তোমার স্বভাবমতো ভালো আছ। ক'দিন থেকেই ভাবছি এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে তোমাকে লিখব। বাবলু প্রসঙ্গে যাতে কোনো দুশ্চিন্তা করতে না পার।

বাবলু ভালো আছে এবং বলা যেতে পারে সুখে আছে। গ্রাম তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। খোলা মাঠ, নদী, বনজঙ্গল এসব তো সে কখনো দেখে নি। সে দেখেছে মানুষ—মানুষের মধ্যে যে-সব খারাপ ব্যাপার আছে, সেইসব। মানুষের বাইরেও যে আরেকটি সুন্দর শান্ত জগৎ আছে, তা সে জানত না। এখন জানল। ঘন্টার পর ঘন্টা দেখি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বনের ভেতর থেকেও কয়েক বার তাকে লোক পাঠিয়ে খুঁজে আনতে হয়েছে। ও তার নিজের একটি পৃথিবী খুঁজে পেয়েছে। সেই পৃথিবী থেকে তাকে সরিয়ে আনতে মন চাচ্ছে না। আমি তাকে এখানের একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি।

আমি জানি তুমি আমার নির্বুদ্ধিতায় হাসছ। আমি সামনে থাকলে হয়তো খুব কড়া-কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দিতে; তবু তুমি একটু ভাবলেই বুঝবে, আমি যা করছি তার ফল শুভ হবার সম্ভাবনা আছে। আমি নিজেও এখানে থেকে গেলাম। নীলগঞ্জ স্কুলে একটা মাষ্টারি জুটে গেছে। সুখী নীলগঞ্জের যে-কাজ শুরু হয়েছিল, তা শেষ করা যায় কিনা তাও দেখছি। দূর থেকে যে-কাজটি অসম্ভব বলে মনে হত, এখন তেমন অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

মজার ব্যাপার কী জান, নীলগঞ্জের লোকজন কেন জানি আমাকে বেশ পছন্দ করছে। আমাকে আড়ালে ডাকে 'পাগলা মাষ্টার'। যদিও পাগলামির কিছুই আমি করছি না। নামটা আমার পছন্দ হয়েছে, কারণ এরা কবির মামাকেও পাগলা মাষ্টার ডাকত। যে-কোনোভাবেই হোক, গ্রামের মানুষদের উপর আমি কিছুটা প্রভাব ফেলেছি বলে মনে হয়। গত শুক্রবারে বড়ো রকমের একটা গ্রাম্য বিবাদ হল। সবাই দল বেঁধে এল আমার কাছে। আমি যেন একটা মীমাংসা করে দিই। আমি যা বলব, তাই নাকি তারা শুনবে। আমার কী মনে হয়, জান? আমার মনে হয় ওরা আমার মধ্যে কবির মামার ছায়া দেখতে চায়। কিন্তু এত বড়ো যোগ্যতা কি আমার আছে? আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র মানুষ।

তোমরা কবির মামার কুলখানিতে কেন এলে না বল তো? শওকত পরপর দু'দিন ষ্টেশনে কাটাল। কখন তোমরা আস। এসে কষ্টেই পড় কি না। তোমরা না-আসায় তার কষ্ট দেখে আমি কষ্ট পেয়েছি। চলে এসো না এক বার। দেখে যাও আমরা কেমন আছি। পিকনিক করতেও তো মানুষ আসে।

কবির মামা প্রসঙ্গে মজার কথা শোন। মাঝে–মাঝে দূর–দূর থেকে লোকজন আসে পীর সাহেবের কবর জিয়ারত করতে। পীর কে বুঝতে পারছ তো? কবির মামা। কী মুশকিল বল দেখি! এক জন নাস্তিক মানুষকে এরা মনে হয় পীর বানিয়ে ছাড়বেই! দূর–দূর গ্রামের লোকজন মোমবাতি আগরবাতি এইসব দিয়ে যায়। আজ থেকে পাঁচ বছর পর যদি দেখ, এখানে বিরাট মাজার শরিফ বসে গেছে, উরস হচ্ছে, এবং আমি সেই মাজার শরিফের প্রধান খাদেম—তাহলে অবাক হয়ো না। এদেশে সবই সম্ভব।

আচ্ছা নীলু, তোমার শরীর ভালো আছে তো? কোনো কারণে তোমার মনটন খারাপ না তো? পরশু রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তুমি মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছ। স্বপ্ন স্বপ্নই। তবু কেমন যেন লাগছে। তুমি ভালো আছ এই খবর জানিও, যদি সময় পাও। যা ব্যস্ত থাক, সময় পাওয়ার কথা নয়। বিশাল এই চিঠি ফেঁদে নিজেই বিব্রত বোধ করছি। কিছু মনে করো না। ভালো থাক।

তোমার দুলাভাই সোভাহান।

পুনশ্চ: বাবলুর আর একটি শিল্পকর্ম পাঠালাম। দু'মাথাওয়ালা ছাগল।

নীলু তার দুলাভাইয়ের চিঠি বেশ কয়েক বার পড়ল। প্রথম পড়বার সময় লোকটিকে যতটা নির্বোধ মনে হচ্ছিল, এখন ততটা মনে হচ্ছে না। হয়তো–বা খুব গুছিয়ে লেখা চিঠির কারণে। এই লোকটি যে এত গুছিয়ে লিখতে পারে তা নীলু জানত না। চিঠির ভেতর খুব সহজ–সরল একটা ভঙ্গি ঢুকে গেছে। অথচ এই মানুষটির জীবন খুব সহজ–সরল নয়।

কোনো রকম আদর্শবাদ, মহৎ চিন্তা, উচ্চস্তরের ভাবালুতা নীলু তার মধ্যে কখনো দেখে নি। এই লোক হঠাৎ বদলে গিয়ে গ্রাম উন্নয়ন শুরু করবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। হয়তো দু' দিন পরই দেখা যাবে গ্রাম আর তার ভালো লাগছে না। সব ছেড়েছুড়ে আবার অন্য কোথাও চলে যাবে। যাবার আগে বাবলুকে এ বাড়িতে ফেলে যাবে। মাস দুই পর চোরের মতো আসবে। দীন ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে থাকবে। তার কাপড়ের ব্যাগে থাকবে বাবলুর জন্যে আনা কোনো সস্তা খেলনা। অক্ষম বাবার ভালবাসা সেই খেলনায় থাকবে, কিন্তু তা বাবলুর মনোহরণ করবে না। আজকাল শিশুরাও সস্তা খেলনা এবং দামী খেলনার তফাতটা ভালোই বোঝে।

সন্ধ্যায় নীলু শফিককে চিঠি পড়তে দিল। শফিক হাই তুলে বলল, 'এত লম্বা চিঠি আমি পড়তে পারব না। বিষয়বস্তু কী আমাকে বল।'

'বিষয়বস্তু কিছু নেই। পড় না। কতক্ষণ আর লাগবে!'

শফিক চিঠি শেষ করে আশ্চর্য হয়েই বলল, 'সুন্দর চিঠি তো!'

নীলু বলল, 'কোন জিনিসটা সুন্দর?'

'ঘরোয়া ভঙ্গিটা। মনে হয় ভদ্রলোক যেন গল্প করছেন। তোমরা এক কাজ কর না কেন—ঘুরে আস নীলগঞ্জ থেকে। কয়েকটা দিন কাটিয়ে আস।'

নীলু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন?'

'টুনির ভালো লাগবে। গ্রামে গিয়ে নদী, বন, এইসব দেখবে। বেচারি একা-একা থাকে।'

'সত্যি যেতে বলছ?'

'হ্যাঁ, যাও। আমিও টলম্যানকে বলে দেখি, যদি ছুটি পাই। সম্ভাবনা অবশ্যি কম, তবু দু'-এক দিনের জন্যে হয়তো ছাড়বে।'

'সত্যি-সত্যি তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ, মানে চেষ্টা করব। বিদেশে ছুটির দিনগুলিতে সবাই বাইরে-টাইরে যায়। আমাদের তো এসব বালাই নেই। কাল আমি টলম্যানের সঙ্গে কথা বলে দেখব, ব্যাটাকে ভেজানো যায় কি না।'

'হঠাৎ তোমার এত উৎসাহের কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তেমন জোরাল কোনো কারণ নেই। যেতে ইচ্ছা করছে। তুমি বাবা-মার সঙ্গেও কথা বল। ওঁরা যদি যেতে চান।'

মনোয়ারা নীলগঞ্জে যাবার কথায় বেশ বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির কারণ স্পষ্ট নয়। তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'এইসব এখন বাদ দাও। আম-কাঁঠালের সিজনে গেলেই হবে।'

'টুনির আব্বা সবাইকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।'

'দল বেঁধে গেলে থাকবে কোথায় শুনি? শীতের দিন। এতগুলি মানুষের লেপ-কাঁথা কে দেবে? হুট করে একটা কিছু করলেই তো হয় না।'

'শীতের লেপ-কাঁথা সঙ্গে করে নিয়ে গেলে হয় না, মা?'

'যদি হয় তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। মুখ দিয়ে এক বার যখন বের করেছ, তখন তো এটা করবেই। যাও, নিওমোনিয়া বাধিয়ে আস।'

হোসেন সাহেব যাবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দেখালেন। মনোয়ারার অনাগ্রহ যেমন চোখে লাগে, তাঁর অতিরিক্ত আগ্রহও তেমনি চোখে লাগে। তিনি নানান রকম লিস্ট করতে লাগলেন। সময়ে-অসময়ে নীলুর সঙ্গে বসে পরামর্শ—'হারিকেন নিতে হবে, বুঝলে বৌমা। এটা খুবই দরকার।'

'ওখানে নিশ্চয়ই হারিকেন আছে, বাবা।'

'তা তো আছেই। হয়তো একটা, বড়জোর দু'টা। এতগুলি মানুষ আমরা যাচ্ছি। দু'টা হারিকেনে আমাদের কী হবে বল? টর্চ লাইট নিতে হবে, মোমবাতি নিতে হবে। একটা কেরোসিনের চুলাও নেওয়া দরকার। ধর চট করে এক কাপ চা খাবার দরকার হল, কোথায় পাবে? সোখানে তো আর গ্যাসের চুলা নেই। কী বল মা?'

'তা তো বটেই।'

'তুমি জহির আর শাহানাকেও বল। ওদেরকে নিয়ে যাই।'

'জ্বি, তাদেরও বলব। টুনির বাবার ছুটি হয় কিনা এখনও বুঝতে পারছি না। ছুটি হলেই বলব।'

'না–না, তুমি মা আগে থেকেই বল।'

শাহানা বেড়াতে যাবার কথায় ঠোঁট উল্টে বলল, ' তোমাদের ব্যাপার তোমরা যাও, আমাকে টানছ কেন?'

নীলু বিস্মিত হয়ে বলর, 'আমাদের ব্যাপার মানে? তুমি কি আমাদের কেউ নাও?'

'না ভাবী। আমি তোমাদের কেউ না।'

'ও, তাই নাকি? আমি অবশ্যি এটা আগে জানতাম না। এখন জানলাম। না হয় তুমি বাইরের গেস্ট হিসেবেই আমাদের সঙ্গে চল। বাইরের গেস্টও কিছু যাচ্ছে।'

'বাইরের কে যাচ্ছে?'

'আমাদের বাড়িওয়ালার মেয়ে বীণা।'

'আনিস ভাই যাচ্ছে না?'

'না।'

'দুনিয়াসুদ্ধ লোককে তোমরা নিচ্ছ, তাকে নিচ্ছ না কেন? সে কী দোষ করল? বলেছিলে তাকে?'

নীলু গম্ভীর মুখে বলল, 'না।'

'বল নি কেন? এটা তো ভাবী সাধারণ ভদ্রতা। একবাড়িতে থাকে, দিনরাত এটা–ওটা ফরমাস খেটে দেয় আর...'

শাহানা কথা শেষ করল না। নীলুর কঠিন চোখের সামনে থতমত খেয়ে গেল। নীলু কড়া গলায় বলল, 'ঐ চিন্তা এখনও মাথায় নিয়ে ঘুরছ?'

শাহানা টেনে–টেনে বলল, 'কোন চিন্তা?'

'তুমি ভালোই জান, কোন চিন্তা। অনেক তো হল শাহানা, আর কেন?'

'তুমি কী বলছ, আমি কিছু বুঝতে পারছি না ভাবী। আমি শুধু বলছি—ভদ্রতা করে হলেও তোমার উচিত ছিল আনিস ভাইকে বলা। সবাই যখন যাচ্ছে।'

'আনিস এ বাড়িতে এখন থাকে না। থাকলে নিশ্চয়ই বলতাম।'

'আনিস ভাই তাহলে থাকে কোথায়?'

'আমি জানি না।'

' সে কী কথা ভাবী, তুমি জান না কেন?'

'আমাকে কিছু বলে যায় নি, কাজেই আমি জানি না।'

শাহানাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। নীলুর বিরক্তির সীমা রইল না। এসব কী শুরু করেছে শাহানা?

আনিসকে নিয়ে বাড়াবাড়িটাই তার অসহ্য লাগছে। নীলুর কেন জানি মনে হচ্ছে, এই বাড়াবাড়ি খানিকটা লোক দেখানো।

নীলু বলল, 'আমি এখন উঠব শাহানা, তুমি জহিরকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে গেলে আমাদের ভালো লাগত।'

'শুধু তোমাদের ভালো লাগলে তো হবে না, আমারও ভালো লাগতে হবে। আমার ভালো লাগবে না।'

'কী করে বুঝলে ভালো লাগবে না?'

'জানি না কী করে বুঝলাম।'

নীলু উঠে দাঁড়াল। শাহানার এখানে এসে তার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। অনেক রকম ঝামেলা করে আসা। অফিস থেকে এই কারণে তাকে ছুটি নিতে হয়েছে। ভেবেছিল প্রথম আসবে শাহানাদের বাড়ি, সেখানে থেকে যাবে শারমিনদের বাড়িতে। কিন্তু এখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। নীলু অবাক হয়ে লক্ষ করল, শাহানা দোতলা থেকে নিচে নামল না। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে ভাবী, পরে দেখা হবে। সময় পেলে আবার এস। অবশ্যি যদি তোমার ইচ্ছা করে।'

গেটের কাছে জহিরের গাড়ি। ড্রাইভার বলল, 'আপনি এসেছেন শুনে স্যার পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেখানে-যেখানে যাবেন, নিয়ে যাব। নীলু বলল, 'আমার গাড়ি লাগবে না, রিকশা নিয়ে চলে যাব।'

'স্যার তাহলে খুব রাগ করবেন। আপা আসেন।'

বাসায় ফিরে দেখে বসার ঘরে আনিস। জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। নীলুর কেন জানি খুব খারাপ লাগছে। ইচ্ছা করছে খুব কড়া-কড়া কিছু কথা শোনাতে।

'ভাবী, ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ, ভালো।'

'আমার নামে কি কোনো চিঠি এসেছে ভাবী?'

'না, কোনো চিঠিফিঠি আসে নি।'

'যদি আসে একটু রেখে দেবেন, আমি এসে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে, রাখব।'

'ভাবী, আপনার কি শরীর খারাপ?'

'শরীর ঠিকই আছে। তুমি এখন যাও। আমি শুয়ে থাকব। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

আনিস ইতস্তত করে বলল, 'ভাবী, আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবেন—শ' দুই?'

নীলু ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এখন আমার কাছে টাকাপয়সা নেই।'

আনিস চলে গেল। সে প্রচণ্ড লজ্জা পেয়েছে। ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজায় একটা ধাক্কা খেল। হাঁটতে গিয়ে লক্ষ করল ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না। সে ভেবেই পেল না, নীলু ভাবীর মতো মানুষ তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার কেন করলেন? তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে।

নিজেকে সামলাতে না–পারলে টপটপ করে চোখ থেকে পানি পড়বে। রাস্তার লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। রাস্তায় নামবার আগে যে করেই হোক নিজেকে সামলাতে হবে। সে নিঃশব্দে ছাদে উঠে গেল।

ছাদে তার নিজের ঘরটির দরজা খোলা। সুন্দর পর্দা ঝুলছে। কে থাকে এখানে? আনিস কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। বীণা, গভীর মনোযোগে পড়ছে। পিঠময় খোলা চুল। চেয়ারে পা তুলে কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসা। আর ঘরটি কী সুন্দর সাজিয়েছে!

'এই বীণা!'

বীণা চমকে উঠল।

'আরে আনিস ভাই, আপনি কোথা থেকে?'

'আকাশ থেকে।'

'আসুন, ভেতরে আসুন তো।'

আনিস ভেতরে ঢুকল। বীণা বলল, 'আপনার ঘরের দখল নিয়ে নিয়েছি।'

'তাই তো দেখছি।'

'নিরিবিলি। পড়াশোনার জন্যে এটা করলাম। আপনাকে তাড়িয়েছিও এই কারণে।'

'ভালো করেছ।'

'উপায় ছিল না, কারণ আমাকে খুব ভালো রেজাল্ট করতে হবে। সারা জীবন ফাস্ট সেকেণ্ড হতে হবে। কেন বলুন তো?'

'বলতে পারছি না।'

'কারণ আমি এমন এক জন পুরুষকে বিয়ে করব যার কাজ হবে দিন–রাত ঘরে বসে থাকা। কাজেই চাকরি–টাকরি করে এই লোককে খাওয়াতে হবে। তার জন্যেই আমার খুব ভালো রেজাল্ট দরকার। যেন পাস করলেই চাকরি হয়ে যায়। বুঝতে পাছেন?'

'পারছি।'

'এখন বলুন তো, আমি কেমন মেয়ে?'

'তুমি খুব জেদী মেয়ে।'

'ঠিক বলেছেন। আর আপনি হচ্ছেন এক জন ভ্যাবদা পুরুষ। এখন বলুন, এ বাড়িতে কেন এসেছেন?'

'এমনি এসেছি।'

'না, এমনি না। নিশ্চয়ই কোনো কাজে এসেছেন।'

'নীলু ভাবীর কাছে এসেছিলাম।'

'কেন?'

'আমার কিছু টাকার দরকার হল, মানে ইয়ে—'

'পেয়েছেন টাকা?'

'না, ওঁর হাত খালি।'

'কত টাকা দরকার?'

'তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করব।'

'আহ্, যেটা জিজ্ঞেস করেছি সেটা বলুন—কত টাকা দরকার?'

'শ' দুই।'

'বসুন এখানে, আমি নিয়ে আসছি। খবরদার পালাবেন না।'

বীণা নিচে নেমে গেল। মা-বাবা দু' জনের কেউই বাসায় নেই। এক খালা আছেন, স্টিল আলমিরার চাবি তাঁর কাছে নেই। লতিফা তোষকের নিচে ভাংতি টাকাপয়সা রাখেন, সেখানে দু'টি ময়লা ন্যাতন্যাতে পাঁচ টাকার নোট ছাড়া কিছুই নেই। বীণা খালিহাতেই উপরে উঠে এল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আনিস ভাই, আপনি কোথায় থাকেন ঠিকানাটা লিখে যান, আমি সন্ধ্যার আগেই টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করব।'

'তুমি শুধু-শুধু ব্যস্ত হচ্ছ বীণা।'

'আমি যা বলছি করুন—এই নিন কাগজ-কলম। পরিষ্কার করে ঠিকানা লিখুন। আমি চা বানিয়ে আনছি, চা খেয়ে তারপর যাবেন।'

বীণা আবার নিচে নেমে গেল।

সন্ধেবেলায় আনিসের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

তার কেন জানি মনে হচ্ছিল, বীণা এ-রকম কিছু করে বসতে পারে। সত্যি সত্যি করলও তাই। নিজেই এসে উপস্থিত। নোংরা ঘর। চারপাশের নোনাধরা দেয়াল, আস্তর উঠে-উঠে আসছে। দীনহীন পরিবেশের কিছুই মেয়েটিকে প্রভাবিত করল না। কিংবা হয়তো করেছে, সে তা বুঝতে দিচ্ছে না। সে আনিসের চৌকিতে বসে আছে বেশ সহজ ভঙ্গিতে, যেন এটাই তার ঘরবাড়ি। কথাও বলছে সহজ স্বরে।

'পাশের চৌকিটায় কে থাকেন?'

'আমার রুমমেট।'

'উনি এখন নেই?'

'না। অফিস শেষ করে টিউশ্যনিতে যান, ফিরতে ফিরতে দশটা-এগারটা বাজে।'

'আপনারা কি নিজেরাই রান্না করেন—হাঁড়ি-পাতিল দেখছি।'

'হ্যাঁ, নিজেরাই করি। খরচ কম পড়ে।'

'রান্না করেন কে?'

'বেশির ভাগ সময় আমিই করি। আমার অবসর বেশি।'

'আজ কী রান্না করলেন?'

'এখনো কিছু করি নি।'

'আজকের রান্নাটা আমি করে দিই?'

আনিস আঁৎকে উঠে বলল, 'কী বলছ এসব! তুমি কি রান্না করবে?'

'আপনার কি ধারণা, আমি রান্না জানি না?'

'জানবে না কেন? নিশ্চয়ই জান। কোনো রকম ঝামেলা না-করে তুমি চুপচাপ বসে থাক তো।'

'আমি কিন্তু এখানে অনেকক্ষণ থাকব।'

'অনেকক্ষণ থাকব মানে?'

'অনেকক্ষণ থাকব মানেও জানেন না? বাংলা ভুলে গেছেন নাকি?'

আনিস কী বলবে, কী করবে ভেবে পেল না। এই মেয়েটা তাকে মনে হচ্ছে সত্যি-সত্যি বিপদে ফেলবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাশের ঘরগুলির বোর্ডাররা বারবার উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আনিস হারিকেন ধরাল। বীণা অবাক হয়ে বলল, 'হারিকেন কেন, আপনাদের ইলেকট্রিসিটি নেই?'

'ছিল। বাড়িওয়ালা এক বছর যাবত ইলেকট্রিসিটির বিল দিচ্ছে না, লাইন কেটে দিয়েছে।'

'বাড়িওয়ালাও মনে হয় আপনাদের মত গরিব।'

'আসলেই তাই। এই এতটুকু বাড়ি, এর সাত জন শরিক। শরিকে-শরিকে বিবাদ লেগেই আছে। বিবাদ মানে কঠিন বিবাদ। মারামারি হচ্ছে ভালোভাবে। পরশু এক জন আরেক জনকে রামদা নিয়ে তাড়া করেছিল।'

'বলেন কি!'

'আজও হয়তো করবে।'

'করে করুক। এই ঘরে না ঢুকলেই হল।'

রাত দশটা বেজে গেছে। বীণা ফিরছে না। বীণার বাবা থানায় ডাইরি করতে গিয়েছেন। ওসি সাহেব চোখ মটকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'মেয়ের কোন 'লভ'-টভ আছে নাকি?' তিনি শুকনো গলায় বলেছেন,'আমার মেয়ে ঐ রকম না।'

'আগে ভালো করে খোঁজ নিন। মেয়ের ট্রাংক, স্যুটকেস এসব খুলে দেখুন চিঠিপত্র পান কিনা। তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের জিজ্ঞাসাবাদ করুন। ওরা এইসব ভালো জানবে। টাকাপয়সা কিছু নিয়ে গেছে?'

'তার মার কাছ থেকে পাঁচ শ' টাকা নিয়ে গিয়েছিল। নিউ মার্কেট থেকে কী-একটা বই কিনবে। টেক্সট বুক।'

'ঐটা ফালতু কথা। যাওয়ার ভাড়া নিয়ে গেছে। সপ্তাহে এ-রকম তিন-চারটা কেইস আমরা ডিল করি। মেয়ে পালিয়ে যায় পেয়ারের লোকের সঙ্গে। সস্তার একটা হোটেলে উঠে ফুর্তি করে।'

'এইসব কী বলছেন আপনি?'

'সত্যি কথা বলছি রে ভাই। তাও তো সবটা বলছি না। রেখেঢেকে বলছি। মাঝে মাঝে কী হয় জানেন? ছেলে মেয়েটাকে ভুজুংভাজং দিয়ে বের করে নেয়। একটা হোটেলে নিয়ে তোলে। সেই হোটেলে আগে থেকেই তার

বন্ধুবান্ধব অপেক্ষা করছে। তারপর মচ্ছবটা বুঝতে পারছেন তো? এইসব হারামজাদাদের ধরতেও পারি না। মেয়ে বা মেয়ের আত্মীয়স্বজন কেউ কেইস করে না। সম্মানহানির ভয়। মানে ইজ্জতের ভয়। মেয়ের আবার বিয়ে দেয়ার প্রশ্ন আছে।'

'ভাই, আপনি এসব কী বলছেন?'

'যা বলছি সত্য বলছি। একটা শব্দও মিথ্যা না। যান, বাড়ি যান। যা করতে বললাম করেন। চিঠি পড়ে কোনো নাম-ঠিকানা পেলে আমাদের খবর দেবেন—টাইট দিয়ে দেব।'

তিনি বাড়ি ফিরলেন ঘোরের মধ্যে। কয়েক বার এমন হল, যেন রিকশা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছেন। শরীর দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। তাঁর ধারণা হল, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হার্ট অ্যাটাকের সময় নাকি খুব ঘাম হয়।

কী করে বাড়ি পৌঁছলেন তিনি নিজেই জানেন না।

বারান্দার একটা মোড়াতে আনিস বসে আছে। বাড়ির ভেতর বেশ কিছু লোকজন। এদের গোলমাল ছাপিয়েও লতিফার গলা ছেড়ে কান্না শোনা যাচ্ছে। তিনি কাঁপা গলায় আনিসকে বললেন, 'এখনও পাওয়া যায় নি?' আনিস বিব্রত স্বরে বলল, 'বীণার কথা বলছেন তো? ওকে নিয়ে এসেছি।'

'নিয়ে এসেছ? কোথায় ছিল সে?'

'ইয়ে, মানে আমার ওখানে একটা বিশেষ প্রয়োজনে—'

'বিশেষ প্রয়োজনে তোমার কাছে? শুয়োরের বাচ্চা, তুমি মানুষ চেন না? জুতিয়ে আমি তোমার দাঁত খুলে ফেলব, বেইমান, নিমকহারাম—'

তিনি সত্যি সত্যি তাঁর স্যাণ্ডেল খুলে ফেললেন। হৈচৈ শুনে ভেতরের বাড়ির সবাই বেরিয়ে এল। লতিফা এসে স্বামীর হাত ধরে প্রায় টেনে হিঁচড়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। হিসহিস করে বললেন, 'কেলেঙ্কারি আর বাড়িও না। যা হবার হয়েছে। এই রাতেই মেয়ের আমি বিয়ে দেব।'

'কী বলছ এসব? কার সাথে বিয়ে দেবে?'

'এই হারামজাদাটার সঙ্গেই দেব, উপায় কী? এত রাত পর্যন্ত এক সঙ্গে ছিল কিনা, কী হয়েছে কে জানে। আগুন আর ঘি।'

তিনি হতভম্ব হয়ে হয়ে পড়লেন। লতিফা কাঁদতে-কাঁদতেই বললেন, 'দাঁড়িয়ে থেক না। কাজীর জোগাড় দেখ।'

'মাথাটা তোমার খারাপ হয়ে গেল নাকি? ঐ হারামজাদাকে আমি জেলের ভাত খাওয়াব। জুতাপেটা করব।'

লতিফা কঠিন স্বরে বললেন, 'আমি কোনো কথা শুনব না। আজ রাতেই বিয়ে হবে। মেয়ে কি না কি করে এসেছে, আমার গা ঘিনঘিন করছে। বমি এসে যাচ্ছে।'

সত্যি তিনি হড়হড় করে একগাদা বমি করলেন।

রাত বারটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আনিসের বিয়ে হয়ে গেল। লতিফা ট্রাংকে

তুলে রাখা তাঁর নিজের বিয়ের শাড়িতে বৌ সাজালেন। শফিকের একটা ধোয়া পাঞ্জাবি আনিসকে পরানো হল। পাঞ্জাবি একটু বড়ো হল। কাঁধের ঝুল অনেকখানি নেমে গেল, তবু সেই মাপে বড়ো ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবিতে অপূর্ব দেখাল আনিসকে। লতিফারও এক সময় মনে হল, ছেলেটার চেহারা তো ভালোই। সুন্দরই তো লাগছে। মেয়ে জামাই খারাপ কেউ বলবে না।

শুধু বীণার বাবা কোনো কিছুতেই অংশগ্রহণ করলেন না। অন্ধকার বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে রইলেন। হোসেন সাহেব গেলেন কথাবার্তা বলে তাঁর মন ভালো করে দিতে। বিভিন্ন দিকে তিনি চেষ্টা করলেন। সব শেষে অত্যাশ্চর্য ওষুধ পালসেটিলা নিয়ে কথা বলা শুরু করতেই বীণার বাবা বললেন, 'এত ফালতু কথা বলেন কেন? ভ্যাজর-ভাজর করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছেন। যান, বাড়িতে গিয়ে ঘুমান।'

চিলেকোঠার ঘরে তাড়াহুড়া করে বাসর সাজান হয়েছে। আশপাশের বাড়ির মেয়েরা এসে জুটেছে। এদের আনন্দের কোনো শেষ নেই। সমস্ত ছাদ জুড়ে ছোটা-ছুটি। একটি রেডিওগ্রাম আনা হয়েছে ছাদে। বিশাল দু'টি স্পিকারে তারস্বরে গান হচ্ছে। সন্ধ্যা কিন্নরকণ্ঠে গাইছেন—ও বাক বাক বাকুম বাকুম পায়রা। অপূর্ব সুরধ্বনিতে শীতের বাতাসে যেন নেশা ধরে গেছে। আনিসের চোখ বারবার ভিজে উঠছে। সে ছাদের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। প্রায় শেষরাতের দিকে নীলু এসে বলল, 'আনিস, তোমার ঘরে যাও। বীণাকে আমরা নিয়ে আসছি।'

আনিস কিছু বলল না। নীলু বলল, 'আজ আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। কিছু মনে রেখো না ভাই। অন্য কারণ ছিল। আমি এমন খারাপ মেয়ে না, আনিস। আমি তোমাকে খুবই পছন্দ করি।'

'ভাবী, আমি তা জানি।'

'আজ যা হল, তোমার জন্য ভালো হল। বীণা একটি অসাধারণ মেয়ে। দেখবে, ও তোমার জীবনটাই বদলে দেবে।'

'তাও আমি জানি, ভাবী।'

'এস, ঘরে এস।'

'আপনার আঁচলে কী?'

'গোলাপ। টবের গাছ থেকে ছিঁড়ে এনেছি। ফুল ছাড়া কি বাসর হয়? তোমার খুব ভাগ্য ভালো। আজ অনেকগুলি গোলাপ একসঙ্গে ফুটেছে।'

রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। আনিস অপেক্ষা করছে। তাকে ঘিরে আছে গোলাপের সৌরভ। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না-ঘটে। এই ঘরে এমন একটি নাটক হবে, কে জানে!

আনিসের মাথা ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে জ্বর এসে যাচ্ছে।

বীণা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপাশে। তার সঙ্গে বেশ ক'টি মেয়ে, সবাই চাপা হাসি হাসছে। বীণার মাথা নিচু। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সে

মাঝে-মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। কাঁদছে নাকি মেয়েটা? কান্নার কী আছে?

৪৫

শেষ পর্যন্ত নীলগঞ্জ যাবার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল। দলটা মোটামুটি বড়োই। রফিক-শারমিন ছাড়া সবাই যাচ্ছে। শাহানা এবং তার বরও যাচ্ছে। শাহানার যাবার ইচ্ছা ছিল না। যাচ্ছে জহিরের কারণে। জহির কেন জানি যাবার জন্যে উৎসাহী হয়ে পড়েছে। অবশ্যি শেষ সময়ে এই দু' জনও বাদ পড়ল। ট্রেন রাত ন'টায়। জহির সন্ধ্যাবেলা এসে বলল, 'একটা সমস্যা হয়েছে ভাবী।' নীলু হেসে ফেলল। জহির বলল, 'বানানো সমস্যা নয়, সত্যি সমস্যা।'

'তোমরা তাহলে যেতে পারছ না?'

'না।'

'সমস্যাটা কী?'

জহির ইতস্তত করে বলল, 'চলুন ভাবী ছাদে যাই, সেখানে বলব।'

'বলতে না-চাইলে বলার দরকার নেই।'

'ভাবী, আমি আপনাকে বলতে চাই। বলা দরকার।'

নীলু চিন্তিত মুখে ছাদে উঠে গেল। নির্ঘাত শাহানা খুব ঝামেলা বাধিয়েছে। সেই ঝামেলার প্রকৃতিটি কী, কে জানে। নিশ্চয়ই জটিল কিছু। নয়তো জহির এতটা অস্থির হত না। সে সহজে অস্থির হবার ছেলে নয়।

'কী ব্যাপার, বল।'

'বুঝতেই পারছেন, শাহানাকে নিয়ে একটা সমস্যা। আজ ভোরবেলায় নাস্তা খাবার সময় সামান্য একটু কথা কাটাকাটি হল। তার পরপরই সে ছুটে তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সেই বন্ধ দরজা এখনও খোলে নি। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা বলতে পারেন। মানে এই জাতীয় অবস্থায় পড়ে আমার অভ্যাস নেই। খুব বিব্রত বোধ করছি।'

'কথা কাটাকটি কী নিয়ে হচ্ছিল?'

'আনিস সাহেবকে নিয়ে। ও বলল, আনিস সাহেবকে এক দিন দাওয়াত করে খাওয়াতে চায়। আমি বললাম—খুব ভালো কথা। ওনাকে এবং ওনার স্ত্রীকে বল। তাতেই ও রেগে আগুন।'

'আমি বুঝলাম না, তাতে রেগে আগুন হবার কী?'

'আমি বুঝতে পারি নি। শাহানা বলেছিল—তুমি এখানে তার স্ত্রীর কথা কেন বললে? তোমার কি ধারণা, আমি শুধু তাকে একা খেতে বলব? তা যদি চাইতাম, তাহলে তো অনেক আগেই বলতে পারতাম। তা তো বলি নি। বিশ্রী ব্যাপার, ভাবী। কাজের লোকদের সামনে হৈচৈ চিৎকার। প্রায় হিস্টিরিয়ার মতো অবস্থা।'

'শাহানার কথা শুনে তুমি কী বললে?'

'আমি কিছু বলি নি। যা বলার মনে-মনে বলেছি। লোকজনের সামনে সিন ক্রিয়েট করতে চাই নি।'

'চল তোমার সঙ্গে যাই, ওকে নিয়ে আসি।'

'বাদ দিন, ভাবী। আপনারা ঘুরে আসুন। নীলগঞ্জ গিয়ে আরো ঝামেলা করবে। আপনাদের আনন্দই মাটি করবে।'

'আমি সব ঠিক করে দেব।'

'কোনো দরকার নেই, ভাবী। এই ব্যাপারটা আমিই ঠিক করতে চাই। বিশ্বাস করুন, আমি ভালোমতোই করব।'

'ও খুবই ছেলেমানুষ জহির। ওর বয়সটা দেখ।'

'আমি জানি। চলুন নিচে যাই। আপনাদের অনেক গোছগাছ বাকি। আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি, আপনাদের ট্রেনে তুলে দেবে।'

শারমিনের না যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মনোয়ারা নতুন করে কথা তুললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে গত ক'দিন ধরেই তিনি চেঁচামেচি করছেন। রফিকের সঙ্গে এক দিন তুমুল ঝগড়া হল। শারমিন এ বাড়িতে আসছে না কেন, এর জবাবে রফিক বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'আমি কী করে বলব? সেটা শারমিনকে জিজ্ঞেস কর। ওটা তার ব্যাপার। হয়তো এ বাড়ি তার ভালো লাগছে না।'

'এ বাড়ি ভালো লাগবে না কেন?'

'খুব সম্ভব তোমার জন্যেই লাগে না। দিন-রাত ক্যাচক্যাচ কর।'

'দিন-রাত ক্যাচক্যাচ করি?'

রফিক এই প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে কেটে পড়ল। মনোয়ারা সারাদিন হৈচৈ করে কাটালেন। আজ আবার শুরু হল। নীলু টিফিন কেরিয়ারে খাবারদাবার ভর্তি করছিল। মনোয়ারা তাকে ধরলেন, 'বৌমা, হচ্ছেটা কী?' নীলু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিসের কথা বলছেন?'

'ছোট বৌমা এ বাড়িতে আসে না কেন?'

নীলু বলল, 'অনেক দিন পরে বাবার বাড়ি গিয়েছে, ক'টা দিন থাকছে, থাকুক না। নীলগঞ্জ থেকে ফিরে এসে আমি ওকে এ বাড়িতে নিয়ে আসব। এখন নিজের বাড়িতেই থাকুক।'

'নিজের বাড়ি তুমি কী বলছ? বিয়ের পর মেয়েদের বাড়ি থাকে একটাই। সেটা হচ্ছে স্বামীর বাড়ি।'

'আপনাদের সময় তাই ভাবা হত। এখন দিনকাল পাল্টেছে।'

'কী রকম পাল্টেছে? এখন বুঝি আর স্ত্রীরা স্বামীদের বাড়িতে থাকে না? তাহলে তুমি এখানে পড়ে আছ কেন?'

নীলু কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, 'আপনার কি সব গোছগাছ হয়েছে মা?'

'গোছগাছ আর কী করব? আমার হল গিয়ে মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। সংসারে কী শুরু হয়েছে, কিছু বুঝতে পারছি না।'

রাত আটটায় স্টেশনের দিকে রওনা হবার কথা। হোসেন সাহেবের দেখা নেই। শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছে দু'টি খুবই প্রয়োজনীয় ওষুধ তাঁর সঙ্গে নেই। একটি হচ্ছে নাকস্‌ভমিকা, অন্যটি পালসেটিলা। গ্রামে যাচ্ছেন, দরকারের সময় হাতের কাছে ওষুধ পাওয়া যাবে না, বিপদে পড়তে হবে। তিনি কাউকে কিছু না-বলে ওষুধের খোঁজে গেলেন।

ফিরলেন রাত সাড়ে আটটায়, যখন সবাই প্রায় নিশ্চিত যাওয়া হবে না। স্টেশনে রওনা হবার সময়ও কেউ জানে না, ট্রেন ধরা যাবে কি যাবে না। ট্রেন অবশ্যি ধরা গেল। এবং ট্রেন ছেড়ে দেবার পর জানা গেল, তাড়াহুড়োয় মনোয়ারার স্যুটকেসটাই আনা হয় নি। তিনি মুখ হাঁড়ির মতো করে নীলুকে বললেন, 'আমার জিনিসের দিকে কেউ কি আর লক্ষ রেখেছে? তা রাখবে কেন? আমি কি একটা মানুষ?'

ট্রেনে ওঠার উত্তেজনা, নতুন জায়গায় যাওয়ার আনন্দে টুনির জ্বর এসে গেল। হোসেন সাহেব তাকে এক ফোটা পালসেটিলা টু হানড্রেড খাইয়ে হাসিমুখে শফিককে বললেন, 'ওষুধটা সঙ্গে না থাকলে কী অবস্থা হত চিন্তা করেছিস? তোরা খামোকা হৈচৈ করিস, কিছু বুঝিস না।'

টুনির জ্বর এসে যাওয়ায় তাঁকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হল।

কামরায় গাড়িভরা ঘুম, রজনী নিঝুম। ট্রেন ছুটে চলেছে। গফরগাঁয়ে অনেকক্ষণ লেট করেছে, সেটা বোধহয় কাটিয়ে উঠতে চায়। নীলু ছাড়া বাকি সবাই ঘুমিয়ে। নীলুর ঘুম আসছে না। শীতের দিন। জানালার কাচ ওঠানো যাচ্ছে না। তার খুব ইচ্ছে করছে কাচ উঠিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে—অন্ধকার গ্রামের উপর হালকা জোছনা। কে জানে, আজ হয়তো জোছনা হয় নি। গাঢ় আঁধারে চারদিক ঢাকা। মাঝে মাঝে দূরে—বহু দূরে কুপি জ্বলছে। কোনো জায়গায় লক্ষ লক্ষ জোনাকি একসঙ্গে জ্বলছে আর নিভছে। বন্ধ ট্রেনের কামরা থেকে এসব দৃশ্যের কিছুই দেখার উপায় নেই। নীলু মেয়ের কপালে হাত রাখল। জ্বর মনে হয় আরো বেড়েছে। সে তার উপর কম্বলটা ভালোমতো টেনে দিল। মাথা কাত হয়ে ছিল—সোজা করে দিল।

শফিক বলল, 'ফ্লাস্কে কি চা আছে নীলু?'

'আছে। তুমি ঘুমাও নি?'

'উহু, চোখ বন্ধ করে পড়ে ছিলাম। গাড়িতে আমার ঘুম আসে না।'

শফিক উঠে নীলুর পাশে বসল। নীলু কাপে চা ঢালতে-ঢালতে বলল, 'মেয়েটা দু'দিন পরপর জ্বরে ভোগে, ওকে এক জন ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'ঢাকায় ফিরেই এক জন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। আমাকে মনে করিয়ে দিও।'

নীলু বলল, 'জানালাটা একটু খুলে দেবে? বাইরের দৃশ্য দেখব।'

'ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকবে।'

'অল্প একটু খোল।'

শফিক পুরোটাই খুলে দিল। আকাশে চাঁদ নেই, তবু নক্ষত্রের আলোয় আবছাভাবে সবকিছু চোখে পড়ে। নদীর পানি ঝিকমিক করে জ্বলে। খোলা মাঠ থেকে চাপা আলো বিচ্ছুরিত হয়। কী অদ্ভুত লাগে দেখতে। এই সব দৃশ্য যেন পৃথিবীর দৃশ্য নয়। এদের হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায়।

তারা চার দিন কাটাল নীলগঞ্জে।

টুনির আনন্দের সীমা নেই। এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে ঘরে পাওয়া যায় না। বাবলুর সঙ্গে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরছে। বাবলুও আগের মতো নেই, তার মুখে কথা ফুটেছে। এই ক'দিনেই গ্রামের কথা বলার টান তার গলায় চলে এসেছে। টুনিকে এই ব্যাপারটি খুব অবাক করেছে। সেও টেনে-টেনে কথা বলার চেষ্টা করছে, মনোয়ারা যা একেবারেই সহ্য করতে পারছেন না। তিনি টুনিকে চোখে-চোখে রাখার চেষ্টা করেন। পারেন না। তাঁর সবচে বড়ো ভয় কখন এই মেয়ে হুট করে পানিতে নেমে যায়। চোখে-চোখে রেখেও কোনো লাভ হয় না। সুযোগ পেলেই পানিতে নেমে পড়ে। টুনি পানিতে নেমেছে, এই খবর শুনলেই তিনি বিশ্রী রকমের হৈচৈ শুরু করেন। নীলুকে বলেন, 'তুমি হচ্ছ মা, তোমার গায়ে লাগে না? চুপচাপ আছ। মেয়েটাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ।'

'ওর কিছু হবে না মা। ওর সঙ্গে সব সময় একদল ছেলেপুলে থাকে, ওরা দেখবে। গ্রামের ছেলেমেয়ে, ওরা হল পানির পোকা।'

কথা সত্যি, টুনির সঙ্গে থাকে বিরাট এক বাহিনী। শওকত এক দিন এক মহিষ ধরে আনল। বিশাল মহিষ। টকটকে রক্তবর্ণ চোখ, বাঁকান শিং। মনোয়ারা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কী সর্বনাশ! এই আজরাইল উঠানে কেন?' শওকত হাসিমুখে বলল, 'বড়ো ঠাণ্ডা জানোয়ার, টুনির জন্যেই আনলাম।'

'কী বলছ তুমি! টুনি এটা দিয়ে কী করবে?'

'উপরে বসব।'

'পাগল নাকি!'

'খুব ঠাণ্ডা জানোয়ার।'

'বের হও! এক্ষুণি এটা নিয়ে বিদেয় হও। পাগলের কারবার। বলে কী, ঠাণ্ডা জানোয়ার।'

শওকত মহিষ নিয়ে বের হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরই মনোয়ারা আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ করলেন, টুনি সেই মহিষের পিঠে। মহিষ গদাইলস্করি চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পেছনে একদল ছেলেপুলে। নীলু মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখছে। সে বলল, 'একটা ক্যামেরা থাকলে ভালো হত। ছবি তুলে রাখা যেত। সুন্দর

লাগছে, না মা?'

মনোয়ারা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এর মধ্যে তুমি সুন্দর কী দেখলে? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এক্ষুণি ঝাড়া দিয়ে গা থেকে ফেলে দেবে।'

নীলুকে তেমন উদ্বিগ্ন মনে হল না। হোসেন সাহেব এই দৃশ্যে খুব মজা পেলেন। মহিষের পিছনে-পিছনে হাঁটতে লাগলেন।

শফিক খুব আগ্রহ নিয়ে সুখী নীলগঞ্জের কর্মকাণ্ড ঘুরে ঘুরে দেখল। এতটা সে আশাই করে নি। এত দিন সে এটাকে এক জন বুড়ো মানুষের শখের ব্যাপার বলেই ধরে নিয়েছিল, এখন কাণ্ডকারখানা দেখে হকচকিয়ে গেছে। লাইব্রেরি ঘরে রাজ্যের বই। এত বই শহরের কোনো লাইব্রেরিতেও নেই। দুটো পত্রিকা আসে এই গণ্ডগ্রামে। শফিক অবাক হয়ে বলল, 'কে পড়ে এই পত্রিকা? আপনি পড়েন, সেটা বুঝতে পারি। আর কে পড়ে?'

'ডাক্তারবাবু পড়েন। হরিনারায়ণ বাবু।'

'ডাক্তার আছে নাকি?'

'ডাক্তার ঠিক না। সরকারী হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার ছিলেন, এখন রিটায়ার করে এই গ্রামে আছেন।'

'ও, আচ্ছা।'

'গ্রামের লোকজনও কেউ কেউ পত্রিকা নাড়াচাড়া করে। তা ছাড়া সন্ধ্যাবেলা এক জন পত্রিকা পড়ে শোনায়। অনেকেই শুনতে আসে।'

'বলেন কী?'

'কবির মামা যে-কাজ শুরু করেছিলেন, তার সুফল দিতে শুরু করেছে।'

'কী রকম সুফল?'

সোভাহান হাসতে-হাসতে বলল, 'নীলগঞ্জের মেয়েদের বিয়ের বাজারে খুব কাটতি। আশপাশের গ্রামের সবাই মনে করে, নীলগঞ্জের মেয়ে মানে আদব-কায়দার মেয়ে। এখানকার কোনো মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেওয়া হয় না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, কবির মামার নিষেধ ছিল। যৌতুক দিয়ে কোনো মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না। কবির মামার জীবদ্দশায় এটা মানা হত না। এখন মানা হয়।'

'আমার তো ভাই রূপকথার মতো লাগছে।'

'আসলেই রূপকথা। বেশির ভাগই হয়েছে ওনার মৃত্যুর পরে। যেমন গ্রামের ভেতরের রাস্তাগুলি। কেউ নিজের জায়গার এক ইঞ্চি ছাড়তে রাজি নয়। মামা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, লাভ হয় নি। তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের দিন সবাই ঠিক করল, কবির মাষ্টার যে-সব রাস্তা চেয়েছিলেন, সেগুলি করে দেওয়া হবে। করাও হল তাই। লোকটি যখন বেঁচে ছিল, তার মর্ম কেউ বোঝে নি।'

'আপনি কি ওনার বাকি কাজ শেষ করতে নেমেছেন?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কী মনে হয়, পারবেন?'

'হয়তো পারব। খুবই কঠিন কাজ। দীর্ঘদিনের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধকার—চট করে এগুলি যায় না। সময় লাগে। আমিও হয়তো পারব না, অন্য এক জন আসবে। এটা হচ্ছে একটা চেইন রিঅ্যাকশন। শুরুটাই মুশকিল। এক বার শুরু হলে চলতে থাকে।'

'ঠিক বলেছেন। শুরুটাই ডিফিকাল্ট।'

'গ্রামের লোকদের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে আমি খানিকটা প্রতারণাও করছি। তাও কাজে লাগছে।'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না। কী ধরনের প্রতারণা?'

'নামাজ পড়ছি নিয়মিত। যদিও ধর্ম, বিধাতাপুরুষ এসব জিনিসে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু যেহেতু ধর্মপ্রাণ মানুষদের জন্য গ্রামের লোকদের খুব মমতা, আমি তার সুযোগ নিচ্ছি।'

শফিক হেসে ফেলে বলল, 'কে জানে এক দিন হয়তো দেখা যাবে, ভান করতে করতে আপনি ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন। বেরুতে পারছেন না। বিরাট বুজুর্গ ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।'

'হতে পারে। পৃথিবী বড়োই রহস্যময়। রহস্যের কোনো শেষ নেই।'

ঢাকায় ফেরার আগের রাতে পিঠা বানানোর উৎসব হল। সেই উৎসবে গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে যোগ দিল। টুনি এক ফাঁকে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে সবাইকে দাওয়াত করে এসেছে। উঠোনে খড়ের আগুন করা হয়েছে। সেই আগুনে তৈরি হচ্ছে পোড়া-পিঠা। বিশাল আকৃতির কদাকার পিঠা। আগুনে পোড়ার পর পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন তা কেটে দুধে জ্বাল দিয়ে খাওয়া। শওকত কোথা থেকে এক গায়ক ধরে এনেছে। সে একটু দূরে তার একতারা নিয়ে বসেছে। তাকে ঘিরে পুরুষদের একটা দল। গায়কের নাম কেরামত মিয়া। তার গলায় সুর তেমন নেই। সুরের অভাব সে পূরণ করেছে আবেগে। একটি চরণে টান দেবার পরই তার চোখ ছলছল করতে থাকে। তৃতীয় চরণে যাবার আগেই চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। গায়ক কেরামত মওলা গান ধরে-

"নিমের পাতা তিতা তিতা
জামের পাতা নীল,
কোথায় আমার প্রাণের মিতা
কোথায় বন কোকিল?"

সবাই স্তব্ধ হয়ে গান শোনে। পুরনো সব দুঃখ হৃদয়ের অতল গহ্বর থেকে ভেসে ওঠে। বড়োই মনখারাপ করে সবাই। তবু ভালো লাগে। হৃদয়ের গহীন চাপা পড়ে থাকা দুঃখগুলি মাঝে-মঝে দেখতে আমরা ভালোবাসি। সেই

সুযোগ বড়ো একটা হয় না। কেরামত মওলার মত গ্রাম্য গায়করা কখনো–কখনো তা পারেন। তাঁদের সাহায্য করে প্রকৃতি।

উঠোনের আগুন জ্বলছে। তাকে ঘিরে বসে বসে আছে বৌ–ঝিরা। আকাশে ছোট্ট একটা চাঁদ। তার হিম হিম আলো পড়েছে দিগন্তবিস্তৃত মাঠে। শীতল কনকনে হাওয়া বইছে। দুখ–জাগীনিয়া পরিবেশ তো একেই বলে।

৪৬

নীলুরা ঢাকায় পৌঁছাল সোমবার ভোরে। নীলুর ইচ্ছা ছিল সোমবারে অফিস ধরা। তা করা গেল না। ন'টা বাজতেই জহির এসে উপস্থিত। জহির বলল, 'আমার সঙ্গে একটু আসতে হবে ভাবী। দশ মিনিটের জন্যে। আমি আপনাকে অফিসেপৌঁছেদেব।'

'ব্যাপার কি বল তো।'

'তেমন কিছু না। আবার কিছুটা আছেও। ভাবী, একটু চলুন আমার সঙ্গে।'

'বেশ চল। আমি কাপড় বদলে নিই। তোমরা ভালো ছিলে তো?'

জহির শুকনো গলায় বলল, 'ভালোই ছিলাম। টুনি কোথায় ভাবী?'

'ওর বাবার সঙ্গে গিয়েছে। ওর শরীরটা ভালো না, জ্বর। যাবার সময়ও জ্বর নিয়ে গিয়েছে। ফেরার পথেও জ্বর নিয়ে ফিরল।'

জামাইয়ের খোঁজ পেয়ে হোসেন সাহেব বেরিয়ে এলেন। নীলগঞ্জের বিস্তারিত গল্প জুড়ে দিলেন।

'রাস্তাঘাট চেনা যায় না। বড়ো একটা রাস্তা করে ইঁট বিছিয়ে দিয়েছে। রিকশা চলে। ইচ্ছা করলে তুমি গাড়ি নিয়েও যেতে পারবে। এইটুক গ্রামে চারটা টিউবওয়েল। দাতব্য চিকিৎসালয় একটা করেছে, ওষুধপত্র অবশ্যি তেমন নেই। আসলে দরকার ছিল একটা হোমিও হাসপাতাল। ওষুধ সস্তা, ইচ্ছা করলে বিনামূল্যে দেওয়া যায়। তাই না?'

জহিল বিরস মুখে হ্যাঁ–হুঁ দিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে যে–কেউ বলে দিতে পারবে, সে কিছুই শুনছে না। তার মন অন্য কোথাও। হোসেন সাহেব অবশ্যি বুঝতে পারছেন না। তিনি উৎসাহের সঙ্গে একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছেন। নীলু কাপড় বদলে তৈরি হয়ে এসেছে, তখনও তাঁর গল্প থামে নি। নীলুকে বললেন, 'পাঁচটা মিনিট দেরি কর মা। জহিরের সঙ্গে একটা দরকারী কথা বলছি। তুমি বরং এর মধ্যে আমাদের জন্যে চট করে চা বানিয়ে আন। আমারটায় চিনি কম।'

নীলু চা আনতে গেল। হোসেন সাহেব শুরু করলেন মহিষের গল্প।

'মহিষ দেখেছ নাকি জহির?'

'দেখব না কেন?'

'আরে না। ঐ দেখার কথা বলছি না। কাছে থেকে দেখা। প্রাণী হিসেবে মহিষ অসাধারণ। বড়ো ঠাণ্ডা প্রাণী। দেখতেই বিশাল, কিন্তু এর মনটা শিশুদেরমতো।'

'তাই বুঝি?

'আমি অবাক হয়েছি। এই টুনি, পর্বতের মতো এক মহিষের পিঠে বসে থাকত। সে দিব্যি বসে আছে, আর মহিষ নিজের মনে হেলেদুলে ঘাস খাচ্ছে।'

'বাহ, চমৎকার তো।'

'জিনিসটা নিয়ে আমি ট্রেনে আসতে আসতে অনেক চিন্তা করলাম। আমার ধারণা, মহিষকে যদি ঠিকমতো ট্রেনিং দেওয়া যেত, তাহলে ঘোড়ার মতো একে ব্যবহার করা যেত। এই জিনিসটা কারোর মাথায় খেলে নি। তুমি কী বল?'

'হতেপারে।'

'মহিষের পিঠে বসাও খুব আরামের। পিঠ অনেক চওড়া। জিন ব্যবহার করার দরকার হত না।'

শেষ পর্যন্ত জহির বলতে বাধ্য হল, 'আমি পরে এসে বাকিটা শুনব। আমার একটা বিশেষ জরুরি কাজ।'

'সন্ধ্যাবেলা চলে এস। শাহানাকে নিয়ে এস, অনেক গল্প বাকি রয়ে গেছে।'

'আচ্ছা দেখি।'

'দেখাদেখির কিছু না। নিয়ে আসবে। রাতে আমাদের সঙ্গে খাবে। মনে থাকে যেন।'

'জ্বি, মনে থাকবে।'

'আসল গল্পগুলিই বলা হয় নি।'

জহিরের কথা শুনে নীলু আকাশ থেকে পড়ল। তার মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছে না। সে বহু কষ্টে বলল, 'এসব তুমি কী বলছ। '

'যা ঘটেছে, তাই বললাম।'

'আমাদের খবর দিলে না কেন?'

'আপনারা আনন্দ করতে গিয়েছেন।, এর মধ্যে হঠাৎ ---তবু খবর নিশ্চয়ই দিতাম। দেখলাম, খবর না দিয়ে যদি পারা যায়।'

'শাহানা এখন আছে কেমন?'

'এখন ভালো।'

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে?'

'হ্যাঁ। গতকাল সন্ধ্যায় বাসায় এনেছি।'

কথা হচ্ছিল জহিরদের বাড়ির একতলায়। নীলু বলল, 'তুমি আবার

গোড়া থেকে বল কী হয়েছে।'

'আপনারা যেদিন নীলগঞ্জ গেলেন, ঐদিনই ঘটনা ঘটল। সারা দিন দরজা বন্ধ করে ছিল। রাত দশটার সময় কাজের মেয়েটা বলল—সে নাকি ধপ করে কি পড়ার শব্দ শুনেছে। আমি দরজা ধাক্কা দিলাম। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম। তখনও বুঝতে পারি নি, ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন। যমে-মানুষে টানাটানি কাকে বলে এই প্রথম দেখলাম। ডাক্তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে, ভাবী। ওরা অসাধ্য সাধন করেছে।'

নীলু উঠে দাঁড়াল। ক্লান্তগলায় বলল, 'আমি শাহানার কাছে যাচ্ছি।'

জহির বলল, 'আমিও কি আসব?'

'না, তোমার আসার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাক।'

'কড়া কথা কিছু বলবেন না ভাবী, মনের যে অবস্থা।'

'আমি সেটা দেখব। তোমাকে ভাবতে হবে না।'

শাহানা নীলুকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'কবে ফিরলে ভাবী?'

'আজই ফিরলাম। তুমি আছ কেমন?'

'এই আছি। আমার কাছে থাকা না-থাকা সমান।'

'তোমার কোনো লজ্জা লাগছে না?'

'লজ্জা লাগবে কেন?'

'ভবিষ্যতে যদি মরার চেষ্টা কর, এমনভাবে করবে যেন বেঁচে ফিরে আসতে না হয়।'

'কী বলছ তুমি ভাবী?'

'খবর্দার, আমাকে ভাবী বলবে না। ফাজিল মেয়ে।'

শাহানা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। নীলুর এই উগ্রমূর্তি সে কখনো দেখে নি। নীলু রুদ্ধ গলায় বলতে লাগল, 'এতটুক মেয়ে ছিলে। চোখের সামনে বড়ো হয়েছ। কত আদর, কত মমতা। আর এই মেয়ে এমন করে? তোমার মরাই উচিত। তুমি উঠে আস। দোতলা থেকে আমার সামনে নিচে লাফিয়ে পড়। এস বলছি।'

এই বলে সে সত্যি-সত্যিই শাহানার হাত ধরে খাট থেকে নামাল। শাহানা কিছু বোঝার আগেই নীলু গায়ের সর্বশক্তি দিয়ে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। শাহানা কাত হয়ে খাটে পড়ে গেল। সে চোখ বড়ো-বড়ো করে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে। তার ফর্সা গালে আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে। যেন সেখানে রক্ত জমে গিয়েছে। নীলু কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল তার দিকে, তারপর একটি কথা না বলে নিচে নেমে গেল। জহিরকে বলল, 'তুমি এখন শাহানার কাছে যাও। আমি চলে যাচ্ছি।'

'আসুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

'তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না। তোমাকে যা করতে বললাম,

কর।'

জহির দোতালায় উঠে এল। শাহানা চুপচাপ খাটে বসে আছে। মাথায় ঘোমটা। শাড়ির আঁচল এমনভাবে টানা যে মুখ দেখা যাচ্ছে না। জহিরকে দেখে সে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। হাসিমুখেই বলল, 'ভাবী আমাকে মেরেছে।' জহির বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি!'

'দেখ না, গালে দাগ বসে গেছে।'

গালের দাগ দেখাতে গিয়ে শাহানা আবার হাসল। মৃদুস্বরে বলল, 'ভাবী এর আগে আরো এক বার আমাকে চড় দিয়েছিল। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। আমার এক বান্ধবী খুব খারাপ একটা বই দিয়েছিল আমাকে। কুৎসিত সব ছবি ছিল সেই বইটাতে। আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়ছিলাম। আমার হাতে এই বই দেখে ভাবী কী যে অবাক হল। কেমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর আমি কিছু বোঝার আগেই একটা চড় মারল আমাকে। হাত থেকে বই কেড়ে নিল না বা কিচ্ছু বলল না। এই ঘটনার কথা কাউকে বললও না। আমি কী যে লজ্জা পেয়েছিলাম। আজ আবার সেদিনের মতো লজ্জা পেলাম।'

জহির লক্ষ করল শাহানা কাঁদছে। খুব সহজেই সেই কান্নাও তার থেমে গেল। চোখ মুছে বলল, 'আমাকে ভাবীর কাছে নিয়ে চল।'

'এখনি যাবে?'

'হ্যাঁ। আমার এই ব্যাপারে ভাবী খুব কষ্ট পেয়েছে। আরেকটা কথা তোমাকে বলি—আমি আর কোনো দিন এ-রকম করব না।'

'তাই নাকি?'

'মাঝে মাঝে আমার এ-রকম হয়। মনে হয় কেউ আমাকে ভালোবাসে না। তখন অদ্ভুত সব কাণ্ড করি। ক্লাস নাইনে যখন পড়ি, তখন এক বার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। স্কুলে যাবার নাম করে বের হয়ে সোজা হাঁটা। হাঁটতে-হাঁটতে যাত্রাবাড়ি বলে একটা জায়গা, সেখান পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'সেখান থেকে ফিরে এসেছি। কেউ জানে না। কাউকে বলি নি। আমি বোধ হয় একটু পাগল।'

'একটু না, অনেকখানি। তোমাকে আমি খুব ভালো এক জন ডাক্তার দেখাব।'

'দেখিও। তুমি আমার উপর রাগ কর নি তো?'

'না!'

'সত্যি না?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'আমার গা ছুঁয়ে বল।'

জহির হেসে ফেলল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসল শাহানা। জহির মুগ্ধ চোখে শাহানার দিকে তাকিয়ে আছে। কী অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী—কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘবরণ চুল।

'শাহানা।'

'বল। তোমার গান কেমন এগুচ্ছে?'

'মোটেই এগুচ্ছে না। সকালবেলা উঠে ভ্যা ভ্যা করতে আমার ভালোও লাগে না। আমি আর গান শিখব না। আমি পড়াশোনা শুরু করব।'

'খুব ভালো কথা।'

'মাস্টার-টাস্টার রাখতে পারবে না। আমি নিজে-নিজে পড়ব।'

'সে তো আরো ভালো।'

'কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'আমি যতক্ষণ পড়ব, তুমি আমার পাশে বসে থাকবে। চুপচাপ বসে থাকবে।'

'শর্ত খুব কঠিন বলে তো মনে হচ্ছে না।'

জহির কিছু বোঝার আগেই শাহানা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। জহির কিছু বলল না, শাহানার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

৪৭

ডাক্তার সাহেবের চেহারা রাশভারী। মাথাভর্তি নজরুল ইসলামের মতো বাবরি চুল। কথাও বলেন খুব কম। ঘন-ঘন নিজের মাথার চুল টানেন। দেখে মনে হয়, কোনো কারণে খুব রেগে আছেন। কণ্ঠস্বরটি খুব সুন্দর। শুনতে ভালো লাগে। এই জন্যেই বোধ হয় নিজের গলার স্বর বেশি শোনাতে চান না।

তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে টুনিকে দেখলেন। আজকালকার ব্যস্ত ডাক্তাররা এত সময় রোগীদের দেন না। ইনিও ব্যস্ত। এঁর ওয়েটিং রুমে রোগী গিজগিজ করছে। তবু প্রতিটি রোগীকে অনেকখানি সময় দিচ্ছেন।

'ওর এই জ্বর-জ্বর ভাব, এটা প্রায়ই হয় বলছেন?'

'জ্বি।'

'এর আগে কোনো ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'না। বাবা হোমিওপ্যাথি করেন। টুকটাক ওষুধ দেন, সেরে যায়।'

'ও, আচ্ছা। আপনার মেয়ে তো খুব রূপবতী। পুতুল-পুতুল দেখাচ্ছে। কি খুকি, তুমি কি পুতুল?'

টুনি হেসে ফেলল। ডাক্তার সাহেব কাগজে অতি মনোযোগের সঙ্গে

কী–যেন লিখতে লাগলেন। আগের মতো সুরেলা মিষ্টি স্বরে বললেন, 'আমি এখানে কিছু স্পেসিফিক টেস্টের কথা লিখে দিচ্ছি। টেস্টগুলি করাতে হবে। সব জায়গায় টেস্ট ভালো হয় না। কোথায় করাবেন তাও লিখে দিচ্ছি।'

'আপনার সঙ্গে আবার তাহলে কখন দেখা করব?'

'আপনি আজই দেখা করবেন। রাত আটটা পর্যন্ত আমি বাসায় থাকব। আপনি রিপোর্টগুলি নিয়ে বাসায় চলে আসবেন।'

শফিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'বাসার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। টেস্টগুলি জরুরি ভিত্তিতে করানোর জন্যে যা প্রয়োজন, আপনি অবশ্যই করবেন।'

'আপনি কী আশঙ্কা করছেন?'

'কিছুই আশঙ্কা করছি না। যা বলার রিপোর্টগুলি দেখে তারপর বলব।'

'ওর তো তেমন কিছু না, সামান্য জ্বরজ্বারি সর্দি।'

'আমি খুবই আশা করছি ওর কিছু না, সামান্য ব্যাপার। তবু আপনাকে যা করতে বললাম করবেন। মেয়েকে সন্ধ্যাবেলা আনার দরকার নেই।'

'আপনার কথায় কেমন জানি ভয়–ভয় লাগছে।'

'সরি। আপনাকে যা করতে বললাম করবেন।'

ডাক্তার সাহেবের বাসায় পৌছাতে–পৌছাতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যেন বেরুচ্ছিলেন। শফিককে দেখে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম, আসবেন না বুঝি।'

'ব্লাড রিপোর্টটা পেতে একটু দেরি হয়ে গেল।'

'বসুন আপনি।'

ডাক্তারের স্ত্রী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'কতক্ষণ লাগাবে তুমি?'

'অল্প কিছুক্ষণ। পাঁচ মিনিট। তুমি গাড়িতে অপেক্ষা কর।'

ভদ্রমহিলা তিক্ত গলায় বললেন, 'বাসাতেও যদি তুমি এসব ঝামেলা কর, তাহলে আমি যাব কোথায়?'

'বললাম তো, পাঁচ মিনিট।'

ডাক্তার সাহেব সব ক'টি রিপোর্ট টেবিলে বিছিয়ে দিলেন। তিনি কিছু দেখছেন বলে মনে হল না। রিপোর্টগুলি আবার একটির উপর একটি সাজিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথার চুল টানলেন। শফিক বলল, 'কী দেখলেন?' ডাক্তার কিছু বললেন না। শফিক আবার বলল, 'কী দেখলেন?'

'আপনার মেয়ের একটা খুব খারাপ অসুখ হয়েছে। হজকিন্স ডিজিজ। এক ধরনের লিউকোমিয়া। লোহিত রক্তকণিকাঘটিত সমস্যা। অসুখটা খুবই খারাপ। এর বিরুদ্ধে আমাদের হাতে এখনও তেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র নেই। তবে বিদেশে প্রচুর কাজ হচ্ছে, ইফেকটিভ কেমি থেরাপি ডেভেলপ করেছে। এতে লাইফ এক্সপেকটেনসি অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। এই ফিল্ডে

প্রচুর গবেষণাও হচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে মোক্ষম ওষুধ বেরিয়ে আসবে। সেই মুহূর্তটি আগামী কালও হতে পারে।'

বাইরে ভদ্রমহিলা ক্রমাগত গাড়ির হর্ন দিচ্ছেন। পাঁচ মিনিট সম্ভবত হয়ে গেছে। তিনি আর দেরি সহ্য করতে পারছেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন, 'আপনাকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দিই?'

'দিন।'

তিনি পানি এনে দিলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনার যদি টাকাপয়সা থাকে, মেয়েকে জার্মানি পাঠিয়ে দিন। জার্মানির এক হাসপাতালে আমি দীর্ঘ দিন পোস্টডক করেছি, আমি সব ব্যবস্থা করব।'

'আমার মেয়ে ভালো হবে?'

'হতে পারে। তবে এটা কালান্তক ব্যাধি, এটা আপনাকে মনে রেখেই এগুতে হবে। মেডিক্যাল সায়েন্স প্রাণপণ করছে। আমার মন বলছে খুব শিগগিরই কিছু একটা হবে। আগামী কাল, আগামী পরশু, আগামী মাস কিংবা আগামী বৎসর। আশা হারাবার মতো কিছু নয়।'

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী এসে ঢুকলেন। তীব্র গলায় বললেন, 'তুমি কি যাবে—না যাবে না?'

'যাব। চল, আমার দায়িত্ব শেষ হয়েছে।'

শফিক উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না। ডাক্তার সাহেব গভীর মমতায় শফিকের হাত ধরলেন। বললেন, 'আসুন, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।'

'দরকার নেই। আপনাদের দেরি হয়ে যাবে।'

'হোক দেরি।'

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী বিড়বিড় করে কী বললেন। শফিক তা শুনল না, শুধু শুনল ডাক্তার সাহেব বলছেন, 'আমি প্রথম এঁকে বাসায় পৌঁছে দেব। তোমার পছন্দ হোক না-হোক, আমার কিচ্ছু করার নেই।'

৪৮

কিছু কিছু গল্প আছে, যা কখনো শেষ হয় না। এই সব দিনরাত্রির গল্প তেমনি এক শেষ না-হওয়া গল্প। এই গল্প দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলতেই থাকে। ঘরের চার দেয়ালে সুখ-দুঃখের কত কাব্যই না রচিত হয়। কত গোপন আনন্দ, কত লুকানো অশ্রু। শিশুরা বড়ো হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যাত্রা করে অনির্দিষ্টের পথে। আবার নতুন সব শিশুরা জন্মায়।

আজ এই বাড়িতে নতুন একটি শিশু জন্মাবে। সে রহস্যময় এই পৃথিবীতে পা রাখার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাতৃগর্ভের অন্ধকার তার

অসহ্য বোধ হয়েছে।

শিশুটি শাহানার। শাহানা এই বিরাট খবরটা এখনও টের পায় নি। তার বোধহয় ধারণা, এমনিতেই তার খারাপ লাগছে। তবু সে নীলুকে এসে বলল, 'ভাবী, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।' নীলু আঁৎকে উঠে বলল, 'ভালো লাগছে না মানে? কেমন লাগছে?'

'বুঝতে পারছি না ভাবী, কেমন যেন পিপাসা লাগছে। আর...'

'আর কী?'

'জানি না ভাবী, বড়ো ভয় লাগছে।'

নীলু পাশের বাড়ি থেকে জহিরকে টেলিফোন করল। সে তার চেম্বারে নেই, বাসায়ও নেই। বাসায় ফিরবে সন্ধ্যার পর। কিংবা কে জানে হয়তো সরাসরি চলে আসবে এ বাড়িতেই। কী সর্বনাশা কাণ্ড! নীলু অস্থির হয়ে পড়ল। হোসেন সাহেব এবং মনোয়ারা—দু' জনের কেউই বাসায় নেই। যাত্রাবাড়ি গিয়েছেন। ফিরতে-ফিরতে রাত ন'টা।

শাহানা বলল, 'ভাবী, আমার কি সময় হয়ে গেছে?'

'বুঝতে পারছি না। শুয়ে থাক। এখনো কি আগের মতো খারাপ লাগছে।?

'না, এখন আর আগের মতো খারাপ লাগছে না। তুমি আমার পাশে বসে থাক।'

নীলু বসল তার পাশে। শাহানা লাজুক স্বরে বলল, 'আমি জানি আজই সেই দিন।'

'কী করে জানলে?'

'দেখছ না, বাসায় একটা মানুষ নেই, শুধু তুমি আর আমি। টুনির জন্মের সময়ও তো এ রকম হল। তোমার মনে নেই, ভাবী?'

নীলু জবাব দিল না। বিকেলের ম্লান আলোয় তার চেহারাটা দ্রুত অন্য রকম হয়ে গেল। টুনির কোনো কথা সে মনে করতে চায় না। কিন্তু কেউ তা বুঝতে পারে না। কারণে-অকারণে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আসে।

টুনি দু' বছর আগে জার্মানির এক হাসপাতালে মারা গেছে। নিঃসঙ্গ মৃত্যু অবশ্যি হয় নি। রুইনবার্গ শহরের সব ক'টি বাঙালি পরিবার সেদিন হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছিলেন। আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছোট্ট বালিকাটিকে ঘিরে বসে ছিলেন। টুনি যত বার বলেছে আমার আম্মি, আমার আম্মি, তত বারই তাঁদের চোখে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। এইসব প্রবাসী বাঙালিরা চাঁদা তুলে নীলুর জার্মানি আসার টিকিট পাঠিয়েছিলেন, যাতে নীলু তার মেয়েটির পাশে থাকতে পারে। অহঙ্কারী নীলু তাতে রাজি হয় নি। বারবার বলেছে, ভিক্ষার টাকায় আমি যাব না। নীলু এবং শফিক এই দু' জনের জার্মানী যাওয়া-আসা এবং থাকার যাবতীয় খরচ শারমিনের বাবা দিতে চেয়েছিলেন। তাতেও কেউ রাজি হয় নি। ওঁর টাকা কেন নেবে? শারমিন এবং রফিকের ডিভোর্স হয়ে গেছে। এই পরিবারটির সঙ্গে তাদের

এখন আর কী সম্পর্ক? কিন্তু একেবারেই কি সম্পর্ক নেই?

শারমিন থাকে আমেরিকায়। টুনির মৃত্যুর আগের দিন আমেরিকা থেকে সে জার্মানি চলে এল। টুনি মারা গেল শারমিনের কোলে মাথা রেখে। তার ছোট-ছোট হাতে সে সারাক্ষণই তার ছোট চাচীকে জড়িয়ে ধরে ছিল। যেন হাত ছাড়লেই চাচী কোথায়ও চলে যাবে। সেইসব হৃদয় ভেঙে-দেওয়া কাহিনী খুব গুছিয়ে শারমিন লিখেছিল। নীলু প্রায়ই ঐ চিঠি বের করে পড়ে। পড়তে-পড়তে তার কাঁদতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কান্না আসে না। টুনির মৃত্যুর পর কী-যে হয়েছে, সে কাঁদতে পারে না। যদিও প্রায়ই তার কাঁদতে ইচ্ছে করে।

কত দিন হয়ে গেল টুনি নেই, তবু তার ছোট্ট ফুল-আঁকা বালিশ প্রতি রাতেই বিছানায় পাতা হয়। বালিশটা মাঝখানে রেখে একপাশে শোয় শফিক, অন্য পাশে নীলু। তারা দু' জনই কল্পনা করে, মেয়েটি দু'জনের মাঝখানেই শুয়ে আছে। শফিক মেয়ের গায়ে হাত রাখতে যায়। নীলুও হাত বাড়িয়ে দেয়। টুনিকে তারা খুঁজে পায় না। এক জন হাত রাখে অন্য জনের হাতে। শব্দহীন ভাষায় দু' জন দু' জনকে সান্ত্বনার কথা বলে।

কত বদলে গেছে সব কিছু। সবচে বেশি বদলেছে রফিক। প্রায় রাতেই মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। কারো চোখের দিকে তাকায় না। মাথা নিচু করে নিজের ঘরে ঢুকে যায়। সারা রাত তার ঘরে বাতি জ্বলে। বাতি নেভালেই সে নাকি কী-সব দেখে। কবির মামা নাকি তার ঘরে হাঁটাহাঁটি করেন। এক দিন নাকি টুনিকেও দেখেছে। টুনি তাকে বলেছে, 'তুমি এমন হয়ে গেছ কেন, সবাই তোমাকে খারাপ বলে!'

'কী করব রে মা, আমি মানুষটাই খারাপ।'

'তোমাকে খারাপ বললে আমার খুব খারাপ লাগে।'

'না, আর খারাপ হব না। তোকে কথা দিলাম। মদ ছেড়ে দিলাম। নো লিকার।'

কিন্তু পরদিন আরো বেশি করে খায়, ঘোর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে ফিসফিস করে বলে, 'সব বাতি জ্বেলে রাখবে ভাবী। বাতি নেভালেই ওরা আসে। বড়ো বিরক্ত করে। সবচে বেশি বিরক্ত করে টুনি। কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান অসহ্য।!'

টুনির কথা নীলু মনে করতে চায় না। তবু বারবার সবাই তাকে টুনির কথা মনে করিয়ে দেয়। হোসেন সাহেব প্রায় রাতেই ঘুমের ঘোরে চেঁচান-ও টুনি, টুনি। নিজের চিৎকারে তাঁর নিজেরই ঘুম ভেঙে যায়। বাকি রাতটা তিনি ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কাঁদেন। নীলু ও শফিক সেই কান্না শোনে। আহ, কী কষ্ট! কী কষ্ট! বেঁচে থাকা বড়ো কষ্টের।ঐ

শাহানা বলল, 'ও ভাবী, আবার যেন কেমন লাগছে। ওরা তো কেউ এল না।

আমার বড়ো ভয় লাগছে। আমাকে তুমি হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

নীলু উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর থেকে বেরুল। আনিস কোত্থেকে যেন ফিরছে। নীলু বলল, 'আনিস, একটা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আস তো, মনে হচ্ছে শাহানাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।'

'আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি। আপনি ওর কাছে গিয়ে বসুন।'

শাহানার কাছে বসতে ইচ্ছা করছে না। নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। রফিকের ঘর হাট করে খোলা। এই সময় সে কখনও ঘরে থাকে না। থাকলে ভালো হত। প্রয়োজনের সময় কাউকেই পাওয়া যায় না।

'ভাবী!'

নীলু চমকে তাকাল। রফিক দাঁড়িয়ে আছে। কখন যে সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছে।

'হচ্ছে কী ভাবী?'

'শাহানার পেইন উঠেছে। তুমি সবাইকে খবর দাও।'

'অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসব?'

'অ্যাম্বুলেন্স লাগবে না। আনিস আনতে গেছে। তুমি জহিরকে খবর দেবার ব্যবস্থা করে যাত্রাবাড়িতে চলে যাও। বাবা–মাকে নিয়ে এস।'

রফিক চলে যেতে গিয়ে থমকেও দাঁড়িয়ে লাজুক গলায় বলল, 'শারমিন এগার তারিখে দেশে ফিরছে ভাবী। আমাকে চিঠি লিখেছে।'

'হঠাৎ তোমাকে চিঠি?'

'আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। চিঠিতে তাই লেখা। আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে।'

'ভালো, খুব ভালো।'

রফিক হাসছে। কত দীর্ঘ দিন পর নীলু ওর মুখে হাসি দেখল। নীলু ভুলেই গিয়েছিল রফিক হাসতে পারে ভেতর থেকে শাহানা ভয়ার্ত গলায় ডাকছে, 'ভাবী, ভাবী।' নীলু নড়ছে না। অবাক হয়ে দেখছে, অনেক দিন পর তাদের পাশের জলা জায়গাটায় ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস নামছে। পাখিরা শহর পছন্দ করে না। এবার কী হল তাদের। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি নামছে কেন? বিদ্যুৎ চমকের মত নীলুর মনে হল, টুনির জন্মের সময়ও ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস নেমেছিল।

নীলু ঘরে ঢুকল। নতুন শিশু আসছে। কত দীর্ঘ দিন সে এই পৃথিবীতে থাকবে। হাসবে, খেলবে, গাইবে। তার আগমনের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আয়োজনের কোনো ত্রুটি থাকা চলবে না।

শাহানা কাঁপা–কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি বারবার কোথায় চলে যাচ্ছ, ভাবী?'

'আর যাব না। এই বসলাম তোমার পাশে।'

'বড়ো ভয় লাগছে, ভাবী।'

নীলু কোমল স্বরে বলল, 'কোনো ভয় নেই।'

ঘরের জানালা খোলা। ঘন হয়ে সন্ধ্যা নামছে। বালিহাঁসের পাখার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। অনেক দিন পর ওরা আবার এল।

নীলু লক্ষ করল, তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। ভুলে যাওয়া কান্না সে আবার ফিরে পেয়েছে। ব্যথায় ছটফট করছে শাহানা। মাতৃগর্ভে বন্দী শিশু মুক্তির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কত না বিস্ময় অপেক্ষা করছে শিশুটির জন্যে।

আমার আছে জল

১

রেল স্টেশনের এত সুন্দর নাম আছে নাকি? "সোহাগী"। এটা আবার কেমন নাম? দিলু বলল, 'আপা, কী সুন্দর নাম দেখেছ?'

নিশাত কিছু বলল না। তার ঠাণ্ডা লেগেছে। সারা রাত জানালার পাশে বসেছিল। খোলা জানালায় খুব হাওয়া এসেছে। এখন মাথা ভার ভার। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো নাক দিয়ে জল ঝরতে শুরু করবে। দিলু বলল, 'আপা, স্টেশনের নামটা পড়ে দেখ না। প্লিজ।'

'পড়েছি। ভালো নাম।'

দিলুর মন খারাপ হয়ে গেল। সে আশা করেছিল নিশাত আপাও তার মতো অবাক হয়ে যাবে। চোখ কপালে তুলে বলবে—ও মা, কেমন নাম! কিন্তু সে আজকাল কিছুতেই অবাক হয় না। কথাবার্তা বলে স্কুলের জিওগ্রাফি আপার মতো। নিশাত বলল, 'দিলু, দেখ তো বাবু কোথায়? দুধ খাবে বোধহয়।'

দিলু বাবুকে কোথাও দেখতে পেল না। এমন দুষ্টু হয়েছে! ওয়েটিংরুমে ঘাপটি মেরে বসে আছে হয়তো। কাছে গেলেই টু দেবে। ধরতে গেলেই আবার ছুটে পালাবে।

ওয়েটিংরুমের সামনে একগাদা জিনিসপত্রের সামনে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বিরক্ত মুখ। তিনি দিলুকে বললেন, 'একেক জন একেক দিকে চলে গেছে। ব্যাপারটা কি? তোর মা কোথায়?'

'জানি না তো।'

'তোর মাকে খুঁজে বের কর।'

'আমি পারব না বাবা, আমি বাবুকে খুঁজছি।'

'বাবুকে খুঁজলে তোর মাকে খোঁজা যাবে না, এরকম কথা কোথাও লেখা আছে?'

সবাই আজ এরকম করে কথা বলছে কেন? কোথাও বেড়াতে গেলে সবার খুব হাসিখুশি থাকা উচিত। কিন্তু এখানে সবাই কেমন রেগে কথা বলছে। রাগটা তার উপরই। ট্রেনে মা তিন বার বললেন, 'দিলু পা নাচাচ্ছ কেন? পা নাচানো একটা অসভ্যতা। চুপ করে বস।'

পা নাচানোর মধ্যে আবার সভ্যতা–অসভ্যতা কী? যত আজগুবি কথা!

'দিলু।'

'বল।'

'তোর মাকে খুঁজে বের কর। আমার পাইপের তামাক রেখেছে কোথায় সে?'

'আমি কি করে জানব? আমি রাখলে আমি জানতাম। আমি তো রাখি নি।'

দিলুর বাবা ওসমান সাহেব রাগী চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। ওসমান সাহেবের বয়স আটান্ন। কিন্তু দেখায় আরো বেশি। শরীর হঠাৎ ভারি হয়ে গেছে। মাথার সমস্ত চুল পাকা। মেজাজের পরিবর্তনও হয়েছে হঠাৎ করেই। এখন আর কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারেন না। তিনি দিলুর উপর ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন। দিলুর বয়স এই মার্চে চোদ্দ হবে। নাকি পনের? মেয়েদের এই বয়সটা অন্য রকম। এই বয়সে চেনা মেয়েগুলোকে অচেনা লাগে। মনে হয় অন্য বাড়ির মেয়ে। এদের উপর কিছুতেই রাগ করা যায় না।

দিলু পরেছে একটা ধবধবে সাদা স্কার্ট। পায়ে মোজা ও জুতা দুই–ই লাল। মাথায় দু'টি লম্বা বেণী। শীতের সকালের রোদে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে বড়ো অচেনা লাগছে। এর উপর রাগ করা যায় না। ওসমান সাহেব বাক্স–পেঁটরা হাতড়াতে লাগলেন। পাইপ ধরানোর ইচ্ছা হচ্ছে। অনিয়ম করা যায়। ছুটি হচ্ছে অনিয়মের জন্যে।

দিলু ওয়েটিংরুমে কাউকে দেখল না। তবে ওয়েটিংরুমের বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। কেউ আছে নিশ্চয়ই। মা বোধহয় বাবুকে বাথরুম করাচ্ছেন। দিলু ডাকল—বাথরুমে কে? জল পড়ার শব্দ থেমে গেল। দিলু আবার বলল, 'বাবু তুমি?' কোনো সাড়া নেই। তার মানে মা। মা একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বাথরুম থেকে কথা বলবেন না।

দিলু যদি বলে—মা, গায়ে মাখার সাবানটা আছে? মা জবাব দেবেন না। বাথরুম থেকে কথা বলা নাকি অসভ্যতা। এর মধ্যে অসভ্যতার কী আছে?

খুট করে দরজা খুলল। দিলু দেখল, ভেজা মুখে জামিল ভাই বের হয়ে আসছেন।

'কি রে দিলু, ইমার্জেন্সি নাকি? যা, ঢুকে পড়।'

ছিঃ, কী অসভ্যতা! জামিল ভাইয়ের একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান নেই।

মেয়েদের কেউ বাথরুমে যাবার কথা ওভাবে বলে নাকি? সে যে বড়ো হচ্ছে এটা কি জামিল ভাইয়ের চোখে পড়ে না? এখন শাড়ি পরলে অনেকেই তাকে আপনি করে বলে। জামিল ভাই বোধহয় তাকে কখনো শাড়ি পরা দেখে নি।

'জামিল ভাই, বাবুকে দেখেছেন?'

'না।'

'মা'কে দেখেছেন?'

'না। কেন?'

'আপা খুঁজছে বাবুকে। বাবা খুঁজছে মা'কে।'

'ওরা মনে হয় স্টেশনের বাইরে হাঁটতে গেছে। চল যাই, খুঁজে নিয়ে আসি। তোকে তো দারুণ লাগছে রে দিলু! ট্রেনে কি এই ড্রেসেই ছিলি নাকি?'

'হুঁ।'

'মাই গড! তখন তো চোখেই পড়ে নি।'

জামিল দেখল, দিলু খুব লজ্জা পাচ্ছে। এর কারণ সে ঠিক বুঝতে পারল না। মেয়েটি কি বড়ো হয়ে যাচ্ছে নাকি?

'দেখতে দারুণ লাগছে' এই কথায় কান-টান লাল করার মানেটা কী? জামিল তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

'দিলু, তুই যেন কোন ক্লাসে এবার?'

'ক্লাস নাইনে। ইস, আপনি যেন জানেন না!'

'কোন গ্রুপ, সায়েন্স না আর্টস?'

'সায়েন্স।'

'বাপ রে বাপ, সায়েন্স! ইলেকটিভ অঙ্কে গোল্লা খাবি তো!'

'কেন, গোল্লা খাব কেন?'

'মেয়েরা অঙ্ক—মানসাঙ্ক এসব জানে নাকি?'

জামিল পাঞ্জাবির পকেট থেকে চিরুনি বের করে বাথরুমের আয়নায় চুল আঁচড়াতে গেল। দরজা পর্যন্ত বন্ধ করল না। কী বাজে অভ্যাস! দিলু শুনল চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জামিল ভাই গুনগুন করে গান গাচ্ছে——আজি এ বসন্তে, এত ফুল ফোটে, এত পাখি গায়।

এই শীতে বসন্তের গান! দিলু বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখল। সুরেরও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। বাথরুমে ঢুকলেই গান গাইতে হবে, এমন কোনো কথা আছে?

'চল দিলু, দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা।'

ওসমান সাহেব একটা কালো ট্রাঙ্কের উপর বসে আছেন। তাঁর মুখে বিরক্তির ভাব এখন আর নেই। পাইপের তামাক পাওয়া গেছে। পাইপ তৈরি করা হয়েছে। বাতাসের জন্যে আগুন ধরাতে পারছেন না। জামিলদের বেরুতে দেখে

হাসিমুখে বললেন, 'জামিল, আমাকে এখানে বসিয়ে একেক জন একেক দিকে কেটে পড়েছে, ব্যাপারটা কি বল তো?'

'সম্ভবত ছুটির দিনে আপনাকে কেউ ভয়-টয় পায় না। আপনাকে নিরীহ মনে করে।'

ওসমান সাহেব শব্দ করে হাসলেন। এত শব্দে তিনি কখনো হাসেন না। দিলুও হাসল। কাউকে হাসতে দেখলেই দিলুর হাসি পায়। ওসমান সাহেব বললেন, 'কি রকম মিসম্যানেজমেন্ট হয়েছে দেখলে? স্টেশনে জীপ নিয়ে থাকার কথা। জীপ তো নেই-ই, এক জন মানুষ পর্যন্ত নেই!'

'এসে পড়বে।'

'কিছু মুখে দেওয়া দরকার। এত বেলা হয়েছে, সবার খিদে পেয়েছে।'

'বেলা কিন্তু চাচা বেশি হয় নি, মাত্র সাড়ে সাতটা বাজে। সকাল হয়েছে মাত্র।'

'তাই নাকি!'

ওসমান সাহেব বেশ অবাক হলেন। জামিল বলল, 'আমি দেখি চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

'ঐখানে একটা চায়ের দোকান আছে।'

'ঐ চা কি মুখে দেওয়া যাবে?'

'চেষ্টা করতে দোষ কি। লেট আস ট্রাই।'

ওসমান সাহেব আবার শব্দ করে হাসলেন। তাঁর মেজাজ সম্ভবত ভালো হতে শুরু করেছে। দিলুও হাসল। এখন বেশ পিকনিক-পিকনিক লাগছে।

২

নিশাত একটা কাঠের বেঞ্চিতে লাল চাদর গায়ে দিয়ে বসে ছিল। রোদ পড়েছে তার মুখে। শীতের বাতাসে তার কপালে ছোট ছোট কিছু চুল নাচছে। সে বসে আছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে। তার ফর্সা গালে লাল চাদরের আভা পড়েছে। দিলু ফিসফিস করে বলল, 'আপা কত সুন্দর, দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখলাম।'

'আপাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাই?'

'ডাক। ডাকলেই হয়।'

দিলু ডাকল, 'আপা, এই আপা।' নিশাত ওদের দু' জনকে দেখল। কিছু বলল না। মুখ ঘুরিয়ে নিল। মুখ ঘুরিয়ে নেবার ভঙ্গিটি--রাগী ভঙ্গি। সে এমন রেগে আছে কেন?

'আপা, আমাদের সঙ্গে যাবে? আমরা স্টেশনের বাইরে হাঁটতে যাচ্ছি।'

'না। বাবু কোথায়?'

'বাবু মা'র সঙ্গে। ওদেরই খুঁজতে যাচ্ছি। তুমিও চল।'

'না, আমি যাব না।'

'চল না আপা।'

এক কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। তোরা যা।'

দিলু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আপা মাঝে মাঝে এমন কড়া করে কথা বলে। এত সুন্দর একটি মেয়ে এরকম কঠিন করে কথা বলবে কেন? দিলু হাঁটতে শুরু করল।

'জামিল ভাই, এগুলো কী গাছ?'

'জানি না কী গাছ।'

'কৃষ্ণচূড়া নাকি?'

'না, কৃষ্ণচূড়া না। কৃষ্ণচূড়ার পাতা তেঁতুল গাছের পাতার মতো। এগুলি খুব সম্ভব জারুল। কচুরিপানার মতো ফুল হয় এদের। নীল রঙের। খুব সুন্দর।'

'এই স্টেশনের নামটা কত সুন্দর দেখেছেন?'

'নামটার একটা গল্প আছে, জানিস?'

'কী গল্প?'

'এখানে এক রাজা ছিলেন। রাজার একটিমাত্র মেয়ে। মেয়ের নাম সোহাগী। রাজ্যে পানির খুব কষ্ট। রাজা ঠিক করলেন এমন এক পুকুর কাটাবেন যে, রাজ্যে পানির কষ্ট থাকবে না। তিনি সত্যি প্রকাণ্ড এক পুকুর কাটালেন। কিন্তু আশ্চর্য, এক ফোঁটা পানি নেই! সে-বৎসর খুব খরা। রাজ্যের লোক হাহাকার করছে। রাজা শুকনো মুখে পুকুর পাড়ে বসে আছেন, তখন শুনলেন কে যেন বলছে—রাজন, তোমার কন্যাকে পুকুরে নামিয়ে দাও, জল আসবে। রাজা সোহাগীকে নামিয়ে দিলেন এবং বললেন—কোনো ভয় নেই মা, জল আসতে শুরু করলেই তোমাকে টেনে তুলে ফেলব।

'মেয়ে পুকুরে নামামাত্রই চারদিক থেকে হু-হু করে জল আসতে লাগল। রাজা আর তাকে টেনে তুলতে পারলেন না। পুকুরটির নাম হল সোহাগী পুকুর। জায়গাটার নাম হল সোহাগী।'

'যান, এটা সত্যি না। বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।'

'বানাব কেন? সোহাগী পুকুর সত্যি সত্যি আছে। জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবি। আর তুই যদি ভরা পূর্ণিমার রাতে পুকুর পাড়ে বসে থাকিস, তাহলে সোহাগীর কান্নাও শুনবি। ঐ মেয়েটি ভরা পূর্ণিমায় কাঁদে।'

'কেন?'

'পূর্ণিমার রাতে সে পুকুরে নেমেছিল, তাই। প্রতি পূর্ণিমাতেই সে আসে।'

দিলু অন্য দিকে মুখ ফেরাল। তার চোখ ভিজে আসছে। তার খুব অল্পতেই কান্না পায়।

নিশাত দেখল—ওরা লোহার গেট পার হয়ে স্টেশনের ওপাশের কাঁচা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জামিল ভাই গল্প করছেন হাত নেড়ে নেড়ে। কি গল্প কে জানে। মুগ্ধ হয়ে শুনছে দিলু। দিলুকে আজ অন্য দিনের চেয়েও একটু বড়ো লাগছে। এত বড়ো মেয়ের স্কার্ট পরা ঠিক না। চোখে লাগে। মাকে বলতে হবে।

লোকজন বিশেষ নেই চারদিকে। শুধু এক জন বুড়ো খুব মন দিয়ে নিশাতকে দেখছে। এই প্রচণ্ড শীতেও তার গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি। নিশাত প্রথমে ভেবেছিল ভিক্ষা চায় বুঝি। কিন্তু না, এ ভিক্ষুক নয়। ভিক্ষুকদের এতটা কৌতূহল থাকে না। তারা সরাসরি ভিক্ষা চায়। না পেলে চলে যায় অন্য কোথাও।

নিশাতের নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে। দু'টি প্যারাসিটামল খেয়ে নেওয়া দরকার। নিশাত উঠে দাঁড়াল। বুড়োটি বলল, 'কই যাইবেন গো মা?' আশ্চর্য, কত সহজেই মা ডাকল! প্রশ্ন করাতেও কোনো সঙ্কোচ নেই। যেন কত দিনের চেনা।

'আমরা যাব নীলগঞ্জ।'

'ডাকবাংলায়?'

'জ্বি।'

নিশাত চলতে শুরু করল। তার পিছনে পিছনে গেঞ্জি গায়ে বুড়োটি আসছে। আরো কিছু জানতে চায় হয়তো। গ্রামের মানুষদের খুব কৌতূহল। ওরা প্রশ্ন করতে ভালোবাসে।

জামিল একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল। দিলু বলল, 'এখানে চা খাবেন? যা ময়লা!' জামিল বলল, 'গ্রামে ঝকঝকে তকতকে রেস্টুরেন্ট কোথায়? এটা মন্দ কি?'

বার-তের বছরের একটা ছেলে চা বানাচ্ছিল। তার সামনে কাঠের একটা লম্বা বেঞ্চে রোদে পিঠ মেলে দু' জন লোক বসে চা খাচ্ছে। তাদের এক জন বলল, 'আপনেরা যাইবেন কোনখানে?'

'নীলগঞ্জ।'

'ওরে ব্যাস, মেলা দূর! যাইবেন ক্যামনে?'

'জীপ আসার কথা।'

'রাস্তা তো ঠিক নাই। জীপগাড়ি আওনের পথ নাই।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। এইজন কি আপনের মাইয়া?'

'না, আমার বোন।'

দিলু দেখল, দু'টি লোকই গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকে দেখছে। তার বড়ো

অস্বস্তি লাগতে লাগল। জামিল ভাই এই বেঞ্চে বসেই চা খাবেন নাকি? লোক দু'টির কৌতূহলের সীমা নেই। এক জন বলল, 'সাব আপনের নাম?'

'আমার নাম জামিল।'

'আপনে করেন কী?'

'মাস্টারি করি ভাই। দেখি, একটু বসার জায়গা দেন।'

দিলু অবাক হয়ে দেখল, ওরা সবাই বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে মাটিতে বসল। আগের মতোই তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। এতটুকু সঙ্কোচ নেই। জামিল বলল, 'দেখি, দু'কাপ চা দাও তো। দিলু খাবি তো?'

'খাব।'

লোক দু' জনের এক জন বলল, 'বজলু, সাবরে আর মাইয়াডারে কুকি বিসকুট দে। খালিপেডে চা খাওন ঠিক না।' ছেলেটি দু'টি লম্বা বিসকিট হাতে করে এগিয়ে দিল। দিলু নিল না, কিন্তু জামিল নিল এবং চায়ে ভিজিয়ে বাচ্চাদের মতো খেতে লাগল। কী যে সব কাণ্ড জামিল ভাইয়ের! দেখতে বড়ো মজা লাগে।

৩

রেহানা বাবুকে নিয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সাব্বির। সাব্বির তাঁর দূরসম্পর্কের ভাগ্নে। সাব্বিরের এখানে আসার কথা ছিল না। হঠাৎ করেই এসেছে। এই হঠাৎ করে আসার অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা রেহানা তা বুঝতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু সাব্বির ছেলেটি হয় খুব চাপা, কিংবা অতিরিক্ত চালাক। তার হাবভাবে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

রেহানার ধারণা ছিল, ট্রেনে সাব্বির নিশাতের আশেপাশে বসতে চেষ্টা করবে, এবং গল্পটল্প করবে। সে তেমন কিছু করে নি। বসেছে কোণার দিকে। কিছুক্ষণ অত্যন্ত মন দিয়ে একটা কমিক পড়েছে। ত্রিশ–বত্রিশ বৎসর বয়সের এক জন মানুষ মুগ্ধ হয়ে কমিক পড়ছে, ব্যাপারটা তাঁর ভালো লাগে নি। কমিক শেষ হওয়ামাত্র সে জানালায় হেলান দিয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করেছে কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশাতের দিকে তার কোনো রকম আগ্রহ বোঝা যায় নি। তবে এও হতে পারে যে, সে চেষ্টা করে তার আগ্রহ গোপন রাখছে। নিশাতকে ভালো রকম জানতে চায়।

আজ ভোরে তিনি দেখলেন, সাব্বির ক্যামেরা হাতে একা–একা যাচ্ছে। বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেও এগোলেন। অল্প কিছু কথাবার্তা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'দেশে কতদিন থাকবে?'

'বেশি দিন না। ক্রিসম্যাসের ছুটির পর যাব। জানুয়ারির তিন–চার তারিখের মধ্যে পৌঁছতে হবে।'

'তাহলে তো খুব অল্প দিন।'

রেহানা ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, 'বিয়ে করে বৌ নিয়ে ফিরবে নাকি? অনেকে তো তাই করে।'

'এখনো কিছু ঠিক করি নি। আমার মা অবশ্যি মেয়েটেয়ে দেখছেন। বিয়ে করতেও পারি।'

রেহানা কিছু বললেন না। দেখলেন, সাব্বির ক্রমাগত ছবি তুলছে। গাছের ছবি। নদীর ছবি। নৌকার ছবি। কুয়াশায় সব ঝাপসা দেখাচ্ছে। ভালো ছবি আসার কথা নয়, তবু ছবি তুলছে। রেহানা একটা ব্যাপার লক্ষ করলেন—এই ছেলেটি অত যে ছবি তুলছে, এক বারও বলে নি—আসুন মামী, আপনার একটা ছবি তুলে দিই। এই বয়সে ছবি তোলার তাঁর কোনো শখ নেই, তবু এটা সাধারণ ভদ্রতা। সাব্বির বলল, 'আপনার নাতি খুব শান্ত। খুব চুপচাপ।'

'খুব শান্ত না। বিরক্ত করে। নতুন জায়গা দেখে চুপ করে আছে। অপরিচিত মানুষের সামনে সে ভেজা বেড়াল।'

'ওর বয়স কত?'

'পাঁচ বছরে পড়ল।'

রেহানা আশা করেছিলেন, সাব্বির এবার বাবু সম্পর্কে কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একটা বকের ছবি ফোকাসে আনতে চেষ্টা করল। টেলিস্কোপিক লেন্স থাকা সত্ত্বেও বকের ছবিটি স্পষ্ট হচ্ছে না। বেশ কুয়াশা। মোটামুটি স্পষ্ট হলে ছবিটি ভালো হত। বকের ধ্যানী ছবিটি হালকা সবুজের ব্যাকগ্রাউণ্ডে ভালো আসছে। রোদ আরেকটু চড়ে গেলে ছবি ভালো হবে না।

'সাব্বির, চল যাই। তোমার মামা বোধহয় রেগে যাচ্ছেন।'

'চলুন।'

বাবুকে কোলে নিয়ে হাঁটতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। এক বার বললেন, 'বাবু, আমার হাত ধরে হেঁটে হেঁটে চল।' বাবু শক্ত করে তাঁর গলা চেপে ধরল। তার মানে সে কিছুতেই নামবে না। রেহানা আশা করছিলেন সাব্বির বলবে—আমার কোলে দিন। আমি নিয়ে যাব। কিন্তু সাব্বির সেসব কিছুই বলল না। লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। মেয়েদের সঙ্গে এত দ্রুত হাঁটা যায় না—এই সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানও কি ওর নেই? রেহানা মনে-মনে বেশ বিরক্ত হলেন।

স্টেশনের কাছে এসে তিনি দিলু এবং জামিলকে দেখলেন। নোংরা একটি বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। তাদেরকে ঘিরে চার-পাঁচ জন গ্রামের মানুষ বসে আছে মাটিতে। দিলু স্কার্ট পরে থাকায় তার ফর্সা পা অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটি তাঁর ভালো লাগল না। গ্রামের মানুষগুলো বোধহয় বসে আছে ফর্সা পা দেখার জন্য। তিনি এক বার ভাবলেন দিলুকে ডাকবেন। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। দিলুর জামাকাপড় কী কী এনেছেন তিনি ভাবতে চেষ্টা

করলেন। মনে পড়ল না। জামাকাপড় সব গুছিয়েছে নিশাত, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

দিলু তাদের দেখেই ডাকল, 'মা, কোথায় ছিলে তোমরা?' তারপর ছুটে এল তাদের দিকে।

'আমরা ভাবলাম তোমরা বোধহয় হারিয়েই গেছ।'

'হারিয়ে যাব কেন? নে, বাবুকে কোলে নে।'

দিলু বাবুকে কোলে নিয়েই বলল, 'সাব্বির ভাই, আমাদের একটা ছবি তুলে দিন তো। এই বাবু, ওনার দিকে তাকিয়ে হাস তো লক্ষ্মী ছেলের মতো।' সাব্বির ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে লাগল। এবং ছবি তুলল বেশ কয়েকটি। রেহানার মনে হল, এই একটি ব্যাপারে ছেলেটির আগ্রহ আছে। ছবি তোলায় তার কোনো ক্লান্তি নেই।

ওসমান সাহেব ভেবে রেখেছিলেন রেহানার উপর খুব রাগ করবেন। সেটা সম্ভব হল না। সাব্বির রয়েছে। তার সামনে কোনো সিন ক্রিয়েট করার প্রশ্নই ওঠে না। তবুও বিরক্ত স্বরে বললেন, 'তোমরা ছিলে কোথায়?'

'কাছেই। তোমার জীপ তো এখনো আসে নি। এত তাড়া কিসের?'

'জীপ আসবে না। নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। গরুর গাড়ি নিয়ে এসেছে।'

'গরুর গাড়ি!'

'দু'টা গরুর গাড়ি, একটা মহিষের গাড়ি। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হবে।'

রেহানা অবাক হয়ে বললেন, 'তিনটা গাড়ি কেন?'

'পাগল–ছাগলের কাণ্ড! যতগুলি পেয়েছে, নিয়ে এসেছে।'

'তোমার পুলিশের লোকজন কেউ আসে নি?'

'না।'

ওসমান সাহেবের মনে হল রেহানা মুখ টিপে হাসছে। কেউ নিতে আসে নি, ব্যাপারটা দুঃখজনক। এ নিয়ে হাসবে কেন? রেহানা বললেন, 'তোমার খবর বোধহয় পায় নি। পেলে আসত।'

'ওয়্যারলেস ম্যাসেজ দিয়েছি। পাবে না মানে?'

'তোমাদের নীলগঞ্জ থানায় হয়তো ওয়্যারলেস নেই।'

'প্রতিটি থানায় ওয়্যারলেস সেট আছে, কী বলছ এসব!'

দিলু বলল, 'বাবা, আমি কিন্তু মহিষের গাড়িতে করে যাব।'

ওসমান সাহেব একটা ধমক দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বের হয়েছেন, ছুটির সময়টায় কোনো রাগারাগি করবেন না।

কিন্তু মেজাজ ঠিক রাখা যাচ্ছে না। কেন কেউ নিতে আসবে না? থানাওয়ালাদের এত বড়ো স্পর্ধা থাকা ঠিক নয়।

৪

গাড়িতে গুছিয়ে বসতে বসতে ন'টা বেজে গেল। প্রথমে কথা হয়েছিল, একটিতে যাবে শুধু মালপত্র। অন্য দু'টির একটিতে জামিল ও সাব্বির এবং আরেকটিতে দিলুরা। কিন্তু নিশাত বলল, 'আমি মা, বাবুকে নিয়ে একটি গাড়িতে একা যেতে চাই।'

'কেন?'

'কোনো কেন–টেন নেই। এম্নি যেতে চাই।'

'সব সময় তুই একটা ঝামেলা করতে চেষ্টা করিস।'

'ঝামেলা করতে চেষ্টা করি না। কমাতে চেষ্টা করি। আমি মা একা যেতে চাই।'

নিশাত শেষ পর্যন্ত অবশ্যি একা–একা গাড়িতে ওঠে নি। রেহানা উঠেছেন তার সঙ্গে। প্রথম গাড়িটিতে বাবা, দিলু ও বাবু। মহিষের গাড়িটিতে জামিল ও সাব্বির।

গাড়ি চলা শুরু করামাত্রই সাব্বির মাথার নিচে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। জামিল বলল, 'কি, ঘুমাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। রাতে ভালো ঘুম হয় নি।'

'এই ঝাঁকুনিতে ঘুম হবে?'

'হবে। আমার অভ্যেস আছে।'

'ঘুমাবার আগে একটা সিগারেট খাবেন?'

'জ্বি না, আমি সিগারেট খাই না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাব্বির ঘুমিয়ে পড়ল। জামিল একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা বোধ করল। এত সহজে কেউ অমন ঘুমিয়ে পড়তে পারে! একা বসে থাকা ক্লান্তিকর ব্যাপার। নেমে গিয়ে প্রথম গাড়িটিতে ওঠা যেতে পারে। সেখানে সিগারেট খাওয়া যাবে না, এই একটা ঝামেলা। তাছাড়া সঙ্গী হিসেবে ওসমান সাহেব বেশ বোরিং হবেন বলেই তার ধারণা। লোকটির রসবোধ নেই। অফিসের বাইরে যে আরো কিছু থাকতে পারে, তা খুব সম্ভব তিনি জানেন না।

এক পর্যায়ে জামিলের মনে হল, এখানে আসা কি সত্যি দরকার ছিল? মানুষ বেড়াতে যায় ফুর্তি করবার জন্যে। এখানেও কি সে–রকম কিছু হবে? সম্ভাবনা খুব কম। জামিল গাড়োয়ানের পাশে এসে বসল। রাস্তায় ধুলো উড়ছে। গরুর গাড়ি খুব ধীরে চলে বলে যে ধারণা আছে, সেটা ঠিক নয়। বেশ দ্রুতই চলছে। গান শুনতে শুনতে যেতে পারলে হত। কিন্তু ক্যাসেট প্লেয়ারটি নিশাতদের সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবে নাকি?

নিশাতের নাক ভার হয়ে আছে। মাথায় একটা ভোঁতা যন্ত্রণা। সে বলল, 'মা,

তোমার কাছে প্যারাসিটামল আছে?'

'আছে। তোর জ্বর নাকি?'

'না, সর্দি। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।'

রেহানা তার গায়ে হাত দিলেন, 'গা তো বেশ গরম। শুয়ে থাক।'

'শুয়ে থাকতে হবে না। তুমি দু'টি ট্যাবলেট দাও।'

'পানি তো নেই। পানির বোতল পেছনের গাড়িতে।'

'পানি লাগবে না। তুমি দাও।'

রেহানা দু'টি ট্যাবলেট দিলেন। নিশাত একটুও মুখ বিকৃত করল না। ট্যাবলেট দু'টি গিলে ফেলল।

'শুয়ে থাক।'

'আমার শুয়ে থাকার যখন প্রয়োজন হবে, আমি শুয়ে থাকব। তোমার বলতে হবে না।'

'তুই এত রেগে আছিস কেন?'

নিশাত মায়ের চোখে চোখ রেখে শীতল গলায় বলল, 'সাব্বির সাহেব আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে কেন? ঠিক করে বল তো মা।'

'বেড়াতে যাচ্ছে, আবার কেন? ও বাংলাদেশের অনেক ছবি তুলে নিতে চায়। আমরা গ্রামের দিকে যাচ্ছি শুনে সেও আগ্রহ করে যেতে চাইল।'

'না, সে কোনো আগ্রহ দেখায় নি। তুমি ঝোলাঝুলি করছিলে।'

'যদি করেই থাকি, তাতে অসুবিধা কি? আমাদের আত্মীয়, এত দিন পর দেশে এসেছে। ঘুরে-ফিরে দেখতে চায়।'

'আসল ব্যাপার কিন্তু তা নয় মা।'

'আসল ব্যাপারটা কী শুনি?'

'তুমি চাচ্ছ ঐ ছেলেটি যাতে আমাকে পছন্দ করে ফেলে, এবং পুরনো দুঃখ-কষ্ট ভুলে আমি তাকে বিয়ে করে ফেলি।'

'যদি চেয়েই থাকি, সেটা কি খুব অন্যায়?'

'হ্যাঁ, অন্যায়। তুমি যা ভাবছ সেটা ঠিক নয়।'

'আমি কী ভাবছি?'

'তুমি ভাবছ, আমার স্বামী নেই। একটা বাচ্চা আছে, কাজেই আমার একটি অবলম্বন দরকার। এটা মা ঠিক না। আমি তোমাদের বিরক্ত করব না, আমি নিজের দায়িত্ব নিজে নেব। অনেক বার তো তোমাদের বলেছি!'

নিশাত দেখল, জামিল এগিয়ে আসছে। সে চুপ করে গেল।

'ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোমাদের কাছে?'

'জ্বি-না, দিলুর কাছে।'

জামিল এগিয়ে গেল। সামনের গাড়িটি অনেক দূর চলে গেছে। নিশাত দেখল, জামিল দৌড়াতে শুরু করেছে। এই দৃশ্যটি তার কেন জানি ভালো লাগল। রেহানা বললেন, 'জামিলকে বলে দে, পানির বোতলটা দিয়ে যাক।'

'কেন?'

'অষুধ খেয়ে তোর মুখ তেতো হয়ে আছে না?'

'মা, আমার জন্যে তোমাকে এত ভাবতে হবে না।'

দিলু ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছিল। ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, তিনি দিলুর কথা বেশ মন দিয়ে শুনছেন এবং তাঁর ভালোই লাগছে।

'সোহাগী নাম কেমন করে হয়েছে শুনবে বাবা?'

'বল শুনি।'

'আমার দিকে তাকাও, বলছি। অন্য দিকে তাকিয়ে আছ কেন?'

ওসমান সাহেব মেয়ের দিকে তাকালেন। দিলু হাত নেড়ে নেড়ে গল্পটা বলল। ওসমান সাহেব বললেন, 'এই জাতীয় মিথ প্রায় সব পুকুর সম্পর্কেই থাকে। এটা ঠিক নয়। একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় মাটি কাটলেই পানি আসবে। শীতের সময় যদি নাও আসে, বর্ষার সময় বৃষ্টির পানিতে ভরে যাবে।' দিলুর মন খারাপ হল। গল্পটা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ওসমান সাহেব বললেন, 'রাজার মেয়ের নাম সোহাগী—এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'বিশ্বাসযোগ্য নয় কেন?'

'রাজাদের মেয়ের এমন সাধারণ নাম থাকে না। এদের গালভরা নাম থাকে। ফুলকুমারী, রূপকুমারী, নূরজাহান, নূরমহল।'

দিলুর বেশ মন খারাপ হল। সে মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাল এবং অবাক হয়ে দেখল জামিল ভাই আসছেন।

'ক্যাসেট প্লেয়ারটা তোর কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা নিতে এসেছি।'

জামিল গরুর গাড়ির পেছনে পা ঝুলিয়ে বসল।

'দিলু, ভালো দেখে কয়েকটা ক্যাসেট দে।'

'রবীন্দ্র সঙ্গীত?'

'না, হিন্দি-ফিন্দি।'

দিলু ক্যাসেট বাছতে বাছতে বলল, 'বাবা কিন্তু সোহাগী পুকুরের গল্পটা বিশ্বাস করেন নি। বাবা বলছেন, মাটি কিছু দূর খুঁড়লেই পানি আসবে।'

'এটা ঠিক নয়। ঢাকা আর্ট কলেজে একটা বিরাট পুকুর আছে। খুব গভীর। বর্ষাকালে পর্যন্ত সেখানে এক ফোঁটা পানি থাকে না।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ। এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় কেউ যদি সেই পুকুরে নামে, তাহলে খিলখিল হাসির শব্দ শোনে।'

ওসমান সাহেব পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, 'জামিল, সত্যি নাকি?'

'পুকুরে পানি নেই বর্ষাকালেও, এটা সত্যি, আমি নিজে দেখেছি। তবে হাসির কথাটা জানি না, ওটা বানানোও হতে পারে।'

দিলু বলল, 'আমাকে ঐ পুকুরটা দেখাবেন?'

'এক দিন গিয়ে দেখে এলেই হয়। তোদের বাসার কাছেই তো।'

জামিল ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে নেমে গেল। দিলু বলল, 'জামিল ভাই অনেক কিছু জানে।' ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না।

'জামিল ভাই আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিল, সেটা দারুণ মজার। তোমাকে জিজ্ঞেস করব?'

'কর।'

'আচ্ছা, মনে কর তোমার কাছে দশ সের পানি দেয়া হল। এখন তুমি কি পারবে এই দশ সের পানি একবারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে? বালতি-টালতি কিছু ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু হাত দিয়ে নেবে এবং একবারেনেবে।'

ওসমান সাহেব ভ্রু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। দিলু মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, 'খুব সহজ বাবা। চেষ্টা করলেই পারবে। একটু হিনট্‌স্‌ দেব?'

'না, হিনট্‌স্‌ দিতে হবে না।'

ওসমান সাহেব সত্যিই গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

জামিল নিজের গাড়িতে ফিরে এসে দেখে সাব্বির উঠে বসেছে। ক্যামেরা নিয়ে কি সব যেন করছে।

'কি, ঘুম হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'কি করছেন?'

'একটা ব্লু ফিল্টার লাগাচ্ছি।'

'ব্লু ফিল্টার দিয়ে কী হয়?'

'দিনের বেলা ছবি তুললে মনে হয় জ্যোৎস্না রাত্রিতে ছবি তোলা হয়েছে।'

'আপনি নিজে তো এক জন ইন্‌জিনিয়ার?'

'জ্বি।'

'আপনাকে দেখে মনে হয় ছবি তোলাই আপনার একমাত্র কাজ।'

'এটা আমার একটা হবি।'

'খুব বড়ো ধরনের হবি মনে হচ্ছে?'

সাব্বির শান্ত স্বরে বলল, 'আমি কিন্তু খুব নামকরা ফটোগ্রাফার। আমার নিজের তোলা ছবি নিয়ে আমেরিকান এক পাবলিশার একটি বই বের করেছে, নাম হচ্ছে--অন দি টপ অব দি ওয়ার্লড।'

'আপনার কাছে কপি আছে?'

'আছে, দিচ্ছি।'

সাব্বির আহমেদ তিন শ' পৃষ্ঠার একটি বই বের করল তার স্যুটকেস থেকে। জামিলের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

'এই বইটির কথা কি দিলুরা জানে?'

'না। নিজের কথা বলতে ভালো লাগে না।'

সাব্বির ছবি তুলতে শুরু করল। ক্যামেরার শাটার পড়ছে। কোনো কিছু যে সে দেখছে মন দিয়ে, তা মনে হচ্ছে না।

একটি গ্রাম্য বধূ লম্বা ঘোমটা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শাটার পড়তে লাগল খটাখট।

ছাগলের গলার দড়ি ধরে একটি আট-ন' বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে। খটাখট শাটার পড়তে শুরু করল। জামিল বলল, 'এই ছবিটা আপনার ভালো হবে না। জোছনা রাতে কেউ ছাগল চরাতে বের হয় না। আপনি বরং ব্লু ফিল্টার বদলে নিন।'

সাব্বির হালকা গলায় বলল, 'উল্টোটাও হতে পারে। ছবি দেখে মনে হতে পারে রাতের রহস্যময়তায় মুগ্ধ হয়ে একটি শিশু তার পোষা প্রাণীটি নিয়ে বের হয়েছে। দু' জনের চোখেই বিস্ময় ও ভয়, তাদের ঘিরে আছে জোছনা।'

'আপনি কি ফটোগ্রাফার, না কবি?'

'আমি এক জন ইন্‌জিনিয়ার।'

জামিল বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'আপনার এই বইটিতে তো মানুষের কোনো ছবি নেই। শুধুই জড়বস্তুর ছবি। মানুষের ছবি বেশি তোলেন না?'

'আমার অন্য একটি বইতে মানুষের ছবি আছে। সবই অবশ্যি "নুড" ছবি।'

'বইটি আছে?'

'আছে।'

'আমেরিকায় আপনি কত দিন ধরে আছেন?'

'প্রায় এগারো বছর।'

'দেশে ফিরবেন না?'

'না।'

'কেন?'

'থাকবার জন্যে ঐ জায়গাটি ভালো। বিশাল দেশ, ঘুরে বেড়ানোর চমৎকার সুযোগ। এরকম পাওয়া যায় না। তা ছাড়া—।'

'তা ছাড়া কি?'

সাব্বির কথা শেষ করল না। মাঠের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'এগুলি সর্ষেফুল না? হলুদ রঙের কী চমৎকার ভেরিয়েশন!'

৫

তারা নীলগঞ্জে ডাকবাংলোয় এসে পৌঁছল বিকেল চারটায়। তখন আলো নরম হয়ে এসেছে। শীতের উত্তরী হাওয়া বইছে।

ডাকবাংলোটি চমৎকার। ফিসারিজের বাংলো। হাফ বিল্ডিং। উপরের ছাদ টালির, মন্দিরের গম্বুজের মতো উঁচু হয়ে গেছে। বাড়ি যত বড়ো, তার চেয়েও বড়ো তার বারান্দা। সেখানে কালো একটি গোলটেবিলের চারপাশে গোটা পাঁচেক ইজিচেয়ার। দেখলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। বাড়িটির চারপাশে রেন্টি (রেইনন্ট্রি) গাছ। বিকেল বেলাতেই বাড়িটিকে অন্ধকার করে ফেলেছে। পেছনে বেশ বড়োসড়ো একটা পুকুর। কাকের চোখের মতো কালো জল।

রেহানা অবাক হয়ে বললেন, 'এই জঙ্গলে এত চমৎকার বাড়ি গভর্নমেন্ট কেন বানিয়েছে!' ওসমান সাহেব নিজেও হকচকিয়ে গেছেন। এদিকে তাঁর প্রথম আসা। খোঁজ-খবর এসেছে জামিলের কাছ থেকে।

'জামিল, এই ডাকবাংলো তৈরী হয় কবে?'

'এটা সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার শিকার বাড়ি। পরে সরকার নিয়ে নেয়। এখন ফিসারিজ ডিপার্টমেন্টের হাতে দেয়া হয়েছে। আগে আরো সুন্দর ছিল।'

'এরচে সুন্দর আর কী হবে?'

'একটা কাঁচঘর ছিল। গোটা ঘরটাই কাঁচের তৈরী। লোকজন কাঁচটাচ সব নিয়ে গেছে। অনেক ঝাড়লণ্ঠন ছিল। বড়ো বড়ো অফিসার একেক জন এসেছেন, একেকটা করে নিয়ে গেছেন। পেছনের পুকুরের ঘাটে মার্বেল পাথরের একটি দেবশিশু ছিল, ঢাকা মিউজিয়াম নিয়ে গেছে।'

'তুমি এত কিছু জান কীভাবে?'

'আমি তো এখানে প্রায়ই আসি।'

দিলু বলল, 'বাবা, আমি একা একটা ঘরে থাকব।' ওসমান সাহেব উত্তর দিলেন না। জামিল বলল, 'তা পারবি না দিলু—সব পুরনো ডাকবাংলোয় ভূত থাকে।'

'আপনাকে বলেছে!'

'সন্ধ্যা হলেই টের পাবি। সন্ধ্যা নামুক—তখন দেখা যাবে।'

বাবুর্চি আছে দু' জন। তারা রান্নাবান্না সেরে ফেলেছে। খাবার ঘরে খাবার দিতে শুরু করেছে। খাবার ঘরটা তুলনামূলকভাবে অন্ধকার। একটা হ্যাজাক বাতি জ্বালানো হয়েছে। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেছে, শুধু নিশাত নেই। রেহানা খোঁজ নিতে গেলেন। নিশাত শুয়ে ছিল। সে ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি কিছু খাব না।'

'কেন খাবি না?'

'খেতে ইচ্ছে করছে না, তাই খাব না।'

'সারা দিন তো কিছুই মুখে তুলিস নি। কিছু মুখে দে।'

'আমি গোসল না করে কিছু মুখে দেব না। আমার গা ঘিনঘিন করছে।'

'জ্বর গায়ে গোসল করবি কী!'

'প্লীজ মা, আমার ব্যাপারে নাক গলিও না। বাবুকে খাওয়াও। তোমরা খাওয়াদাওয়া কর।'

রেহানা মুখ কালো করে বের হয়ে এলেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল করল নিশাত। ঠাণ্ডা পানি। গায়ে জ্বর থাকার জন্যে পানি বরফ-শীতল মনে হচ্ছে। তবু ভালো লাগছে। ঝকঝকে বাথরুম। পেতলের বালতিতে পরিষ্কার জল। মোড়ক-খোলা নতুন সাবান।

নিশাত যখন বেরিয়ে এল, তখন সত্যি সত্যি অন্ধকার নেমে এসেছে।

নিশাত একটি ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিল। উঁকি দিল মায়ের ঘরে। বাবু অবেলায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। আজ সারা দিন বাবুর সঙ্গে তার কোনো কথাবার্তা হয় নি। বাবু কি ক্রমেই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? রাতে সে এখন তার সঙ্গে ঘুমায় না। ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে—দাদীর কাছে যাব। রেহানাকে সে দাদী বলে। কেন বলে কে জানে!

নিশাত বলল, 'ও কি কিছু খেয়েছে?'

'ভাত মুখে দেয় নি। দুধ খেয়েছে।'

নিশাত নিচু হয়ে ছেলের কপালে চুমু খেল। রেহানা বললেন, 'কিছু খাবি মা?'

'না। চা খাব এক কাপ।'

'বস তুই এখানে। আমি চায়ের কথা বলে আসি। মশারি খাটানর কথাও বলতে হবে। খুব মশা এদিকে।'

দরজায় কার যেন ছায়া পড়েছে। নিশাত মুখ তুলে দেখল, জামিল ভাই।

'নিশাত, তোমার নাকি জ্বর?'

'ব্যস্ত হবার মতো কিছু না।'

'ব্যস্ত হই নি নিশাত, খোঁজ নিচ্ছি। খোঁজ নেওয়াটা অপরাধ নয় নিশ্চয়ই।'

'আমি ভালো আছি।'

জামিল ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। চলে যেতে চাইল। নিশাত বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে জামিল ভাই।'

'বল।'

'আপনি বারান্দায় বসুন, আমি আসছি।'

'ঝগড়া করবে মনে হচ্ছে?'

নিশাত জবাব দিল না। বাবুর গালে একটা মশা বসেছিল। হাত দিয়ে সেটিকে উড়িয়ে দিল। ছেলেটিকে বড়ো রোগা-রোগা লাগছে। এই ক'দিন ওর দিকে একটুও নজর দেওয়া হয় নি। নিশাতের মনে হল সে ক্রমেই দূরে

সরে যাচ্ছে। বাবু এখন আর মা'র জন্যে খুব ব্যস্ত নয়। শিশুরা অবহেলা খুব সহজেই টের পায়। নিশাত বাবুর চুলে হাত রাখল। পাতলা লালচে ধরনের চুল। বাবার মতো। কবিরের চুলও এরকম ছিল। তবে বাবুর মতো পাতলা ছিল না। কবিরের চেহারার সঙ্গে বাবুর খুব বেশি মিল নেই। কবিরের নাক ছিল খাড়া, বাবুর তা নয়। সে হয়েছে মা'র মতো। নিশাত নিচু হয়ে বাবুর ঠোঁটে চুমু খেল। কেমন দুধ-দুধ গন্ধ। নিশাত আবার নিচু হল। বাবু ঘুমের মধ্যেই তাকে হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল।

বারান্দা অন্ধকার। এখানে কোনো বাতি দিয়ে যায় নি। জামিল বসে ছিল একা। নিশাত এসে ঢুকতেই সে সোজা হয়ে বসল—হালকা গলায় বলল, 'ভেতরে বসলেই হত, এখানে বড়ো হাওয়া।'

'থাকুক হাওয়া। বারান্দাই ভালো।'

'আলো দিতে বলব?'

'না।'

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। সহজভাবে বলল, 'বল কি বলবে।'

'আপনি আমাদের এই বাংলোয় কেন নিয়ে এসেছেন?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি কী মিন করছ।'

'আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন। এখন ভান করছেন বুঝতে পারছেন না।'

'দেখ নিশাত, আমি ভান করি না। ঐ একটা জিনিস আমি কখনো করি না।'

'তাহলে বলুন, এত ডাকবাংলো থাকতে আপনি এখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন কেন?'

'নিশাত, কবির এবং আমি অনেক রাত এই ডাকবাংলোয় কাটিয়েছি। এই ডাকবাংলোর উপর ওর একটা দুর্বলতা ছিল। আমি জানি, বিয়ের পরও অনেক বার তোমাকে নিয়ে এখানে আসতে চেয়েছে। আসা হয়ে ওঠে নি। আমি তাই ভেবেছিলাম, এখানে এলে তোমার ভালোই লাগবে।'

'আমি ওর সঙ্গেই এখানে আসতে চেয়েছিলাম, আর কারো সঙ্গে নয়।'

'ভেবে নাও, ও তোমার সঙ্গেই আছে।'

'সব কিছু কি ভেবে নেওয়া যায়? জীবন এত সহজ মনে করেন?'

'জীবন সহজও নয়, জটিলও নয়। জীবন জীবনের মতো। আমরাই একে জটিল করি—সহজ করি। তুমি একে ক্রমেই জটিল করছ।'

নিশাত চুপ করে গেল। জামিল হালকা সুরে বলল, 'দুঃখ শুধু কি তোমার একার? আমাদের সবারই দুঃখ আছে।'

'আপনার আবার কিসের দুঃখ? দুঃখের আপনি কী জানেন?'

নিশাত উঠে দাঁড়াল। বাবু জেগে উঠে কাঁদছে। কে এক জন এসে বারান্দায় একটি হারিকেন রেখে গেল। হারিকেনের আলোয় সব কেমন অদ্ভুত

লাগছে।

'জামিল সাহেব, আপনি যেভাবে বসে আছেন, বসে থাকুন। একটা ছবি তুলব। নড়বেন না, শাটার স্পীড খুব কম।'

অনেকখানি সময় নিয়ে সাব্বির ছবি তুলল।

৬

পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেয়ার ধাঁধাটি ওসমান সাহেবের মাথায় ঘুরতে শুরু করেছে দুপুর থেকে। ওসমান সাহেব নিজের ওপরই বিরক্ত হচ্ছিলেন। ধাঁধার মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এই বয়সে কেউ এমন চিন্তিত হয়ে পড়ে না। কিন্তু তিনি হচ্ছেন। এটা কি বয়সজনিত স্থবিরতা? তিনি কেমন যেন চ্যালেঞ্জ বোধ করছেন। এর মধ্যে চ্যালেঞ্জ বোধ করার কী আছে? ধাঁধার উত্তর জানতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই।

তিনি পাইপ হাতে বারান্দায় এসে বসলেন। তাঁর গায়ে ভারি একটা ওভারকোট। গলায় মাফলার। তবু তাঁর শীত করতে লাগল। বয়স! বয়স বাড়ছে। এখন এক দিন একটা মাইল্ড স্ট্রোক হবে। তার লক্ষণও টের পাওয়া যাচ্ছে। ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। ঘুম কমে গেছে। খিদে কমে গেছে। চিন্তাও পরিষ্কার করতে পারছেন না। পারলে এই সহজ ধাঁধার জবাব বের করতে পারতেন। কিংবা কে জানে এটা হয়তো সহজ নয়। হয়তো বেশ জটিল।

বারান্দায় রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন। ওসমান সাহেব রেহানার ডান দিকের খালি চেয়ারটিতে বসলেন। রেহানা বললেন, 'নিশাতের বেশ জ্বর।'

'তাই নাকি?'

'এক শ' দুই–টুই হবে।'

'থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছ?'

'না।'

'তাহলে বুঝলে কীভাবে, এক শ' দুই?'

'অনুমান করে বলছি।'

'অনুমান করে আমাকে কিছু বলবে না।'

'তুমি এরকম করছ কেন?'

'কি রকম করছি?'

'এত মেজাজ দেখাচ্ছ কেন?'

'মেজাজ কোথায় দেখালাম?'

'থানার ওসি ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করলে কেন?'

'খারাপ ব্যবহার তো করি নি। আমি বিরক্ত হয়েছি। এই বিরক্তির ব্যাপারটি তাকে জানিয়েছি। সে জানে আজ ভোরে আমি আসব, কিন্তু সে স্টেশনে আসে নি। আমি ডাকবাংলোয় পৌছানর পর সে এসেছে। আমাকে সে কী ভেবেছে?'

'তুমি কোনো সরকারী ট্যুরে আস নি। তুমি ছুটি কাটাতে এসেছ। কেন সে আসবে?'

'সে আসবে। তার পুরো দলবল নিয়ে আসবে, কারণ আমি পুলিশের আই জি।'

রেহানা এক বার ভাবলেন বলবেন না। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন। এবং বললেন বেশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই, 'তুমি এখন আর আই জি নও। রিটায়ারমেন্ট নিয়েছ। রিটায়ারমেন্টের আগের পাওনা ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি পুলিশের আই জি, এটা এখন যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পার ততই ভালো।'

ওসমান সাহেবের পাইপ নিভে গেছে। নিভে যাওয়া পাইপ হাতে তিনি মূর্তির মতো দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। রেহানা শীতল স্বরে বললেন, 'এখন আর তোমাকে দেখামাত্র পুলিশের অফিসাররা ছুটোছুটি করবে না। এটা মানসিকভাবে একসেপ্ট করার চেষ্টা কর। তোমার জন্যেও ভালো, আমাদের সবার জন্যেও ভালো।' ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। দূরের রেন্টি গাছগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। রেহানার মনে হল এই কথাগুলো হয়তো না বললেও চলত। তিনি গলার স্বর স্বাভাবিক করতে করতে বললেন, 'চা খাবে?'

'না।'

'শীতের মধ্যে ভালো লাগবে।'

'আমাকে এক ঢোক হুইস্কি দিতে বল।'

'হুইস্কি এখানে কোথায় পাবে?'

'আছে, আলিম নিয়ে এসেছে। আলিমকে বল।'

আলিম ওসমান সাহেবের বাসায় গত বিশ বৎসর ধরে আছে। তার বয়স ওসমান সাহেবের চেয়েও বেশি, কিন্তু গৃহভৃত্যদের কোনো পেনসনের ব্যবস্থা নেই, কাজেই তাকে এক দিন আগেই রান্নার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নীলগঞ্জে আসতে হয়েছে। আজ প্রচণ্ড দাঁতব্যথা থাকা সত্ত্বেও সারাদিন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। রেহানা বললেন, 'আলিম শুয়ে আছে। ওর শরীর ভালো না। তা ছাড়া এখানে এসব করতে পারবে না।'

'কেন, এখানে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে। ঘরে তুমি যা কর, তাই বলে বাইরে এসেও করবে?'

'রেহানা, এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি। রিলাক্স করতে এসেছি।'

'তুমি একা আস নি। তোমার সঙ্গে বাইরের মানুষ আছে।'

'বাইরের মানুষ এখানে কেউ না। জামিল ঘরের ছেলে, সে আমার অভ্যাস

জানে, আর সাব্বির এগার বছর ধরে বাইরে আছে।'

'আমি তোমাকে এখানে মদ খেতে দেব না।'

রেহানা বাবুকে কোলে নিয়ে উঠে গেলেন। যাবার সময় হারিকেন হাতে করে তুলে নিয়ে গেলেন। ওসমান সাহেব অন্ধকার বারান্দায় একা-একা বসে রইলেন। এখানে মশা আছে। বন্য মশা। মানুষ কামড়িয়ে অভ্যেস নেই বোধহয়। কামড়াচ্ছে না, শুধু বিরক্ত করছে। ওসমান সাহেব আবার ধাঁধা নিয়ে ভাবতে বসলেন। পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে হবে। শুধু হাতে নিতে হবে এবং একবারে নিতে হবে। কোনো মানে হয়?'

'বাবা, তুমি অন্ধকারে বসে কী করছ?'

দিলু ঢুকল। ওসমান সাহেব মিষ্টি একটা গন্ধ পেলেন। দিলু পাউডার মেখেছে কিংবা গায়ে সেন্ট-টেন্ট দিয়েছে। গন্ধটা হালকা এবং চেনা। পরিচিত কোনো ফুলের গন্ধ। কি ফুল, ওসমান সাহেব সেটা মনে করতে পারলেন না। অনেক দিন সচেতনভাবে কোনো ফুলের গন্ধ নেওয়া হয় নি। দিলু তার পাশের চেয়ারে বসল এবং আবার বলল, 'অন্ধকারে একা-একা বসে কী করছ?'

'তোর সমস্যা নিয়ে ভাবছি।'

'আমার! আমার আবার কি সমস্যা?'

দিলু বেশ অবাক হল। ওসমান সাহেব নরম গলায় বললেন, 'ঐ যে পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেবার ব্যাপারটা।'

'ও আল্লা, তুমি এটা নিয়ে এখনো ভাবছ?'

'হ্যাঁ, ভাবছি।'

'বলে দেব?'

'না, বলিস না। নিজেই বের করব।'

'আরেকটা সহজ ধাঁধা ধরব? জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি। দারুণমজার।'

'না, আর না। যেটা দিয়েছিস, সেটাই আগে সল্‌ভ করি।'

দিলু হাসল খিলখিল করে।

'হাসছিস কেন?'

'বলা যাবে না।'

'যা, আলিমকে একটু আসতে বল।'

'আমি পারব না বাবা।'

'পারবি নে কেন?'

'কী অন্ধকার, দেখছ না? ভয়ভয় লাগে। বাবা।'

'কি?'

'একটা ভূতের গল্প শুনবে? সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি। ওনার নিজের লাইফের ঘটনা।'

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। পাইপ ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

খুব হাওয়া, দেশলাইয়ের কাঠি নিভে নিভে যাচ্ছে।

'বাবা, বলব?'

'বল।'

দিলু তার বাবার কাছে ঘেঁষে এল। একটা হাত রাখল বাবার হাতে। গলার স্বর নিচু করে গল্প শুরু করল।

'বুঝলে বাবা, তখন শ্রাবণ মাস। জামিল ভাই গিয়েছেন তার বন্ধুর বাড়ি। গ্রামের দোতলা বাড়ি। জামিল ভাইকে যে ঘরটায় থাকতে দেওয়া হয়েছে, তার জানালাগুলো খুব ছোট ছোট। বাবা শুনছ তো?'

'শুনছি।'

'তাহলে হুঁ বলবে একটু পরপর। না বললে মনে হবে গল্প শুনছ না।'

'ঠিক আছে, বলব। তারপর কী হল?'

'মাঝরাতে হঠাৎ খুব ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। ঘরে হারিকেন ছিল, হারিকেনটা গেল নিভে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যায় না।'

'তারপর?'

'তারপর হল কি শোন। কে যেন দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। জামিল ভাই বললেন—কে? এক জন মেয়েমানুষের গলা শোনা গেল—দয়া করে দরজা খুলুন।'

'তারপর কী হল?'

'জামিল ভাই দরজা খুলতেই ঘরে একটা মেয়ে ঢুকল—সতেরো-আঠারো বছর বয়স। বাইরে এত ঝড়-বৃষ্টি, কিন্তু মেয়েটি খটখটে শুকনো।

ওসমান সাহেব বললেন, 'ঘুটঘুটে অন্ধকারে জামিল কী করে দেখল, মেয়েটি শুকনো এবং বুঝলই বা কী করে ওর বয়স সতেরো-আঠারো?'

দিলু থমকে গেল। এটা সে ভাবে নি। ওসমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'গল্পটার মধ্যে একটা ফাঁকি আছে, তাই না দিলু?' দিলু জবাব দিল না। তার একটু মন খারাপ হয়ে গেল। ওসমান সাহেব বললেন, 'গল্পটা শেষ কর।'

'না, থাক।'

'থাকবে কেন? বাকিটা শুনি।'

'তোমাকে শুনতে হবে না।'

দিলুর গলার স্বর ভারি। যেন সে এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। সে উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'জামিল ভাইকে কথাটা জিজ্ঞেস করে আসি।'

'পরে জিজ্ঞেস করলেও হবে।'

'না, আমি এখন জিজ্ঞেস করব। কেন সে আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবে?'

'গল্প তো গল্প। গল্প কখনো সত্যি হয়?'

'জামিল ভাই বলেছিল, এটা সত্যি গল্প।'

দিলু প্রথমে গেল খাবার ঘরে। সেখানে এক জন অপরিচিত রোগা লোক হ্যাজাক লাইট ঠিক করতে চেষ্টা করছে। এক-এক বার দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে, লোকটি—"খাইছে রে" বলে এক লাফে পেছনে সরে। ব্যাপারটা দিলুর কাছে খুব মজার লাগল। দিলু হাসিমুখে বলল, 'আপনার কি নাম?'

'আমার নাম বাদলা।'

'বাদলা আবার নাম হয়?'

'বাপ-মায় দিছে, কি করমু কন?'

'তারা বোধহয় নাম দিয়েছিল বাদল।'

দিলুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাজাকটা ঠিক হয়ে গেল—বাদলা দাঁত বের করে বলল, 'আফা, আপনের খুব ভয়।' দিলু বলল, 'আপনি কি জামিল ভাইকে দেখেছেন? ঐ যে লম্বা, গায়ে পাঞ্জাবি আর ক্রীম কালারের চাদর?'

'জ্বি, দেখছি।'

'কোথায় দেখেছেন?'

'এই সাব আর আরেক জন কোট পরা সাব বইসা আছে পুকুরঘাটে। গফ করতাছে।'

'আপনি যান তো, জামিল ভাইকে ডেকে নিয়ে আসুন। বলবেন—দিলু আপনাকে ডাকছে। আমার নাম দিলু। দিলশাদ থেকে দিলু।'

লোকটি চলে গেল। দিলু মুখ গম্ভীর করে বসে রইল। রাত বেশি হয় নি। মাত্র আটটা, কিন্তু মনে হচ্ছে গভীর রাত। ঝিঁঝি ডাকছে চারদিকে। বাবুর কান্না শোনা যাচ্ছে। সে সারা দিন ঘুমিয়েছে, কাজেই সারা রাত সে জেগে থাকবে। একটু পরে পরে কাঁদবে। মা-কে কোলে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে হবে। দিলু শুনল, মা তাকে গল্প বলার চেষ্টা করছেন। তুলা রাশি কন্যার গল্প। এই গল্পটি ছোটবেলায় সেও শুনেছে। এক রাজকন্যার ওজন মাত্র এক ছটাক। কিন্তু এক রাত্রে হঠাৎ তার ওজন বেড়ে গেল।

'কি ব্যাপার দিলু? জরুরী তলব কেন?'

'জামিল ভাই, আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বললেন কেন? কেউ আমাকে মিথ্যে বললে আমার খুব খারাপ লাগে।'

'কোনটা মিথ্যে বলেছি বল তো? মিথ্যে আমি তেমন বলি না।'

'ঐ যে একটা সত্যি ভূতের গল্প বললেন—ওটা আসলে মিথ্যে ভূতের গল্প।'

'কোন গল্পটি?'

'ঐ যে, বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছেন। ঝড়-বৃষ্টির সময়। ষোল-সতেরো বছরের একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মিথ্যে হবে কেন? ওটা সত্যি গল্প।'

'না, সত্যি না। এই অন্ধকারে আপনি কী করে বুঝলেন, ওর বয়স ষোল–সতেরো? ওর কাপড় ভেজা না।'

জামিল গম্ভীর গলায় বলল, 'ঐ রাতে খুব ঝড়–বৃষ্টি হচ্ছিল। ঝড়ের সময় ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকায়। বিদ্যুতের আলো শহরের ইলেকট্রিকের আলোর চেয়েও কড়া।'

দিলু তাকিয়ে রইল চোখ বড়ো করে। জামিল বলল, 'তবে মেয়েটির বয়সের ব্যাপারটা আমার কল্পনা। আমি নিজে তখন অল্পবয়স্ক ছিলাম, কাজেই সব মেয়ের বয়স মনে হত ষোল–সতের।'

দিলু কিছু বলল না।

'কি, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। জামিল ভাই—'

'বল।'

'আরেকটা সত্যি গল্প বলেন।'

'আরেক দিন বলব।'

'জামিল ভাই, আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?'

'না, রাগ করব কেন?'

দিলু হঠাৎ উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। জামিল হাসল। দিলু নিশাতের মতো হয় নি। সে হয়তো এখন কিছুক্ষণ কাঁদবে।

৭

রাতের খাবার দেয়া হল ন'টার দিকে। দেখা গেল কারোরই খাওয়ার দিকে মন নেই। শুধু সাব্বির, খাবার দেয়া হয়েছে শোনামাত্র, এসে বসেছে এবং খেতে শুরু করেছে। রেহানা বাবুকে কিছু একটা মুখে দেয়াবার জন্যে আবার ঘরে এসে সাব্বিরের একা–একা খাওয়ার দৃশ্যটি দেখলেন। সাব্বির ঘনঘন পানি খাচ্ছে। রেহানা বললেন, 'খুব ঝাল হয়ে গেছে নাকি?'

'একটু হয়েছে। অসুবিধা নেই।'

'এরা বেশ ঝাল দেয়। আলিম রান্না করলে এটা হত না। আলিম অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে।'

'কী অসুখ?'

'দাঁতে ব্যথা।'

সাব্বির গম্ভীর মুখে খেয়ে যাচ্ছে। রেহানা লক্ষ করলেন, সে একবারও বলল না—অন্যরা কেউ খেতে আসছে না কেন? এটা একটা সাধারণ ভদ্রতা। দশ–এগার বছর বিদেশে থাকলেই কেউ অভদ্র হয়ে যায় না, বরং আরো ভদ্র হয়। সেটাই স্বাভাবিক। রেহানা বললেন, 'এত কিছু রান্না হয়েছে, কিন্তু কেউ খেতে চাচ্ছে না। সব নষ্ট হবে।'

দিলু ঘরে ঢুকল। সে এসেছে নিশাতের জন্যে এক গ্লাস পানি নিতে। রেহানা দেখলেন, পানি ঢালতে গিয়ে সে অনেকখানি পানি টেবিলে ফেলল। মেয়েটা কাজকর্মে এত আনাড়ি হয়েছে! পানি গড়িয়ে যাচ্ছে সাব্বিরের দিকে। তাকে অল্প সরে বসতে হল। দিলু বলল, 'সাব্বির ভাই, আপনি এত পেটুক কেন, সবাইকে ফেলে খেতে বসেছেন!'

রেহানার কপালে ভাঁজ পড়ল। মেয়েটা এমন রুচিহীন কথাবার্তা বলে! লজ্জায় পড়তে হয়।

দিলু চলে যেতেই সাব্বির বলল, 'আপনার এই মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ। ওর মধ্যে এক ধরনের সরলতা আছে।'

রেহানা কিছু বললেন না। মনে-মনে সাব্বিরের কথাটার অন্য কোনো অর্থ হয় কিনা বুঝতে চেষ্টা করলেন। এই মেয়েটিকে তার পছন্দ, এর মানে কি এই নয় যে, বড়ো মেয়েটিকে পছন্দ নয়? বড়ো মেয়েটির মধ্যে সরলতা নেই? প্রথম দিকে সাব্বিরকে যতটা ভালো লেগেছিল, এখন আর ততটা ভালো লাগছে না। ছেলেটি অভদ্র, অমিশুক। অবশ্যি সে অত্যন্ত সুপুরুষ। চেহারায় অন্য ধরনের কাঠিন্য আছে, যা সহজেই চোখে পড়ে।

কবির এ রকম ছিল না। কবিরের মধ্যে একটা হালকা ফুর্তির ভাব ছিল, যা কোনো বয়স্ক মানুষকে ঠিক মানায় না। এটা ভাবতে ভাবতে রেহানা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি ঠিক এই মুহূর্তে কবিরকে অপছন্দ করার চেষ্টা করছেন। এটা অন্যায়। কবিরকে অপছন্দ করার উপায় নেই। সে এ-বাড়ির সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। ওসমান সাহেব, যিনি পৃথিবীর কোনো কথাই প্রায় বিশ্বাস করেন না, তিনি পর্যন্ত কবিরের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন। একবার কবির এসে বলল, 'খবর শুনেছেন নাকি? মালয়েশিয়ায় একটা মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছে।'

'কী ধরা পড়েছে?'

'মৎস্যকন্যা। মারমেইড। মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল পত্রিকায় বিরাট ছবি ছাপা হয়েছে। হুলস্থুল কাণ্ড!'

'বল কী!'

অন্য কেউ এ-কথা বললে ওসমান সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। কবিরের বেলায় সে-রকম কিছুই হল না। তাঁর মুখ দেখে মনে হল, তিনি বিশ্বাসও করছেন না, আবার ঠিক অবিশ্বাসও করছেন না। রাতে শোবার সময় গম্ভীর মুখে স্ত্রীকে বললেন, 'দুনিয়ায় কত অদ্ভুত জিনিসই না হয়!' রেহানা বললেন, 'জামাইয়ের কথার কি কোনো ঠিক আছে? তুমি এটা বিশ্বাস করে আছ?' ওসমান সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, 'কোন কথাটা এ পর্যন্ত সে মিথ্যে বলেছে শুনি?' ওসমান সাহেব কবিরের কোনো বদনাম সহ্য করতে পারতেন না। এখনো পারেন না। যে-লোক জীবনে কোনোদিন নামাজ-রোজা করেছে বলে রেহানার মনে পড়ে না, সেই

লোকও দেখা যায় একুশে আগস্ট একটা জায়নামাজ টেনে বের করেন, এবং গভীর রাত পর্যন্ত টুপি মাথায় বসে থাকেন। অপরিচিত এই পোশাকে তাঁকে অদ্ভুত দেখায়। একুশে আগস্ট কবিরের মৃত্যুদিন।

'পানি আনতে এতক্ষণ লাগল!'

দিলু পানি আনতে দেরি করে নি। গিয়েছে, নিয়ে এসেছে। নিশাত আজ অকারণে রাগ করছে। দিলু বলল, 'নাও, পানি নাও।'

'লাগবে না, যা। তৃষ্ণা মরে গেছে।'

এটা কেমন কথা! তৃষ্ণা কখনো মরে যায়! তৃষ্ণা থাকেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। দিলু নরম স্বরে বলল, 'আপা খেয়ে নাও, প্লিজ। তুমি শুধু শুধু রাগ করছ।' নিশাত পানির গ্লাস হাতে নিল।

'তুমি রাতেও কিছু খাবে না?'

'না।'

'কেন?'

'দেখছিস না আমার শরীর ভালো না?'

'মাথা টিপে দেব?'

'না, লাগবে না। তুই এখন যা।'

'অন্ধকারে একা বসে থাকবে কেন? আমিও থাকি তোমার সঙ্গে।'

দিলু খাটের উপরে পা উঠিয়ে বসল। অন্ধকারে পা নামিয়ে বসতে তার ভালো লাগে না। সব সময় মনে হয় কেউ এক জন খাটের নিচ থেকে চুপি চুপি এসে পা চেপে ধরবে।

'আপা, একটা ভূতের গল্প শুনবে?'

নিশাত জবাব দিল না।

'সত্যি গল্প। জামিল ভাইয়ের নিজের জীবনে ঘটেছিল।'

নিশাত তবুও চুপ করে রইল।

'এ গল্প শুনলে তুমি আর একা-একা অন্ধকারে বসে থাকতে পারবে না, এবং রাতে ঘুমও আসবে না।'

'এত ভয়ের গল্প শুনতে চাই না। থাক। মাথাধরার মধ্যে গল্প শুনতে ভালো লাগে না।'

'আপা, তোমার মাথার চুল টেনে দিই?'

'দে। আস্তে আস্তে টানবি।'

দিলু নিশাতের কপালে হাত দিয়েই চমকাল। বেশ জ্বর গায়ে। এতটা জ্বর তা বোঝা যায় নি।

'আপা, তোমার গা তো খুব গরম।'

'হুঁ।'

'জানালা বন্ধ করে দিই, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।'

'না, থাক। জানালা বন্ধ থাকলে আমার কেমন যেন লাগে। মনে হয় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।'

মশারি ফেলা নেই। মাঝে মাঝে মশা কামড়াচ্ছে। দিলু হালকা স্বরে বলল, 'জান আপা, আমি কখনো মশা মারি না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কারণ যেসব মশা মানুষকে কামড়ায় তারা সব স্ত্রী মশা। পুরুষ মশারা কামড়ায় না। আমি নিজে মেয়ে হয়ে একটা মেয়ে মশাকে কী করে মারি বল?'

'পুরুষ মশারা কামড়ায় না, এ কথাটা তোকে বলেছে কে?'

'জামিল ভাই বলেছেন।'

নিশাত বিছানায় উঠে বসল। নিচু স্বরে বলল, 'জামিল ভাইয়ের সঙ্গে তোর এত মাখামাখি কেন?'

দিলু অবাক হয়ে বলল, 'এই কথা কেন বলছ!'

'সব সময় তোর মুখে জামিল ভাই, জামিল ভাই। এটা ভালো নয়।'

'ভালো নয় কেন?'

'তোর বয়স কম। এই বয়সে মেয়েরা খুব সহজে নানান রকম দুঃখ-কষ্ট পায়।'

নিশাত চুপ করে রইল। দিলু বলল, 'পরিষ্কার করে বল আপা।'

নিশাত কঠিন স্বরে বলল, 'তোর মতো বয়েসী মেয়েরা খুব সহজে মুগ্ধ হয়। দুঃখ-কষ্ট আসে সে জন্যেই।'

'তোমার কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় তুই ঠিকই বুঝতে পারছিস। আমার যখন তোর মতো বয়স ছিল, তখন তো আমি সবই বুঝতাম। তুই জামিল ভাইয়ের সঙ্গে বেশি মিশবি না।'

'কেন, সে কি খারাপ লোক?'

'না, সে খারাপ লোক না। ভালোমানুষ। বেশ ভালোমানুষ। সে জন্যেই ভয়। এক সময় তুই তাকে ভালোবাসতে শুরু করবি। তোর জন্যে সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে।'

দিলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। নিশাতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু নিশাতের মনে হল দিলু কাঁদছে।

'তুই কাঁদছিস নাকি?'

দিলু কোনো উত্তর দিল না। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।

'চলে যাচ্ছিস?'

দিলু সে-কথারও কোনো জবাব দিল না। নিশাতের মনে হল দিলুকে এসব কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন আর মনে করে কী

লাভ? যা বলা হয়ে গেছে, তা আর ফেরানোর উপায় নেই।

হারিকেন হাতে রেহানা ঢুকলেন। তাঁর কোলে ঘুমন্ত বাবু। তিনি বাবুকে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেলেন। নিশাত বলল, 'ওকে তোমার কাছে রাখ মা। আমি আজ এ-ঘরে একা শোব।'

'কেন, একা শুবি কেন?'

'সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।'

'তোর শরীর ভালো নেই, এক জন কেউ তোর সাথে থাকা দরকার। আমি থাকি কিংবা দিলু থাকুক।।'

'কাউকে থাকতে হবে না।'

রেহানা একটি কঠিন কথা বলতে গিয়েও বললেন না। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন, 'রাতে কী খাবি?'

'কিছু খাব না।'

'খাবি না কেন? তোর রাগটা আসলে কার উপর, ঠিক করে বল তো?'

'কারো উপর আমার কোনো রাগ-টাগ নেই। শরীর ভালো নেই, তাই খাব না।'

'ঠিক আছে।'

রেহানা চলে যাচ্ছিলেন, নিশাত বলল, 'দিলুকে একটু পাঠিও তো মা।'

'দিলু আসবে না। তুই ওকে কী বলেছিস জানি না, দিলু কাঁদছে।'

'কাঁদার মতো আমি কিছু বলি নি।'

রেহানা শীতল স্বরে বললেন, 'তোর কথাবার্তা শুনে আমারই কাঁদতে ইচ্ছে হয়,আর ও তো বাচ্চা মেয়ে।'

'ও বাচ্চা মেয়ে নয়। এই বয়সে মেয়েরা বাচ্চা থাকে না।'

'সবাই তোর মতো নয়। কেউ কেউ বাচ্চা থাকে।'

'এ-কথার মানে কী মা?'

'মানে-টানে কিছু নেই। তুই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ নিশাত। যার দুঃখে আজ এরকম করছিস, তার সঙ্গে তোর আচার-ব্যবহার কেমন ছিল?'

'তার মানে?'

'ক'টা দিন তুই কবিরের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেছিস?'

'মানুষ সব সময় হাসিমুখে থাকতে পারে না।'

'তা পারে না। কিন্তু তুই ভালোমতো ভেবে দেখ তো, কবিরের সঙ্গে তোর ব্যবহারটা কেমন ছিল।'

'তুমি যাও তো মা।'

রেহানা চলে এলেন। নিশাত অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে দরজার ছিটকিনি লাগাল। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘ সময়। বাবু ঘুম ভেঙে কাঁদতে শুরু করেছে—মা'র কাছে যাব। মা'র কাছে যাব। রেহানা তাকে সামলাবার চেষ্টা করছেন। নিশাত শুনল মা বলছেন, 'কেন যে মরতে এখানে

এলাম!'

নিশাতের চোখ জ্বালা করছে। আজকাল তার চোখে জল আসে না। চোখ জ্বালা করে। মা একটু আগে যা বলে গেলেন, সেটা কি ঠিক? মা কি ইঙ্গিত করতে চেষ্টা করছেন না যে, সে এখন যা করছে তা করার তার কোনো অধিকার নেই? মা একটা মোটা দাগের ইঙ্গিত করেছেন। স্থূল ধরনের কথা বলেছেন।

সবার স্বভাব এক রকম নয়। সব মেয়েরাই তাদের স্বামীকে নিয়ে আহ্লাদ করে না। কেউ কেউ গম্ভীর স্বভাবের থাকে। সহজে উচ্ছ্বসিত হয় না। তা ছাড়া কবিরের মধ্যে কি সত্যি সত্যি উচ্ছ্বসিত হবার মতো কিছু ছিল?

সে ভালো ছেলে, এতে সন্দেহ নেই। আমুদে ছেলে। হৈচৈ করত। প্রচুর মিথ্যে কথা বলত। টিভি'র প্রতিটি বাংলা সিনেমা গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখত এবং শেষ হওয়ামাত্র বলত—শালা, সময়টাই মাটি। আগে জানলে কে বসে থাকত? কবির এমন একটি ছেলে, যে পৃথিবীর যে-কোনো মেয়েকে বিয়ে করেই সুখী হত। এই সব ছেলেদের সুখী হবার ক্ষমতা অসাধারণ। এরা হয় সুখী স্বামী, সুখী বাবা এবং বুড়ো বয়সে এক জন সুখী দাদা। সূক্ষ্ম রুচির মানুষ এত সহজে সুখী হয় না। সংসারে সুখী হবার মতো উপকরণ ছড়ানো নেই।

বাবু খুব কাঁদছে। নিশাত দরজা খুলে বের হল। হ্যাজাক লাইটটি বারান্দায় এনে রাখা হয়েছে। জামিল বাবুকে কোলে নিয়ে বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটছে।

'জামিল ভাই, ওকে আমার কাছে দিন।'

জামিল ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করল। বাবুর ঘুমিয়ে পড়ার একটি সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মায়ের কথা শুনে জেগে উঠতে পারে। নিশাত অপেক্ষা করতে লাগল।

আচ্ছা, কবির বেঁচে থাকলে কি এ-রকম করত? ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াত? এটি কখনো জানা হবে না। কিন্তু সবাই বলবে—বেঁচে থাকলে কত আদর করেই না ছেলে মানুষ করত! মৃত মানুষদের সম্পর্কে সব সময় ভালো ভালো কথা ভাবতে হয়। মৃত মানুষরা অনেক সুবিধা ভোগ করেন। সবার বয়স বাড়ে কিন্তু মৃত মানুষদের বয়স কখনো বাড়ে না। নিশাত এক সময় বুড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু কবিরের বয়স সাতাশ বছরেই থেমে থাকবে। তার কোনোদিন চুলে পাক ধরবে না। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হবে না। কোনো মানে হয় না।

'নিশাত, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথায় রাখবে?'

'মা'র কাছে দিয়ে আসুন।'

জামিল হাঁটছে কেমন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। হাঁটার ভঙ্গিটাও কেমন চেনা-চেনা। কবির কি এমন করেই হাঁটত? এখন আর অনেক কিছুই মনে পড়ে না। স্মৃতি

ঝাপসা হয়ে আসছে। এক দিন হয়তো কিছুই মনে থাকবে না।

'নিশাত, ওকে শুইয়ে দিয়ে এসেছি।'

'থ্যাংকস।'

'তোমার জ্বর কেমন?'

'আমার জ্বরের খবর মনে হচ্ছে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।'

জামিল তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মৃদুস্বরে বলল, 'বেড়াতে এসে অসুখে পড়াটা খুব খারাপ।'

'আমি বেড়াতে—টেড়াতে আসি নি। সবাই এসেছে, বাধ্য হয়ে আমিও এসেছি।'

জামিল হালকা স্বরে বলল, 'অবস্থা এরকম হবে জানলে আমি তোমাদের সঙ্গে জুটতাম না।'

'জুটেছেন কেন, আপনাকে তো কেউ সাধাসাধি করে নি। নাকি করেছে?'

'না, করে নি। আমি নিজ থেকেই এসেছি।'

'কেন এসেছেন?'

'নিশাত, তোমার শরীর ভালো না। যাও, তুমি শুয়ে থাক।'

'না, আপনি আমাকে বলুন আপনি কেন এসেছেন। ইউ গট টু টেল মি দ্যাট!'

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। সে লক্ষ করল—নিশাত অল্প অল্প কাঁপছে।

'জামিল ভাই, আমি আপনাকে আগেও পছন্দ করি নি, এখনো করি না। আমার মনে হয় আপনি সেটা জানেন না।'

'নিশাত, যাও ঘুমাতে যাও।'

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে উঠে এলেন—'এই নিশাত, কি হয়েছে?'

'কিছু হয় নি বাবা?'

'জামিলকে কী বলছিলি?'

'কিছু বলছিলাম না।'

নিশাত ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল। ওসমান সাহেব বললেন, 'জামিল, ও চেঁচামেচি করছিল কেন?'

'জানি না চাচা। আপনি এখনো বারান্দায় বসে আছেন কেন? ঠাণ্ডা লাগবে তো!'

'ঠাণ্ডা অলরেডি লেগে গেছে। কিন্তু অন্ধকারে বসে থাকতে ভালোই লাগছে। জামিল, তুমি একটা কাজ কর তো, দেখ, আলিমকে কোথাও পাও কিনা। আর শোন, এই হ্যাজাকটা এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা কর। আলো চোখে লাগছে। তোমাদের খাওয়াদাওয়া হয়েছে তো?'

'হয়েছে।'

'সাব্বির কোথায়? ওকে এখানে আসার পর একবারও দেখি নি।'

'উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

আলিম ওসমান সাহেবের সামনে তাঁর প্রিয় গ্লাসটি রাখল। লম্বা গ্লাস। জার্মান ক্রিস্টালের অপূর্ব গ্লাস। এই গ্লাস ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি তৃপ্তি পান না। ওসমান সাহেব স্পষ্ট একটা সুখের নিঃশ্বাস ফেললেন। আলিম মনে করে এনেছে। আলিম দ্বিতীয় বারে একটা বড়ো বাটিতে একগাদা বরফ নিয়ে এল।

'আরে, তুই বরফ পেলি কোথায়?'

'আসার সময় নেত্রকোণা থেকে বিশ সের বরফ কিনলাম।'

'বলিস কী! গলে নি?'

'কাঠের গুঁড়া দিছি চাইর দিকে। তবু গলছে। এখন আছে অল্প।'

আলিম খুব সাবধানে হোয়াইট হর্সের বোতল খুলে হুইস্কি ঢালল।

ওসমান সাহেবের পেগ সাধারণ পেগের চেয়ে একটু বড়ো। আলিম মাপটা জানে। তবু অন্ধকারে কিছু বেশি পড়ল। অন্য সময় হলে ধমকে দিতেন। আজ কিছুই বললেন না। বরফের ব্যাপারটা তাঁকে অভিভূত করেছে।

'তোর দাঁতের ব্যথার কী অবস্থা?'

'ব্যথা আছে।'

'রেহানার কাছ থেকে নিয়ে তিনটা এ্যাসপিরিন খা, ব্যথা কমে যাবে।'

আলিম কথা বলল না। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন, 'তোর এখানে থাকার দরকার নেই। যা শুয়ে পড়।'

'স্যার, আপনে ঘরে বসেন, বাইরে ঠাণ্ডা।'

'বাইরেই ভালো। শোন আলিম, দু'টা পানির বোতল আর কিছু বরফ দিয়ে যাস।'

'আচ্ছা।'

আলিম চলে যেতেই বিদ্যুতের মতো ওসমান সাহেব দিলুর ধাঁধার রহস্য ভেদ করলেন। অত্যন্ত সহজ উত্তর—বরফ। দশ সের পানিকে প্রথমে জমিয়ে বরফ করতে হবে। তারপর সেই বরফের টুকরোটি হাতে করে যেখানে যাবার সেখানে যেতে হবে।

ওসমান সাহেব গভীর আনন্দ বোধ করলেন। নীলগঞ্জ ডাকবাংলোটি তাঁর কাছে হঠাৎ করে বড়ো প্রিয় হয়ে গেল। যেন তিনি জীবনের সবচে বড় পাওয়াটি এই ডাকবাংলোয় পেয়ে গেলেন। যেন তাঁর আর কিছু পাওয়ার নেই। জীবনের সমস্ত সাধ পূর্ণ হয়েছে।

'বাবা।'

দিলু একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে উঠে এসেছে, শীতে কাঁপছে অল্প অল্প।

'কি রে দিলু?'

'তুমি এখানে বসে কী করছ?'

'কিছু করছি না। বসে আছি।'

'আমার ঘুম আসে না বাবা। তোমার সঙ্গে একটু বসি?'

'বোস।'

'হুইস্কি খাচ্ছ, না? মা জানলে খুব রাগ করবে।'

ওসমান সাহেব একটি হাত মেয়ের পিঠের ওপর রাখলেন। দিলু হালকা স্বরে বলল, 'বাবা, চা-চামুচ দিয়ে এক চামুচ খেয়ে দেখি? আমার খুব খেতে ইচ্ছে করে।'

ওসমান সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন—যা একটা চামুচ নিয়ে আয়। বলতে পারলেন না।

দিলু বলল, 'তোমার শীত করছে না?'

'করছে। তোর মা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ। সবাই ঘুমাচ্ছে। শুধু আমরা দু' জন জেগে আছি।'

'জায়গাটা কেমন লাগছে?'

'ভালো।'

'পুকুরটা দেখেছিস?'

'হুঁ।'

'বিরাট পুকুর, তাই না?'

'হুঁ। এরকম একটা বাড়ি আমাদের থাকলে খুব ভালো হত—তাই না বাবা? পেছনে বিরাট একটা পুকুর থাকবে। সামনে থাকবে প্রকাণ্ড সব রেন্টি গাছ।'

'এগুলো রেন্টি গাছ নাকি?'

'হুঁ।'

'কে বলেছে?'

'জামিল ভাই বলেছেন।'

দিলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল. তারপর খুব হালকা গলায় বলল, 'আপা আমার সঙ্গে আজ খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।'

'আমরা সবাই কখনো-না-কখনো খারাপ ব্যবহার করি।'

'কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি তো কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি না। করি? তুমি বল।'

'ঘুমাতে যা দিলু।'

দিলু উঠে গেল। ওসমান সাহেবের হঠাৎ মনে পড়ল, আরে তাই তো, ধাঁধার উত্তরটা তিনি জানেন, এটা দিলুকে বলা হল না। উঠে গিয়ে ডাকবেন নাকি? কিন্তু তাঁর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

চারদিকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। গাছে জোনাকি পোকা জ্বলছে-নিভছে। শীতল উত্তরী হাওয়া। ওসমান সাহেব চতুর্থ পেগটি ঢাললেন। অনেক বেশি পড়ে গেল, অন্ধকারে অনুমান ঠিক হয় না।

দিলু ঘুমিয়েছে নিশাতের সঙ্গে। প্রকাণ্ড খাট। খাটের নিচে আলো কমিয়ে হারিকেনটা রাখা। ঘরময় আবছা অন্ধকার। পায়ের দিকের জানালার একটা কাঁচ ভাঙা। সেই ভাঙা গলে শীতের হাওয়া আসছে। দু'টি কম্বল আছে গায়ে, তবু শীত মানছে না। দিলু নিশাতের দিকে আরো একটু সরে এল। নিশাত শীতল স্বরে বলল, 'গায়ের উপর এসে পড়ছিস কেন দিলু? সরে শো। এত ঘেঁষাঘেঁষি আমার ভালো লাগে না।' দিলু অনেকখানি সরে গেল। পাশের ঘরে বাবু কাঁদছে। বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছে। বোঝা যাচ্ছে না। দিলু বলল, 'আপা,বাবুকাঁদছে।'

'কাঁদছে কাঁদুক।'

'ওকে এখানে নিয়ে এস না। অনেক জায়গা তো!'

'ভ্যানভ্যান করিস না। চুপ করে থাক।'

দিলুর চোখ ভিজে উঠল। এমন বাজে করে কথা বলে কেন আপা? কী করেছে সে? কিছুই তো করে নি। শুধু বলেছে, বাবু কাঁদছে। এটা বলা কি দোষের? দিলু কম্বলের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে ফেলল। সেখানে গাঢ় অন্ধকার। বাবুর কান্নার শব্দও সেখানে যাচ্ছে না। অন্ধকার দিলুর ভালো লাগে না। অন্ধকারে তার মৃত্যুর কথা মনে হয়। দাদীজান মারা যাবার সময় থেকেই তার এরকম হয়েছে। দাদীজান মারা গিয়েছিলেন রাত ন'টায়। সবাই যখন কান্নাকাটি করছে, তখন হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। কী ভয়াবহ অবস্থা! সবাই কান্না থামিয়ে মোমবাতি মোমবাতি বলে চেঁচামেচি শুরু করল। দিলু বসে ছিল সোফায়, হঠাৎ তার মনে হল দাদীজান যেন উঠে আসছেন তার দিকে। কী অবস্থা! ভাগ্যিস বাবা তখন লাইটার জ্বালিয়ে দিলুর পাশে এসে বসলেন!

নিশাত মৃদুস্বরে ডাকল, 'দিলু ঘুমিয়ে পড়েছিস?' দিলু জবাব দিল না। নিশাত কম্বলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলুকে কাছে টানল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা। এত অভিমানী হয়েছে কেন? নিশাতের ইচ্ছা হল দিলুকে ডেকে তুলে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে। সে আবার ডাকল, 'এই দিলু, এই পাগলি।' দিলুর ঘুম ভাঙল না। নিশাত ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। আর ঠিক তখন জামিলের হাসির শব্দ শোনা গেল। কী আশ্চর্য, অবিকল কবিরের মতো ঘর কাঁপিয়ে হাসি! জামিল ভাই তো এরকম কখনো হাসেন না। তাঁর সব কিছুই মাপা। এবং কোনো কিছুর সঙ্গেই কবিরের কোনো মিল নেই। তবু আজ এরকম মিল পাওয়া গেল কেন? নাকি সব মানুষের মধ্যে অদৃশ্য কোনো মিল আছে?

রাত বাড়ছে। বাবু কাঁদছে না। চারদিকে সুনসান নীরবতা। নিশাত হাত বাড়িয়ে দিলুকে কাছে টানল। দিলু ঘুমের মধ্যেই কাঁদছে। কোনো মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে হয়তো। কত দিন হয়ে গেল, নিশাত কোনো মিষ্টি স্বপ্ন দেখে না।

৮

নিশাত খুব ভোরে জেগে উঠল।

তখনো অন্ধকার কাটে নি। পুবের আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। ঘন কুয়াশা চারদিকে। নিশাত দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মাথার যন্ত্রণা আর নেই। শরীর ঝরঝরে লাগছে। প্রচণ্ড খিদে। এত ভোরে নিশ্চয়ই আর কেউ জাগে নি।

নিশাত টুথব্রাশ হাতে বারান্দায় হাঁটতে লাগল। এত সুন্দর বাড়ি। রাতে ঠিক বোঝা যায় নি। নিশাত হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির পেছনের দিকে চলে এল। প্রকাণ্ড পুকুরটি চোখে পড়ল তখন। কুয়াশার জন্যে পুকুরটি পুরোপুরি দেখা যায় না। মনে হয় বিশাল সমুদ্র। পানি দেখলেই ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। নিশাত এগিয়ে গেল।

এই ভোরেও পাতলা একটা উইণ্ডব্রেকার পরে বাঁধান ঘাটে সাব্বির বসে আছে। তার পাশেই স্ট্যাণ্ড–ক্যামেরা বসান। নিশাত বলল, 'এত ভোরে ক্যামেরায় কার ছবি তুলছেন?'

'কুয়াশার ছবি। আপনার জ্বর সেরে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

নিশাত সিঁড়ি বেয়ে শেষ পর্যন্ত নেমে গেল। হাত বাড়িয়ে পানিতে আঙুল ডোবাল। তার ধারণা ছিল, পানি বরফ–শীতল হবে। কিন্তু তেমন ঠাণ্ডা নয়।

'আপনি যেমন বসে আছেন, ঠিক তেমনিভাবে বসে থাকুন, আমি আপনার একটা ছবি তুলব।'

অনুমতি প্রার্থনা নয়, যেন আদেশ। নিশাত বলল, 'মুখে টুথব্রাশ ঝুলতে থাকবে?'

'হ্যাঁ, থাকুক। আপনি হাত দিয়ে পানি স্পর্শ করছেন। এটাই আমার ছবির থীম।'

সাব্বির ক্যামেরা হাতে কয়েক ধাপ নেমে এল। নিশাতের কি রাগ করা উচিত না? বলা উচিত, এভাবে আমি ছবি তুলি না। কিন্তু নিশাত রাগ করতে পারছে না। কেন পারছে না, সেও এক রহস্য। সাব্বির বলল, 'আজ ঘুম ভাঙার পর থেকেই মনে হচ্ছিল, ছবির জন্যে একটা ভালো কম্পোজিশন পাব।'

'আপনি ছবি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না?'

'ভাবতে পারি হয়তো, কিন্তু ছবির কথা ভাবতেই ভালো লাগে।'

নিশাত হাসতে হাসতে বলল, 'আপনার মাথার মধ্যে শুধু কম্পোজিশন ঘোরে, তাই না?' সাব্বির তার জবাব দিল না। ক্রমাগত ছবি তুলতে লাগল। পানিতে হাত ডুবিয়ে বসে রইল নিশাত। সে একটা ব্যাপার লক্ষ করল—সাব্বির অন্য ফটোগ্রাফারদের মতো নয়। অন্য ফটোগ্রাফাররা বলত—একটু বাঁ দিকে ফিরুন, একটু হাসুন। মাথাটা একটু ওপরে তুলুন। শাড়ির আঁচল টেনে দিন। সাব্বির কিছুই বলছে না। শুধু ছবি তুলছে। নিশাত হাসতে হাসতে বলল, 'এত

ছবি তুলছেন, একটা তো ভালো হবেই।'

'সব সময় হয় না। ছত্রিশটি ছবির মধ্যে যার একটি ছবি ভালো হয়, সে এক জন বড়ো ফটোগ্রাফার?'

'আপনি এক জন বড়ো ফটোগ্রাফার?'

'হ্যাঁ।'

নিশাত লক্ষ করল সে হ্যাঁ বলেছে খুব জোরের সঙ্গে। যেন সে মনেপ্রাণে কথাটা বিশ্বাস করে। সাব্বির বলল, 'যে-ছবিটি দিয়ে আমি প্রথম নাম করি, তার কথা শুনতে চান?'

'বলুন।'

'ছবিটির নাম সরলতা। ইনোসেন্স।'

সাব্বির সহজভাবেই নিশাতের পাশে বসল। যেন দীর্ঘদিনের পরিচিত কেউ পাশাপাশি বসেছে।

'আমি তখন থাকি নর্থ ডেকোটায়। এক বার রুজভেল্ট ন্যাশনাল পার্কে বেড়াতে গিয়েছি। একা-একা গভীর বনে ঢুকে পড়লাম। সেখানে দেখলাম ছোট্ট একটা জলা জায়গা। চারদিকে বড়ো বড়ো সব উইলি গাছ। উইলি গাছের ছায়া পড়েছে পানিতে। অপূর্ব পরিবেশ! এবং সেই অপূর্ব পরিবেশে অল্পবয়সী একটি মেয়ে লাঞ্চবক্স হাতে নিয়ে বসে আছে। ওর বন্ধুটি বোধহয় কাছেই কোথাও গেছে। আমি মেয়েটিকে বললাম—তোমার কয়েকটি ছবি তুলতে চাই। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আমি বললাম—তুমি কি ঘুমিয়ে পড়বার মতো একটা ভঙ্গি করতে পার? সে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। অসংখ্য ছবি তুললাম, কিন্তু মনে হল কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। ছবিটি অসম্পূর্ণ। ঠিক তখন একটা বুনো প্রজাপতি এসে বসল লাঞ্চবক্সে, তৈরী হয়ে গেল ছবি। বিখ্যাত ছবি।'

'বুনো প্রজাপতি আবার কী? সব প্রজাপতিই তো বুনো। পোষা প্রজাপতি আবার আছে নাকি?'

ঐ প্রজাপতিটির পাখায় কোনো রঙ ছিল না। কালো কালো দাগ। কাজেই বুনো প্রজাপতি বলেছি। আপনি কি ঐ ছবিটি দেখতে চান?'

'আছে আপনার কাছে?'

'হ্যাঁ। বসুন আপনি, আমি নিয়ে আসছি।'

সাব্বির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

সাব্বিরকে নিশাত কি আগে ভালো করে লক্ষ করে নি নাকি? বেশ লাগছে একে। মনে হচ্ছে এর মধ্যে ভান নেই। শুধু কথাবার্তা নয়, চোখের দৃষ্টিও বেশ স্বচ্ছ। মেয়েদের মতো বড়ো বড়ো চোখ। না, কথাটা ঠিক হল না। সব মেয়েদের চোখ বড়ো বড়ো নয়। বরং বলা উচিত মেয়েলি চোখ। পুরুষমানুষকে এত বড়ো বড়ো চোখে মানায় না। না, এটাও ঠিক হল না। সাব্বির সাহেবকে তো ভালোই মানিয়েছে। নিশাত বেশ আগ্রহ নিয়ে ছবির

বইটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। যেন এই আগ্রহ থাকাটা ঠিক নয়। এটা অন্যায়।

এত চমৎকার একটা ফটোগ্রাফির বই নিয়ে সাব্বির ফিরবে নিশাত আশা করে নি। সে দু' বার বলল, 'এ বইয়ের সব ছবি আপনার তোলা?'

'হ্যাঁ। ব্যাক কভারে ফটোগ্রাফারের ছবি আছে। দেখুন না।'

'আপনি তো বিখ্যাত ব্যক্তি!'

'হ্যাঁ, আমি মোটামুটি বিখ্যাত। ঐ দেশে অনেকেই আমাকে চেনে।'

নিশাত পাতা ওল্টাতে লাগল। অপূর্ব সব ছবি! মন খারাপ করিয়ে দেবার মতো ছবি।

'তিপ্পান্ন পৃষ্ঠায় ঐ ছবিটি আছে। দেখুন। ঐ ছবিটি দিয়ে আমি ফটোগ্রাফির জগতে প্রথম এন্ট্রি পাই।'

নিশাত তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা খুলে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না।

'ছবিটি ভালো লেগেছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু মেয়েটির গায়ে কোনো কাপড় ছিল না, এই কথা আপনি আগে বলেন নি। ও কি এইভাবেই বনে বসেছিল?

'হ্যাঁ।'

'এবং আপনি ছবি তুলতে চাইতেই রাজি হয়ে গেল? কোনো আপত্তি করল না?'

'না, কোনো আপত্তি করে নি।'

'ঐ মেয়েটির কী নাম?'

'নাম জানি না। ছবির জন্যে মেয়েটির নামের কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আমার মেয়েটির নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

সাব্বির হেসে উঠল। রোদ উঠে গেছে। কুয়াশা মিলিয়ে যাচ্ছে। কেমন চমৎকার লাগছে চারদিক। নিশাত নরম গলায় বলল, 'এই বইটি আমার কাছে থাকুক?'

'থাকুক।'

নিশাত উঠে দাঁড়াল। নিচুস্বরে বলল, 'যাই।' সাব্বির বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলুন।'

'দয়া করে রাগ করবেন না বা মন খারাপ করবেন না।'

'এমন কী কথা যে আমি রাগ করব?'

সাব্বির অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলল, 'আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। শুধু ভালো লেগেছে বললে কম বলা হয়। আমার আরো কিছু বলা উচিত। কিন্তু আমি গুছিয়ে কিছু বলতে পারি না। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমার ভালো লাগার ব্যাপারটা আপনার মা'কে বলতে পারি।'

নিশাত ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু কিছু বলল না, ঘাটের ধাপ

ভেঙে উপরে উঠে এল।'

'আপা, তুমি এখানে, আমি সারা বাড়ি খুঁজছি।'

'কেন?'

দিলু হাত নেড়ে নেড়ে বলল, 'আমরা সবাই মিলে শিকারে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'শিকারে। বালিহাঁস মারব আমরা। এস তাড়াতাড়ি, নাশতা খেয়ে নাও। রোদ বেশি কড়া হলে হাঁস পাব না।'

'বাবু কোথায় রে?'

'জানি না কোথায়। তোমার জ্বর নেই তো?'

'নাহ্।'

'তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন আপা?'

'সুন্দর, সেই জন্যে সুন্দর লাগছে।'

নিশাত হাসল। আজকের দিনটি চমৎকারভাবে শুরু হয়েছে। কুয়াশা নেই। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। আকাশ চৈত্রের আকাশের মতো ঘন নীল। আহ্, চমৎকার একটি দিন!

৯

শিকারে যাবার প্রোগ্রাম হঠাৎ করেই হয়েছে। নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেব সকালবেলা একটি দোনলা বন্দুক আর একগাদা ছররা গুলি নিয়ে উপস্থিত—'স্যার, শিকারে যাবেন নাকি? বড়গাঙ্গের চরে বালিহাঁস পড়েছে। কায়দামতো একটা গুলি করতে পারলে বিশ–পঁচিশটা পাখি পড়বে।'

'বলেন কী!'

'স্যার, একটা স্পীডবোটের ব্যবস্থা করেছি।'

ওসমান সাহেব বহু দিন পর উৎসাহিত বোধ করেন। শিকার করা অনেক দিন হয় না। শেষ শিকারে গিয়েছিলেন প্রায় পাঁচ বছর আগে।

'ওসি সাহেব, তাহলে তো তাড়াতাড়ি রওনা হতে হয়।'

'জ্বি স্যার।'

'চা–টা খেয়েই রওনা দেব, কি বলেন ওসি সাহেব?'

'ঠিক আছে স্যার।'

ওসমান সাহেব ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ দিন পর রক্তে যৌবনের উত্তেজনা অনুভব করেন। থানার ওসির মতো এক জন অধস্তন অফিসারকেও হঠাৎ করে বন্ধুস্থানীয় মনে হয়।

'ওসি সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'দিনটাও আজ শিকারের জন্যে ভালো। কুয়াশা নেই, কিছু নেই।'

'না স্যার, কুয়াশা থাকলেই ভালো। পরিষ্কার দিন শিকারের জন্যে না। একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার স্যার।'

প্রথমে ঠিক হয়েছিল সবাই যাবে। পাখি শিকার হোক না হোক, নৌকাভ্রমণ হবে। কিন্তু সাব্বির যেতে রাজি হল না। তার নাকি শিকারে তেমন উৎসাহ নেই। রেহানাও থেকে গেলেন। কারণ, বাবুর গা গরম হয়েছে। সকালে এক বার বমি করেছে। রেহানা ধরেই নিয়েছিলেন, নিশাত বাবুকে রেখে যাবে না। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, নিশাত দিলুর মতোই উৎসাহ নিয়ে সাজ করছে। অনেক দিন পর তার চোখ ঝলমল করছে।

স্পীডবোটটি আহামরি কিছু নয়। দেশী নৌকায় বার হর্স পাওয়ারের একটা মেশিন বসানো। বসবার জায়গা নেই। চারদিক ভেজা। এটা বোধহয় মাছ আনা-নেওয়া করে। মাছের বোঁটকা গন্ধ। তবু দিলুর ভীষণ ভালো লাগছে। সে বসেছে জামিলের পাশে। বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে ক্রমাগত গল্প করছে। ওসমান সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'মেয়েটা তো বড্ড বকবক করতে পারে!' সবাই হেসে উঠল। দিলু মোটেও অপ্রস্তুত হল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার এক বান্ধবীর গল্প করতে শুরু করল: তার নাম লীনা, কিন্তু সবাই তাকে ডাকে বক লীনা—কারণ সে বকের মতো মাথা নিচু করে হাঁটে। দিলু মাথা নিচু করে ব্যাপারটা দেখাল। ওসমান সাহেব বললেন, 'আয় মা, তুই আমার পাশে বসে গল্প কর।' কিন্তু দিলু নড়ল না। সে জামিলের পাশেই বসে রইল।

বড়ো গাঙের চর পর্যন্ত স্পীডবোট নিয়ে যাবার উপায় নেই। পানি কম। তা'ছাড়া ভটভট শব্দ হচ্ছে। শব্দে পাখি উড়ে যাবে। ওসি সাহেব বললেন, 'এখান থেকে যেতে হবে পায়ে হেঁটে। অসুবিধা হবে না তো স্যার?'

'না, অসুবিধা কি?'

'খানিকটা পানি ভেঙে যেতে হবে।'

'বেশি পানি?'

'জ্বি-না স্যার। খুব বেশি হলে হাঁটুপানি। জুতো খুলে ফেলেন।'

ওসমান সাহেব জুতো খুলে ফেললেন। দিলুও জুতো খুলল। ওসি সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'তুমিও যাবে নাকি খুকি?'

'জ্বি।'

'কষ্ট হবে। একটু পরেই রোদ উঠবে কড়া।'

'উঠুক।'

ওসমান সাহেব বললেন, 'শখ করে এসেছে, চলুক। নিশাত, তুই যাবি নাকি?'

'আমি হাঁটুপানি ভেঙে যাব? পাগল হয়েছ বাবা!'

দিলু বলল, 'চল না আপা। আমি তো যাচ্ছি। তোমার ভালোই লাগবে।'

'এখানে বসে থাকতেই আমার ভালো লাগছে।'

ওসমান সাহেব বললেন, 'একা-একা বসে থাকবি, খারাপ লাগবে না?'

'একা-একা থাকব না। জামিল ভাই থাকবেন। কি জামিল ভাই, আমাকে একা ফেলে নিশ্চয়ই আপনি পাখি শিকারে যাবেন না? নাকি আপনিও যেতে চান?'

'না, আমি আছি।'

রোদের তাপ বাড়ছে। মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছে মাঠ থেকে। এ-অঞ্চল বেশ নির্জন। মাঝে মাঝে দু'-একটা মাছ ধরার নৌকা শুধু যাচ্ছে। নৌকায় বসে থাকা লোকজন তাদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু খুব একটা অবাক হচ্ছে না। স্পীডবোট নিয়ে শহরের লোকজন হয়তো প্রায়ই এদিকে শিকারে আসে।

নিশাত হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বলল, 'জামিল ভাই, এই কি সেই বিখ্যাত কাশফুল?'

'হুঁ। তবে এখনো ফুল ফোটে নি। সময় হয় নি।'

'কই, তেমন কিছু তো লাগছে না।'

'বাতাসে যখন ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে, তখন ভালো লাগে। তুমি কি বোটেই বসে থাকবে, না নামবে?'

'চলুন নামি। হীল পরে হাঁটা যাবে তো?'

'হীল পরে এসেছ?'

'হ্যাঁ, দেখছেন না কত লম্বা লাগছে আমাকে?'

জামিল ঠিক বুঝতে পারছে না। নিশাতকে খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছে। সাজগোজের মধ্যেও যথেষ্ট যত্নের ছাপ। ঠোঁটে কড়া করে লিপস্টিক দিয়েছে।

নিশাত বলল, 'গ্রাম-নদী এইসব কিন্তু আমার কাছে তেমন এক্সাইটিং মনে হয় না।'

'একেক জনের দেখার ক্ষমতা একেক রকম। সাব্বির সাহেব যা দেখে মুগ্ধ হবেন, তুমি হয়তো তা দেখে মুগ্ধ হবে না। তা ছাড়া—।'

'সাব্বির ভাইকে আপনার কেমন লাগে?'

'চমৎকার! ভদ্রলোক অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে দারুণ ইমপ্রেস করেছেন। এই একটি লোক দেখলাম, যার মধ্যে ভান নেই।'

নিশাত ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি একটা ডিসিশনে আসা ঠিক না। আপনি মানুষ সম্পর্কে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে চলে আসেন।' নিশাত খুব সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগল।

জামিল বলল, 'জুতো পরে তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। জুতো খুলে ফেল।'

'খালিপায়ে হাঁটব?'

'হ্যাঁ। খারাপ লাগবে না, শুকনো পথঘাট।'

নিশাত হীল খুলে ফেলল—খালিপায়ে হাঁটতে তার ভালোই লাগল। খুশি-খুশি গলায় বলল, 'ফ্লাস্কটা নিয়ে এলে ভালো হত। কোথাও বসে চা

খাওয়া যেত। শাড়ি–পড়া আট–ন' বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে কোত্থেকে হঠাৎ এসে উদয় হয়েছে। চোখ বড়ো বড়ো করে দেখছে।

নিশাত বলল, 'এ্যাই, তোমার নাম কি?' মেয়েটি জবাব দিল না।

'বাড়ি কোথায় তোমার?'

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে যেদিকে দেখাল, সেদিকে কোনো ঘরবাড়ি নেই।

'জামিল ভাই, মেয়েটি কি হারিয়ে গেছে নাকি?'

'না, ওরা হারাবে না। গ্রামের মেয়ে, সমস্ত অঞ্চল এদের খুব ভালো করে চেনা। নিশাত, কোনদিকে যেতে চাও?'

'চলুন, ঐ গাছটার নিচে বসি। কী গাছ ওটা, বিরাট বড়ো তো!'

'শিমুল গাছ।'

'শিমুল গাছে এত বড়ো বড়ো কাঁটা থাকে নাকি?'

'থাকে।'

জামিল সিগারেট ধরাল। নিশাত হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে চোখে দিল। হালকা স্বরে বলল, 'একটা হাসির গল্প বলুন তো। দিলুকে রোজ কী সব গল্প বলেন। দেখি এবার, আমি একটা শুনি।'

'দিলুকে হাসির গল্প বলি না। দিলুকে বলি ভূতের গল্প। ভূতের গল্প শুনতে চাইলে বলতে পারি।'

নিশাত খিলখিল করে হেসে ফেলল। তার হাসি দেখে ছোট্ট মেয়েটাও হাসতে শুরু করল। জামিল নিজেও হাসল।

'না জামিল ভাই, বলুন একটা হাসির গল্প। দেখি আপনি আমাকে হাসাতে পারেন কিনা।'

'হাসাতে পারলে কী দেবে?'

'আপনি আগে বলুন, তারপর দেখা যাবে।'

'টেলিফোনের খুঁটি বসান হচ্ছে। সারা দিন ধরে কাজ চলছে। সন্ধ্যাবেলা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কাজ দেখতে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা ক'টা খুঁটি পুঁতলে? ওরা বলল—স্যার বারটা। ইন্‌জিনিয়ার সাহেব বললেন—মন্দ না, বারটা খারাপ না। তারপর গেলেন অন্য একটা দলের কাছে—তোমরা কটা পুঁতলে? ওরা বলল—স্যার, একটা। ইন্‌জিনিয়ার রেগে আগুন—এত কম! ঐ দল তো বারটা পুঁতল। দলের সর্দার বলল—আমাদের কাজ আর ওদের কাজ? ওদের খুঁটির সবটাই মাটির উপর, আর আমাদেরটা দেখুন। মাটির উপর আছে চার আঙুল। সবটাই ঢুকিয়ে দিয়েছি।'

নিশাত গল্প শুনে হাসল না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'এই গল্পটা জামিল ভাই আপনি আমাকে ইচ্ছে করে বললেন।'

'ইচ্ছে করে বলব কেন?'

'গল্পটা বাবুর আব্বার।'

'হ্যাঁ, আমি কবিরের কাছ থেকে শুনেছি। এটা একটা চমৎকার গল্প,

তাই তোমাকে বললাম। অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সব কিছুতেই তুমি এত উদ্দেশ্য খোঁজ কেন?'

নিশাত উঠে দাঁড়াল—'চলুন বোটে ফিরে যাই।' ফেরার পথে কেউ কোনো কথা বলল না। ছোট্ট মেয়েটি আবার পেছনে পেছনে আসছে। খুব কৌতূহল মেয়েটির। ছোট্ট শাড়িটা পরেছেও খুব গুছিয়ে। শাড়ির রঙ গাঢ় সবুজ। তার মধ্যে লাল পাড়। জামিল বলল, 'নিশাত, তুমি কি লক্ষ করেছ, বেশির ভাগ গ্রামের মেয়ের শাড়ির রঙ সবুজ?'

'না, আমি লক্ষ করি নি। গ্রামই দেখি নি, গ্রামের মেয়ে দেখব কোথায়?'

'গ্রামের মেয়েরা যে সবুজ শাড়ি পরে, এটাও কিন্তু প্রথম নোটিশ করে কবির। তার ধারণা, এরা সবুজ দেখতে দেখতে সবুজ রঙের প্রতি একটা উইকনেস জন্মিয়ে ফেলে। আমার ধারণা কিন্তু তা নয়।'

'আপনার কী ধারণা?'

'আমার ধারণা, সবুজ রঙের কাপড় ময়লা হয় কম, সে-জন্যই এরা সবুজ কাপড় পরে।'

'আপনার ধারণাটাই প্র্যাকটিক্যাল। কিন্তু হঠাৎ করে আপনি রঙের প্রসঙ্গ আনলেন কেন?'

জামিল কিছু বলল না। স্পীডবোটে উঠে বসল। স্পীডবোটের ড্রাইভার রোদের মধ্যে পা মেলে দিয়ে দিব্যি ঘুমাচ্ছে। নিশাত ফ্লাস্ক খুলল—'চা দেব জামিল ভাই?'

'দাও।'

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু? কেক আছে। নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কে জানে।'

নিশাত এক পিস কেক বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিল। সে নিল না। পিছিয়ে গেল অনেকখানি। জামিল বলল, 'এ ভিখিরি নয়, কারো কাছ থেকে কিছু নেয়া এর অভ্যেস নেই।'

'আপনি চট করে সবকিছু বুঝে যান কীভাবে?'

জামিল হাসল। ঠিক তখনি পরপর দু'টি গুলির শব্দ হল। ওরা পাখি পেয়েছে কিনা কে জানে। স্পীডবোটের ড্রাইভার চোখ কচলে উঠে বসল। শিকারীরা হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। নিশাত অবাক হয়ে দেখল, তার মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, এত পাখি! তারা ডাকছে কর্কশ গলায়। শুনতে ভালো লাগে না।

'ওরা কোথায় যাবে?'

'নিরাপদ কোনো জায়গায় যাবে। তারপর সেখানেও শিকারীরা যাবে। সেখান থেকেও এদের উড়ে যেতে হবে।'

নিশাত তাকিয়ে রইল। জামিল বলল, 'সমস্ত জীব-জন্তু ও পশু-পাখির জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটে যায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে গিয়ে। মানুষের জন্যেও এটা সত্যি। আমরাও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজি।'

'মাস্টারি করতে করতে বক্তৃতা দেওয়া আপনার অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এবং আপনি মনে করেন, জগৎ-সংসারের সমস্ত রহস্য আপনি বুঝে ফেলেছেন?'

'না, তা বুঝি নি, তবে বুঝতে চেষ্টা করি। তোমার মতো চোখ বন্ধ করে থাকি না।'

জামিল একটা সিগারেট ধরাল। নিজেই হাত বাড়িয়ে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সে বড়োসড়ো একটা বক্তৃতা দেবে, কিন্তু জামিল তেমন কিছুই করল না। সিগারেট টানতে টানতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। স্পীডবোটের ড্রাইভার নেমে গিয়ে ছোট মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। এতক্ষণ যে-মেয়ে একটি কথাও বলে নি, তার মুখে এখন খই ফুটছে।

'তোর নাম কি?'

'ফুলি।'

'তোর বাপের নাম কি?'

'কসির শেখ।'

'কোন গ্রাম?'

'আতরা, মিয়াবাড়ি।'

'ভাই-ভইন কয় জন?'

'ছয় জন।'

নিশাত খুব মন দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছে। এই মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল কেন?

'জামিল ভাই।'

'বল।'

'এই মেয়েটি এতক্ষণ কোনো কথাবার্তা বলে নি, কিন্তু দেখুন, ঐ লোকটির সঙ্গে কেমন জমিয়ে গল্প করছে।'

জামিল কোনো উত্তর দিল না।

'জামিল ভাই, আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?'

'না, রাগ করি নি। রাগ করতে হলে একটা অধিকার থাকতে হয়। তোমার ওপর আমার সে-রকম কোনো অধিকার নেই।'

'দিলুর ওপর আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। ওর সঙ্গে আমি কিন্তু প্রায়ই রাগ করি।'

'আপনারা কী নিয়ে এত কথা বলেন?'

'যা মনে আসে তাই বলি। ওর সঙ্গে তো আর হিসেব করে কথা বলতে হয় না।'

নিশাত গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয়, ওর সঙ্গেই আপনার সবচে সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।'

'কেন?'

'এই বয়সে মন অন্য রকম থাকে। আপনি কি বুঝতে পারছেন, আমি কি বলতে চাচ্ছি?'

'পারছি।'

'আপনি কি এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান?'

'চাই। নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করা ঠিক নয়।'

'তার মানে?'

'দিলুর মতো যখন তোমার বয়স ছিল, তখন তুমি আমার প্রতি অন্য রকম ধারণা পোষণ করতে।'

'এসব আপনি কী বলছেন!'

'স্কুল ছুটির পর ক'দিন এসেছ আমাদের বাড়িতে মনে আছে?'

'কেন আপনি এখন এইসব পুরনো কথা তুলছেন?'

জামিল চুপ করে গেল।

দেখা গেল শিকারীরা ফিরে আসছে। ওসি সাহেবের হাতে কয়েকটা হাঁস। ওদের জবাই-করা গলা দিয়ে তখনো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

দিলু ওসমান সাহেবের শরীরে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে। জামিল বলল, 'কী হয়েছে, দিলু?'

'পায়ে কাঁটা ফুটেছে।'

'শিকার কেমন লাগল?'

'ভালো না।'

ওসমান সাহেব উল্লাস বোধ করছিলেন। তাঁর চোখে-মুখে ক্লান্তির কোনো চিহ্নই নেই। ওসি সাহেব বললেন,'স্যার, কাল আবার যাব নাকি?'

'চলেন যাই। নতুন কোনো স্পটে চলেন।'

'স্যার, যেতে হবে কিন্তু আরো সকালে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি শেষরাতে উঠতে পারেন।'

'উঠব। শেষ রাতেই উঠব। নো প্রবলেম।'

ওসমান সাহেব নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবের ওপর অত্যন্ত প্রসন্ন বোধ করেন।

'ওসি সাহেব, রাতে খান আমাদের সঙ্গে।'

'জ্বি-না স্যার, জ্বি-না।'

দিলু বসে নিশাতের পাশে। গাছের গুঁড়িতে বসে থাকা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে, 'এই, নাম কি তোমার?'

'ফুলি।'

'বাহ্, কী সুন্দর নাম! ফুল থেকে ফুলি।'

ছোট্ট মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল।। দিলু বলল, 'সাব্বির ভাই থাকলে এই মেয়েটির ছবি তুলতে বলতাম। কী সুন্দর মেয়ে, দেখেছ আপা?' নিশাত জবাব দিল না। দিলু বলল, 'গ্রামের মেয়েরা কী সুন্দর হয়। বড়ো মায়া লাগে।'

১০

ওসমান সাহেব হুইস্কির বোতল নিয়ে বসেছেন। তাঁর ভাগ্য ভালো, বরফের যোগাড় হয়েছে। ওসি সাহেব জীপ পাঠিয়ে বরফ আনিয়েছেন। শুধু বরফ নয়, তিনি এক কেস বিয়ার এনেছেন। ওসমান সাহেব বিয়ার খান না। তবু খুশি হলেন। প্রথম দিনে এই ওসির উপর এতটা বিরক্ত হওয়া ঠিক হয় নি।

ওসমান সাহেব সত্যিকার অর্থেই ছুটির আনন্দ ভোগ করলেন। আলিম এসে পেঁয়াজ, মরিচ ও ভিনিগার মাখান এক প্লেট চিনাবাদাম রেখে গেছে। হুইস্কির সঙ্গে এই প্রিপারেশনটি অপূর্ব!

গ্লাসে চুমুক দিয়ে তাঁর মনে হল বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। গভীর আনন্দে তাঁর শরীর কাঁপছে। হুইস্কি নিয়ে তো প্রায়ই বসেন, এ--রকম কখনো হয় না। আজ হচ্ছে কেন? ইচ্ছে হচ্ছে হেসে হেসে সবার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে। চাঁদ উঠেছে কিনা কে জানে। যদি চাঁদ ওঠে, তাহলে ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে একটু হেঁটে আসলে হয়তো ভালোই লাগবে।

বারান্দার কাছে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। অপরিচিত কেউ। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবু তিনি পরিষ্কার বুঝলেন, লোকটির গায়ে ইউনিফর্ম।

'খট শব্দে স্যালুট হল—'স্যার আমি। ওসি সাহেব পাঠিয়েছেন।'

'কি ব্যাপার?'

'কিছু না স্যার। পাহারার জন্যে। ফি গ্রুড সেন্ট্রি।'

'পাহারা লাগবে না, তুমি চলে যাও।'

সে ইতস্তত করতে লাগল। ওসমান সাহেব দরাজ গলায় বললেন, 'যাও যাও, পাহারার কোনো দরকার নেই। আমি কি মিনিস্টার?'

এই বলেই তিনি প্রচুর হাসতে লাগলেন। খালিপেটে দু' পেগ পড়ার জন্যেই বোধহয় তাঁর কিঞ্চিৎ নেশা হয়েছে।

আলিমের দাঁতের ব্যথা কমে নি। আজ সারা দিন আরো বেড়েছে। ডান দিকের গাল ফুলে গেছে অনেকখানি।

'আলিম, গোটা চারেক প্যারাসিটামল খাও।'

'স্যার খাইছি।'

'লবণ পানি দিয়ে কুলকুচি কর।'

'করছি স্যার।'

'গরম সেঁক দাও। সেঁকটা খুব উপকারী।'

'স্যার, আর কিছু লাগব?'

'না, লাগবে না। খানা তৈরি হতে দেরি হবে নাকি?'

'জ্বি স্যার।''

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

আজ রাতে রান্নার দায়িত্ব নিয়েছে সাব্বির। ওয়াইল্ড ডাক রোস্টের সে নাকি একটি চমৎকার প্রিপারেশন জানে। দুপুরবেলাতেই সে বালিহাঁসগুলির চামড়া তুলে টক দৈ-এ ডুবিয়ে রেখেছে। টক দৈ-এ আট ঘন্টা ডোবান থাকতে হবে, এক মিনিটও এদিক--ওদিক হতে পারবে না।

আট ঘন্টা পার হয়েছে রাত আটটায়। এখন হাঁসগুলোকে স্টীম করা হচ্ছে। কেটলিতে পানি ফোটান হচ্ছে। কেটলির নল দিয়ে যে-বাষ্প বেরিয়ে আসছে, তাই ব্যবহার করা হচ্ছে স্টীম করবার জন্যে। কায়দাটা ভালোই। দিলু সমস্ত ব্যাপারটা দেখছে মুগ্ধ হয়ে। সে রান্নাঘরে একটা চেয়ার নিয়ে চেয়ারের উপর পা তুলে আরাম করে বসে আছে। এবং সারাক্ষণই কথা বলছে।

'সাব্বির ভাই, স্টীম দিচ্ছেন কেন?'

'স্টিম দেয়ার জন্যে মাংস নরম হবে।'

'টক দৈ-এ ডুবিয়ে রাখলেন কেন?'

'রেসিপিতে বলা হয়েছে, তাই। টক দৈ না পেলে ভিনিগারেও ডুবিয়ে রাখা যেত। টক দৈ ভিনিগারের চেয়ে ভালো।'

'এরপর কী করবেন?'

'পেটের ভেতর রসুন ভরে আগুনে ঝলসাব। ব্যস।'

'এই রান্না কার কাছ থেকে শিখলেন?'

'আমার এক মেক্সিকান বান্ধবী ছিল, ও রাঁধত। ও অনেক রকম রান্না জানত।'

দিলু একটু লজ্জা পেল। কেউ এভাবে বান্ধবীর কথা বলে নাকি? কিন্তু সাব্বির ভাই এমন সহজভাবে বলছেন, যেন বান্ধবী থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

'ওঁর নাম কী সাব্বির ভাই?'

'ওর নাম মারিয়া।'

'মারিয়া? কী বিশ্রী নাম।'

'বিশ্রী কোথায়? মেরি থেকে মারিয়া।'

'উনি দেখতে কেমন?'

'আমার কাছে তো ভালোই লাগত। খুব লম্বা। বড়ো বড়ো কালো চোখ। খুব শব্দ করে হাসত।'

'ওনার ছবি আছে?'

'আছে। দেখতে চাও?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা,দেখাব।'

'সাব্বির ভাই, আমার কয়েকটা সুন্দর ছবি তুলে দেবেন তো?'

'দেব।'

'কবে দেবেন?'

'যখন চাও। কাল ভোরেই দিতে পারি। এক কাজ কর। তোমার লাল শাড়ি আছে?'

'না, লাল স্কার্ট আছে।'

'ঠিক আছে, ঐ লাল স্কার্ট পরে পুকুরে সাঁতার দেবে। আমি ছবি তুলব। সবুজ পানির ব্যাকগ্রাউণ্ডে লাল স্কার্ট চমৎকার আসবে। তবে আমার ফিল্ম হাই স্পীড এ.এস.এ. ফাইভ হানড্রেড। আরেকটু কম হলে ভালো হত।'

'আমি তো সাঁতার জানি না।'

'ইস, সাঁতার দেওয়া ছবি ভালো আসত। জলকন্যার এফেক্ট পাওয়া যেত।'

'রাত-দিন আপনি শুধু ছবির কথা ভাবেন, তাই না?'

'হুঁ, ভাবি।'

দিলু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। দেখল, সাব্বির কীভাবে হাঁসের গায়ে স্টীম লাগাচ্ছে। দেখে মনে হয়, লোকটা এ-কাজ দীর্ঘদিন ধরে করছে। দিলু বলল, 'মারিয়া বুঝি খুব ভালো মহিলা ছিলেন?'

'হ্যাঁ। বাঙালি মেয়েদের মতো।'

'বাঙালি মেয়েরা বুঝি ভালো?'

'হ্যাঁ। বাঙালি মেয়েরা খুব সেন্টিমেন্টাল। সেন্টিমেন্টাল না হলে মেয়েদের মানায় না।'

'আচ্ছা সাব্বির ভাই, আমি কি সেন্টিমেন্টাল?'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে বুঝলেন?'

'জামিল সাহেরেব সঙ্গে বসে তুমি গল্প করছিলে, আমি শুনছিলাম।'

'কথা শুনেই বুঝে গেলেন?'

'দিলু, কথা শুনে অনেক কিছুই বোঝা যায়। আমি বুঝতে পারি।'

দিলু ভয়ে ভয়ে বলল, 'আর কী বুঝেছেন?'

'বুঝলাম যে, তুমি জামিল সাহেবের প্রেমে পড়েছ। এডোলেসেন্স লাভ। চম ৎকারজিনিস।'

দিলুর কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। মিনিট পাঁচেক কোনো কথাবার্তা না বলে সে চুপচাপ বসে রইল। সাব্বির হাসিমুখে বলল, 'কি দিলু, ঠিক বলি নি?'

দিলু কোনো জবাব দিল না।

রেহানা রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন, চোখমুখ লাল করে দিলু চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে আছে। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, 'তুই এখানে কী করছিস?'

'দেখছি।'

'বাবুকে একটু সামলাবার চেষ্টা করলেও তো পারিস। আমি কতক্ষণ দেখব?'

দিলু নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। রেহানা বললেন, 'সাব্বির, তোমার রান্নার কত দূর?'

'হয়ে এসেছে। এখন শুধু আগুনে ঝলসাব।'

'খাওয়া যাবে তো?'

'আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো না লাগলে এতটা কষ্ট শুধু শুধু করতাম না।'

রেহানা বললেন, 'আমাকে কিছু করতে হবে?'

'না, আপনি বিশ্রাম করুন।'

রেহানা চলে গেলেন। পুরুষমানুষ রান্নাঘরে হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, এটা তাঁর দেখতে ভালো লাগে না। অসহ্য লাগে। রেহানা বারান্দায় থমকে দাঁড়ালেন। নিচু গলায় বললেন, 'আজও বসেছ?'

'হ্যাঁ, বসলাম।'

'বোতল ক'টা এনেছ?'

'বেশি না, দুটো মাত্র। রেহানা, একটু বস আমার পাশে।'

'না।'

'কেন এরকম করছ? বেশি দিন তো আর বাঁচব না। শেষ ক'টা দিন আরাম করতে দাও।'

'বেশি দিন বাঁচবে না, এই তথ্যটা আবার কবে যোগাড় করলে?'

'এক পামিস্ট আমার হাত দেখে বলেছে, আমি বাঁচব মাত্র ষাট বছর। ভালো পামিস্ট। যা বলে, তা-ই ঠিক হয়। একটু বস রেহানা।'

রেহানা বসলেন। ওসমান সাহেব হৃষ্ট গলায় বললেন, 'একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি, দেখি বলতে পার কিনা।'

'ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে হবে না। বসে থাক চুপচাপ।'

'দারুণ ধাঁধা, দিলুর কাছ থেকে শিখেছি এবং নিজে নিজেই উত্তর বের করেছি। আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখছি, তুমি পারবে না। কি, বলব?'

ওসমান সাহেব দিলুর পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার ধাঁধাটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন।

কাঁচঘরের পাশের ফাঁকা জায়গাটায় হাঁস ঝলসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাতাসের জন্যে আগুন তেমন জ্বলছে না। বাঁশের চাটাই দিয়ে হাওয়া আটকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। জামিল তদারক করছে মোড়ায় বসে। দিলু

বারান্দা থেকে তাদের দেখল। এক বার ভাবল কাছে যাবে। কিন্তু গেল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। জামিল ডাকল, 'এই দিলু, এদিকে আয়।' দিলু এগিয়ে গেল।

'আমাদের ফটোগ্রাফার সাহেব কি হাঁসকে বাতাস দিয়ে শেষ করেছেন?' দিলু জবাব দিল না।

'কি ব্যাপার, এত গম্ভীর কেন?'

'মাথা ধরেছে।'

'আগুনের পাশে বোস, মাথা ধরা সেরে যাবে। চেয়ারটা টেনে আন।' দিলু বসল।

'গল্প শোনাব নাকি, বল। মারাত্মক একটা ভূতের গল্প জানি। বলব?'

'না।'

'না কেন? তোর কী হয়েছে?'

দিলু মৃদুস্বরে বলল, 'জামিল ভাই, আপনি আমাকে তুই করে বলবেন না।'

'কেন? বলব না কেন?'

'আমার খারাপ লাগে।'

'আপনি করে বলব। তাই চাস?'

দিলু জবাব দিল না।

'তোর কী হয়েছে?'

'তুই করে বললে আমি জবাব দেব না।'

'আপনার কী হয়েছে?'

দিলু গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল। জামিল তাকে হাত ধরে টেনে বসাল।

'দিলু, তোমার কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি?'

'না, কিছু একটা হয়েছে। আমাকে বল।'

'আমার খুব মন খারাপ লাগছে। মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'দূর বোকা মেয়ে!'

জামিল শব্দ করে হাসল। একটা হাত রাখল দিলুর পিঠে। নিশাত দূর থেকে দৃশ্যটি দেখল। এক বার ভাবল—দিলুকে সে ডাকবে। কিন্তু ডাকল না। আগুনের পাশে বসে থাকা মানুষ দু'টিকে সুন্দর লাগছে। বাবু জেগে উঠে কাঁদছে। রেহানা এসে বললেন, 'বাবুকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দে না নিশাত।'

'আমি পারব না।'

'দাঁড়িয়েই তো আছিস।'

'দাঁড়িয়ে আছি না মা। দেখছি।'

'কি দেখছিস?'

'দিলুকে দেখছি। দিলু কেমন বড়ো হয়ে যাচ্ছে, দেখেছ মা?'

রেহানা তাকালেন। তিনি দিলুর বড়ো হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখলেন না। দিলু চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে। এটা একটা অভদ্রতা, দিলুকে বলতে হবে। তিনি বাবুর কাছে গেলেন। নিশাত চড়া গলায় বলল, 'দিলু, তুই একটু আয়।'

দিলু শান্ত স্বরে বলল, 'না।' জামিল বলল, 'যাও না, শুনে আস, কি জন্যে ডাকছে।'

'না, আমি যাব না।'

জামিল কৌতূহলী হয়ে তাকাল। তার মনে হল, দিলু কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করেছে।

দিলু মৃদুস্বরে বলল, 'জামিল ভাই।'

'কি।'

'চলুন, আমরা আজ সারা রাত এরকম আগুনের পাশে বসে গল্প করি।'

'কী নিয়ে গল্প করবে?'

'আগে বলুন, আপনি রাজি আছেন কিনা?'

'না। দারুণ ঘুম পাচ্ছে। তার উপর সারা রাত এরকম ঠাণ্ডায় বসে থাকলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে।'

দিলু উঠে দাঁড়াল। জামিল বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?' দিলু তার জবাব দিল না।

১১

রোস্ট ডাক জিনিসটি যে খেতে এতটা ভালো হবে, রেহানা কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁর আফসোস হতে লাগল, তিনি পাশে বসে রান্নার পুরো ব্যাপারটা কেন দেখলেন না। সাব্বির বলল, 'আমি খুব গুছিয়ে লিখে রেখে যাব, আপনার যখন ইচ্ছা রান্না করতে পারবেন।'

'বালিহাঁস ছাড়া সাধারণ হাঁস দিয়ে রান্না হবে?'

'জানি না। হওয়া তো উচিত। আমি অবশ্যি কখনো ট্রাই করি নি।'

জামিল বলল, 'আমার মনে হয় না, সাধারণ হাঁস দিয়ে এটা হবে। সাধারণ হাঁসগুলোর গায়ে প্রচুর চর্বি থাকে। বালিহাঁসের গায়ে চর্বি থাকে না।'

নিশাত হাসিমুখে বলল, 'আপনি বুঝি পৃথিবীর সব জিনিস জানেন?'

'না, আমি খুব কমই জানি, মাঝে মাঝে লজিক খাটিয়ে দু'–একটা কথা বলতে গিয়ে সবাইকে বিরক্ত করি।'

ওসমান সাহেব বললেন, 'দিলুকে দেখছি না যে! দিলু কোথায়?'

'ও খাবে না। ওর মাথা ধরেছে।'

'চেখে দেখুক। ডেকে নিয়ে আয় তো নিশাত।'

'অনেক বলেছি বাবা।'

জামিল বলল, 'আমি নিয়ে আসছি।'

দিলু কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। জামিলকে ঢুকতে দেখে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। আলো চোখে লাগে বলে হারিকেন ডিম করে রাখা হয়েছে। জামিল বলল, 'দিলু, আমাদের সঙ্গে এসে বস! জিনিসটা বেশ ভালো হয়েছে। তোমার ভালো লাগবে।' দিলু জবাব দিল না।

'তুমি হয়তো লক্ষ কর নি, আমি তুমি করে বলছি। এস দিলু। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা অনেক রাত পর্যন্ত আগুনের পাশে বসে গল্প করব।'

'আমার মাথা ধরেছে জামিল ভাই।'

'এমন মজার গল্প বলব যে মাথা ধরা সেরে যাবে। এস!'

দিলু উঠে এল। গল্প খুব জমে উঠল খাবার টেবিলে। ওসমান সাহেব পর্যন্ত একটা হাসির গল্প বলে ফেললেন। নাসিরুদ্দিন হোজ্জার গল্প। সবারই জানা, তবু সবাই হাসল। কিছু কিছু সময় আসে যখন সব কিছুই ভালো লাগে।

সাব্বির বলল নিউইয়র্কে এক হোটেলে তার অভিজ্ঞতার গল্প—তার বিছানার সঙ্গে একটি যন্ত্র ফিট করা। সেখানে লেখা, গা ম্যাসাজ করতে হলে এখানে দু'টি কোয়ার্টার ফেলুন। বেচারা সরল মনে দু'টি কোয়ার্টার ফেলল। তারপর বিছানায় শোয়ামাত্র বিছানা কাঁপতে শুরু করল। সে কি কাঁপুনি! বসে থাকা যায় না, ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। মিনিট দশেক পর কাঁপুনি থামল। কিন্তু যন্ত্রটির বোধহয় কিছু একটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হল কাঁপুনি। থামে, আবার শুরু হয়। আবার থামে, আবার শুরু হয়।

গল্প শুনে হাসতে হাসতে রেহানা বিষম খেলেন এবং মনে-মনে স্বীকার করলেন ছেলেটি রসিক। প্রচুর রসজ্ঞান না থাকলে গল্পটি এত সুন্দরভাবে বলা সম্ভব নয়। ওসমান সাহেব বললেন, 'সবাই একটা-না-একটা গল্প করছে। নিশাত চুপ করে আছে কেন?'

'বাবা, আমি শুনছি।'

'শুধু শুনলে হবে না। বলতেও হবে।'

নিশাত মৃদুস্বরে বলল, 'একটা মজার জিনিস লক্ষ করলাম আমি। জামিল ভাই হঠাৎ করে দিলুকে তুমি তুমি করে বলছেন।'

জামিল শান্ত স্বরে বলল, 'দিলু বড়ো হচ্ছে, এখন আর ওকে তুই বলা ঠিক নয়।'

'বড়ো কোথায়, ওর মাত্র চোদ্দ বছর বয়স!'

দিলু শীতল কণ্ঠে বলল, 'নভেম্বরে আমার পনের হয়েছে আপা। তোমার কিছু মনে থাকে না।'

'পনের হলেই যদি তুমি বলতে হয়, তাহলে তো আমাদেরও তুমি বলতে হয়।'

দিলু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, 'দিলু মা'র মনটা মনে হয় খারাপ।' নিশাত বলল, 'ওর মন ভালোই আছে। লোকজন ওকে তুমি করে বলা শুরু করেছে। মন খারাপ হবে কেন?'

'আমার মন ভালোই আছে।'

সাব্বির বলল, 'মন ভালো থাকলে আমাদের একটা হাসির গল্প শোনাতে হবে।' দিলু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করল, 'পরীক্ষায় গরু সম্পর্কে রচনা এসেছে। সবাই লিখছে। একটি ছেলে বলল—স্যার, জহির নকল করছে। স্কুলের মাঠে একটা গরু বাঁধা আছে। জহির জানালা দিয়ে গরুটা দেখছে আর লিখছে।' ওসমান সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মদ্যপানজনিত কারণে তিনি ঈষৎ তরল অবস্থায় আছেন। ছোট-ছোট হাসির ব্যাপারগুলো তাঁর কাছে অসাধারণ মনে হল।

'আরেকটা বল তো মা দিলু।'

'ইতিহাসের স্যার প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা বল তো, শেরশাহ্ কোথায় মারা গেছেন? ছাত্র বলল—ইতিহাস বইতে স্যার। পনের পাতায়।'

রেহানার মনে হল, তাঁর এই মেয়েটি একটু অন্যরকম হয়েছে। কারো সঙ্গেই ঠিক মেলে না। একটু যেন আলাদা। নিশাত বলল, 'দু'টি গল্পই জামিল ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা, তাই না?'

'হ্যাঁ। তাতে কোনো অসুবিধা আছে?'

দিলু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে, যেন সে সত্যি জবাবটি শুনতে চায়। সাব্বির বলল, 'এক কাপ চা খেতে পারলে মন্দ হত না। কেউ কি কষ্ট করে চা বানাবে?'

নিশাত উঠে দাঁড়াল, 'আমি বানাব। দিলু, তুই আয় তো আমার সঙ্গে, একা-একা ভয় লাগে।'

কেটলিতে চায়ের পানি ফুটছে। নিশাত এবং দিলু বসে আছে চুপচাপ। দিলুর মুখ থমথম করছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সে কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁদবে। নিশাত বলল, 'তুই চা খাবি নাকি দিলু?'

'না।'

'আয়, আমরা বরং কফি খাই। ইনসটেন্ট কফির পটটা কোথায়, দেখেছিস?'

'আপা, আমি কফি খাব না। তুমি কী বলবে, বল।'

'আমি আবার কী বলব?'

'কিছু একটা বলবার জন্যেই আমাকে রান্নাঘরে এনেছ। এখন বল, কী বলবে।'

'দিলু, তুই কি রাগ করেছিস?'

দিলু চুপ করে রইল। নিশাত বলল, 'চল, দু' জনে দু' কাপ চা নিয়ে পুকুরঘাটে বসি। যা, গরম চাদর একটা গায়ে জড়িয়ে আয়।'

'তুমি কি ওখানে নিয়ে আমাকে কিছু বলতে চাও?'

'আয় না গিয়ে বসি, তারপর বলা যাবে। যা, চাদর–টাদর কিছু একটা গায়ে দিয়ে আয়।'

দিলু উঠে গেল। লাল রঙের একটা শাল বের করে গায়ে দিল। কাঁচঘরের পাশে জামিল সিগারেট টানছে। সে উঁচু গলায় বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?'

দিলু জবাব দিল না। জামিল ভাই তুই বললে সে আর জবাব দেবে না। জামিল বলল, 'দিলু কোথায় যাচ্ছ?'

'পুকুরঘাটে।'

'একা–একা? একটু সাবধানে থাকবে।'

'কেন?'

'ভূত আছে।'

'আপনার মাথা আছে।'

জামিল শব্দ করে হাসল, 'তুমি চাইলে আমি সাহস দেবার জন্যে সঙ্গে থাকতে পারি।'

'সাহস দিতে হবে না।'

পুকুরঘাটটি বড়ো বেশি নির্জন। মাঝে মাঝে হাওয়া আসে, গাছের পাতায় সরসর শব্দ হয়। ক্রমাগত ঝিঁঝি ডাকে, আবার কোনো এক বিচিত্র কারণে হঠাৎ ঝিঁঝির ডাক বন্ধ হয়ে চারদিকে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। নিশাত বলল, 'একটু যেন ভয়–ভয় লাগে রে।'

'ফিরে যাবে?'

'নাহ্, বোস।'

তারা বসল। নিশাত ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। দিলু বলল, 'আপা, তুমি কী বলতে চাও, বল।' নিশাত চাপা স্বরে বলল, 'আমার যখন তোর মতো বয়স, তখন জামিল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। জামিল ভাইরা তখন আমাদের পাশের বাসায় থাকতেন। মগবাজারে।'

'আপা, আমি জানি।'

'না, সবটা তুই জানিস না। তারপর কি হল, শোন। চোদ্দ–পনের বছর বয়সটা তো খুব খারাপ। সেই বয়সে কাউকে ভালো লাগলে সেটা যে কত তীব্র হয়, তা তুই বুঝতে পারছিস কিছুটা। পারছিস না?'

দিলু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। নিশাত বলল, 'অল্প বয়সের ভালো লাগার অনেক রকম ব্যাপার আছে। যখন কলেজে উঠলাম, তখন লক্ষ করলাম, জামিল ভাইকে আর ভালো লাগছে না। এরকম হয়। বি. এ. পড়বার

সময় বিয়ে হয়ে গেল। যার সঙ্গে বিয়ে হল, সে জামিল ভাইয়ের ছেলেবেলার বন্ধু।'

'এসব তো আপা আমি জানি।'

'সবটা জানিস না। শোন মন দিয়ে। তোর দুলাভাই এক জন চমৎকার মানুষ ছিলেন। পৃথিবীর যে-কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারত। কিন্তু আমি হই নি। আমার সারাক্ষণই জামিল ভাইয়ের কথা মনে হত।'

নিশাত চোখ মুছল। দিলু বলল, 'আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন আপা?'

'জানি না কেন।'

'আমার এসব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

নিশাত চুপ করে রইল। কাছেই কোথাও সরসর শব্দ হচ্ছে। দিলু বলল, 'চল আপা, ঘরে যাই।'

'আরেকটু বোস। তোকে একটা মজার গল্প বলি। ক্লাস টেনে উঠলাম যেবার, সেবার আমি আর জামিল ভাই মিলে ঠিক করলাম পালিয়ে যাব।'

'কোথায পালিয়ে যাবে?'

'সে-সব কিছু ঠিক হয় নি। ঐ বয়সে ভেবেচিন্তে তো কিছু কখনো করা হয় না। ভেবেচিন্তে কাজ করতে পারলে এত ঝামেলা হয়?'

নিশাত হাসতে চেষ্টা করল।

'গল্প-উপন্যাসের মতো সত্যি সত্যি এক দিন স্কুলে যাবার নাম করে চলে গেলাম কমলাপুর রেল স্টেশন।'

'তোমরা যাও নি নিশ্চয়ই?'

'না, জামিল ভাই আসেন নি।'

'ভালোই করেছ, যাও নি।'

'না, ভালো করি নি। এখনও তার জন্যে মনে একটা কষ্ট আছে আমার।'

দিলু ছোট্ট করে বলল, 'তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও?'

নিশাত জবাব দিল না। দিলু দ্বিতীয় বার বলল, 'তুমি কি জামিল ভাইকে বিয়ে করতে চাও?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে চাই।'

দিলুর মনে হল নিশাত কাঁদছে। গলার স্বর যেন ভাঙা-ভাঙা।

নিশাত খুব শক্ত মেয়ে। সে কি সত্যি সত্যি কাঁদবে? বিশ্বাস হয় না। দিলু মৃদুস্বরে বলল, 'জামিল ভাইকে কিছু বলেছ?'

'না।'

'বল তাঁকে। তিনি তোমার জন্যেই আসেন।'

নিশাত দিলুকে বুঝতে চেষ্টা করল। শান্ত ভাবলেশহীন মুখ। উজ্জ্বল চোখ। বড়ো মায়াবতী চেহারা দিলুর।

নিশাতের মনে হল, আজ ঠিক এই মুহূর্তে দিলুর বয়স অনেকখানি বেড়ে গেছে।

লেবুফুল ফুটেছে কোথাও, মিষ্টি গন্ধ আসছে। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। নিশাত কাঁদতে শুরু করল। দিলু বসে রইল চুপচাপ। নিশাত ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বেঁচে থাকা বড়ো কষ্ট।'

'আপা, চল যাই। শীত লাগছে।'

'আরেকটু বোস। প্লীজ।'

তারা দু' জন বসে রইল প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। এক সময় হাতে টর্চ নিয়ে তাদের খুঁজতে এল জামিল।

'পানিতে ডুবে গেছ কিনা, তাই দেখতে এলাম। মনে হচ্ছে ঠিক মতোই আছ। কাজেই ডিসটার্ব না করে চলে যাচ্ছি। শুধু একটা জিনিস তোমরা মনে রাখবে, এ-বাড়িতে ভূত আছে। ঠাট্টা না, সত্যি।'

নিশাত কিছু বলল না। দিলু বলল, 'জামিল ভাই, আপনি বসুন এখানে। আপা কী যেন বলবেন আপনাকে। টর্চটা দিন। আমি চলে যাই।'

'যেতে পারবে একা?'

'পারব।'

দিলু যেতে যেতে থমকে পিছনে ফিরে তাকাল। অন্ধকারে জামিল ভাইয়ের জ্বলন্ত সিগারেট ওঠানামা করছে। এর বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কত কাছাকাছি বসে তারা দু' জন। নিশাত আপা যদি আজ বলে—জামিল ভাই, চলুন আজ সারা রাত আমরা গল্প করি, তাহলে জামিল ভাই কী বলবেন?

রাত অনেক হয়েছে। ওসমান সাহেবের ঝিমুনি ধরে গেছে। তিনি উঠব উঠব করছিলেন, কিন্তু আবার ঠিক উঠতেও চাচ্ছিলেন না।

দিলু এক সময় এসে দাঁড়াল তার পাশে।

'ঘুমাস নি মা?'

'না, বাবা।'

'কোথায় ছিলি?'

'পুকুরঘাটে বসেছিলাম আপার সঙ্গে। বাবা, আমি তোমার পাশে একটু বসি?'

ওসমান সাহেব হাত বাড়িয়ে পাশের চেয়ারটি টানতে গেলেন। দিলু বলল, 'বাবা, আমি তোমার সঙ্গে বসব। আমাকে একটু জায়গা দাও।' ওসমান সাহেব সরে জায়গা করে দিলেন। নরম স্বরে বললেন, 'দিলু, তোর কী হয়েছে?'

'জানি না বাবা।'

ওসমান সাহেব মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মনে হল দিলু কাঁদছে। কিন্তু দিলু কাঁদছিল না।

ওসমান সাহেব ভরাট গলায় বললেন, 'যাও মা, ঘুমাতে যাও। ঠাণ্ডা

হাওয়া দিচ্ছে, শরীর খারাপ করবে।'

রেহানা বাবুকে ঘুম পাড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে ছিলেন। দিলুকে দেখে বললেন, 'তোর কি শরীর খারাপ? তোকে এমন লাগছে কেন?'

'শরীর ভালোই আছে।'

'নিশাত কোথায়?'

'পুকুরঘাটে।'

রেহানা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'এত রাতে একা-একা সেখানে কী করছে?'

'একা-একা না মা। জামিল ভাই আছেন।'

রেহানা উঠে বসলেন। তাঁর ধারণা ছিল, জামিলকে নিশাত সহ্য করতে পারে না। তিনি কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও জিজ্ঞেস করলেন না। দিলু বলল, 'মা, আমি তোমার পাশে একটু শুয়ে থাকি?'

দিলু মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। ফিসফিস করে বলল, 'নিশাত আপার সঙ্গে জামিল ভাইয়ের বিয়ে হলে ভালোই হবে মা।'

'কী বলছিস বিড়বিড় করে! পরিষ্কার করে বল।'

'কিছু বলছি না মা।'

দিলু আরো শক্ত করে মা'কে জড়িয়ে ধরল। চারদিকে আবছা অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে। শীতের হিমেল হাওয়া। বাবু ঘুমের মধ্যেই কেঁদে উঠল। একটা টিকটিকি ডাকল—টিক টিক টিক।

১২

দিলু ভাসছিল মাঝপুকুরে।

তার পরনে লাল একটা স্কার্ট। মাথার কালো চুল চারদিকে ছড়ান। দিঘির সবুজ জলের ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটি অসাধারণ কম্পোজিশন। এক জন ফটোগ্রাফার এরকম একটি দৃশ্যের জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করে।

সাব্বির দীর্ঘ সময় দিলুর ভেসে থাকা শরীরটির দিকে তাকিয়ে রইল। ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে। স্কার্টের রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। সাব্বির ছবি তুলতে গিয়েও তুলতে পারল না। পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল, 'তোমরা কে কোথায় আছ, এই মেয়েটিকে বাঁচাও।'

দমকা একটা হাওয়া এল তখন। সে-হাওয়ায় দিলু ভেসে আসতে লাগল ঘাটের দিকে। যেন সে বলছে—"ছবি তুলুন সাব্বির ভাই।"